জ্যোতিঃহারা

অনুরূপা দেবী

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ॥"

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—সাড়ে ছয় টাকা—

অঙ্কন—শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীভানু রায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৩৭।বি, বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা-৯ হইতে
শ্রীপ্রবোধকুমার পাল কর্তৃক মুদ্রিত

পরম স্নেহাস্পদ

শ্রীমান্ ৺গণদেব মুখোপাধ্যায়

প্রাণাধিকেষু—

ভাইটি আমার!

তোমার 'ছোটদি'র লেখা যেমনই হোক্‌, তোমার কাছে বড়ই আদরের ছিল। তোমার এই আকস্মিক অপগত হইয়া যাওয়ার মাত্র চারদিন পূর্ব্বেও বলিয়াছ, বইগুলি শীঘ্র শীঘ্র ছাপাইয়া ফেলুন, আর আমায় একখানা উপহার দিন।

এ জন্মের মত তোমা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি,-কিন্তু তোমাকে যে চির-দিনের জন্য হারাই নাই,—এই পরিচ্ছিন্ন জীবনের পরপারে, মহামৃত্যুঞ্জয়ী মহেশ্বররূপে অনন্তকালের জন্য তুমি যে আমাদেরই হইয়া রহিয়াছ—এই পূর্ণবিশ্বাসে 'জ্যোতিঃহারা'খানা তোমাকেই 'উপহার' দিলাম। আমার অজ্ঞানবাধিত দৃষ্টি তোমায় না দেখুক, তোমার দৃষ্টি তো আজ সর্ব্ববাধা-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বত্রই প্রসারিত। তাই ভরসা যে তোমার ছোটদিদির এই স্নেহোপহারটুকু তোমার কাছে পৌঁছিবেই।

পুণ্যবারাণসীধামে, পুণ্যাহ তিথিযোগে, ভক্তিপূত বাসনা-বন্ধনহীন শান্তিপূর্ণ নিস্পৃহা দ্বারা তুমি আজ যে জীবন লাভ করিয়াছ, আমি জানি সেখানে অজ্ঞানের বা বিস্মৃতির বিন্দুমাত্র স্থান নাই,—তাহা শুদ্ধ জ্ঞানময়।

তোমার—

ছোটদিদি

ভূমিকা

'সুপ্রভাত' মাসিক পত্রিকায় 'বিপত্নীক' নাম দিয়া এই উপন্যাসখানি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। অনুপযোগী বোধে নামটি এবার পরিবর্ত্তিত হইল।

বইখানি ভাল করিয়া সংশোধন করিয়া ছাপাইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আরম্ভেই আকস্মিক বিপদের ভীষণ বজ্রাঘাতে সর্ব্ব শক্তি হারাইয়া 'জ্যোতিঃহারা'র কোন ভারই রাখিতে পারি নাই। যদি কখনও পুনর্মুদ্রণের সুযোগ ঘটে, তবেই এ ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে,—নচেৎ নয়।

বিষয় জটিল, জ্ঞান অল্প, যাঁহারা শিক্ষাগুরু, তাঁহাদের [illegible] হয়ত অল্পজ্ঞতা নিবন্ধন কোথাও কোথাও ভ্রান্তিপূর্ণ হইয়া গিয়া থাকিবে। ভাল করিয়া দেখিবার বা দেখাইবার অবসর ভাগ্যদেবও তো দিলেন না।

সহৃদয় পাঠকবর্গ নিজগুণে সকল ত্রুটি কথঞ্চিৎ সহনীয় করিয়া লইলেই কৃতার্থ হইব।

মজঃফরপুর, লেখিকা

১২ই শ্রাবণ, ১৩২২

চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন

এই পুস্তকখানি সকলের নিকট 'মন্ত্রশক্তি' 'মা' ইত্যাদির মত জনপ্রিয় বা নাট্যাদিজগতে একটা আলোড়ন না আনিলেও স্যার জগদীশ বসু প্রভৃতির মত লোকেদের প্রশংসালাভে ধন্য হইয়াছে। স্নেহাস্পদ গজেন্দ্র-কুমার বিশেষ আগ্রহ পূর্ব্বক এ বইএর পুনর্মুদ্রণের ভার লওয়ায় আমি বিশেষ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা বোধ করিয়াছি। তাঁরা মনে করেন এর মূল 'বিপত্নীক'

সাধারণ উপন্যাসের সহিত সমশ্রেণীয় নহে এবং এই ধরণের উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় একখানিও নাই। 'মেরী করেলী'র রচনাবলীর সহিত ইহা তুলনীয়।

বইখানি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিবার বিশেষ আগ্রহ ছিল কিন্তু এবারে নিজের বিশেষ অসুস্থতার জন্য ইচ্ছানুরূপভাবে ইহার সংস্কার সাধন করিতে পারি নাই, তথাপি যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, এবং সেই জন্য প্রয়োজন বোধে কতকগুলি নূতন পরিচ্ছেদও সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

নিবেদিকা

লেখিকা

এক

বসন্তের দীর্ঘায়ু অপরাহ্ণের পর সুধীরে সন্ধ্যা নামিতেছিল, এমন সময় সহসাই উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে ধূসর মেঘজাল সন্থ অস্তগত সূর্য্যের শেষ কনক-রশ্মিগুলার উপর ব্যাপ্ত হইয়া এমন একটা নূতন শোভার সৃষ্টি করিল যে ঝড় উঠিবার ভয়ে ত্রস্তপদে গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনশীল পথিকেরাও চকিতনেত্রে একবার ঐ দিক পানে না চাহিয়া চলিয়া যাইতে পারিল না। এ অবস্থায় নিজেদের বাড়ীর ছাদে দাঁড়াইয়া অণিমা যে সে সৌন্দর্য্য প্রাণের সহিত উপভোগ না করিয়া পারিবে সেটা সম্ভব নয়।

স্তব্ধ নদী আসন্ন ঝড়ের প্রতীক্ষায় উর্দ্ধে চাহিয়া আছে। নদীবক্ষে খেয়ার নৌকা আরোহী লইয়া তীরের মত ওপারের দিকে ঝড় এড়াইতে ছুটিয়া চলিয়াছে। নিঝুম গাছপালার মধ্যে ছায়াময় বাঁধা ঘাট জনশূন্য। একখানা বেমেরামতি নৌকা নদীর চরে উল্টাইয়া মেরামতি কার্য্য হইতেছিল, তাহারই আড়ালে ছিন্ন কম্বল বিছাইয়া নাগা-সন্ন্যাসী ধুনীর আগুনে গাঁজা চড়াইয়া উর্দ্ধে চাহিতেছে।

ছাদের আলিসায় হাত রাখিয়া হাতের উপর ভর দিয়া অণিমা নদীর দিকে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে। সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বক্ষণে গভীর চিন্তামগ্ন বীরের মৃদুশ্বাসের ন্যায় অত্যন্ত বিলম্বে শ্বাস লইয়া বাতাস আসন্ন সমরের প্রস্তুতিতে মগ্ন আছে। অণিমার মুগ্ধ অনিমেষ দৃষ্টি রঞ্জিত মেঘের উপরেই সংস্থাপিত। মেঘের বর্ণ ও আকার যতই পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিল

দৃষ্টিও ততই বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইতে লাগিল। স্বর্গের স্বর্ণদ্বার যেন আজ এই সোনা মাখানো কালো মেঘের ভিতর হইতে ক্ষণে ক্ষণে চকিত বিদ্যুৎ-শিখার মধ্য দিয়া সুস্পষ্ট হইয়া দেখা যাইতেছিল। মেঘচ্ছায়ায় কৃষ্ণ, সোনালি আভায় সমধিক উজ্জ্বল দুইটি কালো চোখের মধ্যেও বুঝি তাহারই আভাস ভাসিতেছে—দেখিতে দেখিতে সমাধি-জাগ্রৎ যোগীর নিস্পন্দ শরীরে প্রথম স্পন্দানুভূতির মতই বদ্ধ বায়ু স্তব্ধ আকাশে ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কুণ্ডলিত যজ্ঞ-ধূমের মত বাতাসের সহিত ধূসর মেঘ পূর্ব্বে দক্ষিণে দ্রুতবেগে ব্যাপ্ত হইয়া আসিল, তখন আর তার ভিতর অস্তগত সূর্য্যের শেষ আলোটুকু বিদায়ের ম্লান হাসি হাসিতে পারিল না, পরিবর্ত্তে অবসানের অন্ধকার আকাশতলকে নিজের নিরানন্দ বুকের মধ্যে নিবিড় আলিঙ্গনে চাপিয়া ধরিতে বাধ্য হইল।

"আশ্চর্য্য! সুন্দর!" নির্নিমেষে চাহিয়া চাহিয়া অণিমার ভাব-বিমুগ্ধ চিত্ত সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মহিমা ধারণা করিতে না পারিয়া মুগ্ধ কণ্ঠে আত্মগতই বলিয়া উঠিল, "কি সুন্দর!" প্রকৃতির এমন রূপ বুঝি অনেক দিন তার চোখে পড়ে নাই! সে গভীর ভাবে নিঃশ্বাস ফেলিল, "বাবা থাক্‌তে এই পৃথিবী এমনি সুন্দরই তো ছিল, তারপর থেকে সবই যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে, কিছুই যেন চোখে পড়ে না।" এদিকে ঝড়ের বাতাস হু হু করিয়া বহিল। নদীতীরের গাছের মাথাগুলা আতঙ্কে নত হইয়া পড়িল এবং নিদ্রিত নদীর জলে স্বপ্নের আবেশের মত প্রথমে অতি মৃদু হিল্লোল এবং পরমুহূর্ত্তে প্রমত্ত কল্লোল উত্তাল হইয়া দেখা দিল। অণিমা মুগ্ধ দৃষ্টি মেলিয়া সংগ্রাম-প্রবৃত্তা প্রকৃতির রুদ্ররূপ তারও প্রায় তেমনি সংক্ষুব্ধ অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে লাগিল।

অণিমার পক্ষে ঝড় জয় করিয়া তাহার বিভিন্নরূপ উপভোগ করার সাধ টিকিল না। ঝড় ভাল করিয়া উঠিতে না উঠিতে তার সাহসিকতার

প্রতি ক্রূর বক্র ও বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া মেঘফাটা জলের ফোঁটা পৃথিবীর উপর ছড়াইয়া পড়িল। সাঁ সাঁ করিয়া কালো মেঘ পূর্ব্ব-দক্ষিণের সমস্তটাই গ্রাস করিয়া লইল।

অবস্থা দেখিয়া অগত্যাই বিরক্তভাবে বৃষ্টিভরা মেঘের দিকে ভ্রূকুটিভরা নেত্রে চাহিয়া দ্রুতপদে সে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। বাহিরে দাঁড়াইয়া ঝড় খাওয়া আর ঘটিল না।

বৃষ্টিটা জোরেই আসিয়াছিল। বিদ্যুতের তীব্র আলো ক্ষণ চকিত হইয়া উঠিতেছিল, নিরাশ্রয় পাখীগুলা প্রাণপণে হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া বাসার দিকে ছুটিতেছিল, পাখা তাদের ভিজিয়া ভারী হইয়া আসিতেছে,—আহা রে নিরাশ্রয় জীবগুলি! অণিমা পারিলে তাঁদের আশ্রয় দিত।

গঙ্গাতীরের বারান্দায় চৌকি টানিয়া বসিতেই কানে আসিয়া বাজিল—গানের সুর, তাদের পাশের বাড়িতে কারা আসিয়াছে, গান প্রায়ই শোনা যায়। কান পাতিয়া শুনিল—

রুদ্র তাঁহার জটাজুট ঐ ছড়িয়ে দেছেন আকাশে
অগ্নিনাগের লীলার মত তড়িৎলতা বিকাশে।
স্পন্দহারা পবন আজি মূর্চ্ছাহত বিস্ময়ে
পুষ্পরথে পূজার ডালি শুষ্ক হ'ল কার ভয়ে;
মেঘ ডমরুর তালে তালে হৃদয় কাঁপে তরাসে।
ধূর্জ্জটীর নেত্রানলে দগ্ধ হ'ল মদন তো,
মূর্চ্ছি কোথায় কাঁদছে রতি বিদায় নিল বসন্ত;
অটবীরা আকুল চোখে চেয়ে আছে,
পাখীরা খুঁজছে বাসা গাছে গাছে,
নদীর বুকে খেয়ার 'পরে যাত্রী মরে হুতাশে॥

স্থির দৃষ্টিতে সে ধুনন্-যন্ত্রে পেঁজা কার্পাস তুলার মত নদীর বুকে

ঢেউগুলার উদ্দাম ক্রীড়া ও সক্রোধ আস্ফালনে তীরভূমে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যাওয়ার দৃশ্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। সুদৃঢ় দুর্গ-প্রাচীরের উপর যেন শত্রুপক্ষের অসংখ্য গোলা-বৃষ্টি হইতেছে এবং তার অভেদ্য অঙ্গে পড়িয়া ফাটিয়া ঠিক্‌রাইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া যাইতেছে,—প্রাচীর ভেদ করিতে পারিতেছে না। প্রবলের নিকট দুর্ব্বলের শক্তি পরাভূত হইতেছে।

সহসা নৌকার পাশের সেই সন্ন্যাসীটির কথা তার মনে পড়িয়া গেল। সে কি করিতেছে? একে সন্ধ্যা, তার উপর ঘন-মেঘান্ধকার, কিছুই দৃষ্ট হয় না, বৃষ্টিতে ধুনী নিবিয়া গিয়াছে। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে নৌকার পাশে অস্পষ্ট মনুষ্য-মূর্ত্তির আভাস পাওয়া গেল। কি আশ্চর্য্য! লোকটা নিঃশব্দে বসিয়া ভিজিতেছে না কি? দ্রুত উঠিয়া জানালার শার্সি খুলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "সন্ন্যাসী ঠাকুর!"

প্রকৃতির ভীষণ হট্টরোলে তার ক্ষীণ স্বর অতদূরে ভাসিয়া যাইতে সক্ষম হইল না, প্রতিধ্বনি তাহারই কানের কাছে শুধু চীৎকার করিয়া উঠিল। গভীর-গর্জ্জনে শত শত মত্ত হস্তীর মত উন্মত্ত ঝটিকা ত্রস্ত পৃথিবীকে তাল ঠুকিয়া দুরন্ত সমরে আহ্বান করিতেছিল। নীচের তলায় রান্নাঘরের দিকে শুধু আলো জ্বলিতেছে ও মনুষ্যের কথার সাড়া সেই দিক হইতেই যেটুকু আসিতেছে, তা ছাড়া চারিদিকেই নিবিড় অন্ধকার ও বায়ুর আর্ত্ত কণ্ঠ ভিন্ন আর কোন সাড়া নাই। অন্ধকারে পা টিপিয়া নীচে নামিল, ঘাটের দরজা খুলিতেই উদ্দাম বায়ু মুক্ত দ্বারপথে জয়োন্মত্ত আক্রমণকারী সৈন্যদলের মত হো হো করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, যেন আক্রমণ করিতে গিয়াও চকিত বিদ্যুতালোকে তার মুখ দেখিয়া সম্ভ্রমে স্তব্ধ হইয়া গেল, যে মুখে করুণার এমন আলো জ্বলিতে পারে সে অঙ্গ আততায়ীর স্পর্শযোগ্য নয়। কৌরব সভাপ্রেরিত দূত প্রতিকামী বুঝি এমনই বিস্ময় সঙ্কোচে দ্যূতপণবদ্ধা পাণ্ডব-মহিষীর দিব্য মুখে চাহিয়া লজ্জায় নতমুখ হইয়াছিল। দ্বারের

মিঃ দত্তের মেয়েকে বিবাহ করিবার আকাঙ্ক্ষা অবশ্য তার মনে কোন দিনই স্থান পায় নাই, তবে তাকে এযাবৎ সাগ্রহ প্রশংসায় সে স্মরণ করিয়া আসিয়াছে এবং তার ফলে মনের ফলকে তার মুখ সাধরাণাপেক্ষা স্পষ্টরূপে ফুটিয়া রহিয়াছিল বইকি! অণিমার বিদ্যাবুদ্ধি স্বদেশ-প্রীতিকে সে শ্রদ্ধা করিয়াছে। তার সেই উন্নত জীবনের সহিত নিজ-জীবন কর্ম্মে, প্রেমে, দেশসেবায় এক করিতে পারিবে, ইহা ভাবিতে তার দেহমন পুলক-বিস্ময়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

চার

প্রত্যহই দেখা হয়, তবু প্রতিদিনই মনে হয় সুদীর্ঘ কালান্তরে পুনর্মিলন ঘটিল। হয়ত কবিজনেরা ইহাকেই প্রণয়-ব্যাধি নাম দিয়া তাহারও চিকিৎসা বিধান করিয়া রাখিয়াছেন, পদ্মপত্রে শয়নপূর্ব্বক বিকচ-কমলযুক্ত পদ্মপত্রের বায়ুসেবন ইত্যাদি দ্বারায়। এদিনে চিত্তভরা আশা এবং মনভরা আনন্দ লইয়া যামিনী অণিমার সন্দর্শনে ছুটিল। মিঃ দত্তের সুব্যবস্থা-মত বৈকালিক চা পান তার এ বাড়ীতেই কায়েমী হইয়া আছে, তবে আজ সন্ধ্যায় বন্ধুগৃহে ঐ বিষয়েই নিমন্ত্রণ থাকায় সে সেই সংবাদ দিতে আগে-ভাগেই আসিয়াছিল, আর আসিয়াছেই যদি—তবে চা পান না হোক মানস-সঙ্গিনীর কিঞ্চিৎ বাক্যসুধা-পান না করিয়া ফিরিবে কেমন করিয়া।

বড় হলের ড্রইংরুমে মুখোমুখী দুখানি কুশন-ওয়ালা অত্যন্ত আরামদায়ক কৌচে বসিয়া অণিমা ও যামিনী কথা কহিতেছিল। দুজনকারই মুখ উৎসাহদীপ্ত, চিত্ত প্রাণ-প্রাচুর্য্যে ভরা, ওষ্ঠাধরে স্মিতহাস্য। অণিমা, বলিতেছিল, "এখানকার লোকেদের দেখলে বড্ড মায়া হয়। কেমন যেন

ওদের অসুখী মনে হয়। ম্যালেরিয়া আর ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় [illegible]ংশই প্রাণহীন, যান্ত্রিক। হাসতে হয়ত ভুলেই গেছে, কথাবার্তাও [illegible] করে কইতে শেখেনি. যেন কি রকম।"

যামিনী কহিল, "গোড়াতেই যে গলদ। পুরোনো শিক্ষা যেটা ছিল—মাস-এডুকেশন, যাত্রাগান, কথকতা, কবি, লোকনৃত্য ইত্যাদির মাধ্যমে সেটা আর নেই। পাঠশালায় ঈশ্বরস্তোত্র, নৈতিক শিক্ষা এসব উঠে গেছে অথচ অন্যরকম কিছুই তার জায়গা নেয়নি।" এই বলিয়া সে ঈষৎ আবেগের সঙ্গে উচ্চারণ করিল, "এইসব মৌন মূক ম্লান মুখে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে ভাষা। এইসব আশাহীন প্রাণে জাগায়ে তুলিতে হবে আশা।"

অনিমা সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "তাতো হবে, কিন্তু কি করে? কি করে এদের জন্য কিছুটা করা যায়। বড় বড় আইডিয়া নিয়ে বিরাট কোন স্কীম নয়, প্র্যাকটিক্যাল কি আমি হাতে-কলমে করতে পারি তাই আমায় বলুন. আর তাইতে আমার সহায় হোন।"

যামিনী হাস্যস্মিত প্রসন্নতার সঙ্গে অনিমার উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল চোখের উপর দৃষ্টি স্থির করিল, "দেখুন না আমাদের সম্মিলিত শক্তিকে কিরকম কাজে লাগাই। আমাদের প্রথম পরিকল্পনা হবে, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, আর দ্বিতীয় হচ্ছে, এখানে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্টার্ট করা। কেমন, না?"

অনিমা ছেলেমানুষের মত সহর্ষ ধ্বনি করিয়া উঠিল, "আশ্চর্য! [illegible]ক ঐ দুটি কথাই তো আমিও ভেবে রেখেছিলুম!"

যামিনী স্মিত-মুখে উচ্চারণ করিল, "গ্রেট থট্‌স্‌, গ্রেট ফিলিংস্‌ কেম টু দেম লাইক্‌ ইন্‌স্টিংক্টস্‌ আনএওয়ারস্‌।" অনিমার মুখের দিকে রহস্যপূর্ণ হাসি-ভরা চোখে চাহিল। অনিমা সলজ্জ আনন্দে বলিয়া উঠিল, "যান, আপনি বড্ড দুষ্টু!"

পাশের কামরার পর্দ্দা সরাইয়া মিষ্টার দত্ত প্রবিষ্ট হইলেন। পরনে ঢিলা পায়জামা, পাঞ্জাবীর আস্তিন বেশ একটু ঢিলাঢালা, পায়ে নরম স্লিপার। প্রৌঢ় বয়সের বেশ স্বাস্থ্যবান লোক। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হোয়াট এ লাভ্লি পেয়ার! অনি! তা বলে এটুকু তোমার জানা উচিত, আই য়্যাম এ জেলাস ফাদার, আমার চোখের উপর তুমি যে তোমার ফিয়াঁসের সঙ্গে এমন করে ফ্লার্ট করবে আমার বুঝি তা'তে জেলাসি হবে না! হাহাঃ হাঃ!"—মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, দুজনেই লজ্জা পাইল। পূর্ব্বাবধি এই বিলাত-ফেরৎ পরিবারে মিশিয়া পিতাপুত্রীর মধ্যে এরকম হিন্দুসমাজ-বিরুদ্ধ ইয়ারকী যামিনী ঢের শুনিয়াছে, তথাপি দুজনেই লজ্জা পাইল। অণিমা তার হাসিমাখা লজ্জিত দৃষ্টি দিয়া পিতাকে ঈষৎ ভর্ৎসনার ভাবে কহিল, "বড্ড দুষ্টু হচ্চো বাবা! বড্ড যা তা বলো!" মিঃ দত্ত আবারও উচ্চরবে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, "ও নো নো! ডোণ্ট বি য়্যাংরী মাই লেডী! আচ্ছা আচ্ছা এই ওল্ড্ নটি বয় পালাচ্চে, তোমরা দুটিতে যত খুশী ফূর্ত্তি করো—।"...

গুন্ গুন্ করিয়া বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন, "লাভ্ টুক্ আপ দি গ্লাস অফ টাইম্, য়্যাণ্ড্ টার্ণড্ ইট, হিজ গ্লোরিয়াস হ্যাণ্ডস্—এভরি মোমেণ্ট লাইটলি শেকেন্—র‍্যান্ ইটসেলফ্ ইন্—গোল্ডেন স্যাণ্ড্স্—"

পর্দ্দা সরাইতে দেখা গেল ঐ ঘরে অনেক আলমারি-ভর্ত্তি ভালভাল মোটা-মোটা বাঁধানো বই আছে। বইগুলির টাইটেল-পেজ হইতে জানা যায়, ওগুলি সবই পাশ্চাত্য দর্শন, অর্থাৎ হক্সলি, ডারউইন, টিনডেল, কাণ্ট, বেন্থাম, ডয়সন ইত্যাদি। তাঁহাদের মধ্যে ম্যাক্সমূলারও বাদ পড়েন নাই।

অণিমাকে লজ্জাবিপন্না দেখিয়া যামিনী প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করিল,

"মিহির এবার এলো না যে ? ও বিলাত যাচ্ছে কবে ?"

অণিমা তার লজ্জান্বিত দৃষ্টি তুলিয়া উত্তর দিল, "সে তো যাবার জন্যে পা তুলে লাফাচ্চে, যেতে পারচে না—" কথাটা শেষ হইল না, লজ্জায় মুখে বাধিয়া গেল, মাথাটা নীচু করিল।

যামিনী কহিল,—"আমাদের বিয়ের জন্যে তো ? তাকে মুক্তি দিলেই তো পারেন। অন্ততঃ পরার্থে শহীদ হয়েই জগতে একটা রেকর্ড করে নিন, মার্টারদের লিস্টে চাই কি নাম ছাপা হয়ে থাকবে।"

অণিমা হাসি চাপিয়া ভ্রু-ভঙ্গী করিল, "যান্! সব্বাই আমার সঙ্গে একসঙ্গে লেগেছেন একজোট হয়ে। বেশ, লাগুন, পালাচ্চি আমি।"

যামিনী হাসিয়া উঠিবার ভঙ্গী করিল, "চলুন না কোথায় যাবেন ? আমার তো পায়ে ব্যথা হয়নি, আমিও সঙ্গের সাথী হবো।"

অণিমা চোখ পাকাইল, "আঃ, আবার !"

দ্বারের নিকট হইতে বয় জানাইয়া দিল, "বড়বাবু আয়া।" কান্তিবাবু তাঁর লাঠিটা হাতে ধরিয়া ধীরপদে ঘরে ঢুকিলেন। যামিনী, অণিমা উঠিয়া দাঁড়াইল। অণিমা আগাইয়া গিয়া হাতের লাঠি হাত হইতে লইল, তারপর একটি কুশনওয়ালা ভাল আসনে তাঁকে বসাইয়া দিয়া বলিল, "আপনারি জন্যে বাদামের সরবতটা নিয়ে আসি, আপনি বসুন। আচ্ছা ফল-মিষ্টিটাও কি এই সঙ্গেই দেবো, না পরে খাবেন ?"

কান্তিবাবু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, "আহা থাক না মা! তুমি আবার অত কষ্ট করবে কেন, এখন ওসব থাক।"

অণিমা মাথা বাঁকাইয়া আব্দারের সঙ্গে কহিল, "উঁহুঁ! সে হচ্চে না। গরম গরম ছানার মুড়কি ঠাণ্ডা হলে নিউরে যাবে। সরবতটা খেয়ে নিয়ে আপেল আর মুড়কি খেয়ে নিন্। বাবার পাল্লায় পড়লে তো সহজে ছাড়ান পাবেন না।"

কান্তিবাবু হাসিয়া উঠিলেন, "তোমার হাতের ঐ জিনিষটিকে তো নষ্ট হতে দিতে পারিনে, যাও মা, নিয়েই এসো।" অনিমা সানন্দ-পদক্ষেপে প্রস্থিত হইতেই ছেলের দিকে ফিরিলেন, "এসেছি তোমাদের শুভবিবাহের দিনক্ষণ স্থির করে যাবো বলে। অনর্থক দেরি করে কি লাভ।"

যামিনী মনে মনে বলিল—"আমার তো কোনই লাভ নেই, উনিও তো দেখলুম তৈরি হয়েই রয়েছেন, এখন আপনারা দুজনে শুভদৃষ্টি দিলেই তো বেচারা আমরা বাঁচি।" এই স্বগতোক্তি করিয়া প্রকাশ্যে বলিল, "আপনি বসুন আমার একটু কাজ আছে, আমি আসি।"

সে সহর্ষ মুখে লম্বা লম্বা পদক্ষেপে প্রস্থান করিল। এমন সময় পাশের ঘর হইতে মিঃ দত্তের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল,—"হ্যাঁ, ওই যা বল্লুম। লিখে নিন্ এথিস্ট, কোন ধর্ম্মমত আমি মানি না।"

"ঈশ্বরও না?"

"উঁ হুঁ! কিচ্ছু না, সাদা বাংলায় লেখেন যদি, শব্দার্থ হবে নাস্তিক।"

কান্তিবাবু চমকাইয়া উঠিলেন। একি শুনিলেন! তিনি কি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন? স্বপ্নে কি—না তো। কিন্তু ছেলের শ্বশুর হবেন নাস্তিক! ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, আবার সগর্ব্বে বলা হচ্ছে—এথিস্ট, নাস্তিক! যাক মেয়েটা বড্ড ভাল, স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি, শাস্ত্রেও একথা রয়েছে। বিয়েটা হয়ে যাক, যত শীগগির হয়, তারপর ভাল মেয়ে, বুদ্ধিমতী, দুদিনে বুঝে নেবে।

"আসতে পারি?"

ভিতর হইতে সাগ্রহে মিঃ দত্ত ডাকিলেন, "ঈয়েস! ঈয়েস! কতক্ষণ এসেছ কান্তি? ওদের ডিস্টার্ব্ব না করে সোজা এঘরে এলেই পারতে। হাঃ হাঃ হাঃ!—ওকালতি ছেড়ে বড্ড ভোঁতা হয়ে পড়ছো হে। হাঃ হাঃ হাঃ!"—

সেন্‌সস কর্ম্মচারী কাগজপত্র মুড়িয়া উঠিতেছিল, অভিবাদনান্তে চলিয়া গেল। কান্তি আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট ইজিচেয়ারটা আঙুল দিয়া নির্দ্দেশিত করিয়া গৃহস্বামী প্রশ্ন করিলেন, "খবর ভাল ?"

কান্তি পূর্ব্বেকার সম্পর্কটা হয়ত সম্পূর্ণ ভুলিতে পারেন নাই। ধর্ম্মাবতার বা হুজুর না বলিয়া ফেলিলেও আজ্ঞে স্যার এমন ছোটখাট সম্মাননা হবু বেহাই তো করিয়াই থাকেন, উত্তর দিলেন, "ভগবানের দয়ায় সে সব ভালই স্যার! আজ আমি এসেছি আপনার কাছে দরখাস্ত নিয়ে—আমার মা-জননীকে ঘরে নেবার।"

মিঃ দত্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন, "তার মানে সোজাসুজি অনিকে ছিনিয়ে নেবে ? কেমন, না ?"

"অনর্থক বিলম্বে লাভটা কি ? মিহিরও এই বিয়ের জন্যে আটকে রয়েছে, সেটাও ভেবে দেখা উচিত। আর দেখুন শুভস্য শীঘ্রম্ কথাটা দেখেছি বড্ড খাঁটি।"

চিন্তিত ও ব্যথিত স্বরে ছাড়াছাড়া করিয়া শ্রোতা কহিলেন, "তা' কবে সেটা তুমি করতে চাও ?" 'বিবাহ' শব্দটা মুখে জোগাইল না। সত্যই তিনি 'জেলাস-ফাদারই' বটেন! কর্ত্তব্যে ও স্নেহে কি সংঘাত তাঁর ভিতর চলিতেছে সে তিনিই জানেন, আর তার কিছুটা আভাস পায় অণিমা। মেয়ে ছাড়িবার ভয়েই না নিতান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে যামিনীর সহিত মেয়ের বিয়ের ঠিক করিয়াছেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া! গরীবের ছেলে, অল্প আয়াসেই ঘরজামাই হইয়া তাঁর ঘরেই ঘর করিবে, বড় পদস্থ কর্ম্মচারী বা ধনী ব্যারিস্টার স্ত্রীকে তাঁর কাছে রাখিবে কেন ?

কান্তিবাবু উত্তর দিলেন, "সেটা আচার্য্য মশাইকে লিখে ঠিক করতে হবে। কোন দিন তিনি ফ্রি থাকবেন সেটা না জানলে তো নিজে নিজে বলতে পারিনে।"

মিঃ দত্ত বিস্ময়াশ্চর্য্যে যেন আকাশ হইতেই বা পড়িলেন, এমনি ভাবেই কহিয়া উঠিলেন, "আচাজ্জি! সে কি কর্ব্বে? আমার মেয়ের বিয়ে দেবে দাড়িওয়ালা আচাজ্জি বা টীকিওলা ভট্‌চার্যি তা' কি করে হবে? কোন্ মতে বিয়ে দেবেন তিনি?"

আহত স্বরে কান্তিবাবু উচ্চারণ করিলেন, "আমি আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত, সে ত আপনি জানেন, আমার ছেলের বিয়ে সেই মতেই হবে।"

"না না, সে হয়না। আমি আদি অন্ত কোন সমাজই মানিনে, আমার মেয়ের বিয়ে তিন আইনে হবে, ওসব দিয়ে হতে পারে না, আমি এথিস্ট।"

কান্তিবাবু সক্ষোভে কহিলেন, "সে ত এই মাত্র সেন্‌সাসে লেখালেন। কিন্তু অমন ধর্ম্মহীন বিবাহ আমিও তো দিতে পারিনে। আপনি তো জানেন আমি দীক্ষিত ব্রাহ্ম, তবে জেনে শুনে নিজে যেচে আমার ছেলেকে মেয়ে দিতে চাইলেন কেন? কি জন্যে এত বড় অপমান করলেন আমাদের?"

মিঃ দত্ত ঈষৎ স্তিমিতভাবে কতকটা বিমূঢ়বৎ থাকিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "আমায় তুমি মিছিমিছি দোষ দিচ্চো কান্তি! তোমার সুন্দর সুচরিত্র বিদ্বান ছেলেকে জামাই করতে চেয়েছি বলেই যে তোমার ধর্ম্মমতে কনভার্টেড্ হবো এ-ই বা তুমি কি করে আশা করেছিলে? আমি যে এথিস্ট ঈশ্বর মানিনে, কোন ধর্ম্ম মতে আমার আস্থা নেই, এও যে কোন-দিন কারু কাছে চেপে রেখেছি, সে ও তো কই আমার মনে পড়ে না।"

"তা হলে এ বিয়েও হতে পারে না"—বলিয়া কান্তিবাবু সরোষে ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন। সাম্‌নেই অনিমা এক হাতে সরবতের গ্লাস ও অন্য হাতে শ্বেত পাথরের থালাতে কাটা ফল ও নিজ হাতে তৈরি করা মিষ্টান্ন লইয়া সিঁড়িতে উঠিতেছিল, গমনোদ্যত তাঁহাকে দেখিয়া সুমিষ্ট স্বরে কহিয়া উঠিল,—"ও-মা—! বড্ড দেরি করে ফেলেছি বুঝি? একলা ছিলেন? বাবার কাছে যাননি কেন? চলুন, চলুন, না খেয়ে কখনও

যেতে আছে!”

কান্তিবাবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, গাঢ় স্বরে কহিয়া উঠিলেন, “মা! আমার এই কথাটির উত্তর দাও, তারপর ঈশ্বরের যদি অনিচ্ছা না থাকে, অনেক খাওয়াই পেতে পারো। তুমি ঈশ্বরের কোনরূপে অর্চ্চনা করো, তাঁকে বিশ্বাস করো?”

অণিমা হতবুদ্ধি-ভাবে এক মুহূর্ত্ত পরে সসঙ্কোচে উপর করিল, “বাবা আমাদের কোনদিন এসব কথা বলতে বা শিখতে দেননি বরং প্রমাণ করতে চেয়েছেন ঈশ্বর বলে কোন কিছু নেই। তবে—”

আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল হয়ত শুনিলে ভাল করিতেন কিন্তু ধৈর্য্য রহিল না। অসহিষ্ণুভাবে কান্তিবাবু আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, “শিক্ষিতা সুন্দরী ধনী কন্যাকে ঘরে নিয়ে কুল উজ্জ্বল করতে চেয়েছিলুম, এই তার উপযুক্ত পুরস্কার!”

সবেগে সিঁড়ি দিয়া ছুটিয়া নামিয়া গেলেন।

কি হইল! কি ঘটিল—অণিমা বিস্মিত হইবারও অবসর পাইল না, ভিতর হইতে মিঃ দত্তের অধীর কণ্ঠের আহ্বান আসিল, “অনি!”

অনাদৃত উপচারগুলি একটা টিপয়ের উপর রাখিয়া অণিমা ঘরে ঢুকিল। মিঃ দত্ত অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে গৃহ পরিক্রমা করিতেছিলেন, মেয়ে সম্মুখীন হইতেই অভিমানী বালকের মত আহত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, “শুনছো অনি! উনি তোমার সঙ্গে তাঁর ছেলের ব্রাহ্মমতে বিয়ে দিতে চান, সে কি ক'রে হবে বল তো? আমি ব্রেহ্মোজ্ঞানী নই, অমনি খামোকা পরব্রহ্ম সাক্ষী করে আগুনে কলা পুড়িয়ে একটা বিশ্রী কাণ্ড করতে যাবো ওঁর খাতিরে! যা নেই, যা মানিনে, তাই নিয়ে করবো ধাষ্টামী! এটা জোচ্চুরীর কেস হবে না?”

এক চক্র ঘুরিয়া আসিলেন, “কি, কথা বলছো না কেন? আমি

যা নই, সারা দুনিয়াকে ঢাক পিটিয়ে জানিয়ে দেবো আমি তাই? এর চেয়ে বড় জোচ্চুরী কি আছে আমায় বুঝিয়ে দাও তো। কথা কও, না, না, অমন বোবার মতন চুপ করে থেকো না। বল, বল—"

অণিমা বাপের উৎকণ্ঠাকুল মুখের উপর কাঁচের পরানো চোখের মত দুই নেত্র তুলিয়া ধরিয়া অকম্পিত মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, "তাই হবে।"

"তাইতো ভাবছি অনি! কি যে প্রব্‌লেম! সল্‌ভ্‌ তো হচ্চে না। নিজে যা নই—আচ্ছা কোম্‌তের ঐ বইটা নিয়ে এস তো মা! পড়তো শুনি, সত্য সম্বন্ধে ভদ্রলোকের যুক্তি-দৃঢ় মতবাদটা কি অদ্ভুত রকম ছিল। পড়ে শোনাও আমাকে, নিজেও বেশ করে অ্যাপ্রিসিয়েট করে দেখে নাও। নাঃ, কিছু ভাল লাগছে না—"

বইএর আলমারির কাছে গিয়া নিজের কশাঘাত-জর্জ্জরিত চিত্তের মধ্য হইতে উপচিয়া পড়া আঘাত-ব্যথায় নীল হইয়া যাওয়া মুখখানাকে লুকাইয়া ফেলিবার জন্য একটা উপায় পাইয়া অণিমা যেন বর্ত্তিয়া গেল।

বাপের আত্মপ্রসাদ-পরিতৃপ্তি-চেষ্টায়-উৎসুক দৃষ্টি সে যেন সহ্য করিতে পারিতেছিল না। এত সহজেই তিনি তার সম্বন্ধে এতবড় একটা প্রচণ্ড ভুল করিতে দ্বিধা পর্য্যন্ত করিলেন না, তার মনের দিকটা একবার চাহিয়া দেখিবার অবসরও লইলেন না, এ কি করিলেন তিনি? এতদূরে তাকে ঠেলিয়া আনিয়া আজ এত সহসা—

বই লইয়া সে ফিরিয়া আসিতেই হাত নাড়িয়া বাধা দিয়া মিঃ দত্ত কহিয়া উঠিলেন, "না! থাক! ও আমার মনের মধ্যে গাঁথাই আছে, প্রাণের ফলকে জল জল করছে, নতুন করে আর কি শোনাবে। থাকগে।"

অণিমা টেবিলে বই রাখিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। উঃ, যদি এই মুহূর্ত্তে সে এখান হইতে ছুটিয়া পালাইতে পারিত। কোন একটা নির্জ্জন

কোণে মুখ লুকাইয়া অন্ততঃ ক্ষণকালও পড়িয়া থাকিতে পারিত! কিন্তু তা' হয়না, সে তার পিতার কাছে তাঁর নিজের হাতে গড়া' একটা যন্ত্রমাত্র। তার স্বতন্ত্র সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা স্নেহ প্রেম যে থাকিতে পারে, এ হয়ত তিনি ধারণাও করিতে পারেন না। তাঁর ইচ্ছাতেই যাহা গড়িতেছিল, তাঁরই হাতে তা ভাঙ্গিতে বসিয়াছে, এর মধ্যে অণিমা আবার কে?

মিঃ দত্ত একটু সুস্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। কতকটা সহজভাবে কহিতে লাগিলেন, "তুমিই বোঝ, মিথ্যের মুখোশ মুখে পরে যা নেই, বড় বড় বৈজ্ঞানিক বোকা মুখ্য লোকগুলোর রূপকথার যে কল্পিত ভগবানটাকে অকাট্য যুক্তি দিয়ে হুট্ করে দিয়েছে তাকেই ধরে টানাটানি করতে হবে? উনি রেজেস্ট্রী বিয়েকে ধর্মহীন বিয়ে বলে প্রত্যাখ্যান করে গেলেন। আশ্চর্য্য! বিয়ের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্কটা কি? আইন-মত হলেই তো হলো। সে উনি মানবেন না। তাহলে কি হবে? তুমি কিছু বলছো না কেন? বিয়েটা কি মতে হবে তাহলে?"

"হবে না।"

"হবে না? হবে না! আহা, ছেলেটা যে হীরের [illegible] রে! গলদ অনেক আছে কিন্তু আসল জিনিষটায় ভেজাল নেই এতটুকু। আমি প্রকাশকেই ডাকাই। সে তো নাবালক নয় হিন্দু ঘরের, ও কি [illegible] শোনা দরকার। বয়!"

"জী হুজুর!" বলিয়া পরিষ্কার উর্দ্দিপরা বয় প্রবেশ করিলে আদেশ দিলেন, "প্রকাশবাবুকো সেলাম দেনে বলো চাপরাশীকো।"

অস্বস্তিপূর্ণভাবে মেয়ের দিকে চাহিলেন "ঐ বইটে নিয়ে এস তো অনি! সত্য সম্বন্ধে কি অপূর্ব্ব উক্তি করে গেছেন ভদ্রলোক, ঐটে পড় তো। যা আমি নই, যা আমি মানিনে তাকে নিজের বলে প্রচার করা ঘোরতর মিথ্যাচরণ। ঈশ্বর না মানলেও সত্যকে আজীবন দৃঢ়রূপে কায়মনোবাক্যে

মেনে চলেছি। ঐখানটা পড়ো।" পাতা উল্টাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানটি দেখাইয়া দিলেন।

"পরকাশবাবু আয়া—"শব্দটা কানে যাইতেই অণিমা ত্রস্তে উঠিয়া অন্ধকারের বারান্দায় চলিয়া গেল। সেখানে রেলিংএ বুক দিয়া সে তার বুককাটা আকুল কান্নাকে এবার আর রুদ্ধ রাখিতে পারিল না।

"আমায় ডেকেছেন?" যামিনীর স্বর আনন্দ-রুদ্ধ, তাহাতে আশাভরা রাগিণীর সুর। নিশ্চয় বাবার আর্জি মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে, শ্বশুর জামাতার্চনের নিমন্ত্রণ জানাইতে উদ্যত! লৌহ যবনিকা উত্তোলিত হইয়া গিয়া নন্দনকাননে প্রবেশ পথের পাশপোর্ট হাতে আসিয়াছে।

মিঃ দত্ত কহিলেন, "তোমার বাবা ব্রাহ্মমতে, তাও আধাপৌত্তলিক আদি ব্রাহ্মসমাজের মতে তোমাদের বিয়ে দিতে চান। তিন আইনের বিয়ে তিনি দেবেন না। এটা কি তার নেহাৎ অন্যায় জিদ নয় প্রকাশ?"

যামিনী চমকিয়া উঠিল, তার মুখখানা কালো হইয়া গেল, গম্ভীর গলায় জবাব দিল, "তা কেমন করে বলবো? তিনি যখন ঐ সমাজের দীক্ষিত ব্রাহ্ম।"

"তোমার অবশ্য ওসব প্রেজুডিস নেই? অন্ধ গোঁড়ামী—"

যামিনী কহিল, "আছে বই কি, বাবা আমাদের জ্ঞান হওয়া থেকে মনে-প্রাণে ঈশ্বর এবং সমাজকে মানতে শিখিয়েছেন।"

"তা হলে কি রেজেস্ট্রী বিয়েতে তোমারও মত নেই নাকি? অ্যাঁ! কোন আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মমতে বিয়ে দেওয়া, সে যে আমার পক্ষে দারুণ মিথ্যাচরণ, আমি তো পারবো না।"

" 'কোন ধর্ম্ম মানি নে'—একথা মুখে উচ্চারণ করা আমার পক্ষেও

সম্পূর্ণ মিথ্যাচরণ, আমিও তা' বলতে পারবো না।"

মিঃ দত্ত একটা আসনে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, "তা'হলে? আমি দেখছি নিরুপায়।"

যামিনী কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল, 'না, বলে লাভ নেই। এই ঘরেই ছিল, সরে চলে গেল, এত বড় ক্রুটিক্যাল মুহূর্ত্তে পালিয়ে রইলো। ওরও তাহলে এই মত! সেটা আর নাই বা শুনলুম। শুনে কেবল অপমান বাড়ানো বৈ তো নয়। আমায় প্রাণ থেকে চায় না, চাইলে এমন করে চলে যেতো না, এ সময়ে এসে পাশে দাঁড়াতো, বলতো, না, তোমার ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম, আমি তোমাকে চাই, সে যেপথেই হোক! চায় না, চায় না,—যদি চায় জীবনব্যাপী সম্পর্কের গুরুদায়িত্ব নিয়ে নয়, পুরনো খেলনার মত বদলে নেবার পথ রেখে। তেলে-জলে মেশে কখনো? ওঁরা মস্ত বড়লোক আমি নেহাৎ গরীব।' যামিনী উঠিয়া দাঁড়াইল, ঈষৎ নত হইয়া দু'হাত কপালে ঠেকাইয়া ত্বরিতকণ্ঠে কহিল, "আমি এখন আসি"—তড়িৎগতিতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল, বাহিরে আসিয়া একবার প্রত্যাশিতনেত্রে চাহিয়া দেখিয়াছিল। নাঃ, তাহার হিসাবে ভুল হয় নাই।

মিঃ দত্ত বিহ্বল ভাবে বলিতে লাগিলেন, "এ কি হলো! এ কি হলো! অ্যাঁ! আমারি অনিকে তুচ্ছ একটা জুতো তুলে কেউ এমন মুখের উপর প্রত্যাখ্যান করে যেতে পারে এতো আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি! কোথায় তোর ঈশ্বর? কি তার থাকার প্রমাণ? কিন্তু আমার মেয়ে? আমার অনি? সে কি তার চাইতে অনেক বেশী সত্য নয়? তার কি এতটুকুও মূল্য নেই? জগৎ অন্ধ! তার বাসিন্দারাও তাই। তারা কল্পনার কল্পলোকে বিচরণ করে বেড়াতে চায়। বাস্তবকে, সত্যকে তারা চায় না।

"বয়!"

বয় আসিলে আদেশ করিলেন, "একঠো পেগ দেও।" ডাকিলেন, "অনি!"

দম দেওয়া কলের পুতুলের মত অনিমা ঘরে ঢুকিল, "বাবা!"

মিঃ দত্ত মেয়েকে দুহাতে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, "প্রকাশেরও ঐ মত। কিছু যে ভেবে পাচ্ছিনে, কি আমি করি রে? বল্ আমায় তুই, বলে দে না মামণি! কি করি মা আমি?"

অনিমা নিরাসক্ত দুর্ব্বলকণ্ঠে মন্ত্রের মত উচ্চারণ করিল, "কি আর করবে!" তারপর একটু চেষ্টার সঙ্গে কহিল, "চায়ের সময়ও তো হয়েছে, বারান্দায় তোমার চেয়ারটা দিতে বলি, খেয়ে নিয়ে একটু পড়াশোনা করা যাক।"

"ওরা কি তাহলে বিয়ে দেবে না? বন্ধই করে দেবে।"

দাঁতে দাঁতে চাপিয়া একটু নীরব থাকিয়া সচেষ্ট ধৈর্য্যে উত্তর দিল, "আর উপায় কি! তুমি এত ভেবো না, ঘরটা বড্ড গরম—বাইরে বসবে এসো, হাওয়া আছে।"

মিঃ দত্ত ক্রুদ্ধ স্বরে যেন আপনাকেই প্রশ্ন করিলেন, "কিন্তু এটা কি ঠিক হলো? নাঃ, এ যেন কিরকম একটা বিশ্রী লাগছে।"

'মানুষে গড়েন, দেবতায় ভাঙ্গেন' এই প্রবাদ কথাটা চিরদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, যামিনীপ্রকাশের ভাগ্যে এটা মস্তবড় ভাঙ্গন ধরাইয়া দিল।

কান্তিবাবু সব কথা ছেলেকে জানাইয়া তাকেই প্রশ্ন করিলেন, "কিছু কি অন্যায় বলেছি?" নিজের মনে দ্বিধা ছিল না, তথাপি পুত্রের মনের ভাবটাও তো জানা চাই। যামিনী মুখে বলিল, "ঠিকই করেছেন।" মনে মনে পিতার প্রতি অভিমানে মন তার ভরিয়া উঠিল, কিন্তু তাঁকে সে

দোষী করিল না। কান্তিবাবু বলিলেন, "তাঁর মঙ্গল হস্তকে অনুভব না করে যে অন্ধ তাঁর জগতে বাস করতে চায়, মায়ের বুকের দুধে পুষ্ট হয়ে যে মায়ের অপমান করতে দ্বিধা না করে, তারা একদরের লোক। আমরা তাদের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করতে পারিনে। যে বন্ধনে তাঁর মঙ্গল হস্তের স্পর্শ লাগবে না, সে বন্ধন শুধু বন্ধনই।

যামিনী ইহা মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লইতে পারিল না। পিতা বলিলেন, এবন্ধনে বিধাতার হাত নেই, কিন্তু সে জানে এ বন্ধন বিধাতার নিজ হাতের বাঁধা। অণিমার রূপ? বাঙ্গালা দেশের ভদ্র-সমাজে যথেষ্ট না থাকিলেও ওর মত সুন্দরী যে দুটি নাই এমন নয়, কিন্তু এমন হৃদয়বত্তার পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। যামিনী পিতার সান্নিধ্য হইতে সরিয়া অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে ছাদে পায়চারি করিতে লাগিল। মানুষের মনে মনে এমন মিল, উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যে এমন সামঞ্জস্য, আর কখনও কেহ বিবাহ-বন্ধনোদ্যত নরনারীর মধ্যে পূর্ণাঙ্গরূপে ঘটিতে দেখিয়াছে? স্বামী-স্ত্রীর আজীবনের চেষ্টাতেও হয়ত এরূপ একাত্মতা জন্মে না। তবু কি ইহা 'ঈশ্বরের হস্ত-স্পর্শহীন' বলিতে হইবে? তিনিই না দুজনকে দুজনের জন্য নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইয়াছেন? তারা যদি এমন সুযোগ উপেক্ষা করিয়া পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ঈশ্বরই জানেন,—তাদের ভবিষ্যৎ কত অন্ধকার, কি আশাহীন।

বেলা শেষ হইয়া গিয়াছিল। একটু পরেই তার ভবিষ্যতের কালি মাখিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। যামিনী নীচে নামিয়া বহির্ব্বাটির নিজ ঘরের ল্যাম্পটা একটু সরাইয়া লইয়া বই খুলিয়া বসিল। মনে কিন্তু তাহার মক্কেলের প্রতি অথবা আইনের কঠোর ধারাবদ্ধ বইটার উপর এতটুকুও আগ্রহ রহিল না।

পাঁচ

অচলকৃষ্ণ দত্ত এখন যতবড় দুর্দ্দান্ত সাহেব, তাঁর জন্ম হইয়াছিল ততবড় নৈষ্ঠিক হিন্দু পরিবারে। এঁদের পূর্ব্বপুরুষের নাম শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্বৈত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ-শিষ্যদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন। বাড়ীতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণরাধার যুগল মূর্ত্তির সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের দারুময় সন্ন্যাস-মূর্ত্তি নিতাইসহ প্রতিষ্ঠিত। নিত্যপূজা ভোগরাগ সমস্তই বিশিষ্ট বৈষ্ণবাচারে সম্পন্ন হয়। পুরুষরা তাদের ললাট স্নানান্তে চন্দন-চর্চ্চিত করেন, মেয়েরা নাকে কাটেন রসকলি। গলায় প্রৌঢ় ও প্রাজ্ঞরা তুলসীকাঠের মাল্যধারণ করেন, মেয়েরা পাঁচবৎসর বয়স হইতেই তুলসীমালা কণ্ঠে পরিতে বাধ্য। ইদানীং অনেকেই সৌখীন রুদ্রাক্ষধারীদের দেখাদেখি কাঠের মালাকে স্বর্ণমণ্ডিতও করিয়াছেন। নাম জপ না করিয়া এবাড়ীতে ছোট-বড় কেহই জল গ্রহণ করেন না।

এখনকার মিঃ দত্ত জজ সাহেব এমন একটি পারিপার্শ্বিকতার মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কি সূত্রে কেমন করিয়া যে ডিরোজিওর প্রশিষ্য হইলেন এবং স্টেট স্কলারশিপ লইয়া সমস্ত একান্নবর্ত্তী পরিবারবর্গের প্রবল প্রতিরোধ-চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া তাঁদের অজস্র অভিসম্পাতের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অচলকৃষ্ণ জাহাজে চড়িয়াছেন—এ সংবাদ বাড়ী পৌঁছিলে তাঁর মা গৌরের ঘরের দোরে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে ছেলের উদ্দেশে মড়াকান্না কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রত্যহ দুবেলা সে উচ্চগ্রামের ক্রন্দনধ্বনি গৃহবাসীর তো কথা নাই, প্রতিবাসীরও প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। অবশ্য এই ক্রন্দনোচ্ছ্বাসকে কেহ বাধা দিয়া অসম্মান করিল না। সত্যই

তো মায়ের কাছে তাঁর একমাত্র পুত্রের এ যাত্রা তো মহাযাত্রারই সমার্থক। যদি কখনও বা সাতসমুদ্র তেরনদীর ঝড় তুফান এবং বৈলাতিক কুহকিনীদের ফাঁস কাটাইয়া ছেলে তাঁর ঘরেই ফেরে, ঘর তো আর তাকে নিজ অঙ্কে স্থান দান করিতে পারিবে না। ব্রবময়ী মরিলে সে কি তাঁর মুখে আগুন জ্বালিবে, না শ্রাদ্ধ পিণ্ডি দিতে পারিবে? তবে মার কাছে সে ছেলে মরিল না তো কি হইল?

যথাকালে অচলকৃষ্ণ আই.সি.এস পাশ করিয়া চাকুরী লইয়াই ফিরিলেন। ফিরিয়া অবশ্য মায়ের কাছেই আসিয়াছিলেন। ভিতরে ঢুকিতে গেলে সাহেবী পোষাক দেখিয়া ত্রাস্ত-ব্যস্তে চাকরটা পথ আগলাইয়া জানিতে চাহিল, "আপনে কৌনটি আছে?"

পরম কৌতুকের স্মিতহাস্যে অচলকৃষ্ণ বাহিরের ঘরে ফিরিয়া গিয়া একান্ত পরের মতই একটা ঠ্যাং-নড়বড়ে বেত খসা-খসা চেয়ারে বসিয়া প্রতীক্ষমাণ হইয়া রহিলেন।

মাতা পুত্রের সাক্ষাৎ যেভাবে ঘটিল তেমন যেন কোন মায়ের ছেলের বা ছেলের মায়ের ভাগ্যে না ঘটে। অচল আসিয়াছে শুনিয়াই ব্রবময়ী উচ্চ চীৎকারে খানিকক্ষণ বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিলেন। ইত্যবসরে গৃহ-বাসিনীদেরও কড়াকড়া মন্তব্য বৃষ্টি ও উহার দুঃসাহসের বহর দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ যে ধারায় বর্ষিত হইয়া চলিল, তার অর্দ্ধেকখানিও যদি এক-প্রাচীরের মধ্যস্থ অদূরবর্ত্তী ঘরের মধ্যে থাকিয়া উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকে তাড়াইতে লগুড় তুলিবার জন্য কিষাণ ডাকিবার দরকার করে না। তথাপি কর্ত্তব্য হিসাবে কিছুটা ধৈর্য্য ধারণের প্রয়োজন ছিল, ইহা অচল জানিতেন। মায়ের সঙ্গে দেখা হইতে ছেলে মাকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে গেল। গ্যালিশ পরা সাহেবী স্যুট ও হাড়ের মত শক্ত পালিশ করা কফ্ কলার ও তেমনি কড়া ডবল ব্রেস্ট শার্টের প্রসাদে সেদিনের

সাহেবদের মতই এদেশী সাহেবদেরও ভূমি স্পর্শ করিবার সাধ্য ছিল না। মাথাটাই শুধু ঈষন্নমিত করা চলিত, দেহাবশিষ্টকে নয়।

দেশে থাকিতে হয়ত শৈশব কাটাইয়া ছেলে মাকে প্রণাম করে নাই কিন্তু আজকের দিনের কথা সে সব অতীত দিনের সঙ্গে তো এক নয়। দীর্ঘ তিনটি বৎসর পরে বিদ্রোহী ছেলে ঘরে ফিরিয়া মার কোলের কাছে ঈষৎ অপরাধী মন লইয়া স্নেহ-বুভুক্ষিত চিত্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ঠোঁটের কাছে বার বার আকুল ধ্বনি ঠেলিয়া উঠিতে চাহিতেছে, 'মাঃ মাঃ মাগো'! হাত বাড়াইয়া মায়ের পদধূলি লইতে গেলে মা সহসা সর্পাহতের মত দুই পদ পিছাইয়া গেলেন। অনুতপ্ত ছেলের শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম নিবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া সভয় স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "থাক্ থাক্ অচি! এ অবেলায় আর আমায় তুই ছুঁস্‌নে। রোজ জ্বর আসচে কম্প দিয়ে, নেয়ে মরতে হবে তো আবার! সেবা করবে কে?"

অচলকৃষ্ণের অর্দ্ধাবনত দেহ সরল কাষ্ঠদণ্ডের মত মুহূর্ত্তে সমুন্নত হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ বাণ খাইলে পাখী যেমন করিয়া ছটফট করিয়া ওঠে তেমনি করিয়া দারুণ বিস্ময়-আতঙ্কে চমকিয়া উঠিয়া আর্ত্তনাদের মত করিয়াই উচ্চারণ করিলেন, "সে কি মা! আমি তোমায় ছুঁলে তোমায় নাইতে হবে! কি বলছো মা? আমি এমন কি দোষ করেছি যে অচ্ছুত হয়ে গেলুম?"

মা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রাশভারী জ্যেঠাইমা ঘরে ঢুকিয়া চড়া গলায় বলিয়া উঠিলেন, "কি দোষ করেছ তা'ও আমাদের বলে দিতে হবে? মেলেচ্ছ দেশে গিয়ে অখাদ্যিগুলো পেট পুরে কি খাওনি বাছা? এতে কারু কখনও জাত থাকে? তুমি কি আর সেই ঘরের-ছেলে আছ যে আগের মতন এ বাড়ীতে ছোঁয়াছুঁয়ি করে একশা করে বেড়াবে! নিজে নিজেই এটা তোমার আক্কেল করা উচিত ছিল।"

অচলকৃষ্ণের ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল। হাত দু'খানা বক্ষোবদ্ধ করিয়া সোজা জ্যেঠাইমার মুখের দিকে চাহিয়া কঠিন স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "তাহলে এ বাড়ীতে দু'এক দিনের জন্যেও আমার জায়গা হবে না বোধ হয়?"

মা এবার ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। জ্যেঠাইমা তাঁর দিকে একটা কঠোর বক্রদৃষ্টি হানিয়া চিবাইয়া উত্তর দিলেন, "যখন জাত খোয়াতে বিলেত গেছলে তখন কি কারু সঙ্গে পরামর্শ করে গেছলে ধন। এ আমার শ্বশুর দাদাশ্বশুরের ধম্মের সংসার, এখেনে বসে তোমার সে মুর্গি মটন তো চলবে না। থাকতে হলে অতিথশালায় বন্দোবস্ত করে নিয়ে থাকতে পার তো দেখ। ঘরের ছেলে, ভাতটা নয় কাঁচের সানকি টানকি দু'খানা কিনেই তাতে ক'রে দিয়ে আসবে চাকরেরা কেউ। তোমাদের তো ছত্রিশ জাতের অন্ন চলে।"

এরপর যা ঘটিল তা' না বলিলেও ক্ষতি নাই। তবে আরও মস্ত বড় সংঘাত বাধিল তিনি যখন তাঁর চৌদ্দ বৎসর বয়সে বিবাহ করা সাত বৎসর বয়সের কনে অদিতিকে তাঁর সাথী করিবার কথা তুলিলেন। মা ইতিপূর্ব্বেই হাঁটু ভাঙ্গিয়া মাটির উপর বসিয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁর নীরব ক্রন্দন আবার একটু একটু করিয়া সরব হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশ্য এবারে তখন আর তাঁরা তিনটি প্রাণীই উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর জায়েরা ননদেরা আরও দু'চারজন কন্যা-স্থানীয়ারা এবং দাসীরাও জমায়েৎ হইয়াছিলেন। সেজ খুড়ি এই কথা শুনিয়া অবাক হইয়া নিজের গালে হাত চাপিলেন, "ও বড়দি, অচি কি বলছে গো! বাড়ীর বউ যাবে গাউন পরে মুরুব্বীর ঠ্যাং চুষতে? এ আবার কেমন ধারা কথা গো!"

এ সমস্যার সমাধান মেয়ে মহল করিতে পারেন নাই। এর জন্য জ্যেঠামশাইকে মধ্যস্থ করিতে হইয়াছিল। তিনি আসিয়া অতি গাম্ভীর্য্যে

বিচারকের রায় দেওয়ার ছাঁদে তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিলেন, "সে হয় না অচু! নিজে তুমি যা খুশী করছো করগে যাও। এ বাড়ীর বৌকে নিয়ে আর কেলেঙ্কারী করতে যেও না। ওকে ওর ধর্ম্মমতে ধর্ম্মপথে থাকতে দাও। বড় ভাল মেয়ে, ওর পরলোকটা নষ্ট করে দিয়ে তোমার এমন কি লাভ হবে? ইচ্ছে করলে বেশ খ্রীষ্টান যাকে খুশী বিয়ে তো করতে পারবে!"

অচলকৃষ্ণ রূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "ওর পরলোক কি স্বামী ত্যাগ করে মালা জপ করাতে? আপনাদের শাস্ত্রে কি ঐ রকমই লেখা আছে নাকি?"

জ্যেঠা এ কূট প্রশ্নে টলিলেন না, সমান রূঢ় স্বরেই জবাব দিলেন, "স্বামী যদি বিধর্ম্মী হয় সে স্বামীকে স্ত্রী পরিত্যাগ করলে পাপ অর্শায় না, এ শাস্ত্রেই বিহিত আছে।"

"আমি ধর্ম্ম ত্যাগ করে অন্য কোন নতুন ধর্ম্ম গ্রহণ তো করিনি। ওকে বিয়ে করবার কালে যা ছিলাম তাই আছি। বেশ, আমার স্ত্রীকে এখানে ডাকা হোক, সে কি বলে সেটা আমি নিজের কানে শুনতে চাই।"

অচলকৃষ্ণের পিসি বলিয়া উঠিলেন, "সে ছেলেমানুষ ভাল মন্দর কিইবা জানে। তাছাড়া গুরুজনদের সামনে এসে তোমার সঙ্গে কথা কইবে কি করে? যা' তা' একটা বল্লেই হলো! আমি কিম্বা বড় বউ তার মত জেনে এসে তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি।"

গমনোদ্যতা পিসিমাকে প্রচণ্ড ধমক দিয়া অচলকৃষ্ণ বজ্রনির্ঘোষে বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন, অত বাড়াবাড়ি অভিভাবকত্ব করতে আসবেন না। থামুন দেখি!" জ্যেঠার দিকে কঠোর দৃষ্টি হানিয়া কহিলেন, "মিথ্যে সাক্ষী বানিয়ে আপনারা আমার হক্ মারতে পারবেন না। আইন আদালত না করিয়ে

যা' বলছি তাই করুন, তাঁকে এখানেই ডাকুন। উনি যদি আমায় না চান আমি আমার অধিকার ছেড়ে দিতে রাজী হয়ে ফিরে যাব। উনি নাবালিকা নন। ওঁর একটা মতামত নিতে হবে বৈকি।"

অদিতি আসিয়া যে কাণ্ড করিল তার জন্য এ বাড়ীর একটা লোকও প্রস্তুত ছিল না। সুদীর্ঘ ঘোমটাটাকে গলা বরাবর নামাইয়া দিয়া সে আসিয়া দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। জ্যেঠা মহাশয় তাহাকে বিষয়টি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি ওর সঙ্গে যেতে চাও, না নিজের জাতধর্ম্ম বজায় রেখে গুরুমন্ত্র কুলধর্ম পালন করে বাড়ীর বড় বউয়ের কর্ত্তব্য পালন করতে চাও? বেশ করে ভেবে দেখে জবাব দাও তো মা!··· তোমার কোন ভয় নেই মা, তোমার মত যেটি নির্ভয়ে খুলে বলো। আমরা মায়ের মতন করে তোমায় রক্ষা কর্ব্বো।"

অদিতি কাঠ হইয়া নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, কথা কহিল না।

অচলকৃষ্ণ গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "ন্যাকামী করবার সময় নেই। যা বলবার শীগ্‌গির বলে ফেল। আমায় এঁরা এ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। এ বাড়ীতে আমার এই জন্মের মতন শেষ আসা। আমার সঙ্গে তুমি যাবে কি যাবে না?"

অদিতি ঘাড় কাত করিয়া জানাইল, সে যাইবে।

জ্যেঠামহাশয় রাগে অপমানে লাল হইয়া গিয়া প্রচণ্ড আক্রোশে ফুলিয়া উঠিলেন, "সব দিক ভেবে দেখেছো, না যা মনে এলো একটা বলে দিলে? ওর সঙ্গে তোমার এই বিদ্যে বুদ্ধি নিয়ে খাপ খাইয়ে চলতে না পারলে ও যদি তখন তোমায় জুতো মেরে দূর করে দেয়—এ বাড়ীর চৌকাঠ আর তুমি মাড়াতে পার্ব্বে না, সে কথাটি বেশ করে বুঝে যেও শুয়োর গরু খেতে।"

অদিতির ঘোমটা ঠিক থাকিলেও সে মাথা খাড়া করিল।

"কি বলবে বলো। যাবে?"

অদিতি দৃঢ়ভাবে মাথা হেলাইল,—সে যাইবে।

অচলের মা এবার স্পষ্ট করিয়াই কাঁদিয়া উঠিলেন। অচলকৃষ্ণ আসিয়া অদিতির ডান হাতটা মুঠা করিয়া চাপিয়া ধরিয়া হাতে একটা সজোরে ঝাঁকানি দিল, ঈষৎ কোমল কণ্ঠে কহিল, "তবে চলে এসো।"

সে যে বায়ু-বিতাড়িতা বেতসপত্রের মতই কাঁপিতেছিল, আর কেহ না দেখিলেও তিনি তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন।

স্বামীর সংসারে আসিয়া অদিতি ঠিক খাপ খাওয়াইতে পারে নাই একথা সত্য। আর তা' না পারিলে ঠিক যাকে একাত্মতা বলে সে জিনিষটাও সম্পূর্ণ হয় না, এ-ও সত্য। তথাপি অদিতি মেয়েটি এত ধীর বুদ্ধি ও স্থির প্রকৃতির যে তাদের দুজনকার সম্পূর্ণ রূপেই চরিত্রগত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সে কোনদিন তা লইয়া এতটুকু বিরোধ আনয়ন করে নাই। অপ্রতিবাদে স্বামীর সমস্ত সঙ্গত অসঙ্গত দাবী মানিয়া প্রাণপণে তাঁর অনুবর্তিনী হইবার তপস্যা করিয়া গিয়াছে। ও বাড়ীর নিয়ম-মত সেও তার বারো বছর বয়সেই কুলগুরু-প্রদত্ত মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। আমিষ খাদ্য ও বাড়ীতে নিষিদ্ধ। মন্ত্র জপ না করিয়া জলগ্রহণ স্বপ্নেরও অতীত। অথচ এখানে? তা মন্ত্র জপ মনে মনেই করা যায়, আর আমিষ জাতীয় কোন বস্তুই যখন তার গলা দিয়া ধমকের চোটে নামাইলেও পেটে রাখা কিছুতেই সম্ভবপর হইল না, তখন অগত্যাই সে ইহা হইতে ছাড় পাইয়া গেল। মুখে আপত্তি সে জানায় নাই, চেষ্টাও যথাসাধ্য করিয়াছিল কিন্তু তার প্রকৃতি যদি বাহিরের জবরদস্তি ভিতর হইতে না মানিয়া লয়—তবে উপায় কি? ডাক্তারও সেই কথা বলিলেন, "ওঁর নেচার ওঁকে যখন এ বিষয়ে সাহায্য করছে না, তখন চেষ্টা না করে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

উল্টো ফল হয়ে যেতে পারে—কঠিন কোন রোগ এনে।”

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মিঃ দত্ত এখানে একান্ত শান্তপ্রকৃতি নত নম্রস্বভাবা স্ত্রীর কাছে হার মানিতে বাধ্য হইলেও চেষ্টা ছাড়িলেন না। অদিতি যে বাড়ীর মেয়ে তাঁরা অনেকটা উদারমতাবলম্বী ও উচ্চ-শিক্ষিত লোক। অদিতির পিতা নৈষ্ঠিক ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি। একজন সুবিখ্যাত সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিতের তিনি ছিলেন পরমভক্ত মন্ত্রশিষ্য। তাই তাঁর বাড়ীতে বৈষ্ণবাচার ও শাক্তাচারের সমন্বয় ছিল। দেবদেবী নির্ব্বিশেষে সে বাড়ীতে শ্রদ্ধা-সহকারে সম্পূজিত হইতেন। গৃহের কুলদেবতা ছিলেন সর্ব্বজীবের অন্ন-দায়িনী দেবী অন্নপূর্ণা, তাই বলিয়া শালগ্রামরূপী দধিবামনের নিত্য পূজার সেখানে এতটুকু ত্রুটী ছিল না। ঝুলন, রাসযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রামনবমীতে উৎসবের ত্রুটী হইত না। গীতা উপনিষদের পঠন-পাঠনও চলিত। অদিতি শ্বশুরবাড়ীর কঠোর বৈষ্ণব-তন্ত্রে দীক্ষিতা হইলেও বাপের বাড়ীর শোণিত-সম্পর্ক ভিতর হইতে ধুইয়া ফেলিতে পারে নাই। লেড্‌লর দোকানে সিল্ক লেশ ও রিবন কিনিতে গিয়া পথের দোকান হইতে কৃষ্ণ-রাধা ও অন্ন-পূর্ণার আর্ট স্কুলে ছাপা দু'খানি ছবি সে কিনিয়া আনিয়া নিজের ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে গোপনে লুকাইয়া রাখিয়া স্নানের পর প্রসাধন করার অছিলায় তাঁদের মানস-পূজা জপ করিয়া খানিকটা আত্মতৃপ্তি সম্পাদন করিত। তার এই গোপন পূজা অনেক পরে তার মৃত্যুর পরে জানিতে পারিয়াছিল তার একমাত্র সন্তান, কন্যা অণিমা। বয়স তার তখন বছর দশেকের বেশী নয়, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে সে, বাপের চরিত্র সে এই বয়সেই চিনিয়া ফেলিয়াছিল। মায়ের জীবনের গোপন কথা সে তাই গোপনেই থাকিতে দিল। বাপের চোখে পড়িলে বা কানে ঢুকিলে তাঁর মৃতা পত্নীকেও তিনি কখনই যে ক্ষমা করিবেন না, এ কথা সে জানিত। মেয়েকে তিনি তাঁর নিজের আদর্শে তৈরী করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া-

ছিলেন। একবার একটি দাসী উহাকে প্রতিবেশী গৃহের দুর্গাঠাকুর দেখাইয়া প্রসাদ খাওয়াইয়া আনার সঙ্গে সঙ্গেই বরখাস্ত হইয়া যায়। সেকথা সে ভুলিয়া যায় নাই। যে পিতা কখনও একটা চড়া সুরে কথা বলেন নাই, তিনি তার দিকে কঠোর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া কঠিন কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "ফের যদি ঐ সব পুতুল-পূজো ভূত-পূজো দেখতে যাবে তো তোমাকেও অমনি করে—"

শেষ কথাটা মুখ দিয়া উচ্চারিত না হইলেও বুদ্ধিমতী মেয়ের অর্দ্ধোক্তির অর্থ বুঝিতে বাকি ছিল না, সে ভয়ে সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেল।

• •

ছয়

যামিনী পরিবারের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে তাড়াতাড়ি তার বাপ, দত্ত পরিবারের প্রতি একান্ত আক্রোশ বশেই যেন, তার সহিত কলিকাতার বিশিষ্ট ধনী কন্যা সুসঙ্গতার বিবাহ দিয়া বসিলেন। তাঁর ভয় ছিল ছেলে হয়ত বাঁকিয়া বসিয়া কিই না কি করিবে। কিন্তু তাহাকে সামান্য মনমরা হইয়া দু'পাঁচদিন থাকার পর যথাপূর্ব্ব সহজ ভাব অবলম্বন করিতে দেখিয়া হাঁফ ছাড়িয়া পাত্রী খুঁজিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সুসঙ্গতার পিতা তাঁর পরিচিত ও কুটুম্ব সম্পর্কিত। পূর্ব্বেই তিনি এই ছেলের জন্য দরখাস্ত পেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন, খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন হইল না। এক কথার বেশী লাখ কথা তো নয়ই, পাঁচ কথাও কহিতে হইল না। পিতা অবশ্য পুত্রের মতামত দু'বারই জানিতে চাহিয়াছিলেন। অণিমার সঙ্গে সিভিল ম্যারেজে তার সম্মতি আছে কিনা এ প্রশ্নও করিয়াছিলেন। ইহাতে সম্মতি তার

নাই শুনিয়া তার ললাট চুম্বনে অন্তরের একান্ত ও সুগভীর আনন্দ প্রকাশানন্তর এই বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। যামিনীর বিবাহে আদৌ রুচি ছিল না কিন্তু অপমানিত বাপের মানসিকতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সে তাঁহাকে না বলিতেও পারিল না। বস্তুত তার তেজস্বী ধার্ম্মিক ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির পিতা নিজের চেয়ে পুত্র-গৌরবে আহত হইয়াই যে দত্ত সাহেবের এই প্রতি-পক্ষকে খাড়া করিয়া তাঁদের প্রত্যাখ্যানের প্রত্যুত্তর দিতে নিজ স্বভাবের বিপরীত ভাবেই আজ নিজের সহিত বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন, পিতৃভক্ত বুদ্ধিমান ছেলের ইহা বুঝিতে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় নাই। পুত্রবৎসল নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির স্নেহময় পিতার মর্ম্মব্যথা অন্তরে অনুভব করিয়া সে নিজেকে তাঁর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিল। অণিমা যদি বাপের উন্মত্ত খেয়াল খুশীর উপর তাহাকে, অবলীলায় পরিত্যাগ করিতে পারে, সে কেন পারিবে না? সে কি বাপকে সমঝাইয়া তাঁকে মতান্তরে আনিতে পারিত না? না পারুক, অনুমতি আদায় করিয়া লইতে নিশ্চয়ই পারিত, অন্তত যামিনীকে সেদিন দেখা দিয়া তার জন্য প্রতীক্ষা করিতে বলিতেও যে না পারিত তাও তো নয়। না, সে তাকে ভালবাসে নাই। অন্তর হইতে কোনদিনও একান্তভাবে তাকে চাহে নাই, তবে কি জন্য সে অপমানাহত অভিমানী পিতাকে আবারও একটা আঘাত করিবে? কিন্তু এই বিবাহটা কোন্ অশুভ মুহূর্ত্তে ঘটিয়া গেল, যার ফলে দুটি দিন না যাইতেই সপুত্রপরিজন কান্তিবাবুকে হাত কামড়াইয়া শোণিতাক্ত করিতে হইল, এ ষড়যন্ত্র কাহার? মিঃ দত্তর, না কান্তিভূষণের, না যামিনীর পাপগ্রহদের।

সুনন্দা ধনীকন্যা। অত্যন্ত সুখলালিতা সে। বাপ তার ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা লইলে পিতামাতা ছেলেমেয়েদের ধনী বাপের কাছ হইতে কাড়িয়া নিজেদের কাছে আনেন নাই, তারা জমিদার পিতামহের ঐশ্বর্য্য-প্রাচুর্য্যের

মধ্যেই থাকিয়া গেল ভবিষ্যতের আশায়। পিতামহী বাপে খেদানো, মায়ে তাড়ানো নাতিনাতনীদের প্রয়োজনাতিরিক্ত আদর দিয়া তাদের 'আদুরে-গোপাল' তৈরি নির্ব্বাধভাবেই করিতে পাইয়া খুশী হইলেন।

ফলে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সহবৎ কিছুই হইল না। তারা শিখিল শুধু বিলাস-বৈভব ভোগ করিতে। মা বাপের মৃত্যুর পর পিতৃত্যক্ত ঐশ্বর্য্য সুসঙ্গতার পিতা ভবতারণবাবুরই আয়ত্তগত হইল। পরিকল্পনা তাঁদের সার্থক হইল বটে, তবে ছেলেমেয়েদের ইহ-পরলোকও যে সেই মূল্য আদায় করিতে গিয়া ঝরঝরে হইয়া গিয়াছে, সেটুকু বুঝিতে বড় বেশী বিলম্ব ঘটিল না। কি আর করা যাইবে, তারা তো তাঁর ধনভাণ্ডারের ক্যাশ-রক্ষক। বাপ বলিয়াছিলেন, ত্যাজ্যপুত্র করিয়া সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দিবেন, তাদেরই জন্যে তো সেটা করিতে পারেন নাই। এ গল্প সুসঙ্গতাই শ্বশুরঘরে প্রবিষ্ট হইতে না হইতে সগর্ব্বে ঘোষণা করিয়া আশা করিয়াছিল, শ্রোতাদের মনে সে মস্তবড় একটা চমক লাগাইয়া দিবে, পারিয়াছিল কিনা তাহা তার শ্রোতারাই জানে।

কোর্টে সেদিন একটা জরুরী কাজ ছিল, যামিনী সুসঙ্গতাকে একটা ইংরেজী চিঠি নকল করিতে দিলে সে স-তাচ্ছিল্যে জবাব দিল, "হাতের লেখা আমার ভাল নয় বাবু, আর বানান ভুল হলে দোষ দিও না কিন্তু।"

বিস্মিত যামিনী কহিল, "সে কি! দেখে নকল করবে তা'তে বানান ভুল! তুমি তো ম্যাট্রিক দিয়েছিলে শুনি!"

"হুঁঃ! সে তো বাবা জবরদস্তি মাস ছয় সাত একটা প্রাইভেট টিচার ধরে হাড় মাস জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল। আমিও বাবা, তার শোধ নিয়েছি! সমস্ত সবজেক্টেই গোল্লা।" সেই অপূর্ব্ব স্মৃতি-সুখে সে উৎফুল্ল হইয়া হাসিয়া উঠিল। ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া বিরক্ত যামিনী চিঠি হাতেই ফিরিয়া গেল। সেই দিকে সাবজ্ঞা দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সুসঙ্গতার

সরু ভুরু দুটি উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ঠোঁট উল্টাইয়া সে মন্তব্য করিল, "বাবুর অমনি রাগ হয়ে গেল। তাতে আমার বড় বয়েই গেল। আমি কি ওঁর মাইনে খাওয়া মুহুরী নাকি যে মক্কেলের চিঠি নকল করতে যাবো। না বাপু, ও সব আমায় দিয়ে হবে-টবে না। এক দিন যদি করে দিই কোনরকমে, সাত দিন ঘাড়ে পড়বে না? বাবাঃ কি কিপ্‌টে মানুষ! উকিল হয়েছেন, নিজস্ব মুহুরী একটা রাখবার যুগ্যতা নেই। সাত শেয়ারের লোক দয়া করে যেটুকু করে দেয়।"

সুসঙ্গতার বাপের দানে দেওয়া জোড়াখাট, বিভেল করা আয়না দেওয়া দু-দুইটা আলমারী, দামী অর্গ্যান, অনেক ভাল ভাল ফার্নিচার দিয়া তার শোবার ঘরটি সাজানো। অবশ্য সাধারণ বাড়ীর সব চাইতে ভাল ঘরটিও এতো ঐশ্বর্য্য-প্রাচুর্য্যে সুসজ্জিত বলা যায় না। বাড়ীর পক্ষে ঘরের পক্ষে বেশী জাঁকালো হইয়া পড়িয়াছে, যেমন এ বাড়ীর সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা কিটফাট দামী সাড়ী পরা সুসঙ্গতাকেও ঠিক সাজে না। মনে হয় এই মধ্যবিত্তর ঘরে সে একজন বিত্তশালিনী নিমন্ত্রিতা কুটুম্বিনী। একদিন সে বিছানায় শুইয়া নভেল পড়িতেছিল, এদের পাশের বাড়ীর চঞ্চলা আসিয়া আবদার ধরিল, "এট্টা গান গাও না বৌদি! বাজনা বাজিয়ে গান গাইলে আমার বড্ড ভাল নাগে, গাও না ভাই।"

সুসঙ্গতার একেই তেমন ভাল লাগিতেছিল না। গল্পের নায়িকাটি একেবারেই সেই আদ্দিকেলে, 'পতি পরম গুরু' চিরুণী খোঁপায় না পরিলেও ঠিক ঐ মার্কা তার মনে ছাপানো। সে উত্তর দিল, "এ বাড়ীতে গান গাইতে হলে বার, তিথি, নক্ষত্র, দিনক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে হয়, গানের কুষ্ঠি বিচার করতে হয়—তা জানো না? গান কি অমনি খামোকা গাওয়া যায় নাকি, এদের ঘরে?"

চঞ্চলা অবাক হইয়া গেল, "ওমা! সে আবার কি গো! সে তো

ের সময়েই লাগে।"

সুসঙ্গতা কহিল, "উঁহুঃ, তোমাদের দেশে সকল তা'তেই লাগে।"

"না না, হেই বউদি! তোমার দুটি পায়ে গড় করি বৌদি! অত রে তাড়াহুড়ো কাজ সেরে আসছি, লক্ষীটি আমার মাথা খাবে, একটা ও ভাই!"

সুসঙ্গতা উঠিয়া বলিল, "অত করে মাথা খাওয়াচ্ছো যখন,—বেশ ইছি, দোষ-ঘাট হলে আমি কিন্তু জানিনে।" অর্গ্যানের কাছে টায় বসিয়া গাহিল,—

"যমুনার কূলে কালা বাঁশরী বাজায়
ঘরে থাকা কি লো যায়? . .
বাঁশী ডাকে, রাই-রাই,— আমার মন বলে, যাই-যাই,
শাশুড়ী ননদী ঘরে করি কি উপায়?
কেন ডাকে 'রাধা রাধা' জানে না কি কত বাধা,
কি ছলে যে যাবো জলে, করি কি উপায়!—"

যামিনীর ছোট বোন নন্দিনী দ্রুত প্রবেশ করিয়া ত্রস্তে কহিয়া ঠল,—"বউ দি! করছো কি! বাবা বাড়ী রয়েছেন, ও গান কেন লে ভাই! ভাল দেখে একটা গাইলেই তো পারতে?"

সুসঙ্গতা চঞ্চলার দিকে চাহিল, "শুনলে?"

নন্দিনীর দিকে ফিরিয়া তীব্রস্বরে উত্তর দিল, "কেন? কি এমন মন্দ ন গেয়েছি? কি দোষ ঘাট হলো শুনি? নিধুবাবুর টপ্পা নাকি এটা?"

নন্দিনী অপ্রতিভ হইয়া গেল, আস্তে আস্তে বলিল, "দোষের কথা চ না, তবে গুরুজনদের কানে দেবার মতনও তো নয় গানটা। ভাল নের তো আকাল নেই দেশে। রবীন্দ্রনাথের, রজনী সেনের কত ল ভাল গানও তো রয়েছে।"

সুসঙ্গতা ঝাঁজিয়া উঠিল, "দেখ, সকল তাতেই সদ্দারী করতে এ
না, সহ্য হয় না অত বাড়াবাড়ি। নাকে কানে এই খত দিচ্ছি আর
ককখনো এ বাড়ীতে বসে গান গাই—" উঠিয়া আসিয়া বিছানায় শু
পড়িল।

নন্দিনী যেন লজ্জায় মরিয়া গেল, কাঁদো কাঁদো হইয়া গিয়া আ
বলিল, "তুমি বড্ড শীগ্গির চটে ওঠো। বাবা বাড়ী রয়েছেন, ত
বলছিলুম। নৈলে—"

"তোমার বাবা কখন না কখন বাড়ী থাকেন তাই শুনি? চব্বি
ঘণ্টাই তো মেয়েমানুষের মতন ঘরের মধ্যে বসে আছেন, সে হিে
রাখতে গেলে কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত গান গাইবার জন্যে অপেক্ষা করে ব
থাকতে হয়।"

নন্দিনী সক্ষোভে কহিয়া উঠিল, "কি কথায় যে কি কথা টেনে আনে
আজই বাবা দুঃখ করছিলেন, উপাসনায় যোগ দেওয়া ছেড়ে দিয়েছ বলে

সুসঙ্গতা বেগে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, "না, যাই না! বে
যাবো। আমি কি ওঁর মতন বুড়ো হয়েছি? তিনকাল গিয়ে এককা
ঠেকেছে আমার, যে তাঁর সঙ্গে সমানতালে তাল দিয়ে যাবো? ব
পরকালের ডাক এসেছে, কষে সাধনভজন করে পারে যাবার পারা
জোগাড় করুন, আমার উপর এতো জুলুম চালাতে আসেন কেন?"

নন্দিনী ভয়ে ভয়ে কথা কহিল, "আমাদের যেভাবে শিক্ষা দিয়েছে
তোমাকেও সেইরকম তৈরি করতে চান, এ'কে তুমি জুলুম মনে করো বে
বৌদি! আমাদের চাইতেও যে তুমি বেশী আপন।"

সুসঙ্গতা ব্যঙ্গপূর্ণ হাস্য করিল, "হয়েছে, থাক! দেখ নন্দিনী! তু
আর শিক্ষার গুমোর আমার কাছে করতে এসো না। তোমাদের বাড়ী
মতন শিক্ষা আমার সাত জন্মেও হয়ে কাজ নেই। 'অন্ধকার হইে

তাঁহার উপদেষ্টা ডারুইন হক্স্লে হাজার বার তাঁহাকে অস্বীকার করিতে হয় করুন, সত্যই কি তিনি নাই ? কিন্তু তাহাতেও তার এ ব্যর্থ জীবনের নষ্ট শান্তি তো আর পুনঃ-সংস্থাপিত হইবে না। যৌবনের সে আলোকোজ্জ্বল জীবন-স্বপ্ন জন্মের মতই ফুরাইয়া গিয়াছে। তথাপি সে যখন তাঁর যন্ত্রণা-কাতর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তখন হৃদয়ভরা করুণায় তাহার শুষ্ক চিত্ত সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মানবের সমুদয় উন্নতির, আশা-বাসনার দর্প দম্ভ যাহা কিছুরই, এই তো পরিণাম চিত্র!

যামিনী গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মিঃ দত্ত গভীর উদ্বেগের সহিত বলিতেছিলেন, "অনি! যামিনী তো কই এলো না রে ?"

অণিমা তার সান্ত্বনাপূর্ণ কণ্ঠ সমধিক কোমল করিয়া উত্তর দিল, "কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত আছেন, তাই হয়ত একটু দেরী হচ্ছে।"

মিঃ দত্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, "যদি সে না আসে ?"

অণিমা শান্তস্বরেই জবাব দিল, "না-ই যদি আসেন, না-ই এলেন; তুমি কথা বলো না বাবা!"

মিঃ দত্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, সাশ্চর্য্যে কহিলেন, "বলিস কি অনি! নাই বা এলো! ও না এলে চলবে কেন ? কি বলছিস তুই পাগলীর মতন।"

যথা-পূর্ব্ব বাপের কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে অণিমা অবিচলিত স্বরে অথচ শান্ত ভাবেই উত্তরে কহিল, "কেন বাবা, এত ব্যস্ত হচ্চো তুমি! হয়ত আসবেন, কোন কাজে দেরী হচ্চে। তবে আমি বলি, কি এমন দরকার ? পরের উপরই বা কেন আমরা অতটা নির্ভর করতে যাবো। জামাইবাবু তো আসবেন বলেছেন!"

মিঃ দত্ত উত্তেজনায় অর্দ্ধোত্থিত হইলেন, "বলিস কি অনি! তার উপর যে আমার দাবী রয়েছে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই আছে। তার উপর যদি দাবী নেই

তো কার উপর আছে তাই বল তো? তাকে হারিয়ে যে আমি তার দাম বুঝেছি রে। তাকে চিনেছি!" ক্লান্তভাবে শুইয়া পড়িলেন।

"বাবা! মিথ্যে কেন এত উত্তেজিত হচ্চো! আমি বরং পড়ে শোনাই—।"

মিঃ দত্ত হাত নাড়িয়া বাধা দিলেন, "না! থাকগে, সারাজীবন ধরে তো অনেক কিছুই পড়েছি, তা'তে করে কোন কিছুরই কি মীমাংসা হ'ল? জীবনের জটিলতা বেড়ে গেল বই কমলো না তো। বাট আন্‌য়েব্‌ল্ দো উই মাস্ট এভার রিমেইন টু গিভ এ কমপ্লিট য়্যাকাউন্ট অফ ইটস মাইনর পার্টস—না, না, মন ভরে না, ভাল লাগে না। না, না, ভাল লাগে না.—লাগে না—ইট ইজ বিয়ণ্ড আওয়ার রীচ, বিয়ণ্ড আওয়ার ইনটেলিজেন্স—অনি! বড্ড কষ্ট রে!"

অণিমা উঠিয়া দাঁড়াইল, "ওষুধ খাবার সময় হয়েছে—খাইয়ে দিই, খেলে একটু কমবে।"

দ্বারের বাহির হইতে বয় জানাইল, "পরকাশবাবু আয়া—"

যামিনী আসিয়া নমস্কারান্তে খাটের কাছে দাঁড়াইয়াই চমকাইয়া উঠিল। এ কি মূর্ত্তি হইয়া গিয়াছে! সেই তেজোদীপ্ত সতেজ ও অনমনীয় শরীর-মনযুক্ত লোক যে শুধু সংসারেরই নয় সংসারাতীত সর্ব্বশক্তিমানের সহিতও বিদ্রোহ করিতে পিছু হটে না—আজ এই রোগশীর্ণ জরা-জর্জ্জরিত অবসন্ন রোগী, এই কি সেই একই লোক?

গভীর সহানুভূতির সহিত প্রশ্ন করিল, "কেমন আছেন?"

মিঃ দত্ত ক্ষীণকণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিলেন, "ব্যাড য়্যাজ ব্যাড।"

"গঙ্গার ধারের হাওয়ায় একটুও সুস্থ বোধ করছেন না?"

মিঃ দত্তের ক্লিষ্ট অধরে ঈষৎ হাসি ফুটিয়া উঠিল, "ইট ইজ টু লেট ইন দি ডে, মাই বয়!"

একটুক্ষণ পরে কহিলেন, "তোমার সঙ্গে একটু কথা কইবার আছে, প্রকাশ!"

"আজ্ঞা করুন—" বলিয়া যামিনী রোগশয্যার নিকট রক্ষিত চেয়ারখানায় বসিল। অণিমা ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই সুসংযত অথচ শোকদীর্ণমূর্ত্তি অসহায়া নারীর মহিমময় মুখের দিকে এক লহমার জন্য সপ্রশংস দৃষ্টিতে না চাহিয়া পারিল না।—হায়, কোথায় অণিমা আর কোথায় সুসঙ্গতা!

মিঃ দত্ত তখন তাঁর কষ্টে-উচ্চারিত ক্লান্ত স্বরে বলিতেছিলেন, "প্রকাশ! যে ভুল আমি করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত নেই। আমার প্রাণাধিক কন্যার সমস্ত জীবনটাকে আমি নষ্ট করে দিয়েছি। আর তুমি? সন্দেহ হয় সুখী হতে পেরেছ কিনা! আমার ঐ মেয়েকে যে পাবার আশা করে অতখানি এগিয়ে গেছলো সে-কি আর—যাক্ এ সব কথা বলেও লাভ নেই, বলবার অধিকারও হয়ত আমার নেই আজ—"

যামিনীর দুই চোখ দীপ্ত হইয়া উঠিল, দারুণ আক্ষোভে বুক তার ফুলিতে লাগিল—কোনমতে সেই সহসা-জাগ্রত মানসিক বিপ্লবকে সংহত করিয়া রাখিয়া রুদ্ধপ্রায় গাঢ়-স্বরে সে তাহাকে থামাইয়া দিল, "যেতে দিন! অতীতের আলোচনা নিরর্থক। তাতে আপনি অসুস্থ।—মিহির কবে নাগাদ ফিরছে?" কণ্ঠের কম্পন সে রোধ করিতে পারিয়াছিল।

মিঃ দত্ত কহিলেন, "আমার কাছে এই কথাই যে আজ সব্বার চাইতে বড় হয়ে উঠেছে প্রকাশ! কেমন করে তাকে যেতে দোব? আমি নিজে যাই হই না কেন, ওর জীবনটাকে নিয়ে বারগেন করা আমার উচিত হয়নি। তারই ফলে সে মেয়ে আমার চির-সন্ন্যাসিনী হয়ে রইলো তাতে তো কোনই ভুল নেই। সে স্পষ্টই বলে দিয়েছে, বিয়ে এ জন্মে সে করবে না,—কিছুতেই না। মিহির পর্য্যন্ত দেশে নেই, জানি না কবে এবং কি

ভাবে সে ফিরবে। কে ওকে দেখবে। ও যে বড় একা!"

যামিনী তার একান্ত-আহত দৃষ্টি ভূমিলগ্ন করিল, বলিবার কিছুই নাই তার পক্ষ হইতে।

মিঃ দত্ত বিলাপপূর্ণ প্রলাপের মতই বলিয়া চলিলেন, "দেশ-বিদেশে অনেক ঘুরেছি প্রকাশ! অনেকের সঙ্গেই মিশতে সুযোগ পেয়েছি,—বহু সুযোগ্য পাত্র অযাচিত হয়ে ওকে প্রার্থনা করে হৃদয়-ভরা আগ্রহ নিয়ে ছুটে এসেছে। ও কারও দিকে চেয়েও দেখেনি। দ্বিধাহীন চিত্তে প্রার্থিত-তমকেও প্রত্যাখ্যান করেছে। আমি—হ্যাঁ, আমিও তার জন্যে ওকে অপরাধী করতে পারিনি। কেন পারিনি জানো? তোমার মুখ, তোমার ব্যবহার সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে জেগে উঠেছে। বুকের মধ্য হতে তার-স্বরে বিলাপ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, বলেছে, 'ওরে মূঢ়! তার কাছে এরা কি! প্রকাশ! প্রকাশ! আমি হাতের মানিক অতল জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। আমার সব চাইতে প্রিয় যে তারই সর্বনাশ আমি স্বেচ্ছায় করে ফেলেছি। উঃ, কেন তুমি জোর করে তাকে আমার কবল থেকে কেড়ে নিলে না? কেন নিলে না, কেন নিলে না?"—

অসহায় অনুতপ্ত মৃত্যুপথযাত্রীর এই মর্মবিদারী অভিব্যক্তিতে যামিনী যেন তড়িতাহতের মতই চমকিয়া উঠিয়াছিল। একটু পরে আত্মস্থ হইয়া সচেষ্ট গাঢ়স্বরে অতি ধীরে উচ্চারণ করিল, "আপনি জ্ঞানী, বৃথা পরিতাপ পরিহার করুন, নিয়তির লেখা কে অতিক্রম করতে পারে?"

শীর্ণ অধরে শুষ্ক হাসিয়া মিঃ দত্ত কহিলেন, "এ সান্ত্বনা আমার জন্যে নয় প্রকাশ! সে হয়ত তোমার বাবা ভাবতে পেরেছিলেন। আমি তো মানুষের আত্মশক্তির বাইরে কোন দৈবশক্তিকে মানি নি, আজ কি আমি আমার এই একান্ত অসময়ে আত্মপ্রত্যয়হীন হয়ে তাদেরই পায়ের তলায় আত্মসমর্পণ করে দিয়ে নিজের মনকে চোখ ঠারবো?

না, না, এ আমার অবিমৃশ্যকারিতার অবশ্যম্ভাবী প্রত্যক্ষ ফল। এ আমার স্বেচ্ছাকৃত পাপের দণ্ড! এর জন্যে কেউ দায়ী নয়, এ আমি একাই বইবো আর বইবে আমার এই দাম্ভিকতার রক্ত নিয়ে যে আমার সন্তান হয়ে এসেছে, শত নিরপরাধী হলেও সে। আগুনেতে হাত দিয়েছি, হাত পুড়বে না ?"

যামিনী সান্ত্বনার একটি ভাষাও খুঁজিয়া না পাইয়া নীরব রহিল, মনে মনেই বলিল, "আজও সেই একনিষ্ঠ নাস্তিকতা! আশ্চর্য্য মনোবল বটে! তবে দুঃখও তো কম পাচ্চেন না।"

মিঃ দত্ত একটুখানি দম লইয়া আবার বলিয়া উঠিলেন, "আমার মৃত্যুর পর আমার অনিকে তুমি একটু দেখ। ওকে তো সবাই ঠিক বুঝতে পারবে না, ও যেমন যেমন চায় তুমি ওকে সাহায্য করো। ওর ব্যর্থ জীবন যেন আরও ব্যর্থ হয়ে না যায়। উইলে তোমাকেও আমি রমেনের সঙ্গে ওর সম্পত্তির এক্‌জিকিউটার করেছি। উঃ বড় কষ্ট! অনি!"

পাশের ঘরেই ছিল, বাপের ক্ষীণ কণ্ঠের আহ্বান পাইয়া অণিমা দ্রুত-লঘু পদে গৃহ-প্রবিষ্ট হইয়া সহজ সপ্রতিভ ভাবেই যামিনীর দিকে চাহিয়া অনুরোধের ভাবে কহিয়া উঠিল, "প্রকাশবাবু! বাবা এখন একটু বিশ্রাম করবেন।"…

যামিনী উঠিয়া পড়িয়া দুজনকেই বিদায়-অভিবাদন জানাইল, কহিল, "ও বেলা আবার আসবো।" সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। এ যাত্রায় পূর্ব্বেকার সেই আর এক দিনের নির্ব্বাসন-যাত্রার কথা মনে তার না পড়িবার উপায় ছিল না।

যামিনী চলিয়া গেলে অনুযোগের স্বরে অণিমা কহিল, "বাবা, তুমি আজ বড্ড বেশী কথা বলেছ। ও বেলা আর তোমার সঙ্গে ওঁকে দেখা করতে দেব না কিন্তু, সে তুমি জেদ করো না।" বলিয়া মাথায় কপালে

হাত বুলাইতে লাগিল। মিঃ দত্ত অন্যমনে কহিলেন, "না, না, এই যে আমি চুপ করছি! কিন্তু অনি! প্রকাশ একটি রত্ন! আমি কি করেছি বল্ তো? এমন কখন কেউ কি করে? অনি!"

অণিমা সজল কণ্ঠে কোনমতে উত্তর দিল, "কি বাবা!"

"তুই নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ পড়েছিস?"

অণিমা এবার আত্মসংবৃত হইয়াছিল। সাগ্রহে কহিয়া উঠিল, "পড়েছি তো বাবা! কেন? পড়বো, তুমি শুনবে?"

মিঃ দত্তর বিশীর্ণ অধরে একটুখানি স্মিতহাস্য ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন—"নাঃ। ওর একটা স্ট্যান্জা মনে পড়ে গেল।

"মূর্খ তুমি মাটি কাটি লভি কহিনূর,
অনা'সে সে রত্নে হায়, ঠেলিয়া ফেলিলে পায়,
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর—"

অণিমা ত্রস্তে পিতার মুখের উপর হাত চাপা দিল, "বাবা! বাবা! তুমি যদি ও রকম করবে, আমি তা হলে এখ্খুনি উঠে পালিয়ে যাবো। স্থির হয়ে একটু ঘুমোও দেখি। যন্ত্রণা যে বেড়ে যাবে।"

বিনীত শিশুর মতই সরল হাস্যে পিতা কহিলেন, "আচ্ছা মা! আমি ঘুমাবো। তুমি যা হয় একটা কিছু পড়ে শোনাও তাহলে।"

অণিমা উঠিয়া দাঁড়াইল, "কি পড়বো বলো ত বাবা।"

মিঃ দত্ত অধৈর্য্য ভাবে মাথা নাড়িলেন, হতাশ ভাবে জবাব দিলেন, "তোমার যা খুশি! ওঃ লেট, লেট, সো লেট! য়্যাণ্ড ডার্ক দি নাইট য়্যাণ্ড চিল্! লেট লেট, সো লেট—"

"উঃ! বাবা!"

"নাঃ, আর না", মৃদু কণ্ঠে বলিয়া চলিলেন, "লেট, লেট, সো লেট সো লেট, সো-সো-ও—

পিতার বিছানার নিকটে ভূমে জানু পাতিয়া বসিয়া অণিমা ধীরে ধীরে তাঁহার কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে সম্মুখস্থ ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইয়াছে কি না।

•

মিঃ দত্তের শেষ দিন কটা যামিনী নিজের সাধ্যমত তাঁহাদের সাহায্য করিল। অণিমা তাহার অসহায় অবস্থায় এত বড় সহায় পাইয়া তাহার জলভারাকুল মেঘের মত সজলনেত্রের কৃতজ্ঞতায় তাহা পুনঃপুনঃই প্রকাশ করিল। যাহার মুখ চাহিয়া যে মহান তরুকে অবলম্বন করিয়া সেই ক্ষুদ্র লতাটি এ পৃথিবীর সমস্ত ঝঞ্চা বৃষ্টির হস্ত হইতে অক্ষত রহিয়াছিল, তাহার সেই একমাত্র আশ্রয়কে উৎপাটিত করিতেই যে আজ আকাশ জুড়িয়া করাল ঝটিকা বজ্র-প্রহরণে সাজিয়া আসিয়াছে! আসন্ন বিপদের শোণিত-শীতলকারী ভীষণ আতঙ্কে মুহুর্মুহুঃ তাহার বুকের স্পন্দন পর্য্যন্ত যেন থামিয়া যাইতেছিল। মিঃ দত্ত অণিমার অজ্ঞাতে একদিন যামিনীকে বলিলেন, "সে যাতে বিয়ে করে তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে দেখো, আমি তো কিছুতেই পারি নি। একজন সিবিলিয়ানের একান্ত অনুরোধে অনেক করেই বলে-ছিলাম, কিন্তু ও বলে ও নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে 'এ জীবনে বিয়ে করবে না।' বোধ করি এ প্রতিজ্ঞা আমারই দুর্ব্বুদ্ধির ফল। যদি না করে, মিহির দেশে না ফেরা পর্য্যন্ত তুমি তাকে একটু দেখো। তার টাকায় সে যা করতে চায়, তুমি তাতে তাকে সহায়তা করো। আমার মাকে আমি কার কাছে রেখে যাচ্ছি! ওঃ, বিলাভেড্ ডটার অফ মাইন!"

যামিনীর বুকের মধ্যেও প্রচণ্ড বেদনার বিষম আঘাত পড়িল। কেন সে বিবাহে অনিচ্ছুক? এর মধ্যে তার নিজেরই কি কোন সংস্রব নাই? এ কার অভিশাপের ফল?

রমেন্দ্র ও মৃণালিনী অণিমার কাছে আসিয়া পৌঁছিলে যামিনী কিছু নিশ্চিন্ত হইল। মৃণালিনী অণিমার পিসতুতো বোন, সমবয়সী। রমেন্দ্রনাথ ব্রীফহীন ব্যারিস্টার। হাইকোর্টে সে নিরাশ হইয়া পশ্চিমের কোন সহরে যাইবার কল্পনা করিতেছিল, এই সময়ে স্ত্রীর একান্ত উপরোধে মামা-শ্বশুরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। কলিকাতায় থাকিতেই বন্দোবস্ত পূর্ব্বেই ঠিক ছিল, বাসা উঠাইয়া আনিতে যেটুকু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।

যে ক'দিন মৃণালিনী না আসিয়াছিল, যামিনীর পক্ষে সে বড় অশান্তির দিনই গিয়াছে। বসিয়া বসিয়া সহানুভূতিপূর্ণ চিত্তে পিতৃহীনার গভীর মর্ম্মবেদনা পর্য্যবেক্ষণ করা ভিন্ন যেখানে আর কিছুই করিবার নাই, সেখানে না যায় চলিয়া আসা, না যায় থাকা। নিজে পিতৃহীন, তাই পিতৃহীনার অতলস্পর্শ দুঃখ সে নিজের মন দিয়াই অনুভব করিতে পারে। সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া যায়। সান্ত্বনার ভাষা মুখে যোগায় না। এও জানে তার দুঃখের সীমা আছে, তার কাজ আছে, বহুবিধ কর্ত্তব্য আছে, মেয়ে আছে,—এর কিছুই নাই। একরকম সর্ব্বহারা।—স্ত্রীকে বলিল, "মিস দত্তর কাছে যদি এক একবার যাও তো ভাল হয়। বেচারি একেবারে একা।" প্রস্তাব হুসেন্তার মনঃপূত হইল না। রোগীর ঘর বা শোকের সঙ্গ তার সহ্য হয় না। প্রাণ যেন কি রকম করিয়া উঠে। সে উত্তর দিল, "দু'জনে তাঁকে নিয়ে থাকলেই কি সংসার চলবে?"

যামিনী একটু বিরক্ত হইয়া কহিল, "অন্য জায়গায় বেড়াতে যাও যখন তখন কি করে চলে?"

"তুমি তো আমাকে কেবল বেড়াতেই দেখ। তোমাদের বাড়ীতে

জল খাওয়াইয়া মিঃ দত্ত জজিয়তী হইতে অবসর লইয়াছেন। সেবারে যামিনী ইংরাজি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হইয়া বি-এ পাশ করার পর মিঃ দত্ত তাকে বিলাত পাঠানোর কথা তুলিয়াছিলেন। একান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও কান্তিবাবু আর্থিক অনটনের জন্য সে পথ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। যামিনী এখন এম-এ, বি-এল হইয়া হুগলীকোর্টেই ওকালতি করিতেছে। মাঝখানে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ টাইটেল পাইয়া এখন এম-এল ও ডি-এল পরীক্ষার জন্য আইন পড়িতেছে।

এই সময় মিঃ দত্ত পেন্‌সন লইয়া কিছু দিনের জন্য তাঁর হুগলীর বাটীতে বাস করিতে আসিলেন। অণিমা বি-এ পাশ করার পর বাপের কাছে তাঁর প্রিয়শিষ্যারূপে একাগ্রভাবে তাঁর অতি প্রিয় পাশ্চাত্য-দর্শন-সাগরে ডুব দিয়া পড়িয়াছিল। পিতাপুত্রীর জীবনের দুই ধারা একত্রিত হইয়া একই খাতে তখন বহিয়া চলিয়াছে। পুত্র মিহির বার-দুই ফেল করায় এখনও ফাইনাল ল'টা সে পাশ করিতে পারে নাই। আই-সি-এস হওয়া তার পক্ষে অসাধ্য জানিয়া তাকে ব্যারিস্টারী পড়িতে বিলাত পাঠানোর ব্যবস্থা হইতেছিল।

এবারের প্রথম দেখায় মিঃ দত্ত যামিনীকে বলিলেন, "কই হে, তুমি যে বড় বিলেত গিয়ে আই-সি-এসটা দিলে না? এটা কি করলে, অ্যাঁ!"

লজ্জিত মুখে যামিনী উত্তরে তার যা বলার ছিল বলিলে একটু যেন উৎসাহ বোধ করিলেন। সন্দিগ্ধভাবে মন্তব্য করিলেন, "তা এও এক দিক দিয়ে নেহাৎ মন্দ নয়! গুরুদাস রাসবিহারী হতে পারলেই বা কম কি। বেশ! বেশ! লেগে থেকো। খুচরো রোজগারের লোভে পড়া-শুনো যেন ছেড়ে দিও না। তবে কি জানো, বিলেতটা গেলে দৃষ্টিশক্তিটা বাড়ে, মনটা উদার হয়, কূপমণ্ডূকতা ঘোচে।"

অল্পদিনের মেলামেশার পরই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মেয়ের সঙ্গে যামিনীর বিবাহের কথা কান্তিভূষণকে তিনিই বলিয়া বসিলেন।

এ আকাঙ্ক্ষা কি কান্তিবাবুরই মনে জাগে নাই? অনেক দিন আগেই তা জাগিয়াছিল, কিন্তু ইহাকে দুরাশা বলিয়াই তিনি তাহা তাঁর হৃদয়কন্দরের নিভৃত নিলয়ে গোপনে সমাহিত রাখিয়াছিলেন। এতটুকু বহিঃপ্রকাশে নিজেকে ছোট করিয়া ফেলেন নাই। আজ সেই আকাশকুসুম যখন বাস্তব-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল, আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়া বোন সৌদামিনীকে ও পুত্র যামিনীকে ডাকিয়া শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া মন্তব্য করিলেন, বলিলেন, "তোমার পরম সৌভাগ্য প্রকাশ, এমন একটি অনন্যসাধারণ নারীরত্ন তুমি লাভ করতে যাচ্ছো। তাঁর আবির্ভাবে আমার কুল পবিত্র হয়ে উঠবে এবং তোমাদের দুটিকে এক করতে পেরে আমিও ধন্য হবো।"

সেরাত্রে প্রকাশ যখন তার নির্জন শয়ন কক্ষের খোলা জানালাটার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, তার মনে হইল—আকাশভরা তারার দল যেন সেই ছোট্ট জানালাটির সম্মুখে চারিদিক হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তারই মুখের উপরে সকৌতুক-চক্ষে চাহিয়া দেখিতেছে। দূরে অদূরে গাছের পিছনে সারিবাঁধা সু-উচ্চ বৃক্ষশ্রেণী জ্যোৎস্না-রাত্রে ধূসরবর্ণ পাহাড়ের শ্রেণীর মত দেখাইতেছিল। তাদের পদপ্রান্তে তাদের ছোট্ট বাগানে সবুজ লতাগুল্ম গাছপালা যেন উপন্যাসের রচিত স্বপ্ন দিয়া গড়া কুঞ্জবনের মতই বিস্ময়কর। একটু শিরশিরে বাতাস গাছগুলাকে ঈষৎ দোল দেওয়ার মত করিয়া কাঁপাইতেছিল। প্রকাশ পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ করিল। কোন একটা বড় কামনা, নিজেরও অজ্ঞাতে প্রতিদিন একটু একটু করিয়া আগ্রহ ও অবসাদের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া কোন্ সময়ে আমাদের চিত্তের সমস্ত সংগ্রহের সঞ্চিত হইতে থাকে সে খবর আমরা সহসা একদিন জানিতে বিস্মিত হই।

আলোকে' আমি যেতে চাই না, যে তিমিরে আছি সেই তিমিরেই থাকতে পেলে বাঁচি। যাও ভাই, যাও, আমি যা আছি তাই থাকি—তুমি ভাল মেয়ে আমার সঙ্গে মিশো না, খারাপ হয়ে যাবে।' আমার পিছন ছাড়ো, আমার মুক্তি দাও।"

জুতাপায়ের শব্দ হইতেই চঞ্চলা অবাক অভিভূত হইয়া থাকা তাকে মুক্তি পাইয়া দ্রুত পালাইয়া গেল। যামিনী প্রবিষ্ট হইয়া একটু খুশি বোনের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে নন্দু! তোদের কি রকম, গল্প হচ্চে? একি, তুই কাঁদছিস?" কাছে আসিয়া সস্নেহে তার মাথায় চুলে হাত রাখিল, "কেন, রে! সোনামনিটি, কাঁদছো কেন?"

সুসঙ্গতা দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া সরোষে বলিয়া উঠিল, "বলো, বলো, সাতখানি করে লাগাও। বাঃ! বাঃ! এমন বোন-সোহাগী ভাই, আর ভাই-সোহাগী বোন সাত জন্মেও কখন দেখিনি।

যামিনী স্ত্রীর দিকে বিরক্ত মনে ফিরিল, "তুমি বুঝি ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছ?"

সুসঙ্গতা নাক সিঁটকাইয়া জবাব দিল, "আমার এ ছাড়া আর কি করবার আছে? তোমাদের সঙ্গে লাগবার জন্যেই না এই এঁটো পাদাড়ে এসে জুটেছি।"

যামিনী একটুক্ষণ অবাক হইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "আচ্ছা নন্দা এত ভাল মেয়ে, ওর সঙ্গে কি করে তোমার ঝগড়া হয়?"

সুসঙ্গতা চটপট জবাব করিল, "কেন, খুব সহজ উপায়ে। আমি খুব মন্দ বলে।"

নন্দিনী ইত্যবসরে একান্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল, সে চোখ মুছিতে মুছিতে ঠোঁটে একটু হাসির ভাব আনিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি তো কাঁদিনি দাদা! চোকে কি যেন একটা পড়েছিল। বৌদিকে কেন দোষ

দিচ্চো। আমি তোমার খাবার ঠিক করিগে যাই, তুমি কাপড় ছেড়ে এসো।” সে তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল।

সনিশ্বাসে যামিনী ডাকিল, “সুসঙ্গতা!”

সুসঙ্গতা জবাব দিল, “জী হুজুর!”

“এ আবার কী?” যামিনী ভ্রুকুটী করিল।

কেন কি দোষ হ'ল? হুকুম তো একটা কিছু করবেই, তাই বাঁদীর জবাবটা দিয়ে কাজটা একটু এগিয়ে রাখলুম। আমি তোমাদের পণে কেনা বাঁদী বৈ তো আর কিছু নই।”

“থাক তাহলে হুকুমটা আর শুনে কাজ নেই, বাকিই থাক।” যামিনী বাহির হইয়া গেল।

সুসঙ্গতা ক্লান্তির নিশ্বাস মোচন করিল, “বাপ হয়ে এত বড় শত্রুতাই কেউ করে? বিদ্বান! বিদ্বানের পা ধুয়ে ধুয়ে জল খেলেই পেট ভরে যাবে আর কি! হাড়-পোড়ানো মাস-জ্বালানো না কি যে বলে, এদের ঘরে এসে আমার হয়েছে তাই। পয়সার তো ছড়াছড়ি, তাই এর ওপর শ্বশুর মশাই পাঁচটি টাকা পাঠিয়ে দিয়ে হুকুম জারি করেছেন, মাস কাবারে ঐ টাকার হিসাব তাঁকে দেখাতে হবে, ন্যায় অন্যায় খরচা শুধরে দেবেন। হাসবো না কাঁদবো? টাকা যেন আমি কক্ষনো চোখে দেখিনি! আমিও সঙ্গে সঙ্গে ও টাকা ফেরত দিয়ে বলে পাঠালুম, ‘আমার বাবার কাছে আমি অনেক টাকা পাই, ও টাকা আপনাদেরই থাক, কাজে লাগবে।’ ”

যামিনী ঘরে ঢুকিয়া রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, “শুনলুম বাবার দেওয়া টাকা তুমি ফেরৎ দিয়েছ, এতে তাঁর মনে বড় আঘাত লেগেছে। কেন দিলে সুসো!”

সুসঙ্গতা শ্লেষের হাসি হাসিল, কিন্তু উত্তেজিত হইল না, বলিল, “কেন

লুম? তোমাদের হিসেবের কড়ি বাঘে খাবে না বলে, ভালই তো করেছি, তোমরা খরচ বাঁচাতে তো ভালই বাসো, পাঁচটা টাকা বেঁচে গেলো।"

"আমরা গরীব, খরচ বাঁচাবার চেষ্টা আমাদের করতেই হয়; কিন্তু তাই বলে বাবা নিজে হাতে করে যেটা দিলেন, সেটা ফেরৎ দিলে তাকে অপমান করা হয় নাকি?"

সুসঙ্গতা নির্লিপ্তমুখে জবাব দিল, "যাদের মানের বালাই যত কম, অপমানের ভাবনা তাদেরই ততো বেশী।"

"ছিঃ সুসঙ্গতা! বাবার সম্বন্ধে ওরকম সব মন্তব্যগুলো তুমি করো না। গরীব হলেও সম্মানে তিনি বহু ধনীর চাইতো খাটো নন। তার উপর তিনি তোমার পিতৃতুল্য, আমাদের যা করতে হয় করো, তাঁকে এতোটা তুচ্ছ করো না।"

"শুধু এক তরফা সার্মন না চালিয়ে ওঁকেও জানিয়ে দিও, আমায় যেন না ঘাঁটান। আমার ওপর ঢিল ছুঁড়লে পাটকেলটি খেতেই হবে। তা তিনি যিনিই হোন।"

সুসঙ্গতা বাঁকা চোখে বারেক যামিনীর মুখভাবটা দেখিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

সুদীর্ঘ একটা শ্বাস মোচন পূর্ব্বক যামিনী আত্মগতই কহিল, "ইনিই আমার জীবনসঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী!" একতাড়া কাগজ হাতে ছিল, সেইটে হাতে করিয়াই বাহিরে চলিয়া গেল।

সাত

দিন কাটিয়া যায়, আবহকাল যেমন চলিতেছিল। সে কাহারও জন্ম দাঁড়ায় না।

যামিনীর ওকালতিতে ফল তেমন কিছু সুবিধা দেখা গেল না। ডি-এল পড়া আর হইয়া উঠে না। ভবিষ্যৎটা দিনে দিনেই আলোকহীন হইয়া আসিতেছে। জীবন একান্ত বৈচিত্র্যবিহীন, আনন্দপরিশূন্য।

ক্ষুদ্র নাতিনীটিকে দুদিন বুকে ধরিয়া তার ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যে প্রৌঢ় জীবনের বিশ্রাম অবসরটুকুকে মধুময় করিয়া না তুলিতেই কান্তিবাবুর চিরবিশ্রামের আহ্বান আসিল। সংসারের কোলাহল ও হাসি-কান্নার সীমানার বাহিরে যে অনন্ত শান্তিরাজ্যের সংবাদ মনীষীগণের নিকট পাওয়া যায় তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ বিশ্বাসী চিত্ত সেখানেই আশ্রয়লাভ করিল—এমন কথা স্বতঃই মনে ওঠে। মস্ত বড় প্রলোভনও কোন দিন তাঁকে সাংসারিক লাভক্ষতির খতের মধ্যে ভুলাইয়া আনিতে পারে নাই। সাংসারিক যত কঠিন কর্ত্তব্য হোক, সানন্দে মাথা পাতিয়া লইয়াছেন।

পিতৃ-বিয়োগে আহতও হইল যত, ক্ষতিগ্রস্তও হইল তত—যামিনীপ্রকাশ একা, সংসারের ভারও পড়িল তার ঘাড়ে। কান্তিপ্রকাশ দরিদ্র ও অনাথাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন বলিয়া মধ্যবিত্ত পিতা অর্থ রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এ জগতে এক সঙ্গে ইহ এবং পর এই উভয় লোকের সংস্থান করা সহজ কথা নয়, জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া এক লক্ষ্য হওয়া ভিন্ন লক্ষ লক্ষ লক্ষ্য রাখিলে,কোন লক্ষ্যেই পৌঁছানো যায় না। "সব্যসাচী" ক-জন জন্মায়!

যামিনীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা এইবার সত্য করিয়াই ভাঙ্গিয়া পড়িল। সংসারের

দায় ভার লইয়া সে বড়ই নিঃসহায় বোধ করিল, অভাব যেন চারিদিক দিয়া গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। আর ক্ষতিগ্রস্ত হইল যামিনীর মাতৃ-স্নেহবঞ্চিতা শিশুকন্যা নলিনী। মেয়েটি স্বর্গের সৌন্দর্য্য ও পবিত্র প্রাণৈশ্বর্য্য লইয়া আসিয়াও মাতৃ-স্নেহের রুদ্ধ প্রবাহ মুক্ত করিতে সক্ষম হয় নাই। 'গরীবের ঘরে সাত তাড়াতাড়ি একটা মেয়ে কেন?'—এই অমীমাংসিত প্রশ্নের সমস্ত রুদ্ধ আক্রোশ সুসঙ্গতা তার অসহায় সন্তানের প্রতিই নিয়ত প্রয়োগ করিয়া তার উপরে একান্ত রূপে বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষত তার প্রতি হতাদরে যামিনীর বেদনা অনুভব করিয়াই, সে যেন ইচ্ছা করিয়া যতটা মনে নয় মুখে তার চৌদ্দগুণ বেশী করিয়া দেখাইত। শ্বশুরের প্রতি ভক্তি না থাক ঈষৎ একটু ভয় ছিল, তাঁর মৃত্যুতে সে বেপরোয়া ভাবে নিজ কন্যার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার চালাইতে লাগিল। যামিনী যে ইচ্ছা করিয়া তাকে অভাবের জ্বালার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছে—এ বিশ্বাস তার দৃঢ় হইয়া রহিল। পয়সা যদি সত্যই না থাকে তবে সে তাকে বিবাহ করিল কি অধিকারে?

একদিন যামিনী সাহস করিয়া স্ত্রীকে প্রশ্ন করিয়াছিল, "কি তোমার ভাল লাগে সুসো? সাজ-সজ্জা করে বেড়াতে? একটু পড়াশোনা করলে তো হয়।"

সুসঙ্গতা হাসিয়া জবাব দেয়, "তাহলেই আমার চারপো সুখ পুরো হয়, মুহুরীর মাইনেটা বাঁচাতে পারো।"

"কি হবে পড়ে?" আবার বলিয়া সুসঙ্গতা অসাধারণ ঔদাসীন্যের সহিত চাহিয়া দেখিল—"তোমার এখানে কেই-বা মানুষের মতন মানুষ একটা আছে বা আসে, আমাদের কলকাতা সোসাইটিতে আমি খুব ফড়ফড় করে 'ওয়েদার' টৌয়েদারের কথা কয়ে যেতে পারি, দু'একখানা নভেলও কখন সখন পড়তে তো বাধে না।"

উৎসাহ করিয়া যামিনী কথাটা বলিয়াছিল। স্ত্রীর চঞ্চল চিত্তকে সে এইখানে একটু সংযত করিতে পারিবার আশা হঠাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার এই একটা বিশ্বাস আছে যে, যে সকল মানুষ—স্ত্রী কিংবা পুরুষ—বিদ্যাচর্চ্চা লইয়া থাকে, তাহাদেরই পরস্পরের মিল হওয়া সম্ভব। ভিন্ন প্রকৃতির মধ্যে মনের সম্মিলন ঘটিতে পারে না।

আট

কান্তিবাবুর মৃত্যুর পর বৎসরে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া বহু স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তন ও কলিকাতায় ব্যর্থ চিকিৎসায় যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া মিঃ দত্ত আসন্ন সময়ে নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এখানে আসার পর কি ভাবিয়া তিন বৎসর পরে যামিনীকে তাঁর রোগশয্যার নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন।

দুর্ব্বল, রুগ্ন শীর্ণ শরীর বিছানার সহিত প্রায় মিশিয়া গিয়াছে। বাক্-শক্তিও প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছিল। জীবনী-শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। যামিনী যখন গৃহে প্রবেশ করিল, তখনও পর্য্যন্ত তার বিরূপ-চিত্ত মর্ম্মান্তিক আঘাতের আক্রোশে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া রহিয়াছিল। এই বৃদ্ধ, এই বৃথা-গর্ব্বে-অন্ধ, ধন- এবং পদ-মর্য্যাদার দর্পে মত্ত মানব তাঁর স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা দ্বারা এ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি করিয়া গেল তাঁহারই। নির্দ্দোষ, নিরপরাধ সে—একটি হৃদয়হীনা নারীর হাতে পড়িয়া জীবনের সমস্ত উচ্চ আশা ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা এই যে অকালে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে, এর জন্য এইবার এই স্বার্থপর বৃদ্ধকে কোনো এক জায়গায় জবাবদিহি করিতে কি হইবে না? তিনি এবং

এসে আমি তো চোরের অধম হয়েই আছি। তোমার এদিকে তো পড়াশোনার ফুরসৎ নেই, কিন্তু অণিমার কাছে যাবার বেলা তো সময়াভাব হয় না। ঐ সময়টা নিজের উন্নতির চেষ্টা করলে তো হয়।"

ক্রোধ প্রকাশ যামিনী সহজে করে না, ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল, "মানুষের বিপদে আপদে দেখতে হবে না?"

সুসঙ্গতা স্থির কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "সব্বার জন্যেই কি এই রকম করে দেখাশুনো করো?"

"তার মানে?"

"তার মানে জানো না নাকি? অণিমার সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হয়েছিল না?"

সুসঙ্গতার কণ্ঠে তীক্ষ্ণ শ্লেষ। এবার গুরু আঘাতে যামিনী অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, "তোমার কি কারও সঙ্গে বিয়ের কথা হয়নি?"

সুসঙ্গতা হাসিল। হাসিয়া উত্তর করিল,—"তা হবে না কেন। এক-জন ছেড়ে একশ জনের সঙ্গেই হয়েছিল,—কত সব বড় বড় লোক! আমি তো আর তাদের সঙ্গে মাখামাখি করতে যাইনি। তোমার ভালর জন্যেই কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছি, অণিমার সঙ্গে অতটা মেশামেশি করা তোমার উচিত নয়। আমার যেন মনে হিংসা-দ্বেষ নেই কিন্তু লোকে কি সব্বাই চোখ বুজে আছে?"

আর্ত্তদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া কাতর কণ্ঠে যামিনী বলিয়া উঠিল, "থামো সুসঙ্গতা! যথেষ্ট বলেছ।" রাগে দুঃখে অধীর হইয়া সে উঠিয়া চলিয়া গেল এবং দুইদিন স্ত্রীর সঙ্গে কথা কহিল না। কিন্তু সেই নির্ঘাত কথাগুলা যেন তার হাড়ের মধ্যে সূচীমুখী শিলামুখী বাণের মত নির্ম্মম-ভাবে বিঁধিতে লাগিল। সুসঙ্গতা যা বলিতেছিল সেটা মনে রাখা উচিত বই কি! এমন নীচ মন যার স্ত্রীর, তার কোন উন্নত চরিত্র পানে

বেড়াইতে গেল। মেয়ে গাড়ি দেখিয়া সঙ্গে যাইবার জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করিলে ঝিকে ডাকিয়া বলিল, "যা শিগগির ওটাকে সরিয়ে নিয়ে যা।"

যামিনী অদূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, কাছে আসিয়া বলিল, "একটা কথা আমার শুন্‌বে?"

"অত ভূমিকা করা কেন? যা বলবার বলেই ফেল না। এর মানে যেন আমি তোমার কোন কথাই কখন শুনি না, না? ঠোক্কর না মেরে ত কথা কইতে জানো না।"

"দামী গহনাগুলো আর জর্জ্জেটসাড়ীটা খুলে রেখে একখানা সাদা সাড়ী পরে যাও। সে এখন বড্ডই শোকার্ত্ত, ভাল দেখাবে না এত সেজে গেলে।"

"তবে আমার যাবারও দরকার নেই।" বলিয়া সুসঙ্গতা মুখ ভার করিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া আসিল।—"একে তো বারো মাস এই দাসী বাঁদীর মতই একধারে পড়ে আছি, কোথাও যাবো, তাও যে একটু ভদ্রের মত যাবো, সেটুকুও তোমার প্রাণে সহ্য হয় না।"

যামিনী ক্ষুব্ধ স্বরে "তবে তোমার যা খুশি তাই কর", বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল। মেয়েকে ঝি সামলাইতে পারিতেছে না দেখিয়া তাহাকে ঝির নিকট হইতে লইয়া আদর করিয়া প্রগাঢ় স্নেহে চুম্বন করিল। দুজনেই তাহারা স্নেহ-প্রেম-বুভুক্ষিত, তাই পরস্পরের প্রতি সাধারণের চাইতে যেন একটা অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল।

দুঃখের সংসারে মানুষের অভাব-অভিযোগের সীমা কোথায়? এমন একখানি মুখ চোখে পড়ে না, যে মুখে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজিত। কাহার অভাব কে ঘুচাইবে? নিজের অভাব যে এ পর্য্যন্ত দূর করিয়া নিজের হৃদয়কে শান্তি প্রদান করিতে পারে নাই, সে অন্যের অশান্তি দূর করিবার জন্য ব্যগ্র, এ দৃশ্য যেমন হাস্যজনক, একজন অন্ধ অন্য অন্ধকে পথ দেখাইয়া

লইয়া যাইতেছে সেও তেমনি। তথাপি রহস্যময় জগতের এও এক পরম রহস্য, মানুষ তার শত অভাব সত্ত্বেও অপরের অভাব দূর করিবার জন্য আগ্রহী হইয়া উঠে এবং ফলে সেই প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই নিজের অন্ধত্ব সত্ত্বেও অন্যের অভাব কিছু পরিমাণে পূর্ণ করিতে সমর্থও হয়। অভিজ্ঞ লোকেরা হয়ত বলিবেন তার অভাববোধটা হয়ত জগৎ বা দেশবাসীর দারুণ অভাবের জন্যই শান্তির অভাব। অণিমার জীবনে সত্যই তীব্র একটা অনিশ্চিত অভাব-বোধ ছিল। কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না— অথচ কারণটা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বিনিদ্র রাত্রে, রজনীর গম্ভীর ছন্দের তালে তার মনোবীণায় অব্যক্ত একটা ব্যথার সুর বাজিয়া উঠিত, শান্ত সন্ধ্যা তার মৌন ওষ্ঠ মধ্য হইতে তার মৌন হৃদয়ের উদ্দেশে কি যেন একটা অজানা অতৃপ্তির মন্ত্র প্রয়োগ করিত, সে যেন তার অন্তঃকরণকে এদের ঐ নীরব ইঙ্গিত হইতে মুক্ত করিতে পারিত না। মনে হইত যে কার্যের জন্য সে এখানে আসিয়াছিল সে কথা ভুলিয়া সে কাহাদের কাছে অপরাধী হইয়া আছে। সেই বিস্মৃত স্মৃতির অনুচ্চারিত শপথটা চকিতের মত স্মরণ-পথে ভাসিয়া আসে অথচ আসেও না। কি এক অস্বস্তি বোধে হৃদয় ভরিয়া উঠে। এ জাতীয় অশান্তি কখনও সুস্পষ্ট হয় না। কি যেন একটা বিস্মৃত স্মৃতিকে ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে না পারিয়া রোগ-দুর্ব্বল ব্যক্তি যেমন নষ্টপ্রায় স্মৃতিশক্তিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বৃথা চেষ্টায় দুর্ব্বল মস্তিষ্ককে অধিকতর পীড়িত করিয়া ফেলে সেও তেমনি ব্যর্থ চেষ্টায় পীড়িত হইয়া গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া চকিত হইয়া উঠিয়া বসে। মনের মধ্যে কে আসিয়া তার ব্যাকুল আহ্বানে সাড়া দিয়া গিয়াছে। বর্ষার ভিজা মাটির গন্ধে ভরা হাওয়ার সঙ্গে ভাসিয়া আসা করুণকণ্ঠের মিনতিপূর্ণ অনুযোগ শুনিয়া লজ্জাখিন্ন হইতে থাকে। ঝটিকার ক্রুদ্ধ চীৎকারে তারই

প্রতি কাদের ব্যর্থ আশায় ভগ্নচিত্তের তীব্র ভর্ৎসনা অনুভব করিয়া মর্ম্মে মরিয়া যায়। এমন করিয়া সর্ব্বদা সে নিজের মধ্যেই যেন কি এক অভাবের তাড়না অনুভব করিয়া অশান্তির কুণ্ঠায় পীড়িত হয়। সে যেন কাদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূর্ণ করে নাই, সে যেন কাদের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। সাধারণ ছেলে মেয়েদের চেয়ে অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতি লইয়াই সে জগতে আসিয়াছিল। তারপর শিক্ষা তাহাকে তাদের চাইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিয়া দিয়াছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যখন খেলা করিত, মারামারি করিত, হাসিত, কাঁদিত, সে তখন সকলের সঙ্গ ছাড়াইয়া এক পাশে চুপ্ করিয়া হয়ত আকাশের অনন্ত বিস্তৃতির মধ্যে মগ্ন হইয়া না হয় কোন একটি সুদৃশ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিকে বদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। পিতা বৃথা বাক্যব্যয় নিষেধ করিয়াছেন। উচ্চহাস্য, কল্পিত উপাখ্যান শ্রবণ অথবা যে কোন মিথ্যা-প্রশ্রয়ী বিষয় তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।

মা অল্প বয়সে মারা যান। ঘরে স্ত্রীলোকের মধ্যে আয়া আর দাসী ভিন্ন আপনার জন কেহই ছিল না। একবার তার মায়ের দিনের পুরাতন দাসী তাকে প্রতিবেশী গৃহে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা দেখাইতে লইয়া গিয়া বলিয়াছিল, "পেরণাম কর মাকে।" বালিকা চমকিয়া চাহিল, "মা! কই মা?" দাসী বলিল, "দেখ্‌তে পাচ্ছিসনে, ওই যে মা।" অণিমা একবার দেবী প্রতিমার প্রতি সতৃষ্ণ চক্ষে চাহিল। অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ সে ভীতভাবে দাসীর কাপড় ধরিয়া বলিল, "ওকি মা? ও মা ভাল নয়, সত্যিকার মাকে দেখা"—রাগ করিয়া হরিদাসী বলিল, "মেয়ে যেন সং। সত্যিকের মাকে দেখ্‌বি? এমন কি ভাগ্‌গি করে এসেছিস যে দেখ্‌বি। নে, পেরণাম কর্, বাড়ী চ"—মেয়ে বড় জেদী, সে কিছুতেই মাথা নামাইল না। কান্না জুড়িয়া দিয়া আব্দার ধরিল, "হ্যাঁ মাটির ঠাকুর,

কাঠের ঠাকুর না। সত্যিকার আসল ঠাকুর আমায় দেখা।” তখন তারা কলিকাতায় থাকে। হরিদাসী ‘মদনমোহনের’ বাড়ী গিয়া ঠাকুর দেখাইয়া বলিল, এই সত্যিকার ঠাকুর। তবু তার কান্না থামিল না। পুরোহিত তার কান্না দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাপার শুনিয়া তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিয়া বলিলেন, “মা এই যে দেখ্‌ছ মাটির কাঠের ঠাকুর, তিনি এরি ভেতরে আছেন। তিনি সমস্ত পৃথিবী চাঁদ সূর্য্য নক্ষত্র সবেতেই আছেন কিনা, আমরা অত বড়কে মনে ধর্‌তে পারি না তাই এক জায়গায় তাঁর পূজো করি।” অণিমা নিতান্তই বালিকা তবু সে কথাটা ঈষৎ যেন বুঝিল, একটু শান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তাঁকে কেউ দেখ্‌তে পায় না?” পুরোহিত বিস্মিত হইলেন। দাসীকে বলিলেন, “মেয়েটি বড় সামান্য মেয়ে নয়।” মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন “কি করে পাবে? তিনিই যে দ্রষ্টা। চোখ কি চোখকে দেখতে পায়?—কি বল্‌ছি, কা’কে বল্‌ছি? কচি মেয়ে কি এ সব কথা বুঝ্‌বে?” একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, “পায় বই কি মা! প্রাণভরে তাঁকে ডাক্‌তে পার্‌লেই পায়। তুমি পাবে, ধ্রুব প্রহ্লাদও ওমনি করে পেয়েছিল।” “কি বলে ডাক্‌ব?” পুরোহিত মুগ্ধচিত্তে বলিলেন, “হরি বলে ডেকো মা, ছোট প্রাণে ঐ নামেই সাড়া আসে।” আনন্দে করতালি দিয়া বালিকা দাসীর সঙ্গে ঘরে ফিরিল।

মিঃ দত্ত এক বন্ধুর সহিত ঈশ্বরের নাস্তিকত্ব বিষয়ে তর্ক করিয়া উত্তপ্ত মস্তিষ্কে চা পান করিতেছিলেন, এমন সময় কন্যা আসিয়া বলিল, “বাবা! আমি একটি নাম শিখেছি। প্রাণভরে ডাক্‌লে পরেই তাঁর দেখা পাব। তুমি তাঁকে দেখেছ?”

মিঃ দত্ত এক চুমুকে চায়ের পেয়ালাটা নিঃশেষ করিয়া দ্বিতীয় পেয়ালার আদেশ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাকে দেখেছি?” “আমাদের হরিকে।”

"হরি!" "হ্যাঁ গো, হরি ঠাকুর, অত বড় ছেলে হয়েছ এখনো তুমি দেখোনি? আচ্ছা, কেঁদে কেঁদে হরি বলে ডাক, এক্ষুনি দেখ্‌তে পাবে।"

মিঃ দত্ত গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, মুখে তাঁরও হরিধ্বনি উঠিল, কিন্তু 'হরি' নয়, "হরিদাসি!" প্রভুর কণ্ঠ শুনিয়াই হরিদাসীর প্রাণ শুকাইয়া দুমড়াইয়া গিয়াছিল, একান্ত ভীত ভাবে সে একপাশে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইল। মিঃ দত্ত তাঁর সজল জলদ তুল্য মুখ ছাগশিশু তাহার দিকে চকিতে ফিরাইলেন, রূঢ়স্বরে কহিলেন; "এ সব কথা ও কোথা থেকে শিখ্‌লে? তোমাদের সবাইকে বারণ করে দেওয়া আছে না যে, ঠাকুর দেবতা এ সব আবোলতাবোল কথা আমার ছেলে মেয়ের কাছে কেউ কখনো বলতে পাবে না। যাও—খবরদার আর যেন এ রকমটা না হয়।" দাসী কাঁপিতে কাঁপিতে প্রাণ লইয়া পলাইল। ছাড়াইয়া দিবার ভয়েই সে কাতর হইয়া উঠিয়াছিল, মানুষ-করা মেয়েটাকে ছাড়িতে প্রাণ কাঁদিবে, আর সেও যে তাকে ছাড়িয়া দুঃখ পাইবে। যত্ন করিতে তো তার কোন কুলে কেউ নাই। নহিলে এমন বাড়ীতে দাসী হওয়াও কম বিপজ্জনক নয়। ওমা! এ আবার ভদ্দর নোক? দেবতা বামুন মানে না। সেই পেল্লাদের গপ্পের হিরণ্যকশিপু না, কি!—অণিমা হরিদাসীর প্রতি পিতার ভর্ৎসনা শুনিয়াই একান্ত নিরাশ ও নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছিল। মিঃ দত্ত তাহাকেও অবশ্য বাদ দিলেন না। বলিলেন, "ঠাকুর, ঠাকুর করে কি পাগলামি কর্‌চো, ও সব মিথ্যে জিনিষ শি[illegible] না। তোমার ওপর আমার অনেক আশা আছে। মিথ্যে জিনিষে মন দিয়ে শেষে পাঁচজনের মতন তুমিও কাজের বার হয়ে গোল্লায় যাবে। ঠাকুর দেবতা ও সব টুলো বামুনদের দক্ষিণে খাবার জন্যে বুজরুকি। ও সব কিছুই নেই, মানুষের নিজের উদ্যম অধ্যবসায় আর সত্যই মানুষের একমাত্র প্রভু। তাছাড়া আর কেউ তার নিয়ামক নেই নেই নেই, জেনে রাখো।" মেয়ে

বাপকে ভয় করিত, তথাপি তাঁর ক্রোধের কারণ না পাইয়া সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবা, হরি বলা কি ভাল নয়? কেমন সব ভাল ভাল গান আছে হরির" বলিয়া সুর ধরিল, "হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে, বল মাধাই মধুর স্বরে।" মিঃ দত্ত কুপিত হইয়া কহিলেন, "তুশোবার না। যা নেই তা বলে লাভ কি? যারা এ সব শিখিয়ে কচি ছেলেদের মাথা খায়, তারা তাদের মহাশত্রু। নাঃ! হরিদাসীকে ছাড়াতেই হলো দেখ্‌চি।" বালিকা হরিদাসীকে অত্যন্ত ভালবাসিত, সে ভয় পাইয়া কাতর কান্নাভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না বাবা আর আমি কক্ষনও হরি বল্‌ব না, বলব না, ওকে তাড়িয়ে দেবে না।"

এমনি করিয়া তার মুকুল জীবনের প্রথম ঈশ্বর-প্রেম ও সরল বিশ্বাস অভিভাবকের ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটিপাতে মরুভূমে বারিবিন্দুর মত নীরবে শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহা তার সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও সুখ-সম্পদের মধ্যেও তার জীবনকে অশান্তির অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছিল। একটা কোন অনির্দ্দেশ্য অভাবের বেদনায় তার মনটা যেন আহত অঙ্গের মত টনটন করিত। মিঃ দত্তের একান্ত যত্ন চেষ্টায় ও তাঁর প্রদত্ত শিক্ষায় ছোট বেলার সরল ঈশ্বর-বিশ্বাস হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়া গিয়া সেখানে নাস্তিকতার রোপিত বীজ হইতে শাখা প্রশাখা সমন্বিত প্রকাণ্ড বৃক্ষের উদ্ভব হইয়া পূর্ব্ব বিশ্বাসের চিহ্নও বোধ করি সেখানে ফেলিয়া রাখে নাই। কিন্তু অণিমার চিত্তে যেন স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেম তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছিল, বিশাল সমুদ্রের উদ্দেশ না পাইয়া তাহারই ক্ষুদ্র আধারকে উচ্ছ্বসিত করিয়া শত ধারায় শত দিক দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিয়া রুদ্ধ আক্রোশে ক্ষুদ্র তরঙ্গের মতই তাহা নিয়ত ফুঁসিতেছিল। তাহারই বিক্ষোভ গর্জ্জন বুঝি সকল সময় তাকে তার কার্য্যে ও বিশ্রামে দূরস্থ আহ্বানের মত থাকিয়া থাকিয়া চমকিত করিয়া তুলে!

দশ

উত্তরবঙ্গের মালদা জেলার এক জমিদার বাড়ীতে সেদিন বিশেষ কোন উৎসবের আয়োজন চলিতেছিল। উৎসবের উপলক্ষ্য নিরভিভাবক জমিদার-পুত্রের বয়ঃপ্রাপ্তি। কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হইতে আজই সে মুক্ত হইতেছে। বরেন্দ্র তার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উৎসব-সজ্জা দেখিতেছিল এবং মৃদু সঙ্কোচে ভূষণের কোন কোন ব্যবস্থার কদাচিৎ প্রতিবাদও করিতেছিল, কিন্তু প্রবল-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ভূষণকুমারের উপর জোর খাটাইবার মত দৃঢ় মনোবল তার ছিল না। একটা জরির কাজ-করা বনাতের টুকরা দেখাঁইয়া ভূষণ বলিল, " 'লং লিভ দি জমিনদার' লেখা এই লাল কাপড়টা এইখানে টাঙ্গিয়ে দিচ্ছি, খুব ভাল হবে না বরেন ?"

বরেন্দ্র ঈষৎ চিন্তিত মুখে উত্তর দিল, "ভাল হবে কি ? মাষ্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করো।"

ভূষণ শ্লেষের সঙ্গে হাসিল, "তোমার মনে রাখা উচিত, তুমি এখন আর ম্যাষ্টর মশাই-এর অধীনস্থ ওয়ার্ড নও !"

বরেন্দ্রকৃষ্ণ বিব্রত হইয়া উঠিল, "চুপ, চুপ, শুনতে পাবেন যে।"

ভূষণ ঠোঁট উল্টাইল, "ইঃ, তাহলে তো মাথাটাই আমার কাটা যাবে ! পেলেনই বা শুনতে ? যার নিজের এককড়ার আক্কেল নেই তাকে আক্কেল-সেলামী দিতেই হয়। আগাগোড়া এমনি ভাব ধরে রয়েছেন যেন এখনও উনিই তোমার অভিভাবক। তোমার টিকিটি থেকে হাতের মুঠোটি এক ইঞ্চিও ফাঁক করতে রাজী নন।"

"আঃ ভূষণ ! অত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছো কেন ?" বলিতে বলিতে বরেন্দ্র সরিয়া গেল।

ভূষণ গর্জ্জিয়া উঠিল, "মর‍্যাল কাউয়ার্ড! হক কথা বলব তার আবার ভয়টা কিসের! সত্যি কথার কাছে বাপদাদা মানি নে? তার একটা তিন পয়সার ম্যাষ্টর।"

বরেন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিল, সবেগে মাথা নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "না, না, ওসব কি নোংরা কথা তুমি বলছো, ছিঃ!"

ভূষণ ভুরু নাচাইয়া বক্র হাসি হাসিল, "ছিঃই বলো আর ছ্যাই বলো কড়াক্রান্তি দিয়ে মিলিয়ে নিও। এই যে কলকাতা যাবে ঠিক করেছ, ভেবেছ তোমায় যেতে দেবে?"

বরেন্দ্র অসহিষ্ণু ভাবে উত্তর করিল, "দেখে নিও। বলেছেন নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। বার্থ-রিজার্ভও হয়ে গেছে। কালকের আসাম মেলেই তো যাচ্ছি।"

"ওঃ তাই বলো! সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে চিড়িয়াখানা দেখাবেন, বোটানিক্যাল গার্ডেনে হাওয়া খাওয়াবেন! নাকের দড়িটা হাত থেকে নামাচ্ছেন না! আমরা কিন্তু তাহ'লে যাচ্ছিনে! আমরা তো ওঁর নাবালক ওয়ার্ড নই। পুরুষ বেটাছেলে। এ নেহাৎ অপমান।" মুখ ফিরাইল।

বরেন্দ্র সাশ্চর্য্যে কহিয়া উঠিল, "কেন ভাই! এতে অপমানটা কোথায় হলো? রাগ করছো কেন?"

মাষ্টার মশাই শশব্যস্তে আসিয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "বরেন, বার্থ রিজার্ভ তো হয়েই গেল কিন্তু যাওয়া যে এখন শক্ত। বিষম মুস্কিলে পড়ে গেলুম যে বাবা!"

বরেন্দ্র চমকাইয়া উঠিল, "তবে কি যাওয়া হবে না? উদয়শঙ্করের নাচটা দেখতে পাবো না? কেন? হ্যাঁ কাকাবাবু, কি হলো হঠাৎ?"

মাষ্টার মশাল্‌চীদের দিকে চাহিয়া ঠাণ্ডাহাতে ঝাড়ের কাঁচ পরিষ্কার

করার নির্দ্দেশ দিতেছিলেন, বলা শেষ হইলে এদিকে ফিরিয়া উত্তর দিলেন, "আর বলো কেন বাবা! হারুর জরটাকে ডাক্তার বলে গেল টাইফয়েড। আজকের দিনের জন্যেই তোলা ছিল!"

ভূষণ কান পাতিয়া শুনিতেছিল, "হুররে!" বলিয়া লাফাইয়া উঠিল, "ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে বাবা। দেখলে তো, সমস্ত ফিকির-ফন্দি সব কেমন একমুহূর্ত্তে ঘুরে গেল? বাব্বা! এখনও আকাশের গায়ে চাঁদ সূর্য্যি উঠছে তো।"

বিব্রত হইয়া বরেন্দ্র বাধা দিল, "আঃ, কি করছো ভূষণ! শুনতে পেলে—"

ভূষণ মুখ ভেঙ্গাইল, "শুনতে পেলে তো আমার এইটি করবেন!" বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইল, "না হয় চাল কেটে উঠিয়েই দেবেন, তা বলে কারুর বুজরুকি ভূষণলাল সহ্যি করবে না! হ্যাঁ, উচিত কথা বলবো, বন্ধু বেগড়ায় বেগড়াবে, এই হচ্ছে আমার মটো।"

বরেন্দ্র বিব্রত হইয়া উঠিল, "আচ্ছা ভাই আচ্ছা! রাগ করো না, আমি ছুটে একবার হারুটাকে দেখে আসি। আহা, ওর কত সাধ ছিল আজকের দিনের জন্যে। কাঙ্গালীদের মিষ্টি নিজের হাতে পরিবেশন করবে বলে কাকাবাবুর কথা নিয়েছিল। কলকাতায় গিয়ে চিড়িয়াখানায় গিয়ে জিরাফ সাদা ময়ূর এই সব নতুন জিনিষ দেখবে। তা নয়, আজকের দিনেই শয্যাগত হয়ে পড়ে রইলো! নাঃ, আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না।"

বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া ভূষণ আঙ্গুলে তুড়ি দিল, "যাও ম্যাষ্টরের গুষ্টির পা চেটে এসো গে। একবার তুমি আমার হাতে এসে পড়ো না, চাটাচ্ছি তোমার ঐ ফিলানথ্রোপিস্ট ইস্কুল ম্যাষ্টরের গোদা ফাটা পা। তখন যে পাদপদ্ম দেহিপদপল্লবমুদারম্ বলে

বুকে ধরবে তা'তে আস্ত বাছুরের চামড়ার ছেঁড়া পটি বাঁধা থাকবে না, খোকামণি! তাতে—

'নূপুর বেজে যায় রিনি রিনি,
মনে হয় যেন তারে চিনি চিনি।'

কে? মোধো ছোঁড়া না? আরে, এতক্ষণ ছিলি কোথায়? শোন শোন!" অগ্রসর হইয়া গেল।

বরেন্দ্র ও মাষ্টর প্রবিষ্ট হইলেন। মাষ্টার শান্ত কণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আজকের দিনে অতটা মন খারাপ করো না বাবা! তোমার জীবনের আজ একটা শুভ লগ্ন যে, তোমার হারু তোমার আশীর্ব্বাদের শুভেচ্ছায় নিশ্চয়ই নিরাময় হয়ে উঠবে, কিন্তু বরেন টাইফয়েড সন্দেহ যখন হয়েছে, তখন তুমি আর ও বাড়ীতে ঢুকো না বাবা,—সাবধানের মার নেই, এ চিরকেলে কথা মানতেই হয়।

বরেনের দু'চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, ভেজা গলায় সে বলিল,—"হ্যাঁ, কাকাবাবু। ও যে চোখ বুজে পড়ে রইলো, একটিবার চোখও চাইলে না—ডাক্তার কি বলছেন ভাল হবে তো?···

মাষ্টারমশাই ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "না না, তুমি অত ভয় পেও না বাবা! মানুষের জীবনে কত ঝড় জল সইতে হয়, এতটুকুতে অত অস্থির হলে চলে কখনও? তোমায় তো ভগবানের মহাবাণী ছোট্ট থেকেই শুনিয়ে এসেছি 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থঃ নৈতৎ ত্বয়্যুপপদ্যতে।' এত অল্পে মনকে অমন করে এলিয়ে দিও না। যাও, দুদিন নূতন জায়গায় গিয়ে পাঁচটা দেখে শুনে এসো গে। মনটাও খোরাক পাবে, আর এই ছোঁয়াচটাও বাঁচবে। কিন্তু শোন বরেন! রোজ একটা করে নিজের হাতে চিঠি দিতে ভুলো না, আর ফিরতে ওর বেশী দেরি যেন না হয়, তা হলে আমরা দুজনে ভেবেই মরে যাবো।"

"আপনিও কিন্তু রোজ হারুর খবরটা আমায় দেবেন কাকাবাবু! না হলে সাতদিনও আমি ওখানে টিকতে পারব না,—আপনি খুড়িমা হারু যাবে না, সেই তো এত বিশ্রী লাগছে যে কি বলবো!"

মাথায় হাত দিয়া আদরের স্বরে সুদীর্ঘকালের একনিষ্ঠ অভিভাবক আদর করিয়া একটু হাসির মত স্বরে কহিলেন, "দেখ না, হারু সেরে উঠলেই এবার আমরা আবার সবাই মিলে একটি মাসের জন্যে চলে যাব সেই গঙ্গাধারের বাড়ীতে। রোজ নৌকা-যাত্রা করবো, কত মন্দির, তীর্থ সব তোমার কল্যাণে দেখাশুনা হবে! যাও স্নানের সময় হলো। অনিয়ম ক'রো না।"

বাড়ী সাজানো ও অন্যান্য বিষয়ের উপদেশ দিতে দিতে মাষ্টার মশাই এই দিকেই আসিতেছিলেন, বরেন্দ্রকে দেখিয়া বলিলেন, "বরেন! ও লাল সালুটা এখানে টাঙ্গানো আমার মত নয়। লং লিভ দি জমিন্দার এটা যেন কেমন বিশ্রী শুনতে। এই দেখ তোমার খুড়িমা জরি-চুমকীর কাজ করে এইটি কবে থেকে তৈরি করে রেখেছেন, এইটে এইখানে দিয়ে দিই?"

লাল বনাতের টুকরাটি হাতে লইয়া বরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "কি সুন্দর হয়েছে! দেখি দেখি এমব্রয়ডারীর মধ্যে কি সব লিখেছেন,—

আজি নব জীবন-প্রভাতে আশীর্ব্বাদ ধরো বৎস মোর।
যশের প্রদীপ্ত প্রভাকর মাথায় মুকুট হোক তোর।"

বরেন্দ্র সাশ্রু-নেত্রে আশীর্ব্বচন লেখা কারুখচিত বস্ত্রটি মাথায় ঠেকাইল: "খুড়িমাকে প্রণাম করা তো হয়নি, এক্ষনি যেতে হবে।"

মাষ্টার মশাই কাজ দেখাইতে ও দেখিতে সরিয়া গেলেন। ভূষণ কাছ ঘেঁষিয়া আসিল: বলিয়া উঠিল, "অসহ্য ন্যাকামি! 'তুই মুই' করে

করে আশীর্ব্বাদ দিয়ে জানান্ দিচ্ছেন, সাবালক হ'লে কি হবে, তুমি সেই যে নাবালক হয়ে গার্জেন টিউটরের পাল্লায় বাঁধা পড়েছিলে, তাইই রয়ে গেছ। মৃত্যুর টিকিটা তোমার—হুঁ হুঁ, এই হাতে রইল বাঁধা।"

"তুমি ওঁদের একটুও দেখতে পার না।"

ভূষণ বিদ্রূপের হাসি হাসিল, "অসৈরণ সয় না বলে। আচ্ছা, তুমি যে জমিদার হলে, কোর্ট অব ওয়ার্ডের জেলখানা থেকে মুক্তি পেলে এর জন্যে এতটুকু আনন্দ করতে শুনেছ? 'লং লিভ দি জমিনদার' এত বড় কথাটা সহ্যই করতে পারলে না। তার বদলে কিনা বচ্ছ-টচ্ছ বলে একটা ন্যাকামি আছিব্বাদ জানানো হলো, যাকে নিংড়ে ফেল্লেও লং লিভ বলে একটা শব্দও বেরুবে না। অর্থাৎ তুমি বাঁচো আর মরো তাতে ওদের বড় বয়েই গেল, তুমি যে স্বাধীন হয়েছ এই কথাটা তোমার মনে সেঁধুতে না পেলেই হলো। ম্যাষ্টেরীর মাইনে তো আর টানতে পারে না, যদি ম্যানেজার হয়ে বসে যেতে পারে তারই ফিকিরে আছে!"

এগারো

এই সব চিন্তায় ভারাক্রান্ত যামিনীর চিত্ত সমধিক ভাবেই ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। একদিকে সুসঙ্গতাকে লইয়া সে অস্থির হইয়া আছে, এর মাঝখানে অকস্মাৎ ভগবান একি এক উদ্ভট জট পাকাইয়া বসিলেন! 'যা ফুরায় দে রে ফুরাতে' এই নীতি মানিয়া লইয়া সে তো অতীতের সঙ্গে তার জীবনের ছেদ টানিয়া দিয়াছিল কিন্তু মনের ভিতরে যে অতীত জীবন তার মরিয়াও মরে নাই—তাহাকে, সেই মুমূর্ষু চিত্তপ্রাণকে এবার কেন এমন করিয়া বিস্মৃতির কবর খনিয়া টানিয়া তুলিতে তার ভাগ্যদেবতা তার

জীবনের অহেতুক বৈরীর সঙ্গে মিতালী পাতাইয়া এতবড় ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন !

এমন সময় আসিলেন ইন্দ্রনাথবাবু এবং তাঁর দুই মেয়ে অমলা ও জ্যোৎস্না। এরা যামিনীর পিতৃবন্ধু এবং একই সমাজের লোক। ইন্দ্রনাথ জজকোর্টের সেরেস্তাদার ছিলেন, এখন পেন্‌সনভোগী। সমাজকল্যাণ-সাধনের জন্য তাঁর বিশেষ একটা আগ্রহ ও চেষ্টা বরাবরই ছিল, এখন অবসরপ্রাপ্ত জীবনে সেইটাকেই যেন মুখ্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে ছিলেন। সেই সব উদ্দেশ্য লইয়াই তাঁর যামিনীপ্রকাশের কাছে যাওয়া আসা এবং তার মনের খবর জানা ছিল বলিয়াই তার সঙ্গে অন্ততঃ বৃহৎ কার্য্যের মহান্ উদ্দেশ্যের বিষয়ে আলোচনা করিয়াও আনন্দ লাভ করিতেন। যামিনী তাঁর মহতী পরিকল্পনাকে জয়যুক্ত করিবার সহায়তা হয়ত করিতে পারিবে না, তবে এটুকু তো পারে—তাঁর কার্য্যের আন্তরিক সমর্থন করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে যতটুকু সহানুভূতির প্রয়োজন ততটুকু দিতে !

যামিনী উঠিয়া সসম্ভ্রমে গৃহাগত অতিথিদের সম্ভাষণপূর্ব্বক আসন দিয়া বসাইল। তাহাকে জ্যোৎস্নার দিকে অপরিচিতের মত সসঙ্কোচে চাহিতে দেখিয়া অমলা বলিল, "চিনতে পারছ না প্রকাশ ! ও আমার বোন জ্যোতি। জ্যোতি ! প্রকাশদাকে প্রণাম কর।"

জ্যোৎস্না কোনমতে প্রণাম সারিয়া দিদির পিছনে মুখ লুকাইল দেখিয়া অমলা ও যামিনী দুজনেই ঈষৎ সস্নেহ হাসি হাসিল, জ্যোৎস্না মেয়েটি সত্যই যেন একটু জ্যোৎস্নাই, তেমনি স্নিগ্ধ, তেমনি কোমল, তেমনি ভীরু।

যামিনী তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন ঈয়ার হলো তোমার ?"

জ্যোৎস্না কথা কহিল না দেখিয়া অমলাই বলিল, "এ বছর থার্ড ঈয়ারে

উঠলো। হলে কি হবে, যা মেয়ে, সাত চড়ে রা করে না—যে কথা আছে না, ইনি তাই।"

দ্বারের পর্দ্দা ঠেলিয়া পর্দ্দার উপর হাত রাখিয়া আসিয়া দাঁড়াইল গৃহকর্ত্রী সুসঙ্গতা। ঘরে ঢুকিবে কিনা বোধ করি ভাবিয়া লইতেছিল।

অমলা সাগ্রহে ডাকিল, "এসো ভাই এসো। কোথাও বেরিয়েছিলে নাকি? আমি এই প্রকাশকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলুম।"

সব চাইতে কাছের কুশন দেওয়া চেয়ারটায় এলাইয়া বসিয়া পড়িয়া হতাশভাবে সুসঙ্গতা গভীর নিশ্বাস ফেলিল, "আর বলেন কেন? রাত্তির দিন ঘ্যান ঘ্যান করে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলে ঠেলেঠুলে তো পাঠিয়ে দিলেন, বাব্বাঃ! আমি কি সেখানে টিকতে পারি। শোকও তো ঢের লোকের হয়, কিন্তু তাই বলে নিজেকে আর কেউ অত করে 'শো' করে না। বসেছেন তো এক ভেলভেটের কুশনঘেরা ইজি-চেয়ারে, উদাসিনী রাজ-কন্যের মতন উর্দ্ধে চেয়ে, এই লম্বা রুক্ষ চুলের গোছা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে, পাশে বসে এক সুসজ্জিতা সুন্দরী সখী তমালিকা মাধবিকা না কে, কে জানে—সিল্কের রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে দিচ্ছেন থেকে থেকে, কারো মুখে একটি কথা নেই! একি ট্যাব্‌লো অভিনয় হচ্ছে না কি? জানিনে বাবা এ আবার কিসের পালা! ওফেলিয়াও নয়, কুন্দনন্দিনীও নয়। খানিক বসেই মাথা ধরে গেল, পালিয়ে আসতে পথ পাইনে। তা 'আহ্বানও নেই বিসর্জ্জনও নেই', এলে এলে, গেলে গেলে, এ একরকম সুবিধে আছে।"

বিস্মিতভাবে অমলা কথাগুলি শুনিয়া গেলেও ঠিক যেন এদের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারে নাই, বিস্ময়ের সহিতই প্রশ্ন করিল, "কার কথা বলছো বউ?" বলিতে বলিতে সহসা মনে পড়িয়া গেল, "মিস্ দত্তের কি?"

সুসঙ্গতা অসহিষ্ণু অধীরতায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল, "তাছাড়া তোমাদের এই ভূতুড়ে দেশে কে অত ঢং জানে?—কলকাতার আর্ট গ্যালারীতে নিয়ে গিয়ে 'বিষাদিনী' নাম দিয়ে ছবি তুলিয়ে পাঁচজনকে দেখাবার মতন পোজটা হয়েছিল কিন্তু,—বরাত! দুর্ভাগা লোকেরা অমন একটা দর্শনীয় দৃশ্য চোখে একবার দেখে চক্ষু সার্থক করতে পেলে না। আহা!"

সুসঙ্গতা স্বামীর নতমুখের দিকে বিষাক্ত তীরের মত তির্য্যক কটাক্ষ হানিল।

ক্ষণ পরে অর্থাৎ এই কটু মন্তব্যের বিরুদ্ধে নিঃশব্দ অপ্রতিবাদ সহ্যাতীত হইলেও নিরুপায়ে 'প্যাসিভ রেজিস্‌টান্‌স' রূপে গ্রহণ করিয়া লইলে, ধাতস্থ হইবার পর যামিনী স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কাকাবাবু এসেছেন দেখনি বুঝি?"

সুসঙ্গতার নিজহস্তের ক্ষেপণাস্ত্র তাকে নিজেকে তো কাবু করিতে পারে নাই, তাই চট্ করিয়াই জবাব দিল, "কেন দেখব না, কানা ত আর নই। এসেছেন বেশ করেছেন। তার জন্যে করতে হবে কি?"

ইন্দ্রনাথ সুসঙ্গতার প্রকাশ্যভঙ্গীর ইতরতাটা ঢাকা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ভাল আছ বৌমা? নলিনী কোথায়?"

সুসঙ্গতা তার মুখখানা এক ঝটকায় কাত করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া জবাব দিল, "জানিনে তো। ওমা! এ কে গো? জ্যোৎস্না না? ভাল কথা, খুব তো গাইয়ে তুমি—একটা গান গাও না ভাই! ওখানে আমদানী মাথাধরাটা তোমার মিষ্টি গান শুনলে যদি ছাড়ে!—বাজনা তো ওই সামনেই রয়েছে, দেরি করো না, সত্যি ভাই শিগগির একটা গাও।"

জ্যোৎস্না মুখ লুকাইয়া মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, 'গান আমি ভাল জানিও নে, আর একজামিনের জন্যে প্র্যাক্‌টিসও নেই।"

সুসঙ্গতা ফট্ করিয়া বলিয়া উঠিল, "তাই বটে! গানের খ্যাতি তো তোমার জগৎজোড়া। ওই দুঃখেই তো আমি গানের গ-ও উচ্চারণ করি নে আর। এঁর পিসি তো তোমার কথা তোমার গানের কথা বলতে বলতে পঞ্চমুখ।" যামিনীর দিকে কটাক্ষ হানিয়া "হ্যাগা! ইনিও তো এক সময়ে তোমার বউ হতে হতে আমার গলায় দড়ি দেবে বলেই বাদ পড়ে গেলেন। বরাত ভাল। তা এমন আর ক'টি আছে?"

যামিনী লজ্জা অপমানে অভিভূত হইয়াও আত্মসংযত ভাবে ইন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করিল, "আপনাদের অধিবেশনটা কবে হচ্ছে?"

ইন্দ্রনাথ যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়া উঠিলেন, সোৎসাহে আরম্ভ করিলেন, "সেই কথাই তো বলতে এসেছি। এবার এটা একটু ভালভাবে করতে চাই। মিস্ দত্তকে ধরে করে যদি মেয়ে-ইস্কুলটির ভার ওঁর উপর দেওয়া যায়,—আমরাও ওঁকে সাহায্য করবো। এ নাহলে ওটিকে আর বাঁচিয়ে রাখা চলে না। মেয়েদের ওঁর কাছে পাঠাবো কি? দোষ নেবেন না তো?"

যামিনী আন্তরিকতার সঙ্গেই জবাব দিল, "মনে তো হয় না। রমেনরাও সেদিন বলছিল ওঁর জন্য কোন একটা বড় কাজের ব্যবস্থা না করলে আর চলছে না। কিছু একটা অবলম্বন না পেলে কি ধরে উনি উঠবেন? তাছাড়া আগে থেকেই মেয়েদের স্কুল করার ইচ্ছে ওঁর ছিল। এত বড় সহরে মিশন স্কুল ছাড়া কোন মেয়ের স্কুল তো নেই।

"কই গান গাইলে না জ্যোৎস্না? ওমা—ওকি, এক ফোঁটা মেয়ে অমন একগুঁয়ে কেন? এ স্বভাব তো ভাল নয়!"

অমলা সুসঙ্গতার প্রতি একটা বিরস দৃষ্টি হানিয়া বোনকে নরম সুরেই বলিল, "যা পারিস একটা গা।"

জ্যোৎস্না উঠিয়া লজ্জিত পায়ে অর্গানের কাছে অগ্রসর হইতেই,

সুসঙ্গতা অধৈর্য্য ভাবে সাবধান করিয়া দিল, "যা পারবে মানে তা বলে কটকটে এক ব্রহ্মসঙ্গীত যেন গেয়ে বসো না,—শুনলে আমার ধরা-মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

অমলা টিপ্পনি কাটিল, "বৌ আমাদের পরণের শাড়ী থেকে শ্রবণের সঙ্গীত নয়নের দ্রষ্টব্য পর্য্যন্ত খাঁটি লঘুত্বের ভক্ত, কোথাও কোন গাম্ভীর্য্য সইতে পারেন না।"

সুসঙ্গতা জবাব দিল, "না ভাই, যা পারিনে তা পারিনে। জ্যোৎস্না! তুমি একটা নরম-সরম দেখে গান গাও। কটকটে ব্রহ্মসঙ্গীতের বড় বড় ভাষার ভনিতে বুকে যেন জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেয়। পাপী মানুষ কিনা হাঁপিয়ে উঠি।"

জ্যোৎস্না অনেক কষ্টে নিজেকে সহজ করিয়া তুলিয়া কোন মতে গাহিল,—

চিত্ত চঞ্চল রে, কেন কে জানে।

কেন কাঁদে—

গান থামিতে না থামিতে সুসঙ্গতা প্রায় চিৎকার করিয়া জ্যোৎস্নাকে একটা ধমক দিল, গাইলেই যদি তবে অমন একটা কাঁদুনে গান গাইলে কেন বলতো? তোমাদের এই দেশটাই দেখছি কান্না-ভরা পান্‌সে প্যান-পেনে। কলকাতায় আমাদের সব কত ভাল ভাল গান তো গায়। রজনী সেন রবি ঠাকুর তো গান কিছু আর কম লিখে রাখেন নি, তোমাদের পছন্দর ছিরি যেমন! যাক্, আজ আমার কান্না শোনারই পালা ছিল। আচ্ছা আমি ভেতরে চল্লুম, মাথাটা বড্ড কষ্ট দিচ্চে বাপু, কিছু ভাল লাগছে না, শুয়ে পড়ি গে।"

সুসঙ্গতার পশ্চাতে এঁরাও গমনোদ্যত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন, ইন্দ্রনাথ-বাবু দেখিয়া শুনিয়া কেমন যেন নিজেই লজ্জিত অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিলেন, যেন এমন পারিবারিক বিপ্লবাংশের দর্শক হইতে বাধ্য

হওয়ায় তিনি এবং তাঁহারা অপরাধী হইয়া পড়িয়াছেন। বলিলেন, "এসো অমলা, আমরাও উঠি,—একটু কাজও আছে আজ—।"

যামিনী অপ্রতিভ ভাবে কোনমতে বলিয়া ফেলিল,—"একটু চা খেয়ে যাবেন না, কাকাবাবু!"

মনে পড়িল তার পিতা বর্ত্তমানে পিতৃবন্ধুর এ বাড়ীতে বড় আদরের পূর্ব্ব ইতিহাস।

"আজ থাক বাবা! আর একদিন হবে", বলিতে বলিতে স-কন্যা ইন্দ্রনাথ বিদায় লইলেন। অমলা গভীর স্নেহে প্রণত যামিনীর কপালে ছুঁইয়া মনে মনে কিছু একটা গভীর ভাবার্থযুক্ত প্রার্থনা হয়ত কোথাও জানাইল। জ্যোৎস্না কি একটি লহমার মধ্যে তাঁর সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা তার ফ্যাকাশে রক্তহীন অপমানিত মুখভাব লক্ষ্য না করিয়াই গেল? না, বোধ হয়।

সকলে প্রস্থিত হইলে যামিনী দুই হাতে মাথা ধরিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, তার মুখ হইতে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে নির্গত হইল,—

"ইচ্ছে করে যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাই।"

বারো

মৃণালিনী ঈষৎ রাগ করিয়া অনুযোগ করিল, "কি করছিস বলতো এমনি করেই শরীরটাকে কি মাটি করবি ঠিক করেছিস! এমন করে থাকলেই কি তাঁকে ফিরে পাবি? নে উঠে বোস, চুলটা বেঁধে দিই; কাপড়টা ছাড়, আজ হয়ত অমলারা আসতে পারেন, সেই যে কি হিত-সাধিনী সভা না কি তাদের একটা আছে, যার বার্ষিক অধিবেশনে তোকে

নিয়ে যাবেন বলেছিলেন, সেই সব কথা কইতে আসবেন বলে পাঠিয়েছেন।"

অণিমা উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিল, "আমার আর কিছুই ভাল লাগে না। দাদাও যদি আসতো।"

মৃণালিনী তার কুণ্ডলী পাকানো চুলের রাশি খুলিয়া তার উপর চিরুণি চালাইতে চালাইতে সাগ্রহ স্বরে কহিয়া উঠিল, "ওঁকে একবার আসতে লেখ না। সত্যিই তো, এতবড় কাণ্ডটা ঘটে গেল।"

অণিমার অধর প্রান্তে গভীর বিষাদের এক ফোঁটা ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে মাথা দোলাইয়া উহার প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিল, বলিল, "ভেবেছ লিখলেই সে আসবে? বাবার অত অসুখেই যখন এলো না, উল্টে লিখলে, তুই তো রয়েছিস আমি গিয়ে আর কি বেশী করবো! না, সে আসবে না। যা করতে গেছে ভালয় ভালয় সেটাই শেষ করে আসুক। নে কি করবি কর।"

মৃণালিনীর মনটা বিশেষ ভাবেই যেন বিগলিত হইয়া গেল, বলিল, "দেখ একটা কথা ভাবছি, ওঁদের যে সামান্য একটা মেয়ে-পাঠশালা ছিল, সে তো উঠে এসেছে, মরমরঁ অবস্থা প্রায়। তোরও তো মেয়ে-স্কুলের সাধ অনেকদিন থেকেই। তা ওদের সঙ্গে মিলে না হয় একটা ভাল করে মেয়েদের ইস্কুলই করে ফেল। পরের উপকারের সঙ্গে নিজেও একটা কাজ পাবি।"

অণিমা একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটা দীর্ঘশ্বাসকে টানিয়া রাখিয়া যথাসম্ভব মৃদু করিয়া মোচন করিল, "মনে তো অনেক কিছুই করি, মনটাকে যে কিছুতেই স্থির করতে পারছি না রে। কি জানি, আমার মনে হয় এ জন্মে আমার দ্বারা আর কোন কিছুই হবে না। বাবা আমার পৃথিবীকে শূন্য করে দিয়ে গেছেন।" নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

মৃণালিনী তাহাকে কাছে টানিয়া নিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছাইয়া

দিতে দিতে সান্ত্বনা-শীতল কণ্ঠে কহিতে লাগিল, "চুপ কর ভাই, চুপ কর। বাপ মা কি কারও চির দিন থাকে? তোর তো তবু এতদিন পর্য্যন্ত ছিলেন, আমার কথা ভাব দেখি, কত কম বয়সে ওসব পাট চুকে গেছে।" মনে মনে বলিল, "মুখে যাই বলি মন তো আমার সবই জানে। তোমার পরমহিতৈষী বাবা যে তোমার বুকটা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে গেছেন। না হলে আজ তোমার এ দশা কেন? স্বামী পুত্র নিয়ে রাজরাণীর মত সুখে থাকতে পারতে। কি চমৎকার ছেলে ঐ যামিনীপ্রকাশ! যেমন রূপ তেমনি গুণ আর তেমনি কি মিষ্টি স্বভাব। ওকে দেখেও মায়া হলো না, নিজের খেয়ালটাকেই বড় করে দেখলেন! এর নাম সন্তান-স্নেহ? কাজ নেই বাবা অমন স্নেহ পেয়ে!"

প্রকাশ্যে কহিল, "মনটাকে শক্ত করে নে, দেখছিস তো কতলোকের কত দুঃখ কত অভাব, ওদের দিকে চাইলে নিজের দুঃখকে ভুলে যেতে পারবি, নইলে কি আর মানুষ বাঁচতে পারতো রে? ঐ শোন ভাই! ওরা সব বোধ হয় আসছেন, তুই যা ভাই! চট করে সাড়ীটা বদলে মুখটা ধুয়ে আয়। কেঁদে কেঁদে যা মুখের ছিরি করেছিস।"—

অণিমা মৃদু আপত্তির সহিত উত্তর দিল, "থাকগে ভাল লাগছে না।"

মৃণালিনী তার হাত ধরিয়া তুলিয়া দিল, "ছিঃ! অমন করে কি লোকের সামনে বার হতে আছে। যা লক্ষীটি।"

এক দরজা দিয়া অণিমা বাহির হইয়া যাইতেই বয় আসিয়া অন্য দোরের কাছ হইতে জানাইল, "দিদিমণি সব আয়া।" প্রবিষ্ট হইল অমলা ও জ্যোৎস্না। মৃণালিনী সাদর অভ্যর্থনা জানাইল, "আসুন ভাই দিদি! এসো ছোট্ট বোনটি এসো। কি আনন্দ যে হলো। দুটিতে একলা থাকি, প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

অমলারা আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, "মিস্ দত্ত একটু শান্ত হতে

পেরেছেন? বড্ডই কাতর দেখে গেছলাম, রোজই ভাবি আসবো, কিছু না কিছু কাজ পড়ে যায়। বাবা তো ছুটি বেলা ওঁর মনের শান্তির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানান।"

"তা তিনি ঐ রকমই স্নেহময় বটেন! একবার দেখেই এত ভাল লেগেছে, যামিনীবাবু ওঁকে কাকাবাবু বলেন, না? আমরাও এবার থেকে তাই বলবো।"

ইতিমধ্যে অণিমা যৎসামান্য প্রসাধন সারিয়া পর্দ্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকিল এবং বয় জানাইল যামিনীবাবু আসিয়াছেন।

মৃণালিনী অভ্যর্থনা জানাইল, "আসুন প্রকাশবাবু!

অণিমাকে কতকটা স্বাভাবিক দেখিয়া যামিনীর চিন্তা-ভারাক্রান্ত মুখ ঈষৎ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, নমস্কার বিনিময়ান্তে প্রশ্ন করিল, "ভাল আছেন?"

অণিমা যামিনীর প্রশ্নের উত্তর দিয়া অমলার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। অপরাধী ভাবে কুণ্ঠিত স্বরে কহিল, "আমি যেতে পারিনি, তবু যে দয়া করে এসেছেন,—"

কথাটা বলা শেষ হইল না, অমলা তার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া নিজের পাশের চেয়ারটিতে বসাইয়া দিয়া চিবুক-স্পর্শে চুম্বন গ্রহণ করিয়া হাসিল,—"দয়া করে, না ভালবেসে? দেখ তো প্রকাশ! আমরা চারটি বোনে কেমন পাশাপাশি বসেছি, কেমন মানিয়েছে বল তো?"

যামিনী হাসিয়া উঠিল, "বারে! ভাইটি বুঝি তুচ্ছ হলো? হংস মধ্যে—?" অমলা ঈষৎ অপ্রতিভতাকে ঢাকা দিতে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, "তাই না কি হয়? তুমি তো 'একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি'—তারা বৈ তো আর আমরা চাঁদ নই ভাই! যতই হই না কেন? কি বলো ভাই মৃণাল?"

সকলেই সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিল যে তারা এইটুকুর ভিতরে অমলার

এই সব স্নেহাভিব্যক্তির মধ্য দিয়া যেন একান্ত আপন হইয়া পড়িয়াছে। সুদূর ব্যবধানের আলগুলি আর যেন তাদের মধ্যে বর্ত্তমান নাই।

অতঃপর দুচারটা এপাশ ওপাশ আলাপচারীর পরেই অমলা যামিনীর দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল, "বাবার সঙ্গে কি কথা হলো? 'হিতসাধিনী' সভার অধিবেশন তাহলে কবে হচ্ছে? দিন-টিন ঠিক হল কি?"

যামিনী অণিমার দিকে চাহিল, "কাকাবাবু সেই কথা বলতেই আমায় পাঠালেন। সামনের রবিবারে সভা হবে আর আপনাকে হতে হবে এবারকার সভায় সভানেত্রী।"

অণিমা সত্য-সত্যই সঙ্কোচে শিহরিয়া আচমকা বলিয়া ফেলিল, "ওরে বাবারে! আমি সে পারবো না। প্রকাশবাবু! দয়া করে তাঁকে আমার অসংখ্য প্রণাম জানিয়ে বলে দেবেন। আমার দ্বারা এ কাজটি কিছুতেই হবে না। আমি বরং অন্য ছোট খাটো হুকুম খাটবো ওঁর আদেশ পেলে, নেত্রীত্ব করার শক্তি আমার নেই।"

অমলা তাহাকে দুইহাতে সাদরে জড়াইয়া ধরিল, স্নেহের আবদারে গলাইয়া কথা বলিল, "যাই বলো তুমি আর যাই কও, কিছুতেই আমরা ওসব কথা কানেও তুলব না। তোমাকে সভানেত্রী হতেই হবে। সব মেম্বাররা মিলে পাকা হয়ে গেছে।" অণিমা তথাপি আপত্তি তুলিতে যাইতেছিল, "আমি কিন্তু কক্ষনো সভায় দাঁড়িয়ে এ পর্য্যন্ত মুখ এক ইঞ্চি ফাঁক করিনি, আমাকেই একেবারে আপনারা এতবড় একটা দায়িত্বে ঠেলে দিলেন। এ কি বলুন তো!"

অমলা তাহার মাথাটি নিজের বুকে চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া উত্তর করিল, "দিদিমণির জুলুম ভাই! কি আর করবে বল, এড়াতে তো পারবে না ছিনেজোঁকটাকে।"

এমন সময় ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল সুসজ্জতা। তার পরণে 'বার্ড

অফ প্যারাডাইস' প্যাটার্নের জরিদার জর্জ্জেট, হাতে কাজ-করা জাপানী পাখা, মুখে পেণ্ট করা, হাইহিলের ব্রোকেডের জুতা। সে আসিয়াই বলিয়া উঠিল, "বাঃ বাঃ! চাঁদের হাট বসে গেছে যে! তাই না বলি, আফিস সেরে ফিরেই হন্তদন্ত হয়ে কোথায় না জানি ছুটলেন! তা' আমায় একটু জানিয়ে এলেই তো হত। তাহলে আর বেচারা আমি তোমাদের এমন প্রাইভেট মজলিসটায় রবাহূত এসে পড়ে রসভঙ্গ করে দিতুম না। আমার জন্যে সবাই চুপ হয়ে গেল যে! তা' আমি না হয় চলেই যাচ্ছি। ক্ষমা করবেন দয়া করে।"

মৃণালিনী প্রায় ছুটিয়া আসিয়া তার হাত ধরিল, "ওমা—এ কি কথা! আপনি আসায় যে আমরা কত খুশী হয়েছি তাও কি আবার কথার মালা গেঁথে আপনাকে জানাতে হবে নাকি? আপনাকে তো আমাদের মধ্যে পাবার জন্যে আমরা সর্ব্বদাই আপনার কাছে আবেদন নিবেদন জানাচ্ছি, আপনিই বলেন সময় পান না।"

সুসঙ্গতা একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া হাত পাখায় নিজ শরীরে হাওয়া লাগাইতে লাগাইতে জবাব দিল, "তা ভাই এমন কিছু অসঙ্গত কথাও তো আর বলিনি। উনি তো আপনাদের দোর কামড়ে পড়েই আছেন। আবার আমি শুধু যদি তাই করি আমার সংসারটা চলে কি ক'রে? আমরা তো ভাই, আপনাদের মতন বড়লোক নই। বয় খানসামা বাবুর্চি আয়া এসব তো আর হাতের কাছে ঘুরছে না। যা করব না করব সবই নিজের হাতে। বাচ্চা মেয়েটা আছে, তারও তো ঝঞ্ঝাট কম নয়!"

মৃণালিনী অপ্রতিভের একশেষ হইয়া মৃদু মৃদু উচ্চারণ করিল, "তা সত্যি!"

যামিনীর স্বাভাবিক শান্ত দৃষ্টি সহসা প্রখর হইয়া উঠিতেই সে দৃষ্টি ভূমিলগ্ন করিয়া ফেলিল, মনে মনে বলিল, "আহা যা সত্যি সে আর না

বলাই ভাল! সংসার দেখেন বুড়ো অথর্ব্ব পিসীমা—আর মেয়ে, সে কোন মতে বেঁচে থেকে স্বাভাবিক ক্রমে বড় হচ্ছে। নন্দিনী চলে গিয়ে তারও ঐ পিসীমাই একমাত্র গতি।"

সুসঙ্গতা এদিক ওদিক চাহিয়া জ্যোৎস্নাকে দেখিতে পাইয়া খুশী হইল, "এই যে তুমিও আছ! ভালই হয়েছে একখানা ভাল দেখে গান শুনিয়ে দাও না।"

জ্যোৎস্না অনিচ্ছা-মন্থর মৃদুকণ্ঠে প্রতিবাদ করিল, "আজ আমি পারবো না মাফ করবেন আমায়।"

সুসঙ্গতা বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কেন গো! আজ আবার তোমার হলো কি? ভাল গলা হলেই ও রকম হয়ে থাকে, ও আমি অনেক মেয়েরই দেখেছি, পুরো খোশামোদের মাশুলটি আদায় না করে গায় না।"

অমলা বিরক্তি-বিরস মুখে বলিয়া উঠিল, "না ভাই! ওর সে রকম গলাও নয়, আর স্বভাবও সেরকম নয়। ওর ক-দিন সর্দ্দিকাশি হয়েছে, আজ পারবে না, অন্যদিন শুনো।"

সুসঙ্গতা কখনও নিজের জিদ ছাড়িতে জানে না, সেও বিরক্তি-নীরস কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাইল, "না ভাই! গাইতে হয়তো আজই হোক। আবার কবে আপনাদের অষ্টবজ্র সম্মিলন ঘটবে সে খবর আমায় দিচ্ছে কে? ওগো সুন্দরি! একটু গা তোল দেখি। না হয় প্যালাই পাবে না। ক্ল্যাপ পাবে, এন্‌কোর দেব। কিছুরই ত্রুটি করব না, বাড়ী গিয়ে একটা গোলাপের তোড়াও নয় পাঠিয়ে দেব। নাও নাও, উঠে পড়।"

সকলেই অস্বস্তিবোধ করিতেছিল, যামিনীর মুখে আষাঢ়ের মেঘ ঘনীভূত হইয়া উঠিল, সে লজ্জায় অধোমুখ হইয়াই রহিল। জ্যোৎস্না কাঁদো-কাঁদো মুখে দিদির বজ্রগর্ভ মুখের দিকে চাহিল। অমলা বেশ কঠোর স্বরেই

কহিল, "গাও জ্যোৎস্না! বেশী বড় গান নিও না, [illegible] রাখতে পারবে না।"

জ্যোৎস্না শুধু গলায় মৃদু কণ্ঠে গান ধরিল,—

'যে সুর বাজে তব একতারাতে, সে সুর বাজাও [illegible] চিত্ত-বীণায়।
সে প্রেম প্রাণে উঠুক জেগে, যে প্রেম তোমার বিশ্ব[illegible]গায়।
দাঁড়াও এসে হে অপরূপ, আমার মাঝে আড়াল ক[illegible]
আমার মনের মলিনতা স্পর্শে তব পড়ুক ঝরে।
জীবন আমার সফল করো তোমার প্রেমানন্দের বিমল ধা[illegible]।—

গান শুনিয়া অণিমা সহসা যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাইল. সে মনে মনে উচ্চারণ করিল, "প্রেমানন্দের বিমলধারায়? আমার প্রাণে প্রেমও নেই! আনন্দও নেই? তাই বোধ করি মনে প্রাণে আমার এই অনির্ব্বাণ দাহজ্বালা, জীবনভরে একটা প্রচণ্ড হাহাকার! বাবা! বাবা! যদি অন্যদের মতন মনে করতে পারতাম, তুমি আছ, কোন একটা আনন্দময় পরিবেশে আনন্দের মধ্যে নব কলেবরে সুস্থ হয়ে সুখে আছ হয়ত কত শান্তি পেতাম। তোমার সেই অশেষ রোগযন্ত্রণার কাতরানি, অ[illegible]ত-তার আর্ত্তবিলাপ আজও হয়ত দু'কানকে এমন করে দগ্ধ [illegible] না, বুক ফাটিয়ে দিয়ে সকল সময়ে মনে হত না, তোমায় হারিয়েছি, অ[illegible]লের মতই এ হারানো।"

মৃণালিনী জ্যোৎস্নাকে জড়াইয়া ধরিল, "কি মিষ্টি গলা! বোনটি আমাদের যেন সত্যিই এক টুকরা চাঁদের জ্যোৎস্না? যেমন মিষ্টি চেহারা স্বভাবটাও তেমনি মিষ্টি,—আবার তারও ওপর টেক্কা দিয়েছে ঐ মিষ্টি-রসে-ভরা মধুমাখা কণ্ঠ!"

সুসঙ্গতা কপাল কুঁচকাইয়া অসহিষ্ণুতার সঙ্গে কহিয়া উঠিল, "আচ্ছা জ্যোৎস্না! সেদিন তোমায় বলিনি, যে ঐ কটোমটো ব্রহ্মসঙ্গীতগুলো

আমি চু'চক্ষে পড়ে দেখতে পারিনে। এ তোমার যেন আমায়ই ইচ্ছে করে অপমান করা।"

অমলা সচমকে এবং ঘোর বিরক্তির সহিত রাগতঃ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "এসব কি কথা বউ! ও কখন তোমায় রাগাবার জন্যে গান গাইতে পারে? নানক কবীর নয়, দ্বিজেন্দ্র সত্যেন্দ্র নয়, এ গানও কটকটে লাগলো তোমার? তাহলে বললেই পারতে তুমি কলকেতার থিয়েটারের স্নসের গান ছাড়া অন্য কিছু যাতে ভগবানের নাম-গন্ধ আছে তা সইতে পারো না। তবে সেসব গান ও জানেই না যে তোমায় গেয়ে শোনাবে।

সুসঙ্গতাও চড়াস্বরে কহিয়া উঠিল, "আপনি থামুন দেখি মিসেস কর! বোনের হয়ে আর আপনাকে ওকালতি করতে হবে না।"

যামিনী দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া সকলকে যথাযোগ্য বিদায় অভিবাদন সারিল; অমলার পদধূলি লইয়া একেবারেই নীরবে ঘরের বাহির হইয়া গেল। গমনোদ্যতা সুসঙ্গতা অমলার দিকে ফিরিল, "কি লোক নিয়ে যে ঘর করি একটু নমুনা দেখুন! টাকা খসাতে হলেই বাবুর মাথায় বাজ পড়ে, সর্ব্বনাশ হয়ে যায়। পি-আর-এস-এর টাকা গুলো তো রয়েছে, ঐ থেকে মোটে তিনটি হাজার টাকা কি মাথা-মুণ্ড খুঁড়ে যে আদায় করেছি, সে আর আপনারা ধারণা করতেই পার্ব্বেন না! বাড়ী মেরামতও তো ঐ করে করেই হয়েছে। কেমন একটি ছোটলোকী মনোবৃত্তি। সুখে যারা থাকতে জানে না অন্যকে সুখে রাখতে তারা জানবে কেমন করে! নজর বলে কিছু নেই, হাড় কেপ্পন!" সশব্দে জুতা বাজাইয়া চলিয়া গেল।

মৃণালিনী ঈষৎ খেদপূর্ণ স্বরে কহিয়া উঠিল, "বেচারী যামিনীবাবু!"

দিল। সে গভীর সহানুভূতির দীর্ঘশ্বাস সযত্নে চাপিয়া রাখিয়া মনে মনে বলিল, "ওঁর ভাগ্যে এই হয়েছে! নাঃ, আমার দুঃখ ঢের কম।"

জ্যোৎস্না বিস্ফারিতনেত্রে সুসঙ্গতার বাক্যবাণ নিক্ষেপ-কৌশলে প্রায় হতভাব হইয়া গিয়াছিল, মনে মনে তেমনি বিহ্বলভাবেই বলিয়া উঠিল, "দেবতাকেও দৈত্য বানাতে পারা যায়? ক্ষমতা আছে মানুষটার কিন্তু।"

অমলাও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তার মনও এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকে নাই, সেও ভাবিতেছিল ওর এই দুর্ভাগ্যের জন্যে আমিও খানিকটা দায়ী। জ্যোতির সঙ্গে বিয়ে দিতে আমিই ত তখন মত করিনি। আর ওঁর বাবাও অত তাড়াহুড়ো না করলেও তো পারতেন। ও কাজটা তিনি ভাল করেছেন তা বলতে পারব না। একটু সময় দিলে সব অবস্থাটাও তো আমরা বুঝতে চেষ্টা করতুম। একেবারে ক্ষেপে গিয়ে সামনে যা পেলেন টেনে এনে গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। সেকেলে বাপেদের মতন।..."আচ্ছা আজ আসি ভাই! সময় পেলেই আসবোখন।"

অণিমা ও মৃণালিনী সমস্বরেই বলিয়া উঠিল, "সে বোধ করি এরপর আর আমাদের মধ্যে বলাবলির অপেক্ষা থাকবে না, না!"

অণিমা মৃণালিনী যামিনীর মত অমলাকে প্রণাম করিল। জ্যোৎস্নাও করিল ওদের দুজনকে। আদর খাইয়া হাসিমুখে কতকটা সুস্থমনে পরস্পরের কাছে তারা বিদায় লইল।

মৃণালিনী অণিমাকে টানিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল, "কি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে দেখ।"

তেরো

যামিনী স্ত্রীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্ত্তব্যবোধে মিঃ দত্তের কন্যার খোঁজ খবর না লইয়া পারে না, মৃতের নিকট প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাকে আসিতেই হয়। একদিন সে আসিলে অণিমা বলিল, "একটা কথা ভাবছিলুম।"

যামিনী ঈষৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?"

"আমার ইচ্ছে করে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল করতে চেষ্টা করলে হয় না ? আমার তো যথেষ্ট সময় থাকে।"

যামিনী প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে তার প্রতি চাহিতেই তার বুক ঠেলিয়া পূর্ব্বস্মৃতি ভাসিয়া উঠল। একরাশ বাধা যদিও কণ্ঠাগ্র অধিকার করিয়াছিল তথাপি কোন মতে বাধা ঠেলিয়া যামিনী কহিল, "আর একটা কাজ করতে পারলেও তো ভাল হতো।"

"কি" বলিয়া অণিমা এবার তার উৎসুক ও প্রশ্নপূর্ণ চক্ষু উন্নত করিল। "দু' একটা পানা পুকুর যদি একটু কাটিয়ে দেওয়া যায়, কতলোকের কত যে উপকার করা হবে !"

অণিমার অনেকদিন পূর্ব্বের কথা মনে পড়িল কিন্তু মন হইতে সে দুঃখকে বিদায় দিয়া সে উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "তাই করুন, মানুষ আগে বাঁচুক।"

যামিনী চেষ্টা করিল এ পর্য্যন্ত সে এই অর্থসাধ্য কার্য্যের কিছুই করিয়া উঠিতে পারল না। পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতির খরচ বাদে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির কিছু টাকা মাত্র তাহার সংসারের সম্বল ছিল। ইচ্ছা ছিল সেই টাকা

নামে করিবে এবং সাধারণকে এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাদের সাহায্য চাহিয়া যদি সম্ভব হয়, অন্ত চেষ্টাও করিতে পারিবে। রিক্তহস্তে ভিক্ষার ঝুলি ধরিতে সে আন্তরিক ঘৃণা বোধ করে এবং জানে দৃষ্টান্ত দ্বারা যেমন সাধারণের চিত্ত জয় করা যায় কথার দ্বারা তা হয় না। কিন্তু এই সাধু সংকল্প কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইল না। এই সময়ে ভূমিকম্পে তাদের পুরাতন বাড়ী একটু বিধ্বস্ত হইল এবং সুসঙ্গতা বাড়ী মেরামতের সময় কান্নাকাটি রাগারাগি এবং এমন কি উপবাসী থাকিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া সংস্কার করাইল। দ্বিতলের দুইটা ঘরে কিছুতেই চলে না। পিসীমাকে নীচে থাকিতে হয়। নলিনীর আব্দার কে সহ্য করে বলিয়া সেও পিসীমার কাছে নির্ব্বাসিত। উপরে ঘর না হইলে কিছুতেই আর চলে না, ঘর দুইটা তাহাকে করাইতেই হইবে। এর জন্য টাকা চাই, যামিনী বৃথা কাজে না ঘুরিয়া নিজের কাজে মন দিলেই তো যথেষ্ট টাকা আসে, উপরে ঘর না উঠিলে সে মেয়েকে উপরে সে স্থান দিবে না। সুসঙ্গতা জেদ ধরিল উপরে আর দুইটা ঘর করিয়া দিতে হইবে। যামিনী প্রথমতঃ এ প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই, কিন্তু স্ত্রীকে সে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না, অগত্যা অনেক মন-কষাকষির পর তার একটা কঠিন বাক্যে আহত হইয়া সে ঘর করিয়া দিতে তো সম্মত হইলই বরং রাগ করিয়া বাকি টাকাগুলিও তার কাছেই ধরিয়া দিল। সুসঙ্গতা হাসিমুখে টাকা বাক্সে রাখিয়া দিয়া মুখটা হঠাৎ ভারী করিয়া বলিল, "রাগ কর তো দিয়ে কাজ নেই। আমি রাগারাগি ভালবাসি নে।" যামিনী গম্ভীর মুখে উত্তর করিল, "রাগ কিসের? টাকা তুমিই রাখো, আমার ওতে কি দরকার!" সুসঙ্গতা স্বামীর বাক্যের নিগূঢ় শ্লেষ না বুঝিয়াছিল এমন নয়, তথাপি সে এতগুলো টাকা হাতে পাইয়া এতটাই খুশী হইয়াছিল যে, তার তুলনায় ঐটুকু আঘাত কিছুই নয়। ঢিলের বদলে পাটকেল মারার নীতি সে ত্যাগ করিল। পরদিনেই বাপের বাড়ী গিয়া

একখানা ব্রোহাম গাড়ি, অণিমার ঘোড়ার মত একটা সাদা ঘোড়া এবং তাহারই গৃহের গৃহসজ্জার অনুরূপ গোটাকতক গৃহসজ্জার ফরমাস দিয়া একজোড়া হীরার ইয়ারিং কিনিয়া কানে পরিয়া পিতার সব চেয়ে বড়লোক বন্ধুর বাড়ী বেড়াইয়া আসিল। অবশ্য এই সকলের জন্য তাহাকে কিছু ঋণ করিতে হইয়াছিল। তা' সে স্বামী পরে শোধ দিবেন। সে তো চাক্‌রে স্বামীর স্ত্রী নয়। সুসঙ্গতার মনের স্ফূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ রায় এখন বেশ পাচ্ছেন, না?" "হ্যাঁ, এখন খুবই পাচ্ছেন।" বলিয়া সুসঙ্গতা গম্ভীর মুখে রহিল। "শুনে বড়ই সুখী হলুম। হাইকোর্টে আসবেন কবে?" সুসঙ্গতার গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর দিল, "আর কি কর্‌তে আসবেন, ওখানেই তো যথেষ্ট প্র্যাক্‌টিস্ হয়ে গেছে। নাইবার খাবার সময় পান না।"

যামিনী একটা কাজে দু'চার দিনের জন্য বর্দ্ধমানে গিয়াছিল। ফিরিয়া সে নিজের বাড়ীটাকে চিনিয়া উঠিতে পারিল না। সুসঙ্গতা খুব খুশী মেজাজে হাসিমুখে তাহাকে সেদিন অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু তাহার বুকের রক্ত যেন দেখিয়া শুনিয়া হিম হইয়া আসিয়াছিল। আহা! কতগুলা হতভাগ্য এই টাকাটায় কলেরা ম্যালেরিয়ার কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারিত। গরীব মানুষ সে, তাহার এ ভান কেন? এ কি ছলনা নয়? এ কি অসত্যের প্রশ্রয় নয়? কিন্তু মুখে সে একটি কথাও বলিয়া সুসঙ্গতার আনন্দের ব্যাঘাত করিল না। আচ্ছা সুসঙ্গতার সাধই মিটুক। আজ হইতে সে তাহার সমুদয় আশা উৎসাহ তাহারই দুরাকাঙ্ক্ষা-অগ্নিতে আহুতি দান করিবে। ইহাই তাহার জীবনের ব্রত হইল। তাই যখন অণিমা স্কুলের কথা পাড়িল, তখন সে তাহার নিজের বহু দিনের আশা প্রকাশ করিয়াছিল। তাহার প্রস্তাব অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়া অণিমা যখন আনন্দে রুদ্ধবাক্ হইয়া বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, "আপনার মন কত বড়!"

তখন লজ্জায় প্রথমটা সে আরক্ত হইয়া উঠিয়া তাহার অতিরিক্ত প্রশংসা-বাদে বাধা দিতে গিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণে কি ভাবিয়া নিবৃত্ত হইল। ক্ষতি কি? যাহার কাছে তার হৃদয়ের সমুদয় মহত্ত্ব এবং সদ্‌গুণ সমূহ ধূলিমুঠির মত হেয়, যার কাছে মনের এতটুকু উচ্ছ্বাস, একটি ক্ষুদ্র পরিকল্পনা প্রকাশ করিতে গিয়া ঔদাসীন্যের তীব্র উপেক্ষাঘাতে সঙ্কোচে মরিয়া হৃদয়-প্রান্তেই ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহার ভবিষ্যতের সকল উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা একে একে শুকাইয়া মরিয়া গিয়াছে, তার জন্য অর্থ চিন্তাই বাকি থাক্ কিন্তু যদি আর কেহ তাদের মুমূর্ষু প্রাণে চেতনা দিয়া জীয়াইয়া তুলে, তাহাতে বাধা দিয়া কি হইবে? তুলুক না। তাহাকে লইয়াই তো একদিন ইহারা মাথা তুলিয়াছিল। তাহার হৃদয়হীনা সহধর্ম্মিণীর নিষ্ঠুরতার আঘাত হইতে তাহার হৃদয়-বৃত্তিগুলিকে রক্ষা করিবার পক্ষে জীবনের ক্লান্তি ও অবসাদের মধ্যে এই সহকর্ম্মিণীর সহানুভূতিটুকু তাহার জন্য খুবই সামান্য হইবে না।

একদিন মিলি ও অণিমার কাছে খোঁচা খাইয়া স্ত্রীকে গিয়া বলিল, "ওদের সঙ্গে একটু দেশের কাজে যোগ দিও না।"

সুসঙ্গতা ভ্রূ টানিয়া জবাব দিল, "বেশ মজার কথা তো! সময় কি আমি হাতে গঁড়বো নাকি? তুমি যে 'ঠাকুর ল' না কি একটা যে পুরস্কারের জন্যে লিখছিলে সেটার কতদূর? যাতে পয়সা আসে তাতো তোমার ইচ্ছে করে না? কেবল আমায় টিট্‌কারি দেবার আর অভাবে দুঃখে ঠেলে ফেলে রাখবারই মতলব তোমার বৈ তো নয়। এত দুঃখের সংসারে থাকা আমার বাবু আর পোষায় না। কখন কি এতটা কষ্ট সওয়া অভ্যাস আছে, সেটাও একটু ভেবে দেখো।"

"পয়সার চেষ্টা করিনে কি করে বল্‌চো সুসঙ্গতা? তোমার জন্যে মনুষ্যত্ব একরকম বিসর্জ্জন দিয়েছি। যাদের কাছে ফি নেওয়া উচিত নয়,

তাদেরও টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করি। আর কি করবো বলো, লোকের বাড়ী সিঁদ দোব কি?"

"আমার জন্যে? আমিই তোমার সর্ব্বস্ব খাচ্ছি?"

যামিনী একটু বেগের সহিত বলিল, "হ্যাঁ,—তোমারই জন্যে। আমার কি এমন খরচ? সবই ত তোমায় এনে দিই।"

"তুমি না হয় নিখাকী, তা' তোমার পিসী, তোমার মেয়ে এঁরাও বুঝি কিছু খান না, পরেন না, মুখে তুলো দিয়ে থাকেন?"

যামিনী ব্যথিত মুখে চাহিল, "অণিমার দেখে একটু পরের জন্যে ভাবতে শেখো। সেও তো মেয়েমানুষ, অথচ নিজের সমস্ত টাকাকড়ি পরের জন্যে উৎসর্গ করচে।"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, বড্ড ভাল! বিয়ে করনি কেন তাকে, যদি এতই সে ভাল? আমায় ঈশ্বর যেমন করেছেন, তেমনি হবো তো, না তোমার ফরমাসে নূতন হয়ে তৈরি হবো!"

"তবু ভাল, ঈশ্বরের নামটাও নিলে। তবে ওটা বৃথা অপবাদ তাঁর। তিনি ভালই করেছিলেন, নিজে ইচ্ছে করে যেমন হচ্চো।"

সুসঙ্গতা এবার রাগিল, সহজে সে রাগে না। সক্রোধে কহিয়া উঠিল, "কিসে তুমি আমায় এতই মন্দ দেখ বলতো? দুঃখে কষ্টে যেমন করে রেখেছ, তেমনি দুর্দ্দশাতেই পড়ে আছি। যখন তখন সেই নাস্তিক অণিমার সঙ্গে তুলনা করতে এসো যে! ঐ অণিমাই তোমার উন্নতির দফা সারবে দেখো, তা' আমি এই বলে রাখলুম। চব্বিশ ঘণ্টাই অণিমার হুকুম খাটা, অণিমা কি তোমায় মাইনে করে সরকার রেখেছে?" ইহার পর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এ আলোচনা এইখানেই বন্ধ হইয়া গেল এবং যামিনী হঠাৎ অণিমার স্কুল-স্থাপনের বিষয়টা ত্যাগ করিয়া নিজের বাহিরের ঘরে দ্বার দিয়া 'ঠাকুর ল' পুরস্কার আশায় "স্ত্রী ধন" আইন সম্বন্ধে লিখিবার চেষ্টা

অণিমার পিতার উৎসাহেই একদিন যাহা শুরু করিয়াছিল, দৃঢ়সঙ্কল্পে লিখিতে আরম্ভ করিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে ধনোপার্জ্জনের দিকেই ফিরাইয়া ধনী হইবার চেষ্টা করিবে। সুসঙ্গতার দারিদ্র্য দুঃখ দূর করিতে এ জীবনের সবটাই যদি ব্যয় করিতে হয় তাই হোক্।

অণিমা সুসঙ্গতার কাছে আসিয়াছিল, শুনিয়া গেল তার একটুকু অবসর নাই। যামিনীর সহসা নির্লিপ্ততার কারণও যে না বুঝিল তাও নয়। তার এমনও মনে হইল, হয় ত তার জন্য যামিনীর সাংসারিক ক্ষতি হইতেছে না, সে কাহারও জীবনে দুর্গ্রহের দুঃস্থ দৃষ্টি দান করিবে না। নিজেই মৃণালিনীকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী বাড়ী ফিরিল। দু' একজন মহিলা তাহাকে আদর করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং সাহায্য করিতেও সম্মত হইলেন। কিন্তু লেডিস্ কমিটির মধ্যে নাম দিতে কেহই সম্মত হইলেন না। "মা, দিদিমা যাহা করেন নাই, সে কার্য্য কেমন করিয়া তাঁহারা করিবেন। লোকে কি বলিবে? বাবুরা রাজী নন।" তাঁদের পক্ষে এমন অনেক নজীর ছিল। অণিমা কাহাকেও রাজী করাইতে পারিল না, কেবল একজন নূতন ডিপুটির অল্পবয়স্কা পত্নী স্বামীর আদেশে সম্মত হইলেন।

কিন্তু এত করিয়াও কাজ বিশেষ অগ্রসর হইল না। টাকা বেশী না হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু যামিনী বাবু না আসিলে তো কোন ব্যবস্থাই হয় হয় না। রমেন্দ্রনাথ এ সব বিষয়ে একেবারেই আনাড়ী। ইতিমধ্যে সেই বি, এ উপাধিধারিণী প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পত্রোত্তর আসিয়াছে। আরও একটি শিক্ষয়িত্রীর যোগাড় হইয়াছে এবং সর্ব্বাপেক্ষা একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে, বরিশাল নিবাসী হরনাথ ভট্টাচার্য্যের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী চারুমতী তাদের জেনানা স্কুলে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও প্রথম পাঠ শিক্ষা দিতে সম্মত হইয়াছেন। হরনাথ কিছুদিন অণিমাকে সংস্কৃত কাব্য ব্যাকরণ পড়াইয়াছিলেন এবং মাসে মাসে এখনও তার কাছে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ কিছু পাইয়া থাকেন।

নিজেও তিনি উদারচিত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। চারুমতীও পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী একজন ভাল পণ্ডিতের মেয়ে, পিতার কাছে সে বাংলা ও সংস্কৃত চলনসই শিখিয়াছিল। অনিমা পণ্ডিত মহাশয়কে ধরিয়া এই দুরূহ কার্য্যটি সাধন করিয়া তুলিয়া ছিল। তাহাকে বাড়ী বাড়ী মেয়ে পড়াইয়া ঘুরিতে দেখিলেও কেহ আশ্চর্য্য হইবে না, কেন না তাহাকে অনেকেই সুস্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, "তুমি ব্রাহ্ম না খ্রীষ্টান ?" কিন্তু হিন্দু সমাজের মধ্য হইতে যদি দু' একজন এই কার্য্যে যোগদান করেন, তবে তাঁদের দৃষ্টান্ত অন্যকেও হয় ত অনুবর্ত্তী করিবে এবং এইরূপে এই কার্য্যটি যথার্থ হিন্দু বালিকাদের শিক্ষার উপযোগী হইতে পারিবে। কিন্তু এদিককার ব্যবস্থা একটু হইল তো যামিনীবাবু সরিয়া দাঁড়াইলেন। এর অর্থ কি ? স্ত্রী পছন্দ করেন না এই কারণ ? ছিঃ! অতি সাধারণ লোকের মত তিনিও কি তবে এই মহদুদ্দেশ্য ভুলিয়া স্ত্রীর অঞ্চলপ্রান্তে গ্রন্থি বন্ধন করিয়া কাজের সময় ঘরের কোণে আশ্রয় লইবেন ? তাঁহারই না চেষ্টা, তাঁহারই না অধ্যবসায়ের বলে সে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে ? সেই উন্নতির লেখা লিখিত প্রশস্ত ললাটে কি এতটুকু সাহস লেখা নাই ? মৃণালিনী স্বামীর সহিত কলিকাতায় গিয়াছে, আজ তারা ফিরিয়া আসিবে না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যামিনীর প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে সে তার আগমনাশায় হতাশ হইয়া ছাদে আসিল। ছাদে একা দাঁড়াইয়া একবার তার মনে হইল—কি ক্লান্ত, কি উদ্দেশ্যহীন জীবন তার! এমন করিয়া বাঁচিয়া থাকায় ফল কি ? এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। বাস্তবিক আশাহীন ক্লান্ত জীবনের চেয়ে মৃত্যু মন্দ কিসে ? মৃত্যুকে লোকে এত ভয় করে কেন ? লোকে জানে না মৃত্যুর ওপারে কি আছে, তাই অনেক অদ্ভুত কল্পনার দ্বারাই তারা মৃত্যুর পরপারটাকে ভয়ের চোখে দেখে, কিন্তু যথার্থ সে সব তো কিছুই সত্য নয়। মৃত্যুতেই জীবের সব শেষ। জীবনের চেয়ে মৃত্যু শতগুণে নয় সহস্র গুণেই ভাল।

চৌদ্দ

পরদিন সে যখন নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল, তখন সদ্যোনিদ্রোত্থিত শান্ত চিত্তটিকে তার আর তেমন ভারাক্রান্ত বোধ হইল না, বরং আনন্দে ও উৎসাহে আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এই বিশ্বের প্রথম অভিব্যক্তির মুহূর্ত্ত হইতেই যে কর্ম্ম-স্রোত সারা জগতের দেহের মধ্য দিয়া শোণিত-স্রোতের মত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, কে তার গতিরোধ করিতে পারে? জীবনী-শক্তি যেমন জীবনের সহিত একীভূত, কর্ম্মও তেমনি জীবিত প্রাণীর স্বতঃসিদ্ধ বৃত্তি। জীবন থাকিতে কে ইহা ত্যাগ করিতে পারে? আর কেনই বা তা' করিবে? যদি জীবনের পরে অনন্ত রজনীব্যাপী অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু না-ই থাকে, তথাপি এই ক্ষণিকের আলো ত্যাগ করিবার জন্য যে ব্যগ্র হয় সে মূর্খ নয়তো কি? জীবন ক্ষণস্থায়ী হইলেও এই যে একটি শুভ্র শান্ত ক্ষণিক বিকাশ এও তো তুচ্ছ নয়! অচিরস্থায়ী বলিয়াই তো জীবনের এত মূল্য।

নীচে নামিয়া সম্মুখের বড় ঘরে প্রবেশ করিল। এ ঘর পিতার মৃত্যুর পর হইতে শূন্যই পড়িয়া আছে। সে ধীর পদে প্রবিষ্ট হইল হয়ত স্মৃতিকে ভাল করিয়া জাগাইয়া তুলিতে চাহিতেছিল। তিনিই না তাহাকে আত্মনির্ভরতা শিখাইয়া ছিলেন? একদিকে ঈশ্বরবিশ্বাস, অদৃষ্টবাদ তিনি নিবারণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু দেশভক্তি ও কর্ম্মোদ্দীপনার শিক্ষায় তাঁর তো বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না! তাঁর মতে মানুষ আত্মবলে সর্ব্বক্ষম হইতে সমর্থ, অপর কোন শক্তির মুখাপেক্ষা তার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তবে কেন সে এমন নিরুদ্যম হইয়া পড়িতেছে, আর কেহ সহায় না থাক, নিজে তো আছে। ঘর কিন্তু শূন্য ছিল না, হরনাথ ভট্টাচার্য্য একখানা বেতের কেদারায়

বসিয়াছিলেন। অণিমা এ সময় তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল; প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কতক্ষণ এসেছেন পণ্ডিত মশাই—কেউ তো আমায় বলেনি!"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তার সাড়া পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; আশীর্ব্বাদ করিয়া একটা কিছু বলিবার জন্য একবার মুখ তুলিয়া আবার যেন ঈষৎ কুণ্ঠিত হইয়া থামিয়া গেলেন।

অণিমা বলিল,—"বসুন পণ্ডিতমশাই!"

"না, মা, আর বস্‌বো না। স্নানাহ্নিক পূজার্চ্চনা এখনও কিছুই হয়নি। একটা দরকারী কথার জন্যই অসময়ে এসেচি।" এই কথা বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় অপরাধী ভাবে অণিমার মুখের দিকে চাহিলেন।

অণিমা তাঁর প্রয়োজনীয় কথাটা আন্দাজে বুঝিয়াছিল। শুনিবার ভাবে চুপ করিয়া রহিল।

দু' একবার চেষ্টার পর হরনাথ ভট্টাচার্য্য হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন,—"আমার পত্নীর সংস্কৃত পাঠ শিক্ষা দিবার কথা হয়েছিল, আমিও অসম্মত ছিলুম না, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা ঘটে উঠছে না মা! তুমি কিছু মনে ক'রো না।"

অণিমা শান্তস্বরে প্রশ্ন করিল,—"কেন?"

প্রশ্নের ধরণে ও তার সঙ্গে স্থির দুটি উজ্জ্বল চোখের চাহনিতে বৃদ্ধ পণ্ডিত ফাঁপরে পড়িলেন। একবার কাসিয়া এক হাতে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন,—"লোকে বড় নিন্দে করছে মা! সকলেই বল্‌চে,—'এ দৃষ্টান্ত সমাজের পক্ষে বিশেষ হানিকর হবে।' কি করি মা, জানই তো আমাদের পাঁচ জনকে তুষ্ট করেই তো সংসার প্রতিপালন করা, সমাজের ভয় সর্ব্বদাই রাখতে হয়।"

অণিমা তার স্বাভাবিক গম্ভীর মৃদুতার সহিত তাঁর মুখের দিকে

চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি নিজে কি স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে চেষ্টা করাকে অন্যায় মনে করেন?" তার এই কূট প্রশ্নে বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিতেছিলেন, চোখ নামাইয়া বলিলেন,—"না মা, তা মোটেই করি নে, বরং হৃদয়ের সঙ্গে প্রশংসাই করি। শিক্ষাই মানব-হৃদয়ের অন্ধকার নাশ করবার প্রদীপ। শাস্ত্রেও আছে 'কন্যাপ্যেব পালনীয়া—শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ'। স্ত্রী-শিক্ষা অশাস্ত্রীয় নয়। বৈদিক কালের তো কথাই নাই,—পৌরাণিক কালেও কৃষ্ণা, ভদ্রা প্রভৃতির অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।"

"তবে সে প্রদীপ-জ্বালাবার কাজে সাহায্য করতে ভয় পাচ্চেন কেন? আপনারা যদি সমাজের প্রকৃত মঙ্গল না দেখবেন, তবে কে দেখবে পণ্ডিত-মশাই? যারা হিন্দু সমাজকে উন্নত করবার ভার নেবে, তারা হিন্দুর জাতীয় শিক্ষার ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছুরই খবর রাখবে না! তবে হিন্দুর ছেলেমেয়ে তাদের নিজের ভাষা, নিজের আচার-বিচার কেমন ক'রে পালন করতে শিখবে? অথচ তা না করলেও তাদের সব্বাই মিলে তারস্বরে দুষবেন।"

ভীতভাবে হরনাথ মাঁথা চুলকাইয়া বলিলেন,—"মা আমি বড্ডই গরিব, সমাজের ভয় করি। তাই উচিত জেনেও তা পালন কর্‌বার সাহস মনে রাখ্‌তে পারিনে।"

নৈরাশ্যে অণিমার অধর-প্রান্তে গভীর দুঃখের হাসি আসিল। হায় ব্রাহ্মণ! কোথায় তোমার সেই ব্রহ্মতেজ! যাঁদের একটি অঙ্গুলীর ইশারায় বিক্ষিপ্ত সমাজের গতি পর্ব্বত-রুদ্ধ স্রোতস্বতীর গতির মতই মুহূর্ত্তে ফিরিয়া দাঁড়াইত, সমাজ আজ তাঁহাদিগকে ভয় না করিয়া, তাঁহারাই সমাজকে ভয় করিতেছে! সমাজ-দেবতা ব্রাহ্মণের পরিণাম কি শেষে এই হইল? এই শক্তি লইয়াই তোমরা নিজেদের 'ভূ-দেব' বলিয়া গর্ব্ব কর? কিন্তু ব্রাহ্মণের মধ্যে আজ কয়জন 'ভূ-দেব' আছেন?

একটু পরেই মুখ ফিরাইয়া সে আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, —"তবে আজ আসুন পণ্ডিতমশাই, পূজো হয়নি বল্‌চেন। মাঘের একটা কবিতা ভাল বুঝ্‌তে পারিনি, যেদিন সময় থাকবে, দয়া ক'রে একটু বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন তো। এ মাসের টাকাটা ওবেলা পাঠিয়ে দোব।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইটুকুর জন্যই একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। ক্রিয়াকাণ্ডহীনা হিন্দুয়ানির বহির্ভূতা এই নারী তাঁর এক জন বড়ই উদারহস্ত যজমান। মাসিক পাঁচটি টাকা, তা' ভিন্ন ছেলেদের জামায় কাপড়ে সর্ব্বদাই সে মুক্তহস্ত। এই ঘটনায় বৃত্তিটা সুদ্ধ যাইবে ভাবিয়া তিনি ভীত হইতেছিলেন, অথচ এদিকে নিরুপায়। কিন্তু সে রকম ঘটিবে না জানিয়া অণিমাকে মনের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরিয়া গেলেন। এটুকু বুঝিয়াই অণিমা কথাটা ও রকম করিয়া বলিয়াছিল, নতুবা মাঘের কবিতা বুঝিবার তার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

সে কেন প্রতিশোধ লইবে? কার উপরে এ প্রতিশোধ, এ তো দেশ-মায়ের পূজা। বিদ্রোহী চিত্তকে হাড়িকাঠে বাঁধিয়া স্নেহময়ী জননীকে সন্তান-শোণিতে রঞ্জিত করিবার আয়োজন তো হয় নাই। সব চেয়ে শ্রেয়, সব চেয়ে প্রেয় যাহা তাহাই নিজের হাতে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিবার উদ্যোগ করা হইয়াছে মাত্র। কাপালিকের কালী পূজা নয়। জগদ্ধাত্রীর আবাহন।

লোকে বলে,—এই বিরোধ-বিক্ষিপ্ত মানবসকলের একজন নেতা আছেন। যদি তাই থাকেন তবে এই সব ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা ও তুচ্ছ সঙ্কীর্ণতার বিরোধ, এই বিশাল মানবসমাজকে শতধা স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়াছে কেন? তিনি তাদের হৃদয়ে তাঁর নির্ম্মল অবিচ্ছিন্নতার আনন্দ দান না করিয়া এই রকম ক্ষুধিত ক্ষুব্ধ উদ্দাম বৃত্তিগুলিকেই বা কেন জাগাইয়া দিয়াছেন? এত কথা এত গোলমাল বাহির হইতে হানাহানি টানাটানি, প্রবৃত্তির মধ্যে এই যে অসত্যের বিকৃতিকে ফুটাইয়া তোলা, লোকাচারের কঠোর নিয়মশৃঙ্খল-

কেই ধর্ম্মের স্থানে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা; এই সব অমঙ্গলকে কি তিনি তা হইলে তাঁর মঙ্গল হস্তে বাধা দিতেন না? যদি একই সুর জগতের মানব-চিত্তের তন্ত্রীতে চড়াইয়া দেওয়া থাকে; যদি একই আনন্দ ভিন্ন, সত্য ভিন্ন, চৈতন্য ভিন্ন জগতের আর কোনও দ্বিতীয় সত্তা না থাকে, তবে কেন এক চিত্ত-বীণার সঙ্গে সঙ্গে সকল বীণায় সেই একই কল্যাণের—আনন্দের—সত্যের সুর বাজিয়া উঠে না? মিলনের শান্তি না চাহিয়া—বিরোধের কাটাকাটিকে এই যে শোণিত-নদীর এ-পারে ও-পারে থাকিয়া বরণ করিয়া নেওয়া, সমাজকে বিপ্লব-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত আলোড়িত করিয়া তুলিয়া এই যে মানুষের সঙ্গে মানুষের দুর্ল্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের নিয়ত সৃজন, এ সকল হইতে কি বুঝায় যে তাদের মধ্যে এখন কেউ একজন আছেন,—যিনি শান্ত, শিব, সুন্দর? দুষ্কর্ম্মের বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া মানুষ কি তা হইলে কখনও তাঁর কোল ছাড়িয়া এত দূরে সরিয়া যাইতে পারিত? কোথায় সেই সত্য! কোথায় সেই আনন্দ? কই সে সুন্দর?

বসন্তের উজ্জ্বল প্রভাত তার অপর্য্যাপ্ত পুষ্পসম্ভার লইয়া সকলকেই সমান আদরে ডাকিতেছে। নির্ম্মল বাতাস—স্বর্গের পুণ্য গন্ধ ও আকাশের অবিচ্ছিন্ন রাগিণীর সুর বহন করিয়া সকলেরই প্রাণকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। বিশ্ব ভরিয়া সামঞ্জস্যের ও আনন্দের ঘোষণা দিকে দিকে ভরিয়া উঠিতেছে। পাখীরাও সেই সুরে সুর মিলাইয়া কোন্ অনাদি প্রভাত হইতে বিশ্ব-তপোবনের শাখায় বসিয়া সেই চিরবন্দিতের বার্ত্তাই তো কানে কাছে আনিয়া দিতেছে। তবে তুমি যদি এ গান না শুনিবে—কর্ণকে বধির করিয়া রাখিবে—এ রূপ না দেখিয়া চক্ষু মুদিয়া চলিয়া যাইবে—নিজেদের প্রাণের মধ্যে কিসের সাড়া শুনা গিয়াছে, তাহা বুঝিয়াও যদি না বুঝিবে—তবে সে ত্রুটি কার?

পণ্ডিতমহাশয় চলিয়া গেলেও অনিমা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তেমনি করিয়া

দাঁড়াইয়া রহিল। সে হিন্দু নয়, সে ব্রাহ্ম নয়, সে এ সকল কিছুই নয়, কিন্তু সে মানুষ। মানব-হৃদয়ে যতটুকু স্নেহ, প্রেম, প্রীতি ও ভক্তি থাকিতে পারে, তার চিত্তেও যে তার চাইতে একটুও কম নাই, এ কথা স্বীকার করিতে সে কুণ্ঠিত নয়। আহার, বিহার, মেলা-মেশা, প্রভৃতি সামাজিক বন্ধনের সীমানা ছাড়াইয়া অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে সমস্ত মানুষ যেখানে সুখে দুঃখে লাভে লোকসানে এক, সেই ভেদ-বিরোধ-শূন্য বিশ্ব-মানবকেই সে আপন করিতে চাহিয়াছিল। সমাজ-বন্ধন তার জটিল পাশ-অস্ত্র হাতে অদৃশ্য মেঘ-লোকে ইন্দ্রজিতের মত সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকুক এবং অসংখ্য নর-নারী নিজ নিজ অঙ্গ সেই নাগ-পাশের কঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য আগ্রহান্বিত হউক ; তার তা'তে ক্ষতি কি? সে নিজে বন্ধনের বাহিরে দাঁড়াইয়া—বদ্ধ মানবের পানে সকরুণ বেদনায় চাহিয়া আছে এবং বদ্ধ শরীরের ভিতরে তাদের যে বন্ধন-মুক্ত মনটুকু নিজের অবস্থা না জানিয়া আধারের সহিত নিজেকেও বদ্ধ ভাবিতেছে, তাহারই সহিত সে আত্মীয়তা করিতে চায়। তাকেই বুঝাইতে চায়, 'তোমার অবাধ-গতি ও স্বাধীনতা কেহ নষ্ট করে নাই। তুমি শুধু সমাজের নও, তুমি বিশ্বের। বাহিরে বিরোধ যতই থাক্, ভিতরে কাহারও সঙ্গে কাহারও প্রকৃত বিরোধ নাই। এস আমরা এক সঙ্গে বিশ্বের—অতদূর যদি বা না পারি অন্ততঃ—আমাদের এই ভারতের, এই বাংলার মঙ্গল খুঁজি,—তার কল্যাণ কামনা করি। বড় কিছু না পারি যতটুকুই হোক, তবু তা'তেই জীবন সার্থক হোক।

আজ সে বুঝিল,—ভারত কেন এমন অভাগা! পূর্ব্ব ঋষিরা সামাজিকতার যে ভেদ বাহিরের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, সে আর নাই। এখন সেই ভেদজ্ঞানই সর্ব্বস্ব হইয়াছে। মিলিয়া মিশিয়া ক্ষুদ্র শক্তিকে বৃহত্তর করিয়া তুলিতে কাহারও আর সাহসও হয় না, প্রবৃত্তিও নাই।

আবার যেন মনের বল ও উৎসাহ কমিয়া যাইতে আরম্ভ হইল। যামিনীবাবু না আসিলে কর্ত্তব্যই স্থির হয় না। সাহায্য চাই। একা সে কি করিবে? কিন্তু যামিনীবাবুই বা কেন তাকে সদা সর্ব্বদা সাহায্য করিবেন? পারিলেও তাঁহার নিজের কোন আনন্দ যদি এর মধ্যে বর্ত্তমান না থাকে তবে কেনই বা করিবেন? কে সে তাঁর? অনাত্মীয়—নিঃ-সম্পর্কীয়, তাহাতে আবার একটা—স্ত্রীলোক মাত্র! তার কাজে তার আনন্দে, তিনি নিজের চেষ্টা নিজের ইপ্সিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেনই বা অংশ গ্রহণ করিতে আসিবেন? বিশেষতঃ তাঁর স্ত্রী যখন দারুণ বিরোধী।

পনেরো

কলিকাতার একটি ছোট্ট বাড়ী। বাড়ীটি ছোট হইলেও ছিমছাম, রুচি-সম্মত ভাবে সাজানো গোছানো। ঘরের মেজেয় পাতা ঘর জোড়া জাজিমের উপর বসিয়াছিল বরেন্দ্র, ভূষণ ও তাদের দু তিন জন সঙ্গী। বরেন্দ্র যেন কুতকটা দিশাহারা ভ্যাবাচাকা খাওয়া বলিতে পারা যায়। সে চুপি চুপি ভূষণকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "এরা কারা ভূষণ! কাদের বাড়ী এটা? কোন ভদ্রলোককে তো এখানে দেখতে পাচ্চি না? গান কে গাইবেন? তুমি যে বললে, এমন গান আমি জন্মে কখনো শুনিনি। সত্যি আমি আর ভাল গান কোথায় শুনলুম! কই ওস্তাদ-টোস্তাদ তো কাউকেই দেখছি নে?" ভূষণ মুখ টিপিয়া হাসিল, "জানলেন মশাই! সবুরে মেওয়া ফলে। সব রকম কি আর তাড়াহুড়োয় হয়? এই যে এলেন বলে—"

বলিতে বলিতেই পিছনদিককার দরজা খুলিয়া রঞ্জন বাইজী ও তার সঙ্গে দুজন লোক বাঁয়া তবলা ও তানপুরা লইয়া প্রবিষ্ট হইল। রঞ্জনের

বয়স কম, চেহারায় বেশ একটু জৌলুস আছে, সাজপোশাক তারই উপযুক্ত। বরেন্দ্র বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিল। তার জীবনে এমন একটি জীব দেখা দূরে থাক, দেখিবার কল্পনাও হয়ত করে নাই। মিষ্ট স্বরে অপরিচিতা মেয়েটি বলিল, "নমস্কার কুমার সাহেব, আপনি কৃপা করে যে দাসীর কুঁড়ে-ঘরে পায়ের ধূলো দিয়ে কৃতার্থ করেছেন, এর জন্যে জন্মের মত আপনার চরণে কেনা হয়ে গেছি জানবেন।" সঙ্গে সঙ্গে মধুর করিয়া হাসিল।

বরেন্দ্র একেবারে জড়াইয়া গেল, সে কোনমতে প্রতি-নমস্কার করিয়া ভাঙ্গা গলায় কি বলিতে গিয়া কি বলিল, তা' সে নিজেও জানিতে পারিল না, "আমায় ওসব কি বলছেন, আ-আ-আপনি কত গুণী—"

রঙ্গন এবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, "উঃ! কান দুটিকে লজ্জায় একেবারে রাঙ্গিয়ে ফেল্লেন!"

বরেন্দ্র ভূষণকে মৃদু ও বিস্ময়ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "ওঁরা দুজন বুঝি গাইবেন?"

ভূষণ কুটিল কটাক্ষে রঙ্গনকে দেখাইয়া দিল, বলিল, "ওরা নয়, এই ইনি।"

বরেন্দ্রের বিস্ময় সীমাতিক্রম করিল, সে অবাক হইয়া গেল, "অ্যাঁ! স্ত্রীলোক গান গাইবেন? সে কি?"

ভূষণ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "কলকাতায় এসব চলে।" রঙ্গনের দিকে চাহিয়া গভীর ইঙ্গিত করিল,— "দেখছেন তো কি রকম কাঁচামাল, ফেরেস্‌মাল বিবিসাহেবার খাসে এনে দিচ্ছি! 'বন থেকে বেরুলো টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে'।"

"আপনি বুঝি মেয়েদের গান কখন শোনেননি?"

রঙ্গনের সহাস্য-প্রশ্নে সলজ্জভাবে বরেন্দ্র জবাব দিল, "আজ্ঞে না। কোথায়

শুনবো, আমাদের পাড়াগ্রামে তো ওসব চল নেই।"

ভূষণ টিপ্পনি কাটিল, "তার উপরে রাঘব বোয়াল ম্যাষ্টর মশাই-এর পেটের মধ্যে বসে মানুষ হচ্ছিলেন। কোর্ট অব অয়ার্ডের ওয়ার্ড হয়ে। নেন, বিবিসাহেবা! একখানা ভাল দেখে লাগসই গান শুনিয়ে দেন দেকি।"

"কি গাইব?" বরেন্দ্রের দিকে হাসিয়া চাহিল, "হুকুম ফরমাইয়ে। কই, উনি তো কিছু বলছেন না।"

বরেন্দ্র করুণভাবে বলিল, "গান সম্বন্ধে আমি বড্ড আনাড়ী। আপনার ইচ্ছামত যা ভাল হয় গান।"

রঞ্জন গাহিল,—

"না, নাগো না, আশা ছাড়িব না।
আশায় বেঁচে রবো, ভুলিব না।
যদি জীবন যায়, সাথে লবো আশায়,
নিরাশার বেদনা বহিব না।"

ভূষণের দল হট্টগোল করিয়া উঠিল, "এনকোর, এনকোর।"

বরেন্দ্র ভূষণকে চুপিচুপি বলিল, "কি চমৎকার গলা! সত্যিই চমৎকার!"

ভূষণ বলিল, "তা' আমায় গোপনে বলা কেন, যাকে বলবার তাকেই বলো না। তুমি কি এখনও সেই ম্যাষ্টরের কোলে শুয়ে রয়েছ যে ভয়ে গলা থেকে রা বেরুচ্ছে না?"

বরেন্দ্র জোর করিয়া দ্বিধা ঠেলিয়া কোন মতে বলিয়া ফেলিল,— "আপনার গান আমার খুব ভাল লেগেছে।"

রঞ্জন তার সৌজন্য শিক্ষার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া যথেষ্ট সংযমের সহিত করজোড়ে জানাইল, "আপনার মত দরদী মরমী শ্রোতাকে যে

একখানা গান শোনাতে সুযোগ পেয়েছি এ আমার পরম সৌভাগ্য।"

বরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "না না, সেকি।"

রঙ্গন কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে মৃদু শ্বাস ছাড়িয়া জবাব দিল, "তা ছাড়া কি! এদিন কি আমার পোড়া বরাতে আর কোনদিন আসবে কুমার সাহেব!"

ভূষণ আগ বাড়াইয়া বরেন্দ্রের কাছে ঘেঁষিয়া আসিল, বলিয়া উঠিল, "আলবৎ হবে। কি বলেন কুমার বাহাদুর?"

বরেন্দ্র মন্ত্র-সম্মোহিতের মতই সাগ্রহে বলিয়া গেল, "নিশ্চয়। যেদিন আপনি বলবেন এসে গান শুনে যাব।"

ভূষণ রঙ্গনে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হইল। রঙ্গন হাতজোড় করিল, "আপনি এই পচা নর্দ্দমায় কি দুঃখে কষ্ট করে আসতে যাবেন। শুনেছি আপনার নাকি ভরা গঙ্গার উপরে রাজবাড়ীর মতন বাড়ী আছে, হুকুম করলে আমিই তো সেখানে ছুটে গিয়ে আপনাকে যত আপনার খুশী গান শুনিয়ে আসব।"

বরেন্দ্র বিব্রত বোধ করিতে লাগিল। ভূষণকে জনান্তিকে বলিতে গেল, "সেটা কি—"

ভূষণ তার হাত টিপিয়া সতর্ক চক্ষে রঙ্গনের দিকে চাহিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, "করছো কি! বিবিসাহেব শুনতে পেলে কি মনে করবেন বল ত? এদের সব সেই বাদশা-আমলের কালচার! কায়দা-কানুন সবই উঁচুপর্দ্দায় বাঁধা। এরা তোমার নেড়া-নেড়ীর দলের লোক নয়, মনে রেখো।" রঙ্গনকে ডাকিয়া বলিল, "শুনছেন বিবিসাহেব! উনি বলছেন, সে আবার আমায় বলতে হবে নাকি? আমি যখন ওঁর দরজা পার হয়েছি তক্ষুনি তো ওঁর পাল্টা দেবার এক্তিয়ার এসেই গেছে।

রঙ্গন মুখ টিপিয়া হাসিল, "ওঃ, তাই বলছিলেন বুঝি? তা' বেশ তো আমি কালই তা'হলে গিয়ে হাজির হচ্ছি, কেমন?"

বরেন্দ্রের সাহস বাড়িতেছিল, সে সঙ্কোচ ঠেলিয়া প্রশ্ন করিল, "আপনি কেত্তন গাইতে পারেন? একটা শোনাবেন? আমার বড় ভাল লাগে, আমি অবশ্য ভাল কেত্তন কথন শুনিনি।"

রঞ্জন গান ধরিবার তোড়জোড় করিতে করিতে সহাস্য কটাক্ষ হানিল, এই কাঁচামাল যে কতটা কাঁচা সে এবার আন্দাজ করিয়া লইয়া সৎসাহস সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে, কহিল, "দেখবেন শেষটা যেন 'দূর দূর' বলে কানে আঙ্গুল দেবেন না,—

আমি কত না যতনে মালাটি গেঁথেছি কার আশাপথ চাহি।
তার আসা-পথ পানে আকুল নয়নে চেয়ে চেয়ে দিন বাহি।
সখি গো! এ মালা পরাব কায়? যতনের ধন অযতনে গেল
শুখায়ে ঝরিল হায়!
আমার সাধের মালাটি শুখায়ে গেল। মালা যে আমার শুখায়ে
গেল গো।
যার তরে সখি! এ মালিকা গাঁথা, সেজন-বিহনে সুখ না ভেল।
আমার সাধ করে গাঁথা মালা যে শুখালো, এ মালা পরাবো কারে?
আমার মনেরই আগুনে মালা শুখালো, ভেবে ভেবে প্রাণে
সুখ না ভেল,
বঁধুয়ার লাগি সুখ ফুরালো, তনু শুখালো, সেই তাপে মোর মালা
শুখা[illegible]।
এ মালা পরাবো কারে? যারে পরাইতে গেঁথেছিনু মালা তারই
দরশন নাহি।
সেই নিঠুর নিপট শঠ বিহনে, সেই সে কঠিন পাষাণ বিনে,
আর কারেও দিতে মন চাহে না, প্রাণ যাচে না, অবোধ পরাণ
কারেও চাহে না,—

সে না আসিলে কারে বা দিব ? মালা দূরে যাক, প্রাণ ছাড়িব,
প্রাণই দিব,
কি হবে এ ছার মিছার জীবনে, সে ধন বিহনে প্রাণ ছাড়িব, মালা
কোন্ ছার, প্রাণই দিব।
সে না যদি আসে ত্যজিব জীবন, যমুনায় অবগাহি।—"

বরেন্দ্রর মুগ্ধকণ্ঠ উচ্চারণ করিল, "স্বর্গীয় !"

বন্ধুগণ সমস্বরে উচ্চরব তুলিল, "একসেলেণ্ট……"

জনৈক বন্ধু—"এনকোর—"

রঙ্গন আভূমিবিনত সেলাম ঠুকিয়া লজ্জাভরা অভিনয়ে কহিল, "খুব যাহোক ঠাট্টাটা করে নিলে।"

বরেন্দ্র অনেকখানি আগ্রহেই এবার বলিয়া উঠিল, "একটুও না। আমি একবার কলেজের ফোনোগ্রাফে রবীন্দ্রনাথের বন্দেমাতরম্ আর দুতিনজন ওস্তাদের গানই যা শুনেছিলুম। তাছাড়া গাঁয়ের বৈরিগী বোষ্টমদের দু'একখানা কেত্তন। সে কি আপনার গানের পাশে দাঁড়াতে পারে ? আচ্ছা আজ যাই, আর একদিন এসে আবার এই রকম কেত্তন শুনে যাব।"

রঙ্গন বিনয়ে গলিয়া পড়িল, "সে আপনার দয়া।"

ভূষণ দুজনকেই শোধরাইয়া দিল, "সে কি! কাল যে আপনার রিটার্ন-ভিজিট দেবার নেমন্তন্ন, কুমার সাহেবের দরবারে। কি ভুলো মন রে বাবা !"

বরেন্দ্র একটু অপ্রতিভ মুখে সামলাইয়া লইল, "ওঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাইতো ! তা' যাবেন কিন্তু আপনি।"

অণিমার সহিত যামিনীর এই চার মাসে চার পাঁচ বারের বেশী দেখাই হয় নাই। নিজেই সে একবার সুসঙ্গতার গৃহে গিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছে। দিন-দুই মাত্র তিনি নিজে তার সংবাদ লইতে আসিয়া অল্পক্ষণ থাকিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। একান্ত অভিমানে অণিমা তাদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে কোন কথাই উত্থাপন করে নাই। যামিনীও কুণ্ঠিতভাবে দু'একবার কোন প্রশ্ন করিতে গিয়া চাপিয়া গিয়াছে। অণিমার মুখের গম্ভীর সংযত ভাব সত্ত্বেও সে যেন তার হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় অভিমান অনুভব করিয়া ভিতরে ভিতরে দারুণ আহত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কেমন করিয়া আত্মাপরাধ ক্ষালন করিবে? যেমন নীরবে আসিয়াছিল, তেমনি মনোবেদনা বহন করিয়াই ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে।

আজকাল আদালতে তার পশার প্রতিপত্তিটাও বাড়িয়া উঠিতেছে। অল্পবয়স্ক উকিলদের ভিতর বার-লাইব্রেরীর কেদারা চাপিয়া হাস্য-কৌতুক এবং রাজনীতি-চর্চ্চার মধ্যে আজকাল তাহাকে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। বেলাবেলি বাড়ী ফিরিয়া সুসঙ্গতার হাসি মুখে ছায়াপাত করা এখন তাহার নৈমিত্তিক কার্য্য—নিত্য নয়।

হুগলী কলেজে সে এখন আইন অধ্যাপকের পদ লইয়া তাহাতেও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু এ যশে তার চিত্তকে কোন মতেই সান্ত্বনা বা শান্তি দিতে পারিতেছিল না। কার জন্য সে এই পরিশ্রম করিতেছে? কে তার উন্নতির দিনে পাশে দাঁড়াইয়া তার যশোমুকুট ধারণ করিবে? সহানুভূতিপূর্ণ কোমল করতল দিয়া তার কর্ম্মের শ্রান্তি মুছিয়া লইয়া উদ্বেগের তাপ-তপ্ত দেহ শান্ত বক্ষে টানিয়া নিজের শীতলতা দিয়া জুড়াইয়া

দিবার জন্য কেহ তো তার বিশ্রাম-মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া নাই। নিজের মাসিক একশত টাকা আয়, একটি ক্ষুদ্র গ্রাম-প্রান্তের নির্জ্জন ছোট নদীর তীরে সামান্য একখানি বাড়ী এবং একখানি সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়—এই তিনটি জিনিষ হইলেই তার মতে একজন মানুষের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। কিন্তু সেই যে একখানি সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়, তারই যে এ জগতে বড় অভাব। তাহারই অভাবে গাড়ী-ঘোড়া-আসবাব-পত্রে কিছুতেই যে কুলাইতেছে না! অবস্থা যতই ভাল হইয়া উঠিতেছে, সংসারের অভাব ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। যামিনী-চিত্তের এইটুকুই গোপন দুর্ব্বলতা। আত্মাভিমান ইহাকে বাহিরে প্রকাশ করিতে দিতে সম্মত নয় বলিয়া ভিতরে ভিতরে বেশী করিয়াই পীড়া দেয়। সুসঙ্গতার বড়মানুষীর সাধ মিটাইতে সে নিজের সমস্ত উপার্জ্জন রুদ্ধ-বিদ্বেষে তারই হাতে তুলিয়া দেয়, পেটুককে মিষ্ট খাওয়াইয়া অরুচি আনিতে যেমন কাহারও কাহারও সাধ থাকে এও তেমনি। কিন্তু যামিনী সেইখানে ভুল করিয়া বসিয়াছে। ঘি ঢালিয়া আগুন নিবাইতে গেলে তাহা আরও বেশী করিয়াই জ্বলিতে থাকে,—নির্ব্বাপিত হয় না।

সে দিনের সেই বড়রকম ঝড়-বৃষ্টির দিন বৈকালে সুসঙ্গতা বাপের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিল। মধ্যে মধ্যে পাঁচ সাত দিন কলিকাতা না ঘুরিয়া আসিলে তার মনে শান্তি থাকে না। বিশেষ আজকাল অনেক নূতন গহনা হইয়াছে, পাঁচজনকে ত দেখানো চাই,—এখানে এই সব বাজে লোকেদের মধ্যে তার হীরার ব্রোচ পান্নার আংটি কে-ই বা বুঝিবে? সুসঙ্গতার মন প্রফুল্ল। যামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবা ভাল আছেন?"

শ্বশুর বিশেষ অসুস্থ সে সেদিন কি একটা কাজে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছিল।

"তেমন ভাল নয়, তবে আগের চেয়ে ভাল। বাবা যে উইল করেছেন।"

যামিনী ওর বাবার উইল সম্বন্ধে কোন আগ্রহ না দেখাইয়া মক্কেলের কাগজ দেখিতে লাগিল। একটা আপীল কেস্। ব্যাপারটা গোলমেলে।

সুসঙ্গতা স্বামীর ঔদাসীন্যে বিশেষ মনোযোগ করিল না, সে কতকটা আপনার মনেই বলিল,—"তা'তে আমাকে চল্লিশ হাজার টাকা দিয়েছেন, সব মেয়েদেরই চল্লিশ হাজার ক'রে। বাবা অবর্ত্তমানে অবশ্য—।

সুসঙ্গতার একটি বই ভাই ছিল না।......

যামিনী একটু বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া তার আত্ম-স্বপ্নে-ভোর মুখের দিকে চাহিল,—"তোমার বাপের অবর্ত্তমানে? তাতেই এত আনন্দ?"

এটা নিতান্ত নিষ্ঠুরতার অব্যর্থ আঘাত! এ আঘাতে সুসঙ্গতার লজ্জায় মরিয়া যাইবার কথা! মার খাইয়া খাইয়া নিরীহ যামিনীও আজকাল দু'এক ঘা ফিরাইয়া দিতে শিখিয়াছে। কিন্তু সে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই উত্তর করিল,—"অত টাকা পেলে কার না আহ্লাদ হয়! কম টাকাটা কি, তুমি এত টাকা হয়ত জন্মে কখন চক্ষেও দেখনি। হ্যাগা, 'ঠাকুর ল'-এর দশ হাজার টাকা পাচ্চো কবে? এখনও দেরী আছে বুঝি? আচ্ছা, যা'হোক পাবে তো? এইবার কল্‌কাতায় একখানা বাড়ী কিনে সেই-খানেই যাই চল। এখানে আর জঙ্গলে পড়ে থাকতে ভাল লাগে না। কোনও আমোদ নেই,—কিছু না, এমন করে থাকা যায়?—আহা, কল্‌কাতা সোনার কল্‌কাতা, রোজ নিমন্ত্রণ, রোজ আমোদ-আহ্লাদ,—ট্যাব্‌লো টিপার্টি কত কি।"

যামিনী আবার নিজের কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কাজ হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল,—"তোমার টাকা পাবার তো তা'হলে প্রথমটা

ব্যাঘাত হ'তে পারে সুসঙ্গতা? কি করে এখানকার কাজ কর্ম্ম ছেড়ে যাবো? সে হ'তে পারে না।"

সুসঙ্গতা কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় কোথা হইতে মায়ের সাড়া পাইয়া নলিনী ছুটিয়া আসিয়া তার ধূলামাখা অপরিচ্ছন্ন হাতেই তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে গেল। সুসঙ্গতা কলিকাতা যাইবার সময় মেয়েকে সঙ্গে লইয়া যায় না। যেহেতু পিতার আদরে মেয়ের মাথাটি চিবাইয়া খাওয়া হইয়া গিয়াছে। ভদ্র-সমাজে স্থান পাইবার যোগ্যই সে নয়। তা ছাড়া তার তেমন ভাল পোষাক কিছু ছিল না। যামিনীর এইখানে অত্যন্ত কড়া হুকুম ছিল, সুসঙ্গতা নিজে যত খুশি ফ্রেঞ্চ লেস ও সিল্কের শ্রাদ্ধ করিতে হয় করুক, কিন্তু উহার একটি টুকরাও তার মেয়ের গায়ে উঠিতে পাইবে না। এর প্রতিবাদ করিবার সুসঙ্গতার তেমন কিছু গরজ ছিল না—বরং তার এতে কিছু খরচাই বাঁচিত। কাজেই এ লইয়া তাদের মধ্যে তেমন বাদানুবাদ হইত না। কিন্তু সে এখনও তার রাস্তার কাপড় ছাড়িয়া রাখে নাই। গায়ে সম্পূর্ণ নূতন ফ্যাসানের ফিকে গোলাপী সিল্কের জামা, শাড়ীখানিও সেই রকম এবং বড় বাহারে। নলিনীর ময়লা হাতে আর একটু হইলেই সমস্তটা মাটি হইয়া গিয়াছিল আর কি! মেয়ের আলিঙ্গন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সুসঙ্গতা পিছাইয়া গিয়া বিরক্ত স্বরে বলিল,—"যা, যা, খেলা করগে যা। না আছে গা-হাত পরিষ্কার,—না আছে পায়ে জুতো, আদর ক'রে কোলে উঠতে এলেন। এমন অসভ্য হয়েছে মেয়েটা, দু'চক্ষে দেখতে পারিনে।"

নলিনীর মুখখানি ছোট হইয়া গেল। ক্ষুণ্ণ হইয়া সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল, দুই দিন পরে মার সঙ্গে তার এই সাক্ষাৎ। যামিনী হঠাৎ কাজ ছাড়িয়া মুখ তুলিল। শিশুর ছোট হাত দু'টি তখনও মায়ের দিকে পূর্ব্বের মতই একটুখানি বাড়ানো রহিয়াছে। আকস্মিক আনন্দ-ভঙ্গে

চোখ দু'টি একটু বেদনা-চকিত। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া যামিনী ডাকিলেন,—"নলিনী। আমার কাছে এসো মা।"

বালিকা ভগ্নোৎসাহে পিতার কাছে গিয়া তাঁর স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়া তাঁর প্রসারিত বাহু-মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। যামিনী দুই হাতে বুকে টানিয়া লইয়া তার ক্ষুদ্র মুখখানিতে প্রগাঢ়-স্নেহে চুম্বন করিল। সে মুখে এখন আর বেদনার চিহ্ন ছিল না।

ইহাতে যেন তাহাকেই বিশেষ অপমান করা হইল! তীব্র রোষে সুসঙ্গতার অঙ্গ জ্বলিয়া গেল। ক্রুদ্ধস্বরে সে বলিয়া উঠিল,—"এমনি ক'রেই মেয়েটাকে একেবারে নষ্ট করছ, নিজেই এর পরে বুঝ্‌বে! আমার ওর জন্য এতটুকু এসে-যায় না। ও মলো কি থাক্‌লো তা'ও আমি ভাবিনে।"

"বুঝি বুঝিবো, তোমায় তো বুঝ্‌তে হবে না। নেল্ যাও তো মা, ঝিয়ের কাছে কাপড় প'রে এসোগে। তোমায় এমামবাড়ী নিয়ে যাবো।"

নলিনী মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিয়া পিতার কোল ছাড়িয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। সুসঙ্গতা তার চলিষ্ণু মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া স্বামীকে শুনাইয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "দাঁড়াও না, চাবুক দিয়ে সোজা করবো তোমার—"

যামিনী হঠাৎ প্রদীপ্তভাবে ফিরিয়া বলিল,—"সাবধান হয়ে কথা বোলো সুসঙ্গতা, ও চাবুকের ঘা ওর পিঠে পড়্‌লো না, আমার পিঠেই পড়্‌লো—তা'জানো?"

"সাধ ক'রে পিঠ পেতে নিলেই পড়ে। তুমি যখন মেয়েকে আদর দেখিয়ে আমার অপমান কর, তখন কোন দোষ হয় না, না? তোমার আচার-ব্যবহার একটুও ভাল নয়। কোনও ব্রাহ্ম ঘরের মেয়েকে তোমার বিয়ে করা উচিত হয় নি। হিঁদুর ঘরে স্ত্রীদের যেমন বাঁদীর মতন রেখে দেয়, তোমার ইচ্ছে যে আমাকেও তুমি সেই রকম ক'রে রাখো। তা' যে পারবে সে কথা ভুলেও ভেবো না। যে ঘরের মেয়ে তুমি বিয়ে করেছ,

তারা তোমার মতন অনেককে পয়সা দিয়ে কিনে রেখে দিতে পারে তা জেনো।"

"তা' পারলে হয় তো ভালই হ'ত, তারাও বোধ হয় এই রকম অবস্থায় প'ড়েই রাখে। তুমি ব্রাহ্ম বলে' আর গুমোর ক'রো না। যে ব্রহ্ম শব্দ শুনে মূর্চ্ছা যায়, সে আবার ব্রাহ্ম কিসের? অত বড় বিলাসিতায় যে গড়া, তার পক্ষে ব্রাহ্ম হিন্দু কিছুই হওয়া যায় না।"

সুসঙ্গতার গর্ব্বিত মুখে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি প্রতিশোধের ভাবে ফুটিয়া উঠিল। সে-ও তীক্ষ্ণকণ্ঠে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাঘাত করিল,—"তুমি আর মুখ নেড়ে কথা বোলো না। যদি তোমার মনে যথার্থ ধর্ম্মভাব থাক্‌তো, তা হ'লে ঈশ্বর-না-মানা নাস্তিক অণিমার জন্যে এমন ক'রে প্রাণটা বার কর্‌তে না। বুঝিনে নাকি কোন কিছুই? এত ন্যাকা আর তা ব'লে নই।—"

কথাটা শেষ হইয়া উঠিল না, অকস্মাৎ স্বামীর ক্রুদ্ধ মুখের ভ্রূকুটী তাহাকে একটুখানি বিচলিত করিয়া তুলিল। তাঁহার ললাটে ঘনায়মান মেঘের মত অপমানিত ক্রোধের একটা উচ্ছ্বাস ভিতরের রক্তকে সুদ্ধ যেন কালো করিয়া তুলিয়াছিল। সুসঙ্গতা ঈষৎ লজ্জিতভাবে এক মিনিট স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বাহিরে গিয়া দাসীকে ডাকিয়া বলিল,—"গাড়ীখানা আনতে বল। আর আমার সঙ্গে চল গঙ্গায় একটু বেড়িয়ে আসি। বাবা, যা বাড়ী—এ বাড়ীতে আবার মানুষ একদণ্ড তিষ্ঠুতে পারে।" দাসী জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবুও যাবেন তো?" "হ্যাঃ, তিনি আবার যাবেন না! তাঁরই জ্বালায় বলে বাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছি। তিনি আবার আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবেন! তা হ'লে সেই দিনই পৃথিবী উল্টে যাবে তা জানিসনে বুঝি? না না, ওটাকে নিতে হবে না। মেয়েটাকে দেখলে আমার গা জ্বালা করে, দু'চক্ষের বিষ। ছেলেমেয়েগুলো কি কর্‌তেই যে জন্মায়!"

যামিনী ঘরে বসিয়া স্ত্রীর মন্তব্য শুনিল। "আহা কি সুন্দর মিষ্টি স্বভাবটি! অনেক ভাগ্যে মানুষ এমন স্ত্রী পায়!" কাগজের তাড়াটা ফিতা দিয়া বাঁধিতে আরম্ভ করিল। "ইচ্ছে করে,—" কি ইচ্ছা করে সেটা বোধ করি ভাবিয়া পাইল না।

কলমটা কলমদানীতে ফেলিয়া কাগজগুলি ড্রয়ারে রাখিতেছে, এমন সময় গৃহান্তরে নলিনীর কান্না ও সুসঙ্গতার তর্জ্জন শোনা গেল। বেড়াইতে যাইবার জন্য সুসঙ্গতা পাউডার মাখিতেছিল, নলিনী কৌটাটা টানিয়া ফেলাতে কাচের কৌটা ভাঙিয়া গিয়াছে, কিন্তু শাসনের পরিমাণ দেখিয়া যামিনীর বুঝিতে বাকি ছিল না যে, কাচের কৌটার চেয়ে তার ভিতর আরও কোন গূঢ় কারণ বর্ত্তমান ছিল। সত্যই আঘাতগুলা তারই উদ্দেশ্যে পড়িতেছিল। সে চেয়ারের উপরে যেমন ছিল তেমনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। বলিবার কিছু নাই।

সতেরো

জীবন যখন দুর্ব্বিষহ শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে, আনন্দ যখন সহজ জীবন হইতে বহু দূরে চলিয়া যায়—চেষ্টা, উদ্যম ও উচ্চ আশা ক্লান্ত জীবনকে অবসাদের গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া সরিয়া পড়ে, অনর্থক সেই মরুমধ্যে পাদপ-ছায়া খুঁজিয়া বেড়াইলে পা দুইটা অবসন্ন হইয়া পড়ে, আশ্রয় মিলে না।

নূতন রঙ্ চঙ্ ও লোহার রেলিঙে পুরাতন বাড়ীটির যথেষ্ট বাহার খুলিয়াছিল। বাগানের লতা, গুল্ম, রঙিন পাতায় আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। সুসঙ্গতার গাড়ীর শব্দ মিলাইয়া গেলে যামিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইল। ক্লান্তিতে অবসন্ন, উত্তপ্ত জগৎটা যেন হঠাৎ

কোন যাদুকরের মায়া-যষ্টির স্পর্শে স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া শান্তিতে, শোভাতে নবীনতর হইয়া উঠিয়াছে, তার কোথাও জীবন-সংগ্রামের চিহ্নটি পর্য্যন্ত নাই। যামিনী মুক্ত বাতাসে শ্রান্তির নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত আকাশের দিকে চাহিল। গোধূলির আকাশ বর্ণে বৈচিত্র্যে অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে।

এই নবীনতার স্নিগ্ধতাটুকু তাহার প্রাণকে যেন কোমলভাবে স্পর্শ করিতে লাগিল। বাহিরের কোলাহল ও ঘাত-প্রতিঘাতে যে চিরন্তন সত্য আমাদের চক্ষের সম্মুখে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে বাধ্য হয়, মধ্যাহ্নের সূর্য্যের মত সে কেবল মেঘের ফাঁক হইতে আপনাকে প্রকাশ করিবার অবসর অনুসন্ধান করিতে থাকে।

স্ত্রীর সহিত ঝগড়া আজ নূতন না হইলেও অন্য দিনের মত যামিনী আজও নিজের ব্যবহারে একটু লজ্জাবোধ করিতেছিল। কেন সে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া নিরুত্তর থাকিতে পারে না? সুসঙ্গতা দোষী, কিন্তু সেও হয়ত খুব নির্দ্দোষ নয়। একমাত্র সহিষ্ণুতা দ্বারাই যখন তার উগ্রতাকে রোধ করা সম্ভব, তখন উল্টা পথে চলিয়া কেন মিথ্যা হানাহানিকে বাড়াইয়া তোলা? সংসারে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন না হইলে সে জীবনের মূল্য যেমন তুচ্ছ হইয়া পড়ে, উদ্দেশ্যও তেমনি ব্যর্থ হইয়া যায়। এই বিবাহ না হইলেই ছিল ভাল, কিন্তু যখন হইয়াইছে তখন শান্তি স্থাপনের জন্য সন্ধির চেষ্টা করাই তো প্রয়োজন, অনর্থক বিদ্রোহে লাভ কিছুমাত্র নাই।

পিছন হইতে একটি কোমল স্পর্শ যামিনীর সমস্ত-দেহটাকে চমকাইয়া তুলিল। অতি মধুর সে স্পর্শ! তার অন্তরের মধ্য হইতেই যেন সন্ধির মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া শিশু কন্যা শান্তির স্পর্শ দিয়া তার অশান্তি দূর করিয়া দিয়াছে।

যামিনী ফিরিয়া মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইল। তার অশ্রুধারা শুকাইয়া গিয়াছে কেবল চোখ দুটি একটু ফুলিয়া আছে। যামিনী ব্যথিত ভাবে তাহাকে প্রগাঢ় চুম্বন করিল। "তুমি কোথায় ছিলে নেল্? আমি মনে করেছিলুম ঝিয়ের সঙ্গে বেড়াতে গেছ।" নলিনীর টুক্‌টুকে ঠোঁট দু'টি একটু ফুলিয়া উঠিল, সে পিতার গলা জড়াইয়া ঈষৎ অভিযোগের সহিত কহিল,—"মা আমাকে এমন মেলেচে!" বলিতে বলিতে সে পিঠের জামা তুলিতে চেষ্টা করিল। সত্যই তার কচি গায়ে ফর্সা রঙের উপর পাঁচটা আঙুলের দাগ এখনও সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই। যামিনী অন্য-দিকে মুখ ফিরাইল। সে আঘাতটা যেন তার নিজের পিঠেই পড়িল। উহার এই শাস্তি তো তারই জন্য।

বাগানে একটা বড় গোলাপ ফুটিয়াছে দেখিয়া বালিকা পিতার কোল হইতে নামিয়া ছুটিয়া সেটি তুলিতে গেল। যামিনী বারান্দার লোহার বেঞ্চিখানায় বসিয়া গভীর নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তার আশা একান্তই দুরাশা,—সুসঙ্গতার সহিত মিল করিয়া চলা অসম্ভব!

ফুল লইয়া নলিনী নাচিতে নাচিতে ফিরিয়া আসিল। পিতার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সসঙ্কোচে কাছে আসিয়া কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অসহিষ্ণু হইয়া ফুলটি পাশে রাখিয়া দু'হাত দিয়া নত মুখখানা তুলিবার চেষ্টা করিয়া ডাকিল,—"বাবা!

"কেন বাবা?" যামিনী কন্যাকে জানুর উপর বসাইয়া তার কচি গালে চুমা দিল। শিশুও তাহাকে প্রতি-চুম্বন করিয়া হাসিয়া বলিল,—"আমি বুঝি তোমাল বাবা? আমি তো মামণি।" যামিনীও হাসিল,—"আমার সবই তুই নেল্! খুব লক্ষ্মী মেয়ে হয়ো মা!—কেউ যেন আমার নলিনীর নিন্দে করতে না পারে। মনে রেখো খারাপ লোককে ঈশ্বর দয়া করেন না।" নলিনী আগ্রহের সহিত বড় করিয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি প্রকাশ করিল।

এমন সময় ফটকের বাহিরে রাস্তা দিয়া একখানা বড় জুড়ী চলিয়া গেল। ঘণ্টার শব্দে—ঘোড়ার পায়ের খুরের টক্‌টক্ ধ্বনিতে পিতা ও কন্যা সেই-দিকে এক সঙ্গেই চাহিয়া দেখিল। সহিস কোচম্যানের জ ঁাকালো পোষাক, চামরের বাঁট ডুটা আলোয় চক্‌মক্ করিয়া উঠিল। গাড়ী চলিয়া গেলে নলিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা! আমাদেল ঐ লকম একটা গাড়ী হবে?" যামিনী তার আহত পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। আগুনে হাত দিলে যেমন হাত জ্বালা করিতে থাকে প্রতিবারের অঙ্গুলী চালনায় তার অঙ্গুলী কয়টিকে তেমনি করিয়া যেন দগ্ধ করিয়া দিতেছিল, বুকের মধ্যে একটা অব্যক্ত বেদনায় রক্তের তালে তালে কেবলই এই প্রশ্ন বাজিয়া উঠিতেছিল, "কি দোষে সে এমন স্ত্রী লাভ করিল? কি অপরাধে এই নিষ্পাপ শিশু এমন পাষাণীর গর্ভে জন্মিয়াছে?" কন্যার প্রশ্নে সে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া উত্তর দিল, "কেন আমাদের তো একটা গাড়ী আছে।"

"সেটা তো মাল, তোমাল আল আমাল দন্যে একতা ওমনি গাড়ী কেনো না বাবা, দু'জনে আমরা খালি তা'তে ক'লে বেড়াব। মাকে কক্ষনো উথতে দেবো না।"

"তা'তে যে অনেক টাকা লাগবে মামণি! আমরা গরীব মানুষ, কোথায় অত টাকা পাব?" নলিনী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ক পয়সা হ'লে হবে বাবা? আমাল পাঁচটা পয়সা আতে।"

যামিনী ঈষৎ স্নেহের হাসি হাসিল, "পয়সা না মা, হাজার—দেড় হাজার টাকা লাগবে।"

"সে কত টাকা বাবা! দেড় হাজাল্?"

"সে তুমি গুন্‌তে পারবে না, অনেক টাকা সে।" নলিনী আবার চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

যামিনী তার নিজের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল,—তাই আকাশের বর্ণ পরিবর্ত্তন দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ অন্ধকার হইয়া আসাতে নলিনীর দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। ঘন কাল মেঘ প্রকাণ্ড মত্ত হস্তীর মত এদিকে সেদিকে ছুটিতেছে। তাদের মাথায় সোনার তাজ, পিঠে সোনা লাগানো হাওদা, সে একটু চেঁচাইয়া উঠিল, "বাবা! বাবা! কত মেঘ কলেছে দেখ!" যামিনী হঠাৎ চিন্তা-স্রোতে বাধা পাইয়া স্বপ্নোত্থিতের মত চমকিয়া চাহিল। আকাশের দিকে চাহিতেই হঠাৎ তার মনটা শিহরিয়া উঠিল। প্রবল বেগে এখনি যে ঝড় উঠিবে সুসঙ্গতা যদি সে সময়ে নৌকায় থাকে?

নলিনীকে কোল হইতে নামাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাড়ী হইতে গঙ্গা অনেক দূর। গাড়ীখানাও নাই। থাকিলেও এই আসন্ন ঝড়ের মুখে ঘোড়াকে লইয়া যাওয়া কঠিন হইত। হয় নৌকায়, না হয় গাড়ীতে, সুসঙ্গতা আজ এক রকমে না এক রকমে বিপন্ন হইবেই হইবে। এতক্ষণ যদি ফিরিয়া আসিত! বিরক্তিতে অধর দংশন করিয়া সে আকাশের অবস্থা দেখিতে লাগিল। কিন্তু একটু পরেই হঠাৎ মনটা লঘু হইয়া আসিল। সে তো আর ছেলে মানুষ নয়, বোকা নয়, নিশ্চয়ই এতক্ষণে নৌকা হইতে নামিয়া পড়িয়াছে।

নলিনী তার ছোট্ট হাতে তার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। "বাবা! আমায় দপ্প বল। লোজ এমনি মেঘ তললে বেশ হয়, না বাবা? তালে মক্কেল আল্ আসে না।"

পিতা একটু করুণ ভাবে হাসিল, "ওরা না এলে খাবো কি মা?"

"মক্কেল তো খাবাল্ আনে না বাবা! তালা তো তাকা আনে। ভাঁলাল ঘলে অনেক তাল তো আতে।" এমন সময় জোর বাতাস উঠিয়া বাগানের ও রাস্তার ধূলায় একাকার করিয়া দিল।

আভারো

যে দুর্য্যোগের রাত্রে অণিমা তার গৃহে আশ্রয়হীন সন্ন্যাসীকে আশ্রয় দিয়াছিল, তার পরদিনের কথা এ। বিছানা হইতে উঠিয়া সম্মুখের জানলা দিয়া চাহিতেই গত রাত্রের সমস্ত কথা তার স্বপ্নের মত মনে পড়িল। কি সুন্দর সেই অপরাহ্নের মেঘজাল! আবার তার পরের সেই দুর্জ্জয় ঝটিকার রুদ্র-তাণ্ডবলীলা, সেও এক ভীমকান্ত সৌন্দর্য্যের ভীষণ সমাবেশ। মানব-জীবনের উপরেও ওই রকম স্বর্ণ-মেঘ সহসা কোন্ অতর্কিত মুহূর্ত্তে ঐরূপ বজ্রবাহিনী করালীরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহাকে বিধ্বস্ত বিত্রস্ত করিয়া দিয়া পুনশ্চ আবার এই রূপেই কমলা মূর্ত্তির শান্ত শোভায় সাজিয়া আসে। সে যে কার কতখানি লইয়া গেল, কাহাকে বা একেবারেই ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল এই প্রশান্ত পরিতৃপ্তির ভাব দেখিয়া কে তার ভিতরকার সেই ধ্বংসকারী প্রবৃত্তির পরিচয় লাভ করিতে পারে? অরণির ভিতরে অগ্নি যে কত বড় প্রচণ্ড ক্ষুধা লইয়া ধূমায়িত হইতেছে, তাহা তার সৌম্য মূর্ত্তি লক্ষ্যে কে বুঝিবে?

অণিমার রাত্রের সেই অদ্ভুত প্রকৃতির অতিথির কথা স্মরণ হইল। দৃঢ় পেশিযুক্ত শালপ্রাংশুভুজ, সুদীর্ঘ সবল অর্দ্ধনগ্ন কৃষ্ণমূর্ত্তি সামান্য একজন ভিক্ষুকমাত্র,—কিন্তু সেই প্রকাণ্ড শরীরটার মধ্যে সেই যে শিশু সরল বিশ্বাসে, ভক্তিতে, প্রেমে আনন্দে মাখামাখি মহৎপ্রাণটি সে যেন একটি অতুল্য সামগ্রী। এমন নির্ভরতা লোকে কোথায় পায়? কে শিখায়? শেখে না সঙ্গে আনে? কোথা হইতে আনে? সত্যই ও জিনিসটা কি নিত্য বস্তু? মানুষের মরণে কি মনোবৃত্তির বিনাশ বা বিলোপ হয় না?

অন্যমনস্ক অণিমা জানলা খুলিয়া গঙ্গাতীরে চাহিয়া দেখিল। সবুজ

ঘাসের উপর দিয়া প্রবল বৃষ্টিস্রোত গিয়া তাদের অঙ্গ হইতে সমুদয় মালিন্য নিঃশেষে ধুইয়া ফেলিয়াছে। গঙ্গাতীর সবুজ রংয়ের একখানা কার্পেট পাতার মতন দেখাইতেছিল। জলের অদূরে দু'এক ঝাড় শিয়ালকাঁটার গাছ হল্‌দে ফুল ও শুভ্রশিরস্ক সবুজ পত্রে বড় বেশী সাজন্ত হইয়াছে। অবহেলার বস্তুও সময়ানুসারে দ্রষ্টার দৃষ্টিতে পরিতৃপ্তির সুখ দিতে অক্ষম নয়। এ জগতে তুচ্ছ কি? যদি সত্যই তারা কোন এক অনুরাগী সৃষ্টি-কর্ত্তার হাতের সৃষ্টি হয়, তবে তাঁর হস্তপূত বালুকণা হইতে অভ্রভেদী হিমাচল কেহ কাহারও তুলনায় হেয় নয়। আর যদি এদের উপর কোন এক বিধাতৃশক্তির কার্য্য বর্ত্তমান নাও থাকে তথাপি স্বয়ং-সিদ্ধ-বিশ্ব তো ক্ষুদ্রতম অণুপরমাণু সংযোগেই এই বৃহত্তমরূপগ্রাহী,—একই উপাদানজাত হীরক-কয়লার এত প্রভেদ কি দর্শকেরই মনের বিকার? না তা তো নয়, এ জীবন্ত জাগ্রত বিশ্বকে কোন্ হিসাবে মায়া বলিব?

গঙ্গাতীরে নব জাগ্রত নরনারীর সমাবেশের প্রভাতাকাশ ধ্বনি মুখরিত। ভট্টাচার্য্যদের 'চ্যাটা বৌটা'র নিন্দায় সেদিন স্নানের ঘাট আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। অণিমা একবার উৎসুক নেত্রে গঙ্গাতীরের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত চাহিয়া দেখিল। সন্ন্যাসী নাই! পূর্ব্ব দিনের বৃষ্টির জলে নির্ব্বাপিত ধুনিটার অর্দ্ধ-দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডগুলির নিকট গাঁজার কল্কেটা অবহেলিত পড়িয়া আছে। উল্টানো নৌকাখানাকে টানাটানি করিয়া মাঝিরা তখন জলে নামাইতেছিল।

গাঁজার কল্কে দেখিয়া অণিমার বিশ্বাস হইল, হয় ত সন্ন্যাসী এখনও তাহার বাড়ীতেই আছে, ঘুম এখনও হয় ত ভাঙ্গে নাই। দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, 'পাগলা বাবা তো সেই রাতেই যেমন তুমি চ'লে এসেছ অমনি সেই ঝড়জল মাথায় ক'রেই বাড়ী থেকে বার হয়ে গেছে।' অণিমা এ সংবাদে কিছু বিষণ্ণ হইল। সে নিজে যাঁহাকে বিশ্বাস করিতে

পারে না, আর কেহ যথার্থ মনের সহিত তাহাকে মানিতেছে দেখিলে, সে তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিতই হইয়া উঠে। অবজ্ঞা করিতে পারে না।

সন্ন্যাসীর কথার প্রসঙ্গে অনেক কথাই সে ভাবিতেছিল, এমন সময় মৃণালিনী কলিকাতা হইতে ফিরিয়াই ভয়-চকিত ভাবে তার সন্ধানে সেই ঘরে ছুটিয়া প্রবেশ করিল। তার শাকবর্ণ মুখে আতঙ্কের ঘোর চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল! অণিমা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চাহিল,—"কি হয়েছে মিলি?" মৃণালিনীর সর্ব্বশরীর থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল, নিরুদ্ধশ্বাসে সে বলিয়া উঠিল,—"কালকের ঝড়ে একটা নৌকাডুবি হয়েছে, লোকে বলাবলি করছে মিঃ বসু—যামিনী বাবু নাকি ডুবে গেছেন।" মৃণালিনী কথা শেষ না করিয়াই দ্রুতপদে চলিয়া গেল। রমেন্দ্র নৌকা হইতে নামিয়া বাবুগঞ্জের ঘাটে যেখানে জনতা হইয়াছিল, সেই খানে চলিয়া গিয়াছিল। চাকরদের পাঠাইয়া দিতে মৃণালিনীকে বলিয়া দিয়াছে। জনশ্রুতিটা অস্পষ্টভাবেই তাদের কানে উঠিয়াছে, এখনও প্রকৃত ব্যাপার ঠিক বুঝা যায় নাই।

সহসা এ সংবাদে অণিমার জানু দুইটা ভাঙ্গিয়া পড়িল, গলা তার শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল। উপরে নীচে দক্ষিণে বামে সমস্ত কঠিন পৃথিবীটা যেন তরল বাষ্পের আকারে নেত্রপথ হইতে এককালে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হইয়া আসিতে লাগিল। রুদ্ধ-প্রায় কণ্ঠ হইতে ভাষাহীন কাতর আর্ত্তনাদ করিয়া সে যেন তার নিজের কানকে শুনাইতেই আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল,—"যামিনী বাবু ডুবে গেছেন! যামিনী বাবু মারা গেছেন!"

ঘরটা চলন্ত রেলগাড়ীর মত কাঁপিতেছিল, দম কমাইলে ঘড়ি যেমন চলিতে চলিতে থামিয়া যায়, বক্ষের স্পন্দন তেমনি করিয়া হঠাৎ কোন্ সময় থামিয়া গিয়াছিল। ঘূর্ণিত মস্তকে সহসা সে সম্মুখের টেবিলটা ধরিয়া

লজ্জার পতন হইতে আত্মরক্ষা করিল।

ডুবে গেলেন! অত বড় আশা, অত মহৎ প্রাণ,—একটা অসহায় শিশুর মত দুর্দ্দমনীয় তরঙ্গের প্রবল উচ্ছ্বাসে ক্লান্ত হয়ে চিরদিনের মত অস্তমিত হ'ল! কেউ বাঁচালো না? কেউ রক্ষা করলে না?—

সেও তো কাল নিশ্চিন্ত মনে ঘরের মধ্যে বসিয়া সেই সফেন তরঙ্গের প্রচণ্ড সংহার-লীলা দেখিতেছিল, সেও তো কিছু করে নাই? হয় তো মৃত্যু-যন্ত্রণার করুণ আর্ত্তনাদ তার ঐ জানালার উপরেও নিষ্ফল চেষ্টায় বারে বারেই আঘাত করিয়া গিয়াছে! অণিমা আর্ত্তভাবে সবেগে মাটিতে বসিয়া পড়িল। মিলি হয়তো ভুল শুনেছে,—হয়তো তাকে পাওয়া গিয়েছে,—হয়তো এখনও দেহে তাঁর প্রাণ আছে,—কে তাঁকে বাঁচাবে? সহসা মেঝের উপর হাঁটু ভাঙ্গিয়া বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধশ্বাসে সে ডাকিয়া উঠিল,—"জানি না যথার্থ কেউ আছ কিনা! লোকে এমন সব বিপদে যাকে ডাকে আমার পক্ষে তার স্থান যে শূন্য! বাবা! ও বাবা! এ আমার তুমি কি করে গেছ! এ কি অন্ধকারে আমায় ডুবিয়ে রেখে গেলে।"

তাঁর চতুর্দ্দিকে তখন প্রবল বেগে ভূমিকম্প হইতেছিল। ঘোর দুর্দ্দিনে সকল মানুষ—শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী নির্ধন—যে একমাত্র শেষ উপায় গ্রহণ করিয়া থাকে, যেন কার মন্ত্রবলে আজ নিজেরও অজ্ঞাতসারে সেই উপায়কেই সেও তো অবলম্বন করিয়া বসিল! তার সারা চিত্ত যেন তার সঙ্গে সেই ক্ষণে বিদ্রোহী হইতে চাহিল। তারপর সহসা তার দুই চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এতক্ষণের পর অসহনীয় যন্ত্রণা যেন সীমার মধ্যে ফিরিতেছিল। এই সময়ে বাহিরে কিসের একটা গোলমাল শোনা গেল। অণিমা উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত চিত্ত-বৃত্তিকে সমাধি-নিরোধের ন্যায় স্থির করিয়া শুনিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। কেবল চাকরদের কথা হইতে যামিনীপ্রকাশের নাম

পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইতে শুনিতে পাইল মাত্র। তবে কি সব সত্য? সত্যই কি যামিনী নাই। ভূমে মাথা ঠুকিয়া তার কাঁদিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। সে এই একটু মাত্র পূর্ব্বেই যে তাঁর উপর কত দোষারোপ করিয়া মনে মনে তাঁর পত্নীভীতির ধিক্কার দিয়াছে। বাহিরের দিকে আবার একটা শব্দ শুনিতে পাইল। এবার জুতা-পায়ের শব্দ। প্রথম পদশব্দটা চিনিল, সেটা রমেন্দ্রের। দ্বিতীয় শব্দটা পরিচিত মনে হইল বটে, কিন্তু ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। সে পায়ের যেন অত্যন্ত অনিচ্ছুক স্খলিত শিথিল গতি। এই সময়ে রমেন্দ্র কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমরা ভুল শুনেছিলুম, যামিনীর স্ত্রী নৌকাডুবিতে মারা গেছেন, যামিনী তখন নৌকায় ছিল না।"

দৈববাণীর মতই যেন কথা কয়টা অণিমার বক্ষের তুষারশীতল জমাট রক্তকে স্বাভাবিক উত্তাপ প্রদান করিল। আগন্তুকগণ এই ঘরেই প্রবেশ করিতেছে, মুহূর্ত্তে সে তার ভাঙ্গিয়া পড়া দুর্ব্বল দেহকে সচেষ্ট সচেতন করিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অবসন্ন স্নায়ুজাল যেমনি অতর্কিত নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, তেমনি তড়িৎ সঞ্চালনেই আবার তা প্রাণ-চঞ্চল হইয়া উঠিল। এবার নিজের সেই অভূতপূর্ব্ব ব্যবহার স্মরণ করিয়া অণিমা নিজেই যেন ঘোরতর বিস্ময় অনুভব করিল। সে এ কি করিতেছিল? এমন পাগলামি কেমন করিয়া তার মাথায় চাপিল? মনে করিতে আপনা-আপনি ঈষৎ একটু হাসিও ঠোঁটের গোড়ায় ফুটিতে চাহিল। ভাগ্যে মিলি তখন চলিয়া গিয়াছিল! দুর্ব্বল অক্ষম শিশু অন্ধকার দেখিলে যেমন সংস্কারবশে ভূতের ভয়ে রামনাম গ্রহণ করিতে করিতে আলোর দিকে ছুটিতে থাকে এবং আলোয় আসিয়া পৌঁছিলে এতক্ষণকার সাহস সেই রামনামকে যেমন তার আর প্রয়োজন হয় না, তেমনি ভয়ে মুহ্যমান দুর্ব্বলচিত্ত বিপদে পতিত হইলেই ঈশ্বরকে ডাকে। যেন তিনি তার

আজ্ঞাকারী ভৃত্য মাত্র,—কিংবা ভিজিট লওয়া ডাক্তার। সেও আজ তার নিদারুণ আতঙ্কের সময় আত্মবিস্মৃত হইয়া ঠিক যেন সেই রকমই একটা হাস্যকর অভিনয় করিল না কি? যার সঙ্গে কখন কোন পরিচয় ছিল না, হঠাৎ তাকে এত বড় আত্মীয় কেমন করিয়াই মনে করিয়া বসিল? আবার এও এক আশ্চর্য্য কাণ্ড! যামিনীবাবুর অলীক মৃত্যু-সংবাদ তাকে অমন করিয়া অভিভূত করিল কেন? যেন সেই মুহূর্ত্তে মনে হইয়াছিল সে নিজেই বুঝি অসহায় হইয়া ফুটন্ত নদীগর্ভের অতলস্পর্শে ডুবিয়া যাইতেছে। কই জীবনে কখনও তো সে এতখানি আত্মবিস্মৃত হয় নাই? যামিনী তার কে? কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে কষ্ট পাইতে হইল না। হৃদয়ের গভীর তলদেশের মধ্য হইতে বিবেকবুদ্ধি ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, তার আবার কে হইবে? তার দেশমায়ের সন্তান না? দেশের সুপুত্র না? এই না যথেষ্ট। দুর্ভাগা ভারতবর্ষ যাদের মুখের পানে একটু আশার চক্ষে চাহিতেছে, সে-ই যে তাহার আত্মীয়তর, আত্মীয়তম। আবার কে?—সে ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে পারে, প্রাণদায়িনী অন্নদায়িনী দেশমাতৃকাকে তো পারে না। যামিনী না হইয়া বালগঙ্গাধর তিলক হইলেও বোধকরি সে এমনই ব্যাকুল হইত।

রমেন্দ্র প্রবেশ করিল। তার পশ্চাতে,—এ কে এ? যামিনী না? অণিমা চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু উহার উপর দৃষ্টি পড়িতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইল। যামিনী জীবিত দেহ লইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু তার সমস্ত চেহারাটা এতই অদ্ভুত বিকল দেখাইতেছিল, জীবিত মানুষ বলিতেই যেন সন্দেহ জন্মে। গায়ে মাথায় ধূলা, জুতা ও কাপড়ে কাদা মাখামাখি, মুখের রঙ যেন সর্পাহতের মত নীল মাড়িয়া গিয়াছে। খুব পরিচিত লোকেও বোধ করি এখন তাহাকে দেখিয়া সহসা চিনিতে উঠিতে পারে না। অণিমা

নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া তার দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। ভাল মন্দ কোনও কথাই তার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

যামিনী গৃহে প্রবেশ করিয়া কোনদিকে না চাহিয়া অবসন্ন ভাবে একখানা কেদারার উপরে সজোরে বসিয়া পড়িয়াছিল, অণিমাকে সে হয় তো দেখিতেও পায় নাই। মাতালের মত তার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত তখন টলিতেছিল। রমেন্দ্র অণিমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "শিগগির একটু চা পাঠাও দেখি। প্রকাশকে আবার এক্ষুনি যেতে হবে।" যামিনীর নিদারুণ শোকে শোকাম্বিত মুখের দিকে একবার মাত্র মমতামথিত দৃষ্টিপাত করিয়াই অণিমা দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

উনিশ

যামিনীর বাড়িতেও ইতিমধ্যে এই দুর্ঘটনার সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। রান্নাঘরের উনান জ্বলে নাই, দাসী চাকরেরা কেহই বাড়ী ছিল না। সম্ভবত ঘাটে গিয়া ভিড় বাড়াইয়া থাকিবে, কাহারও কোন সাড়াটি না পাইয়া বিরক্ত চিত্তে যামিনীর পিসীমা নলিনীর 'মেলিন্‌স্ ফুড্' তৈয়ারী করিবার জন্য 'স্টোভ' জ্বালিয়া জল গরম করিতেছিলেন, ঘরের মধ্যে বিছানায় গায়ে ঢাকা দিয়া জরতপ্ত দেহে মাতৃহীনা নলিনী শুইয়াছিল।

দরজাটা নিঃশব্দে খুলিয়া অণিমা প্রবেশ করিল। নলিনী চোখ বুজিয়া ছিল, তাহাকে দেখিতে পায় নাই। সে তার শিয়রে বসিয়া ক্ষুদ্র কপালটি স্পর্শ করিল। গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে। নলিনী জাগিয়াই ছিল, তার মৃদু স্পর্শ সে জানিতে পারিল, চোখ মেলিয়া মৃদু স্বরে ডাকিল "বাবা!" ক্লিষ্ট মুখখানিতে হর্ষের একটি চঞ্চল রেখা লীলায়িত হইয়া উঠিল।

অণিমা তার সম্মুখে সরিয়া বসিল, গায়ে হাত দিয়া স্নেহ-স্বরে বলিল, "জেগে আছ? কেমন আছ নলিনী?"

"ভাল", বলিয়া বালিকা আবার ক্লান্তিতে চোখ মুদিল। তার পর আবার চোখ মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কোথায়?"

অণিমা তার রুক্ষ চুলগুলি কপাল হইতে সরাইয়া দিতে দিতে কহিল, "তিনি কাজে গেছেন, এখুনি আসবেন!"

নলিনী পাশ ফিরিয়া শুইল, "মা? মা বেড়াতে গিয়েছিল আর তো এলো না?" অণিমা চুপ করিয়া রহিল। সদ্য-মাতৃহীনা এই দুখের শিশুকে সে কি বলিবে? 'তার মা নাই',—এই নিষ্ঠুর কথা কেমন করিয়া বলিবে? অথচ এতবড় সত্যটাকে সমূলে চাপিয়া ফেলাও যে তার অভ্যাসের বিপরীত। সত্য—সে সত্য, সত্যের নিকটে ছোট বড় সামান্য অসামান্য কিছুরই তো প্রভেদ নাই। ক্ষুদ্র সত্য বলিয়া কোন জিনিসকে সে তো কোনদিন অবহেলা করিতে শিখে নাই। নলিনী তাকে নীরব দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া আয়তচক্ষে তার ব্যথিত মুখের দিকে চাহিল। ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিল, "মাসিমা!"

"বলো?"

"মা কই?"

অণিমার চোখ জলের আভাসে আর্দ্র হইয়া আসিল। [illegible] কঠিন কাজ। জীবনে শিশু-সঙ্গ তার ভাগ্যে কোন দিনই তো ঘটে নাই। শিশু-হৃদয়ের পুলক চাঞ্চল্য ও বেদনার আক্ষোভ যে কত সামান্যেই জাগিয়া উঠে, লজ্জাবতীর পাতার মত হাওয়ার স্পর্শে অবসাদে নুইয়া পড়ে, সূর্য্যালোকে পদ্মকলির মত মুহূর্ত্তে বিকশিত হয়, শুধু এইটুকু অভিজ্ঞতা নিজস্ব শৈশবস্মৃতির মধ্য হইতে লাভ করিয়াছে মাত্র। নতনেত্রে মাতৃহীনা মেয়েটির মুখের দিকে না চাহিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিয়া ফেলিল,—

"তোমার মা তো সব সময় তোমার কাছে থাকতেন না।" নলিনী পাশ ফিরিয়া শুইয়া নিশ্বাস ফেলিল, "মার্ জন্যে আমাল্ মন কেমন কল্ছে যে।" তার ঠোঁট দু'খানি ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, বালিশে মুখ গুঁজিয়া সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পিসিমার মেলিনস্ ফুড তৈরী হইয়া গিয়াছে কিন্তু ফুডের গুঁড়া ভাল মিশিয়া যায় নাই বলিয়া তাঁর উত্যক্ত চিত্ত উত্যক্ততর হইয়া উঠিয়াছিল, চামচ দিয়া তৈরী খাবারটুকু নাড়িতে নাড়িতে দাসী-চাকরগুলার আক্কেলের কথা ভাবিতেছিলেন, নলিনীর অস্ফুট কান্নার শব্দ কানে ঢুকিতেই সাড়া দিলেন, "কিরে ননী উঠেছিস ? কাঁদছিস কেন ?" বলিতে বলিতে মেলিনস্ ফুডের বাটি কাপড়ের বেড়ের উপর বসাইয়া চামচ দিয়া নাড়িতে নাড়িতে আসিয়া অণিমাকে দেখিয়া ঈষৎ বিস্মিত ও অনেকখানি আনন্দের সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি এসেছ মা। এতবড় বিপদ, একটা জনমনিষ্যির দেখা পর্য্যন্ত নেই। একলা মানুষ কোন্ দিকে যে কি করি। অমলারাও এখানে নেই।"

অণিমা উঠিয়া তাঁকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। ব্যস্ত হইয়া পা সরাইয়া লইয়া পিসিমা বলিয়া উঠিলেন, "আহা, থাক মা থাক, অমনই আশীর্ব্বাদ করচি আমি। ননী, ক্ষিধে পেয়েছে রে ?"

নলিনী ঠাকুরমার সাড়া পাইয়া চুপ করিয়াছিল। জামার হাতে চোখের জল মুছিতে মুছিতে মুখ লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া ঘাড় নাড়িল, "না।" দুঃখে গলা ধরিয়া রহিয়াছে তাই কথা বলিতে পারিল না। মা কাল তাহাকে মারিয়া ধরিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, তার পর আর ফিরিয়া আসিলেন না। এ ঘটনা কিছু নূতন নয়। প্রতিবারই কলিকাতা যাওয়ার সময় বা অন্য কোথাও নিমন্ত্রণ যাত্রার সময় সে যাইবার জন্য আব্দার ধরিলে কিংবা কোন রকমে তাঁকে বিরক্ত করিয়া ফেলিলে মা ই কাণ্ডই করেন। তবে এবার সঙ্গে সঙ্গে ঝড় ওঠা ও বাড়ীতে ভয় ভাবনা,

সব্‌বার উপর পিতার ব্যস্ত ব্যাকুল ভাবে গভীর দুর্য্যোগের মধ্যেই বাড়ী-ছাড়া, এই সমস্ত মিলিয়া তার ক্ষুদ্র চিত্তে একটা অনির্দ্দেশ্য ভীতি সঞ্চার করিয়াছিল। গত রাত্রেই তার জ্বর আসে। সকালবেলা এই ঘরের মধ্য হইতেই সে শুনিতে পাইতেছিল, বাড়ী সুদ্ধ লোকেরা কি যেন তার মার কথাই বলাবলি করিতে করিতে দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায় গেল, দিদি?" পিসিমা সুসঙ্গতার স্বেচ্ছাকৃত পাপের এতবড় প্রায়শ্চিত্ত সত্ত্বেও তার প্রতি আক্রোশ ভুলিতে পারেন নাই, ঝাঁঝিয়া বলিলেন, "মার কথা আর বলো না বাছা! বাছাকে আমার বিয়ে হ'য়ে পর্য্যন্ত হাড়ে নাড়ে জ্বালিয়েছেন, মরেও তেমনি করেই জ্বালালেন! এই দুর্যোগটা তার কোথা দিয়েই যে কাটুলো।"

"অ্যাঁ। মা মলে গেছে?" বলিয়া নলিনী বিছানায় উঠিয়া বসিল। মৃত্যুকে সে তেমন করিয়া না চিনিলেও সে যে একটা ভয়ানক কিছু, একদিন প্রতিবেশী-গৃহের মৃত্যু-ক্রন্দনের মধ্যে সে সম্বন্ধে সে ঝিয়ের কাছেই একটু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। শুনিয়াছিল মানুষ মরিয়া গেলে আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। সে ক্রন্দনের উপক্রম করিল,—সৌদামিনী দেখিলেন, মাতৃহীনা মেয়েটির উপর তিনি নিজের বিরক্ত চিত্তের জ্বালায় জ্বলিয়া বড় বেশী অবিচারের আঘাত করিয়া ফেলিয়াছেন। সাম্‌লাইয়া লইলেন, "না না, কে বল্লে ম'রে গেছে। মা তোমার কলকাতা গেছে যে, তোমার দাদামশায়ের অসুখ কিনা, তাই আবার কালই ফিরে গেল, তোমাকে দেখে। কান্নাকাটি ক'রো না, লক্ষ্মী মেয়ে, চুপটি ক'রে শুয়ে ঘুমোও।" নলিনী বড় শান্ত মেয়ে, মনের মধ্যে সান্ত্বনা না পাইলেও সে দিদির কথায় বিশ্বাস করিবার চেষ্টা করিয়া পাশ বালিস জড়াইয়া শুইয়া রহিল। তারপর কোন সময় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

সৌদামিনী তপ্ত বাটিটা নামাইয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। সারা-

রাত্রি অনিদ্রায় ও দুর্ভাবনায় কাটিয়াছে। বুড়ো মানুষ, ক্লান্তিতে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আঁচলে চোখ রগড়াইয়া হাই তুলিয়া তন্দ্রাটা ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, "উঠে ব'সে চায়ে চে ছিঁয়ে একটু একটু ক'রে খা, অনেকক্ষণ তো কিচ্ছু খাস্‌নি।" নলিনী চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিল।

অণিমার দিকে চাহিয়া সৌদামিনী কহিলেন, "কি কাণ্ডটাই হয়ে গেল! বৌটি ঘরে এসে পর্য্যন্ত একটি দিনও ভাল কাট্‌লো না। এরা সব কোন কিছুই তো মানে না, এ যদি আমার মায়ের আমল হতো—অপয়া বৌ ব'লে তিনি কোন্ দিন বৌকে শান্তি-স্বস্তেন ক'রে শুধ্‌রে নিতেন।"

অণিমা চুপ করিয়া রহিল। শান্তি-স্বস্ত্যয়নের মহিমা তার জানা নাই এবং বিশ্বাসও হয়ত বা ছিল না।

সৌদামিনী বলিতে লাগিলেন, "এখনও যদি মিটে থাকে তাহ'লেও তো বুঝি। বাছা আমার যে কি করে ভাল থাকবে সেই ভেবেই হৃৎকম্প হচ্চে! সেই দুর্যোগ যাতে একটা জীবজন্তু খোঁয়াড়ের বার হয় না, বাছা আমার সারা রাত্তির তাইতে ঘাট আর ঘর ক'রে বেড়িয়েছে। অতি বড় শত্তুর এসেছিল ওর।"

মৃতার প্রতি অবিচারের করুণায় অণিমার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিতে ছিল। আহা, যে জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে—সাধের সংসার ফেলিয়া অমন দেবতার মত স্বামী এই স্নেহের পুতুল শিশু-কন্যা এ সব ছাড়িয়া নিষ্ঠুর কষ্টকর মরণে জগৎ হইতে যে এত অকালে চিরবিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছে, তার সেই অস্ফুটন্ত বিকাশের নিদারুণ স্মৃতি কি এমনই করিয়া, এরই মধ্যে তিরস্কারপূর্ণ অভিযোগে বিচারিত হইবার যোগ্য? সে যাই হোক্, সে যাই থাক্, তবু আর তো সে আসিবে না! এতক্ষণে হয়ত তার ভস্মীভূত দেহের অণু-পরমাণুটুকু পর্য্যন্ত তাদের উৎপত্তি-উপাদানে বিলীন হইয়া নিশ্চিন্ত হইল।

সৌদামিনী দু' একবার কথা জমাইবার চেষ্টা করিয়া তার নীরব ঔদাসীন্তে অপ্রসন্ন মনে থামিয়া গেলেন। মনের ঝালটা বাহির করিতে না পারিয়া মন তাঁর একান্ত ভারী হইয়াই রহিল। অন্তর্বাষ্পের শক্তিতে জগতে অসাধ্য সাধন চলিতেছে, সেই শক্তি মানবচিত্তের মধ্যে যদি পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে, তবে তার দ্বারাও তেমনি সাধারণাসাধ্য কার্য্য সম্পাদিত না হইবে কেন—কিন্তু ষ্টীমের যে শক্তি প্রকাণ্ডকায় রেলগাড়ীকে সহস্র আরোহী-সমেত বহন করে তাহারই অতিরিক্ত প্রয়োগে তাহা আবার বিপ্লবও সংঘটিত করিয়া বসে। মানুষের মনের মধ্যেও প্রাকৃতিক শক্তি ঠিক এই হিসাবেই কাজ করে। সৌদামিনীর মনের হতাশামিশ্রিত ক্রোধ অণিমার নিকটে কথঞ্চিৎ বাহির হইতে পারায় তাঁর বুকের ভিতরের আলোড়ন কতকটা কমিয়া আসিলেও এর সহানুভূতিহীন মৌনতায় সম্পূর্ণরূপে থামিল না। 'মনে মনে ঈষৎ অপ্রসন্ন হইয়া ভাবিলেন, 'মেয়েটির সব ভাল, কিন্তু বড্ড মুখচোরা বাছা! মুখে একটা রা' নেই, এ কেমন লেপাপড়া-জানামেয়ে!

অণিমাও এখানে আসিয়া নিজেকে বিপন্ন বোধ করিতেছিল। আসিয়াছে যখন হঠাৎ ফিরিয়া যাওয়া যায় না, অথচ সমস্ত দিনটা পরের বাড়ী চুপচাপ বসিয়া কাটানো তার পক্ষে কষ্টকর কম নয়। না পারে সে ছেলে ভুলাইতে, না জানে বৃদ্ধার মন-রাখা আলোচনায় যোগদান করিতে। চিরটা কাল কাব্য-সাহিত্য, রাজনীতি এবং দর্শন ঘাঁটিয়াই সে যে দিন কাটাইয়াছে, সমাজ সম্বন্ধে ঔদাসীন্ত শুধু তারই নিজস্ব ব্যক্তিগত গুণ-দোষ নয়—এ তার পিতৃশোণিতের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। সৌদামিনী তাকে সাক্ষী মানিয়া সন্তোমৃতা বধূর সম্বন্ধে বিরক্তিপূর্ণ কঠোর মন্তব্য করিতে করিতে ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্ত চিন্তা বিলাপ করিতেছিলেন—এবার ফিরিয়া আসা দাসদাসীদের তিরস্কারান্তে তাদের সাহায্যে খাওয়া-দাওয়ার উদ্যোগ আয়োজনে ব্যাপৃত

হইয়া এতক্ষণে একটু শান্ত হইতে পারিলেন। প্রতিবেশীদের ভিতর দু'তিন ঘর উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু। তাঁদের এক ঘর ছাড়া অন্যেরা কোন সুখ-দুঃখে এই ব্রাহ্মপরিবারের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না। কান্তিভূষণের নিকট উপকার তাঁরা প্রয়োজনানুসারে লইতে কুণ্ঠিত হন নাই, এখনও দরকার পড়িলে অনেকেই যামিনীর নিকট ছুটিয়া আসেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আদান ভিন্ন প্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করাও যে ন্যায়সঙ্গত, এই সাধারণ বোধটা তাঁদের মাথায় কখনও প্রবিষ্ট হয় নাই। পল্লীগ্রামে বিলাতফেরৎ বা ব্রাহ্ম ঘরের মেয়েদের সম্বন্ধে এমনই একটা অসাধারণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়া আছে, যে গৃহস্থ মহিলারা তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার চেষ্টা করিয়াও দেখেন না, যে তাঁদের ধারণাটা সর্ব্বত্র সমূলক কি না। মূর্খ গ্রাম্য-নারী যে শিক্ষিতা মেয়েদের নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্রী হইয়া থাকে, এই সহজ বিশ্বাসটুকুই খুব সম্ভব তাঁদের পরস্পরের মেলামেশার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না, মানব-চরিত্রের যে দুর্ব্বলতা সেটা সমাজগত বা ধর্ম্মগত নয়, সেটা তাদের ব্যক্তিগত। অনেক লেখাপড়া-শেখা মেয়েকে যেমন গর্ব্বান্ধ দেখা যায়, তেমনি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেও তো সেরূপ দুর্ব্বল প্রকৃতির অভাব নাই। তাই ধরিয়া বিচার করা উচিত নয় যে, শিক্ষিতা মেয়েরা অশিক্ষিতাদের সহিত শ্রেণী হিসাবেই সহানুভূতিহীনা ও অন্য জগতের অপাংক্তেয় অপরিচিত জীব।

এই রকম বিশ্বাস একটা তো আছেই,—তার উপর এখানে তাদের বিশ্বাসটা ভিত্তিহীনও তো নেহাৎ ছিল না। বাস্তবিকই সুসঙ্গতা ভুলিয়াও কখন গরীব প্রতিবেশীদের উপর এতটুকু সহৃদয়তা দেখায় নাই। এখানকার অনেক ধনী পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা ও হৃদ্যতা কিছু কিছু ছিল, কিন্তু ময়লা কাপড়-পরা জ্যাকেট-সেমিজ-বিহীনা গরীব প্রতিবেশিনীদের কেহ কখনও বাড়ী আসিলে সে অবজ্ঞায় ভাল করিয়া

তাদের পানে চাহিয়াও দেখিত না এবং কেরাণী-টেরাণীদের স্ত্রীদের সঙ্গে কথা কহিতে ঘৃণা হয়, এ কথা সে সগর্ব্বে ও প্রকাশ্যে বলিতে কুণ্ঠিত-মাত্র হইত না। বরং আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করিত। এ জন্য সমবয়সীদের মধ্যে বড় একটা কেহ এ বাড়ীতে আসিত না। তবে সৌদামিনীর সরল সৌজন্যে মুগ্ধ দুই একটি প্রৌঢ়া কখনও কখনও দুপুরবেলা নাতি-নাতিনী কোলে লইয়া খিড়কি দরজা দিয়া ঢুকিয়া তাঁর ঘরে আশ্রয় লইত। সুসঙ্গতার প্রতি তাদের কোন সহানুভূতি তো ছিলই না বরং পরস্পরের মধ্যে একটু যেন বিদ্বেষভাবই বর্ত্তমান ছিল। এই সেকেলে-ভাবাপন্ন বৃদ্ধা পিস্‌শাশুড়ীটির প্রতি সুসঙ্গতার চিত্ত প্রসন্ন ছিল না। এই সব পাড়ার বুড়ীগুলোকে লইয়া তাঁর জটলা করা সেই জন্যই তার আরও চক্ষুশূল হইয়াছিল। সে জানিত এই মাধ্যাহ্নিক আলোচনায় বধূবর্গের প্রতি বিশেষ করিয়াই আক্রমণ হইয়া থাকে এবং সে-ও তার মধ্য হইতে বাদ পড়ে না।

আজ সৌদামিনী আশা করিয়াছিলেন তাঁর প্রতিবেশিনী সঙ্গিনীদের মধ্যে কেহ না কেহ এতবড় বিপদে সহানুভূতি দেখাইতে আসিবে কিন্তু যখন সমস্ত আকাশটাকে স্বর্ণ-রেণুতে সোনামাখা করিয়া তুলিয়া সূর্য্য অস্তে চলিয়া গেলেন এবং পিছন দিককার পোড়ো আমবাগানের মধ্যে শৃগালগুলা প্রথম প্রাহরিক কর্ত্তব্যহিসাবে তারস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিল, তখন তাঁর প্রতীক্ষিত চিত্ত হইতে প্রতীক্ষার আশা নিঃশেষ হইয়া গেল। অণিমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখলে তো মা, সব্বার কি আক্কেল! হ্যাগা মানুষের বিপদ দেখলে যদি পিছিয়ে যাবি, তবে ভালর দিনে কি শুধু গল্প করবার জন্যে লোকের সঙ্গে ভাব করা? আমি হ'লে তো এমন করতে পারতুম না।" অণিমা ঈষৎ চিন্তিতভাবে তাঁর পানে একবার চকিত চক্ষে চাহিয়া দেখিল। লোকের সহানুভূতি? সে জিনিষটা এমন কি ভালো? মনে পড়িতেছিল সে একদিন অযাচিত করুণা ও অপ্রার্থিত

সহানুভূতির চাপে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল এবং তার পক্ষে সেটা এত অসহনীয় হইয়াছিল, যে সে কাতর হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ নিজের মনে বলিয়াছে, "কবে এরা আমায় ছেড়ে দেবে ?" মৃত পিতার উদ্দেশ্যে অশ্রু-প্লাবিত নেত্রে ব্যাকুল হইয়া বলিয়াছে, "যদি শুনতে পেতে, যদি দেখ্‌বার উপায় থাকৃত, যদি তুমি কোথাও থাকৃতে তবে আমার এ কষ্ট তুমি কখনও সইতে পারতে না।" সেই সহানুভূতি, সে জিনিষটা কেহ যাচ্ঞা করিয়া লইতে চাহে ?

যামিনী যখন বাড়ী ফিরিল তখন একেবারেই বেলা নাই। সান্ধ্য আকাশে আলোকদীপ্ত তারকা লহরে লহরে হীরার হারের মত ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। ডাক্তার আসিয়া নলিনীকে দেখিয়া প্রেস্‌ক্রিপশন বদলাইয়া দিয়া গিয়াছেন, এখন জ্বরটা খুব কম। উঠিয়া বসিয়া গোটাকতক কাঁচের পুতুলকে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরায় বউ সাজাইয়া সে একাই বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে খেলা করিতেছিল। চঞ্চলার ছোট বোনটি এতক্ষণে কয়েকটি পুতুল লইয়া তার সঙ্গে খেলিতে আসিয়াছে। তাকে অবশ্য এ বাড়ীতে আসিতে বারণ করা হইয়াছিল, হয়ত অশৌচাচার এরা মানে না, কি যে করে তা কে আর দেখিতে গিয়াছে ! সৃষ্টি হয়ত একশা করিয়া রাখে।

যামিনী আসিয়া প্রথমেই নলিনীর ব্যগ্র আলিঙ্গনে নিজেকে নীরবে সমর্পণ করিয়া দিয়া তাহাকে গভীর স্নেহের সহিত নিবিড় ভাবে বুকে বাঁধিয়া চুম্বন করিল। দুই হস্তে তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বুকে মুখ রাখিয়া নলিনী ডাকিল, "বাবা !" "নেল্‌ !" "বাবা তুমি এত দেরী করলে কেন ? আমার যে বড্ড ভয় কচ্ছিল—" নলিনীর ছোট্ট বুকখানাতে আবার যেন হঠাৎ কান্না ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

যামিনী তার সারা মুখে—মাথায় পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে করিতে

বুকের খুব কাছটিতে তাহাকে টানিয়া আনিয়া মৃদু গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল, "কাজ ছিল যে নেল্।" তারপর হঠাৎ অণিমার দিকে নজর পড়িতে মেয়েকে ছাড়িয়া দিয়া ঈষৎ মাথা নোয়াইয়া বলিল, "আপনাকে দেখতে পাইনি—" অণিমাও মাথাটা একটু নীচু করিয়া কপালে হাত দুটি ঠেকাইয়া প্রতি-নমস্কার করিল। তারপর সহানুভূতিপূর্ণ করুণার সহিত সঙ্কুচিতভাবে তার শোকক্লিষ্ট ও দুশ্চিন্তা-ক্লান্ত মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল। কি অপরিচিতই না তাহাকে দেখাইতেছে!

নলিনী পিতার গায়ে হাত দিয়া ডাকিল,—"বাবা!"

পিতা আবার তার কপালের তাপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এখন জ্বর নেই বোধ হচ্ছে। ডাক্তার এসেছিলেন?" অণিমার দিকে না চাহিয়াই সে কথাটা বলিল, তথাপি প্রশ্নটা তাহাকেই যে করা হইল তাহাতে তো সন্দেহ ছিল না।

"এসেছিলেন, এই ওষুধটা বদলে দিয়ে গেছেন। জ্বর তখন সামান্য একটু ছিল, এখন নর্ম্মাল হয়ে গেছে।" এই বলিয়া একটি ঔষধের লেবেল-মারা শিশি শেল্‌ফের উপর হইতে উঠাইয়া আবার যথাস্থানে স্থাপন করিল। একটু আগেই এক দাগ খাওয়ানো হইয়া গিয়াছে।

নলিনী আব্দার করিয়া বলিল, "ও ওষুধ বড্ড তেতো, ও আমি আর খাবো না।" কন্যাকে সস্নেহে আদর করিয়া যামিনী বলিল, "লক্ষ্মী মেয়ে যে তুমি।—দুষ্টু মেয়ের মতন ওষুধ খেতে কি আব্দার করে?" নলিনী আর কিছু না বলিয়া পিতার কোল ঘেঁষিয়া তার গায়ে হেলিয়া রহিল। প্রতিবেশীর যে মেয়েটি বাড়ীর লোককে লুকাইয়া আসিয়াছিল, যামিনী ঘরে ঢুকিবামাত্র সে নিজের পুতুলগুলি গুছাইয়া লইয়া আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মবাড়ীতে মৃতা বধূর উদ্দেশে কোন রকম নিয়ম অনুষ্ঠান হইবে

কি না, সে বিষয়ে হিন্দু প্রতিবেশিনীগণের মনে বিশেষ করিয়া একটা সংশয় ছিল। হয় ত গোবরছড়া দেওয়া, হাঁড়ি ফেলা, স্নান করা—এ সব অবশ্য-কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানের মধ্যে কিছুই এরা করিবে না, এই ভয়েই যে সৌদামিনীর প্রতিবেশিনীরা তাঁর বিপদে এ বাড়ীতে উঁকি দিতেও আসেন নাই, তাহা বোধ হয় বলা বাহুল্য এবং এই জন্যই দত্তগিন্নীর ছোট নাত্নী তরুবালা তার রাঙা দিদির বার বার নিষেধ সত্ত্বেও খেলার লোভে নলিনীর কাছে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু নিতান্ত ভয়ে ভয়েই ছিল।

যামিনী নলিনীর রুক্ষ চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে মুখ না তুলিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আপনি আমাদের জন্যে অনেক কষ্ট করেছেন—" কথা শেষ করিয়া সে তার মুখের দিকে চাহিল। অণিমার দুই নেত্র করুণায় ভরিয়া উঠিয়াছে, সামনের ল্যাম্পের আলো পূর্ণ প্রকোপে তারই উপর পড়িয়াছিল। যামিনী মুখ তুলিতেই তার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিলে অণিমা অপ্রতিভ ভাবে দৃষ্টি নত করিল। কুণ্ঠিত স্বরে কহিল, "এ কেন মনে করছেন? কিছুই তো করিনি।"

যামিনী ক্লান্ত স্বরে কথা কহিল, মনে হইল সে যেন আর কাহারও কণ্ঠ-স্বর, বলিল, "রমেন যা করেছে নিজের ভাই থাকলে এর বেশী পারে না। আর মিসেস রায়ও সারাদিন ধরে যত লোক এসেছে—পুলিস অফিসার সব্বাই-এর জন্য চা খাবার সমস্ত জুগিয়েছেন। তা ছাড়া—" শেষ কথা সুসঙ্গতার শোচনীয় পরিণামের শেষ সমাপ্তির সহায়তার কথা তার মুখ দিয়া আর বাহির হইল না। উঃ, কি অসহনীয় দৃশ্য! সেই একান্ত সুখাভি-লাষিণীর সযত্নসজ্জিত প্রসাধিত দেহ তার কর্দ্দমাক্ত করুণমূর্ত্তি লইয়া কি অসহ্যই না হইয়া উঠিয়াছিল।

যামিনী আসিয়াছে খবর পাইয়া পিসিমা শশব্যস্ত হইয়া আসিলেন। ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"আহা বাছা আমার এক দিনের কষ্টেই

যেন আধখানি হয়ে গেছে গো! এমনও শত্তুর এসেছিল—" যামিনী নন্দিনীকে দেখাইয়া তাঁহাকে থামিবার ইঙ্গিত করায় ঈষৎ লজ্জিত ভাবে থামিয়া গিয়া মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "এসেই মেয়ে নিয়ে বসলি কেন, খাবি চল, কাল থেকে তো খাড়া উপোসী রয়েছিস।" আবারও যামিনী অসন্তোষপূর্ণ নিষেধের ইঙ্গিত করিল। পিসিমা সে দৃষ্টিতে সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন। "মনেও থাকে না ছাই!"—কিন্তু মেয়ের কানে শব্দটার আঘাত এড়াইল না। সে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া বলিল, "এঁ্যা বাবা! তুমি তাল থেকে কেন খাওনি, তোমালও কি আমাল মতন অসুখ তলেছে?" যামিনী তাহাকে আদর করিয়া মৃদু নিঃশ্বাসের সহিত উত্তর দিল, "হ্যাঁ মা!" তারপর তাহাকে ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া পিসিমার দিকে চাহিয়া বলিল, "রমেন আমায় যা খাওয়াবার খাইয়েছে, আর কিছু আমি খাবো না। উঃ, ঘরটা বড্ড গরম।" সত্য সত্যই জানালা-দরজাবন্ধ রোগীর ঘর সুস্থ অথচ যে পূর্ণরূপে সুস্থ নয়—তার পক্ষে অসহ্য গরমই হইয়া উঠিয়াছিল।

সৌদামিনী বলিলেন, "যা না একটু বাইরে বস্‌গে যা। আমি ননীর কাছে থাকি। তুমিও যাও মা! আহা ভাগ্যে তুমি এসেছিলে মা, নইলে এই রোগা মেয়ে নিয়ে একা এই নির্ব্বান্ধব পুরীর মধ্যে সারা দিনটাই কাটানো দায় হতো। বড্ড ভাল মেয়ে তুমি।"

বিহঙ্গিনীকে পিঞ্জরে পুরিলে যেমন হয়, এই বদ্ধ গৃহে সারাদিন থাকিয়া অণিমার স্বাধীন চিত্তও তেমনই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। পিঞ্জরের পাখীকে পিঞ্জর হইতে মুক্ত করিয়া দিলে সে যেমন আনন্দ-কৃতজ্ঞতায় দ্বিধা-হীন চিত্তে তৎক্ষণাৎ খোলা আকাশে ছুটিতে চাহে,—তেমনি করিয়া সে দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়াই যামিনীকে অনুসরণ করিল। গাড়ী-বারান্দার সম্মুখে অণিমাকে বসিবার জন্য একখানা চৌকি সরাইয়া দিয়া যামিনী নিজে কাঠের বেঞ্চখানার উপরে বসিল, অণিমা বসিল না। সে চৌকি ধরিয়া চুপ

করিয়া দাঁড়াইয়া একবার বাহিরের পানে উৎকণ্ঠিত ভাবে তাকাইয়া দেখিল, হয়ত দেখিল তার অপরাহ্ণে-ফেরত-দেওয়া গাড়ী এখন পুনরাগমন করিয়াছে কি না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছিল। চাঁদ না উঠাতে রাস্তার ওপারের ঘেঁটু ও কালকাসন্দা বনে ইতোমধ্যেই অন্ধকারের পূর্ণ আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বিষণ্ণ সন্ধ্যায় জনহীন স্থান যেন আজিকার দুর্ঘটনার শোকে সমাচ্ছন্ন থাকিয়া অধিকতর ও বিষণ্ণতর মূর্তিতে এদের কাছে দেখা দিয়াছে। মানব-জীবনের নশ্বরতাই শুধু নয়, সেই সঙ্গে এই বিশ্বের পর্য্যন্ত লয়-সংবাদ দিবার জন্যই যেন জীবিত চিত্তের নিদারুণ দৈন্য মৃত ব্যক্তির সকরুণ স্মৃতিতে পরিষ্কার রেখায় মানুষের মনের মধ্যে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে যামিনী বলিল, "কতটুকু সামান্য একটা ঘটনার উপরেই মানুষের জীবনের গতি, মানুষের সমস্ত লাভ-লোকসান নির্ভর করে থাকে!" তার কণ্ঠে বিষাদ ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া স্তব্ধ সন্ধ্যার নিস্তব্ধতাকে যেন নির্ম্মম একটা বেদনার আঘাত প্রদান করিল।

অণিমা তার মুখের দিকে বিষণ্ণ নেত্র তুলিয়া চাহিল। সেও এই ধরণেরই কোন একটা কথা হয়ত ভাবিতেছিল। সদ্যোমৃতা সুসঙ্গতার স্মৃতিটা আজ যেন তার গৃহে এবং গৃহবাসীদের মনের মধ্যে একটা কণ্ঠ-বিদীর্ণ ত্রস্ত বিহঙ্গের মত পক্ষপুট সঞ্চালন করিয়া ফিরিতেছে, একটা অসুখী প্রেতযোনির মত অঙ্গে অঙ্গে অজ্ঞাত শিহরণ আনিয়া নিঃশব্দ লঘু চরণে যেন এদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দু'জনেই আবার চুপ করিয়া গেল। সান্ত্বনার বাণী মুখে আনিয়াও তাহা উচ্চারণ করিতে অণিমা একান্ত কুণ্ঠিত হইতেছিল। সেই একঘেয়ে বাঁধা গৎই তো,—যা ইতিপূর্ব্বে কত লোকে কত বারই না বলিয়া গিয়াছে। সেই সব সাধারণ কথাই তো বলিতে হইবে? কি হইবে তা বলিয়া?

তার অন্তরে করুণা কাঁপিতেছিল। পার্শ্ববর্ত্তী সঙ্গীর হৃদয়ের গভীর শোকের কষ্টকর স্মৃতিতে চিত্ত ভরিয়া বেদনার সহিত সুগভীর সহানুভূতি নীরব নিস্তব্ধ রজনীর অনিবৃত্ত ঝিল্লীস্পন্দনের মত হৃদয়ের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ধ্বনিত ও রণিত হইতেছিল কিন্তু হৃদয়ের এই ক্লান্ত করুণার আবরণে তাদের কথোপকথন মৃদুতর হইয়াই রহিল।

সে রাত্রে বাড়ী ফিরিলে মৃণালিনী আসিয়া নলিনীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল, যামিনীকে তাহারা স্নানের পর কিছু আহার করাইয়া পাঠাইয়াছে, সে সংবাদটা অযাচিত হইয়াই প্রদান করিয়া মন্তব্য করিল, "প্রকাশবাবুকে প্রথমে বড়ই কাতর মনে হয়েছিল, এবেলা দেখলুম বেশ একটু যেন সামলে নিয়েছেন। স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁর হয়ত খুব বেশি শোক লাগেনি।" অণিমা সমস্ত পথটা গাড়ীর মধ্যে অন্ধকারে বসিয়া এই কথাটাই ভাবিয়া আসিয়াছে। হঠাৎ অন্যের মুখে সেই কথাই শুনিয়া একটু চমকিত হইল। অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কথার উপর একটু জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, "না, না, খুবই লেগেছে। বাইরে ঘটা করে সেটাকে প্রকাশ করাটা তিনি দুর্ব্বলতা দেখানো মনে করেই অমন করে চুপচাপ আছেন।—না না, মিলি! মনে ওঁর খুবই লেগেছে।" মিলি একটু অবজ্ঞার সহিত মাথা নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ, একেবারেই যে লাগেনি তাই কি আর আমি বলচি, তবে যতটা লাগা উচিত ছিল, ততোটা নয়। দু'জনের [illegible] মনের মধ্যে একটুও মিল ছিল না। একেবারে স্বভাবে পোল-টু-পোল ফারাক ছিল তো।"

অণিমা একটু চিন্তিত ভাবে মিলির কথা শুনিতেছিল কিন্তু হঠাৎ সে উত্তেজিত হইয়া সবেগে বাধা দিল, "ওঁকে অতখানি অবিচার করো না মিলি! নাই বা থাকলো মনের মিল, তবু স্ত্রী তো। প্রায় পাঁচ বছর

বিয়েও হয়েছিল। আর এমন শোচনীয় মৃত্যু, কষ্ট হয়নি, কি বলিস তুই।"

মৃণালিনী হাসিয়া বলিল, "পুরুষ চরিত্র তুমি যা' চিনেছ! এই আমি ব'লে রাখলুম, ছ'মাস না যেতে যদি প্রকাশবাবু আর একটা বিয়ে না করেন তো,—আমার নাম আমি বদলে ফেলব।"

কথাটা বড়ই নিষ্ঠুর! এখনও এক অহোরাত্র অতীত হয় নাই, যার স্ত্রী মরিয়াছে; শুধু মৃত্যুই নয়, সে কি শোচনীয় বিষাদজনক অপমৃত্যু,—এখনও সেই দুর্দ্দাম ঝটিকার ভীম গর্জ্জনের মধ্যে যার অসহায় আর্ত্ত চীৎকারের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ওই শব্দবহ আকাশের বায়ু-প্রবাহে মিশ্রিত হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে—গভীর স্তব্ধ শ্মশানভূমে এখনও গিয়া খুঁজিলে যার শেষ ভস্ম-চিহ্নটুকু ধরণী অঙ্কে প্রলিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তার স্বামীর হৃদয় সম্বন্ধে এমন দৃঢ় করিয়া শপথ লওয়া, এটা নিজেরই নিষ্ঠুর দুর্ব্বলতা। সে একটু ভর্ৎসনার ভাবে তার দিকে ফিরিয়া কহিল, "কক্ষনোই তা' করবেন না, দেখিস। প্রকাশবাবু সাধারণের মত লঘু প্রকৃতির লোক মোটেই নন।" এইটুকু বলিয়াই সে হঠাৎ আহত ভাবে মুখ ফিরাইয়া লইল। তার মনে তাঁর আদর্শ কতখানি উচ্চ, লোকে হয়ত তা' বুঝিতে পারিবে না, এই কথাই তার মনে হইল। কি লাভ তর্ক করিয়া?—

মৃণালিনী তার দিকে অত্যন্ত কৌতুকের সহিত চাহিয়া গোপন অর্থযুক্ত একটুখানি চাপা হাসি হাসিয়া মনে মনে বলিল, "তোমার তার জন্যে এত মাথা ব্যথা কেন গো?" প্রকাশ্যে আত্ম-তিরস্কার করিয়া বলিল, "বেশ বাজে কথা নিয়ে বসলুম তো আমি। আয় ভাই রাত হয়ে গেছে, খাবি আয়। প্রকাশবাবু বিয়ে করুন, বিপত্নীক থাকুন, তা'তে আমাদের কি এলো গেল।"

আহারাদি সারিয়া যখন সে তার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে। মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া অতি ক্ষীণ একটি

জ্যোৎস্না-রেখা গৃহতলে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। গঙ্গায় জোয়ার আসিয়াছে, কুলু কুলু ধ্বনি করিয়া জল জানালার তলায় বহিয়া চলিয়াছে। সলিল-স্নিগ্ধ-বাতাস বহিতেছে। পূর্ব্ব রজনীর বিপ্লবচিহ্ন এই শান্ত প্রকৃতির কোন অঙ্গেই আর বিদ্যমান নাই। মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার ভাবিয়া ইতিপূর্ব্বে অনিমার যে বিরক্তি বোধ হইয়াছিল, মানুষের প্রতি প্রকৃতি জননীর স্নেহপূর্ণ সহানুভূতি অনুভব করিয়া সেটুকু মুছিয়া গেল। সেই অস্ফুট কলধ্বনির মধ্যে বিলাপের মূর্চ্ছনা ও স্নিগ্ধ বায়ু-প্রবাহের সহিত তাঁর বেদনাপূর্ণ সহানুভূতির সাড়া সে যেন শুনিতে পাইল। আর সে সবই যে সেই একজন লোক,—যাকে সে একটু পূর্ব্বেই একান্ত একেলা সান্ত্বনাহীন শোকের মধ্যে ছাড়িয়া আসিয়া নিরুপায়ে নিজেরই অন্তরে পীড়িত হইতেছে, তাহার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইতেছে, এমনই তার বোধ হইল। বিছানায় ক্লান্তদেহ নিক্ষেপ করিয়াও সে শুনিল, তার অন্তঃপ্রকৃতির সহিত মিলাইয়া বাহিরের বিষণ্ণা প্রকৃতিও করুণ কণ্ঠে বলিতেছে,—আহা বেচারি যামিনীপ্রকাশ!—

কুড়ি

সুসঙ্গতার শোচনীয় মৃত্যুর পর প্রথম শোকাবেগ সীমিত হইলে যামিনী অনুভব করিল, একটা কঠিন বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সে যেন স্বাধীন হইতে পারিয়াছে। সুদীর্ঘ এবং সপরিশ্রম কারাবাসের পর স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। সত্য কথা বলিতে গেলে, অস্বীকার করা যায় না যে, সুসঙ্গতার জন্য অভাব বোধ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তাদের সম্পর্ক যেরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল উহাতে সেটা আশা করা চলে

না। কিন্তু যামিনীকে একান্তরূপেই কাতর করিয়াছিল তার এই ভীষণ পরিণাম। সেই গোলাপী সাড়ির সলিলাক্ত ভাঁজের নীচে শুদ্ধ একখানা বুক, সেখানার মধ্যে তার এতটুকু প্রেম ছিল না, এক বিন্দু সহানুভূতিও ছিল না,—তবু সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সুখেচ্ছায় পরিপূর্ণ হৃদয় তার স্বামীর স্বাভাবিক করুণা-উৎসের ধারাকে সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ রাখিতে পারে নাই। অনুতপ্ত যামিনী পুনঃ পুনঃ কাতর কণ্ঠে তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছে, "আমি তোমায় হয়ত কোন দিনই ভালবাসতে পারিনি সুসঙ্গতা! হয়ত তাতে আমাদের দু'জনকারই দোষ ছিল, কিন্তু এই যে তোমায় এমন করে যেতে হল এ শুধু আমারই দোষে। কেন আমি তোমায় জোর করে ধরে রাখলুম না, কেন বিপদের মুখে যেতে ছেড়ে দিলুম। কেন ভুলে গেলুম তোমার স্বামী আমি, তোমার প্রতি আমার কর্ত্তব্য আছে।—"

তাহাদের সন্ধ্যার সেই কলহ,—প্রণয়-কলহ না হইলেও তার পরিণাম জগতের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ কলহ হইতেও যে ভীষণতর হইয়া দাঁড়াইল, সে কি তারই জন্য নয়? একটুকু পূর্ব্বে সে স্ত্রীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার কথাই তো মনে করিয়াছিল? হায় অদৃষ্ট, সকল সময়ে তো কই এমন করিয়া মানুষের প্রতি অতর্কিত ক্ষুদ্র ইচ্ছাটি পূর্ণ করিয়া দেয় না, অথচ এ কি সে করিয়া বসিল তার কপালে!

নলিনী ক'দিন খুব ভুগিল। সুসঙ্গতার মৃত্যুর পর হইতে প্রতিদিনই অণিমা দ্বিপ্রহরে আহারাদি সারিয়া নলিনীকে দেখিবার জন্য যামিনীর গৃহে আসিতেছিল, নলিনীর আরোগ্যের সঙ্গেই আসা বন্ধ করিল। আসিবার সময় মৃণালিনীকেও সে সাধ্যসাধনা করিয়া সঙ্গে আনিত। নিজে সে মুখচোরা মানুষ, সৌদামিনীর সঙ্গে মানাইয়া চলে, এমন কোন পুঁজিও তার ছিল না। সারা জীবনই সে তার পিতা ও ভ্রাতার কাছে বিদেশী বড় লোকদের জীবনের কাহিনী, প্রকৃতির নূতন নূতন রহস্যোদ্ভেদ

সংবাদ, দেশী ও বিদেশী ইতিহাস, বৈদেশিক ন্যায় ও দর্শন ব্যতীত সাংসারিক ব্যাপারের কিছুই তো আলোচনা করিবার অবসর পায় নাই। পৃথিবীর চারটি মহাদেশের মানব-সংগৃহীত সমস্ত সংবাদই প্রায় তার স্মৃতিমন্দিরে জমা করা রহিয়াছে। কেবল ইহার ভিতরে যেটুকু জানিলে সমস্ত জানার সমাপ্তি ও সামঞ্জস্য হয় সেইটুকু যে সে জানে না। ঘরকন্নার কথা, আলু-পটলের দর এ সমস্ত অপর কোন একজন শিক্ষিত যুবকের চেয়ে তার বেশী কিছু জানা ছিল না। কাজেই সৌদামিনীর কাছে তার শিক্ষার দীনতা তাহাকে অত্যন্ত ছোট করিয়াই ফেলিয়াছিল। সৌদামিনী দু'চারটি প্রশ্ন করিয়া একদিনেই তার বিদ্যা-বুদ্ধির সর্ব্বেব পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত হইয়া ভাবিয়াছিলেন, "মেয়েটি খালি কচুপড়ার মদ্দামী লেখাপড়া শিখেছে গা, সংসারের একটা কাজ শেখেনি! বিয়ে থাওয়া হ'লে ঘর সংসার করবে কি ক'রে?"

অণিমাও তাঁর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া নিজেকে নিজের নারীত্বের নিকটে ঈষৎ অপরাধী বোধে একটা অতীত স্মৃতি স্মরণ করিয়া অল্প শিহরিয়াও উঠিয়াছিল। মনে পড়িয়াছিল, এই তারই জীবনের মধ্যে এমনও একটা সময় আসিয়াছিল, যখন জীবনের গতি অল্প একটা সময়ের জন্য ভিন্নপথে প্রবাহিত হইতে চলিয়াছিল। সেই সময় কিছু দিন মনের ঝোঁকে দু' চারখানা রন্ধন-বিষয়ক পুস্তক ও একটা স্টোভও কিনিয়াছিল। সেই একটা সময়েই সে তার ইদানীং মৌন মূক হইয়া যাওয়া বাজনাগুলার বিশ্রাম-অবসরকে হ্রাস করিয়া ফেলিয়া তাদের মৌন আবরণের অভ্যন্তরস্থ পুঞ্জীকৃত ভাবের রাশিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে কুণ্ঠিত মাত্র হয় নাই। আর—আর একটা কথা মনে হইলেও এখন তার চিত্ত প্রাণ আত্মধিক্কারে অবনত হইয়া পড়ে। সেই সময়টাতেই তার হৃদয়ের মধ্যেও গভীর ও গম্ভীর ভাবসমূহ বসন্তপবনের চঞ্চল হিল্লোলের মত লঘু, সুন্দরীর চঞ্চল

চরণের নূপুরনিক্কণের ন্যায় মুখর এবং নিদাঘ-উপবনস্থ পুষ্পমঞ্জরীর মতই বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল। চির-স্বাধীন মাতঙ্গ স্বল্পদিনের পরিচিত বন্ধনস্তম্ভকে যে রকম অসহ্য মনে করে, সেই দুঃসময়ের স্মৃতিটাও অণিমার চিত্তকে তেমনি একটা ক্লেশজনক চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। বনের পাখীকে খাঁচায় পুরিবার প্রলোভন দেখানো হইতেছিল, সেটা কিছু অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু পাখীও যে সেই প্রলোভনে ভুলিয়া সোনা-মোড়া লোহার গারদে প্রবেশ করিতে পা বাড়াইয়াছিল এইটেই না তাহার পক্ষে একান্ত লজ্জা এবং অপমানের বিষয়।

কিন্তু সে কথা এখন আর ওঠে কেন? একটি দিনের ছোট একটি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই তো তার হৃদয়ের মধ্যে যে আমূল পরিবর্ত্তিত একটা নূতন জীবনের সূচনা ভাবের রাশি লইয়া বীণার তানে জাগিয়া রং ফলানো ছবির মতন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তটি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, বাঁধা বীণার তার খান খান হইয়া খসিয়া পড়িয়াছে, সমাজের, সংসারের নিন্দা পুরস্কার আর তো তার মনে অণুমাত্র ভাবাবেগ জাগ্রত করে না। সেই একই দিনে সে পাকপ্রণালীর পুস্তক-গুলা আলমারিতে তুলিয়া ফেলিয়াছে, স্টোভটাকে রান্নাঘরে পাঠাইয়া দিয়াছে এবং পিয়ানোটাকে চাবি বন্ধ করিয়া ফেলিয়া নিজের চিরদিনের সখাদের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

সৌদামিনী মিলিকে পছন্দ করিলেন। সে পিসিমার কাছে বসিয়া আনাজ তরকারীর বাজার দর বুঝিয়া লয়। নিরীহ অণিটাকে চাকরগুলা খুব ঠকাইয়া খায় এবং ভবিষ্যতে যখন সে না থাকিবে তখন বেচারার সংসারের অবস্থা কি হইবে, এ সম্বন্ধেও সে পিসীমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলে, "এমন কেউ একজন গিন্নীবান্নিওলা ঘরে ওর বিয়ে হয়, যিনি ওকে মেয়ের মতন ক'রে টেনে নেবেন, তা' হ'লেই ওর সুবিধে, নৈলে

ওর কি যে দশা হবে, তাই ভেবেই আমি গেলুম! এমন সরল শান্ত মেয়ে পিসিমা সংসারে তুমি দুটি দেখোনি, ঘর সংসারের কোন খবরই জানে না, যে যা' কবৃচে তাই সই।" তারপর যখন সে পিসিমার পাকা চুল তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিল, তখন সৌদামিনীর খুশির সীমাই থাকিল না। হাসিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "আহা ভাল হোক্ মা তোমার, বড় ভাল মেয়ে তোমরা। এমন বড় ঘরের মেয়ে—এত সব লেখাপড়া শিখেছ, তবু কত নম্র, কত বিনয়ী, আমার বউমা অমন ছিলেন না।" তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বড় করিয়াই পরিত্যাগ করিলেন।

নলিনী পথ্য করিবার পরদিন তাহারা আর তাহাকে দেখিতে আসিল না দেখিয়া যামিনী নিজেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার উদ্দেশ্যে তার বাড়ী গেল। মনে একটু উদ্বেগও ছিল, কেন তারা আজই আসা বন্ধ করিল, অসুস্থ নয় তো?

একুশ

সেদিন যামিনী যখন অনিমার কাল্পনিক অসুস্থতার চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সে নিজের বাড়ীর দোতালার সেই ঘরে মৃণালিনীর সহিত সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরেই তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে।

মৃণালিনী বৈকালিক বেশ পরিয়া আসিয়া দেখিল, কোলের উপর বাঁধানো বই রাখিয়া সে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি একটা লিখিতেছে। তার তরঙ্গায়িত কালো চুলের রাশি পিঠ ছাড়াইয়া পড়িয়াছিল, চূর্ণ কুন্তলগুলা স্বেদ-জড়িত হইয়া গিয়াছিল, আনতমুখে নিবিষ্টতায় একটি প্রসন্ন ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

মৃণালিনী পাশে আসিয়া লেখাটার দিকে নেত্রপাত করিয়া বলিল,—"কি লেখা হচ্চে? দয়া! প্রবন্ধ নাকি?

অণিমা কথা না বলিয়া পূর্ব্বের মত লিখিয়া যাইতে লাগিল। ভাবের উচ্ছ্বাস যখন অন্তরে জাগিয়া উঠে, তখন গানে সুর অথবা লেখায় সরসতা দুইই সে যোগান দিয়া চলে। তখন জনসঙ্গ বাধাস্বরূপ ঠেকে এবং সেটাকে এড়াইয়া যাইবারই চেষ্টা জাগে। মৃণালিনী শিক্ষিত সমাজের মেয়ে। ছোটবেলা হইতেই সে মামার বাড়ী ঘেঁষা, তার পিতা ব্রাহ্ম ও বিলাত-ফেরৎ না হইলেও আধুনিক নব্যসমাজের মতই চলিতেন। অগত্যা ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন না উঠিয়া মৃণালিনীকে লেখাপড়া শিখিতে হইয়াছিল। তার বিবাহও হইল বিলাত-ফেরৎ ব্যারিস্টারের সঙ্গে। রমেন্দ্রনাথ যদিও স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী, কিন্তু স্ত্রীকে সে কোনও মতেই তার মতের মধ্যে টানিয়া আনিতে পারে নাই। মিলির বুদ্ধি-শুদ্ধিও মন্দ নয়, তবে স্ত্রীলোকের যে পুরুষের মত প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র সমাজ এবং তার বাহিরেও বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিতে পারে, এই সৃষ্টিছাড়া নব্য-ধারণার সহিত তার বিশেষ ভাবেই বিরোধ ছিল। এ লইয়া অণিমার সঙ্গেও তর্ক চলিত এবং রমেন্দ্র-নাথকে তার বিপক্ষে দাঁড়াইতে দেখিলে সে ক্ষেপিয়া উঠিত। তর্কের গতি কোন্দলের দিকে ফিরিতেছে দেখিয়া রমেন্দ্রনাথ সরিয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইত। মিলির কাছে তর্কাতীত কোন্দলে তারা যে জিতিতে পারিবে না,—সে বিষয়ে দু'জনেই তারা নিশ্চিত।

অণিমার লেখা বন্ধর জন্য কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া মৃণালিনী দোয়াতটা সরাইয়া ফেলিল। নিবিষ্টচিত্ত অণিমা জানিতে পারে নাই, সে চিন্তিত ভাবে কালি লইতে গিয়া কলমটা মাটিতে ঠুকিয়া চাহিয়া দেখিল, দোয়াত নাই। রাগ করিয়া মিলির দিকে চাহিতেই সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, অণিমা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—"দে, আমার দোয়াত দে, শুধু শুধু বাধা দিস্‌নে—"

মিলি হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে বলিল,—"কেন গো, বড্ড উচ্ছ্বাস জেগে উঠেছে? আচ্ছা, একটা কথা আমায় বল্ তো আগে, তোরা ঐ যে সব লিখিস্ ওতে পৃথিবীর কি কিচ্ছুটি উপকার হয়?"

এই প্রশ্ন অণিমার মনেও যে না উঠিয়াছিল এমন নয়, বরং থাকিয়া থাকিয়া যখন তখন ঐ কথা তার চিত্তকে সন্দেহে দোলাইতে থাকিত। কিন্তু অন্যের নিকট দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করা তার স্বভাব নয়, যেখানে নিজের মনে সংশয় জাগে, বাহিরে সে সেই ভিত্তির উপরেই জোর দিয়া চাপিয়া দাঁড়ায়। মৃণালিনীর বিদ্রূপ-প্রশ্নে তাই সে উত্তর করিল,—"বিন্দু বিন্দু ক'রে জল দেয় ব'লে কি বৃষ্টির দরকার নেই বল্‌তে চাস্?"

মিলি হাসিতে লাগিল—"বৃষ্টি-বিন্দুতে কি কিছু হয়? যখন অসংখ্য বিন্দু একত্র হয়ে ধারাকারে পরিণত হয় তখনই তা কাজে লাগে।"

"বিন্দু না থাকলে ধারা পেতে কোথা? এই যে এত বড় বিরাট বিশ্ব-সংসার, এদের বিশ্লেষণ করতে করতে কোথায় গিয়ে বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষার ফল পৌঁছচ্ছে শুনি? তুই কি বলবি অত ক্ষুদ্র অণুপরমাণু ওরা কি জন্যে পরস্পরের সঙ্গে তাদের শক্তি সংযোগ করতে যায়?"

"দূর আমি কি তাই বলচি? না ভাই তোর তর্ক তুলে রাখ, তোর সঙ্গে কে পারবে। যাবিনে?"

"কোথায়?" বলিয়া সে এমনই সহজভাবে তার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সদ্য-পরিত্যক্ত দোয়াতটার মধ্যে কলম ডুবাইল যে,—মিলি তার ছলনাটুকু ধরিতে পারিল না, বলিল—"নলিনীকে দেখতে।" আবার কোলের উপর একটু নত হইয়া পড়িয়া অসমাপ্ত লেখাটার উপর মনসংযোগ পূর্ব্বক অণিমা উত্তর করিল—"সে তো ভালই আছে, কি আবার দেখব? তুই যা দেখি মিলি, আমি লেখাটা শেষ করি।"

"প্রকাশবাবুর পিসিমা আমাদের পথ চেয়ে বসে থাকবেন, আমরা না

গেলে হয় তো ক্ষুন্নও হবেন, আজ তো যাই চল, কাল থেকে যাসনি না হয়।" এই বলিয়া মিলি একটু উৎসুক হইয়া চাহিল। সে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাল করিয়া চুল বাঁধিয়াছে, কাপড়টাও ছাড়া হইয়া গিয়াছে, এখন একবার বেড়াইয়া না আসিয়া উল্টা প্রকৃতির মেয়েটার কাছে এগুলোকে অপব্যয় করিতে মনে খুঁৎ লাগিতেছিল।

অণিমা দৃঢ়তার সহিত ঘাড় নাড়িল—"কোনো দরকার নেই যখন, তখন শুধু শুধু সময় নষ্ট করতে পারি নে। তুই যা একটু—"

"ইস, তাই গেলুম তো" বলিয়া মিলি চাপিয়া বসিল,—"ওই সব তোর উদ্ভট কথা-বার্ত্তা আমি বুঝতে পারিনে। আমি এই বুঝি বাবু, মানুষের জীবনটা নিছক সংগ্রামের জন্তে তৈরি হয়নি। জগতের মধ্যে যেটুকু শান্তি আছে, যেটুকু তৃপ্তি আছে, সেইটুকুই সে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে নিজের জন্তে আদায় করে কেড়ে নেবে, বাকি যা কিছু অশান্তি ও অতৃপ্তি সেগুলোর খবর শখ করে টেনে নেবার দরকার নেই।"

অণিমা নিজের কাজ করিয়া যাইতে যাইতে মুখ না তুলিয়া ধীর ভাবে কহিল,—"তুমি যা বলছ সংসারের মধ্যে সাড়ে চৌদ্দ আনা লোকেই তাই বলবে, —কিন্তু এটা ভুল।"

"ভুল! কক্ষনো না। যদি মন্দটা নিলেই মানুষের পথ চলা সম্ভব হ'ত, প্রকৃতির মধ্যে কোনো ভাল জিনিসই থাকতো না।"

"যদি সেটা বাস্তবিকই মন্দ হয়। ভবিষ্যৎ শান্তির জন্যই যুদ্ধের নিয়ম হয়েছে, যুদ্ধ করে মরবার জন্তে নয়। জগতের কুৎসিত ও ক্লেশকর অংশটা থেকে মন এবং দৃষ্টিকে বন্ধ করে রাখার মতন অন্যায় আর কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। ভালয় মন্দয় সুখে দুঃখে হাসি কান্নায় এই জগৎ তৈরি হয়েছে, তার ভালটুকু মাত্র নিয়ে মন্দ অংশটার দিকে না চাইলে জগৎকে আধখানা দেখা হবে। খুঁজে যদি দেখতে শেখো তবে প্রকৃতির

এই অশান্তিকর অংশ যেটাকে তুমি বলছ, তারই মধ্যে তার শোকের আর্ত্তনাদ, বিদ্রোহের চীৎকার ও সৌন্দর্য্য-হীনতার নিরানন্দের মধ্যে এমন একটা সম্পূর্ণ বস্তুকে দেখতে পাবে যা তার নিজস্ব। ভীষণকে কুৎসিতকে সুন্দর সৌম্য ক'রে তোলাই মানুষের একমাত্র কাজ।—আর প্রকৃতি তাদের মধ্যে সেই শক্তি প্রচুররূপে দিয়েও রেখেছেন। প্রতিজনেই সেটাকে নষ্ট না করে কাজে লাগালেই জগতের মূর্ত্তি বদলে যেতে পারে। তার মধ্যে সুন্দর কুৎসিতের দুটো বিভাগ না থেকে—ভীষণে-মধুরে, কুৎসিতে-সুন্দরে, শোকে-আনন্দে মিশে গিয়ে মহান্ রূপ পরিগ্রহ করতে পারে।"

মিলি সকৌতুকে কহিল,—"কাব্যি!"

অণিমা কলম ফেলিয়া মুখ তুলিল। উত্তপ্ত রক্তের উজ্জ্বল দীপ্তি তার শুভ্র ললাটে মঙ্গল গ্রহের মত রক্ত-আভায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। "কাব্য? মানব-জীবনের চেয়ে কোন্ কাব্যটা সত্য? কোন্ বড় কাব্য তার চেয়েও বড় মিলি? কাব্য কবি কোথা থেকে পেলেন? এই মানব-জীবনই তো এক একটা মহাকাব্য। প্রকৃতির মতন বড় কবি আর কে কোথায় আছে? তাঁর লেখা যাঁরা পাঠ করতে পেরেছেন, তাঁরা তাঁরই ছড়ানো ভাবকে তাঁদের কাব্যে সংগ্রহ করে রেখেছেন। কাব্যকে তুমি উপহাস করো না।"

মিলি একটুখানি চুপ করিয়া রহিল। তারপর তার ওষ্ঠ-প্রান্তে ঈষৎ একটা উপহাসের হাসি ফুটিয়া উঠিল,—"আচ্ছা কবিরা তো ভাব নিয়েই ভোর থাকেন, কাজ কাজ করে ছুটে বেড়ান না, তোর এ কি ধারার কাব্য রে? মহাকাব্য না খণ্ডকাব্য?"

অণিমা বিরক্তির হাসি হাসিল,—"জগতের প্রতি জীবনটিই এক একটি মহাকাব্য। কোথাও তাতে ট্র্যাজেডি, কোথাও বা কমেডি; কিন্তু আসলে—"

"কোনখানেই কি কার্য হয় না?"

অণিমা তাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া খোঁচা মারিল, "হয় না কে বললে? তোর সঙ্গে একটা কথা কয়েও সুখ নেই, যা!"

মিলি নির্লজ্জের মত তিরস্কার গায়ে মাখিল না, হাসিতে হাসিতে বলিল—"তাই তো বল্‌ছিলুম, যেখানে কথা ক'য়ে সুখ পাবে সেইখানেই চল।"

অণিমা বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল—"সে আবার কোথায় গো? প্রকাশবাবুর পিসীমার সঙ্গে? না ভাই! সত্যি কথা বলতে কি, পৃথিবীতে যদি আমি কাউকে ভয় করি তো এই মানুষটিকেই। এমন লজ্জা করে আমার—উনি যখন কৃপার সঙ্গে বল্‌তে থাকেন, 'আহা বাছা রে! তা' ঘর কন্নার কাজ কিছুই কি তুমি শেখোনি? হাজারও হোক্ মেয়ে-মানুষ তো, শিখো মা একটু একটু।' "

মিলি তার দুঃখ-নিবেদনে কিছুমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শন করিল না, সকৌতুকে হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—"তা' মন্দই বা কি এমন বলেছেন? সত্যিই তো, মেয়ে-মানুষ যদি মেয়ে-মানুষের মতনই না চলবে তবে সে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালো কেন? বিধির মতিভ্রম? তিনি কি তাকে পুরুষ করে গড়তে পারতেন না?"

"তোর বিধাতা কি তোর কানে কানে মেয়েমানুষের কর্ত্তব্য সমস্ত লিস্টি করে ব'লে দিয়ে গেছেন নাকি? কিসে জান্‌লি যে মেয়েমানুষের কর্ত্তব্য কেবল গয়না গায়ে দিয়ে বেড়াতে যাওয়া, আর না হয় ভাত রেঁধে বাসন মেজে দিন কাটানো? তার ওপরে উঠতে তাকে মানা?"

মিলি এবার রাগিল, উত্তেজনার সহিত কহিল,—"সকল মেয়েমানুষ কি কেবল সংসারে গয়না পরে বেড়ায় নাকি? আর কর্‌লেই বা ঘর নিকানো বাসনমাজা, নিজের ঘরকন্না নিজে দেখে তা'তে আবার লজ্জাটা

কি? পুরুষমানুষ উপার্জ্জন করবে, স্ত্রী সংসার না দেখলে গরীবের ঘর চলবে কেন?"

"গরীবের মেয়েরা নিজেদের কর্ত্তব্য পালন ক'রে যায়, অসীম সহিষ্ণুতার সঙ্গে জীবন সংগ্রামে তারা বুক পেতে দাঁড়ায়, তাদের কথা নয়,—কথা হচ্ছে যারা তা করে না, যাদের তা করবার দরকার হয় না, তারা করবে কি? কুম্ভকর্ণের মতন নিদ্রা দেবে, আর তাস পেটাবে? যাদের সুযোগ আছে, শক্তি আছে, কেন তারা সেটা অপচয় করবে? সমাজের জন্যে, জগতের প্রতি জীবের জন্যে তা খরচ না ক'রে নিজের জন্যে—অর্থাৎ একটা কাল্পনিক ভোগের জন্যে জমা ক'রে রেখে মরচে ধরাবে কি অধিকারে?"

তর্ক বাড়িয়া চলিল। কথা নূতন নয়, সমস্যাও চিরকালের। কোনও দিনই কোনও জটিল সমস্যা এ পর্য্যন্ত নিরাকৃত হয় নাই, আজও হওয়া সম্ভব ছিল না। শাস্ত্রকারের এবং সমাজ-সংস্কারকের দল চিরদিন ধরিয়াই নরনারীর জন্য বিশেষ বিশেষ স্থান এবং কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া থাকিলেও এবং এ সম্বন্ধে আইন ও নিয়ম শৃঙ্খলা-ব্যবস্থিত হইলেও নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থির হইয়া থাকা মানব-প্রকৃতির ধর্ম্ম নয়। তারা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে। মানব-প্রকৃতি নিয়মের নিগড়ে একদিকে দৃঢ় বদ্ধ থাকেও যেমন, তেমনি সে তার সেই নিয়ম-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে সদর্প ঔদ্ধত্যে উদ্যত হইয়া উঠিতেও ছাড়ে না। এইটাই তো মানব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

পরাজিত-প্রায় মিলি যখন রাগ করিয়া উঠিয়া যাইতেছিল, সুখো দাসী আসিয়া যামিনীপ্রকাশের আগমন সংবাদ দিল।

মিলি বলিল,—"আপনি এসেছেন প্রকাশবাবু! বেশ হয়েছে। সমস্ত দিনটা আজ আমার ব্যর্থ বকুনি বকে বকে মাথা ধ'রে গেছে—কচুপোড়া তর্কেরও মীমাংসাই হ'লো না।"

যামিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"কিসের তর্ক আপনাদের ?"

সলজ্জ-কৌতুকে অণিমার নেত্র-তারকা হাসিতেছিল, সে বলিল,—"যত সব বাজে কথা! সমস্ত দিনটা আমায় বকিয়ে মেরেছে। কি নিয়ে? সেই চিরকেলে বাঁধা গৎ, যা আছে—স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য।" যামিনীকে প্রবন্ধটার দিকে চাহিতে দেখিয়া লজ্জা-জড়িত উত্তেজনার সহিত সবেগে বলিয়া উঠিল, "পড়বেন না প্রকাশবাবু! ও ছাই হয়েছে, ও আপনি পড়বেন না।"

"আপনার লেখা ছাই কখনও হতে পারে না। তবে জানতুম না যে আপনি বাংলা লেখেন। আপনার ইংরাজী রচনা যে রকম চমৎকার হয়, তা'তে আমার বিশ্বাস আপনি যদি বাংলা লেখার চর্চ্চা করেন, তা'হলে আমাদের সাহিত্য আপনার কাছেও হয়ত যথেষ্ট উপকৃত হতে পারবে।"

যামিনী যে একথা বলিল, এর বিশেষ কারণ ছিল। মিঃ দত্ত বাংলা ভাষার অনুরক্ত তো ছিলেনই না, বরং বিরুদ্ধ ছিলেন বলিলে অন্যায় বলা হয় না। পুত্র-কন্যা দু'জনকেই তিনি তাঁর নিজের আদর্শ মত গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছিলেন, সে কথা বলা হইয়াছে। তাদের বাংলা শিক্ষার দিকে একবারেই দৃষ্টি রাখেন নাই,—বরং বিপরীত দিকে অর্থাৎ কিসে তারা ইংরাজী শিক্ষায় উৎকর্ষ লাভ করিবে সেই দিকেই তাঁর সমস্ত চেষ্টাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ছেলেমেয়েরা তাঁর সঙ্গেও বাংলায় কথাবার্ত্তা কহিতে পাইত না। এ সম্বন্ধে তেমনি কড়া হুকুম তাদের গৃহশিক্ষকের প্রতিও দেওয়া ছিল। তারা অল্প-শিক্ষিতা মায়ের সংস্রবে 'খারাপ' হইয়া যাইতে পারে, এই ভয়ে তাদের খুব ছোট বেলায় তাঁর কাছেও বড় একটা থাকিতে দেওয়া হইত না। মেম গবর্নেস এবং যার ইংরাজী উচ্চারণে দেশীয় টান যত কম থাকে, তেমনি দেখিয়া গৃহশিক্ষক—এই দুই লোকের কঠোর শাসনের মধ্য দিয়া শিশু দুইটি যখন

তাদের কৈশোর অতিক্রম করিতেছিল, সেই সময় একদিন সহসাই তাদের মনের গতি একই দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। কোন বিদেশী পণ্ডিতের সংস্কৃতসাহিত্যের প্রতি উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রবন্ধাবলীতে তীব্র অনুরাগের পরিচয় তাঁর কোনও প্রসিদ্ধ পুস্তক হইতে পাইয়া অনিমা হঠাৎ কালিদাসের গ্রন্থাবলী কিনিয়া আনাইয়া একদিন নিজের শয়ন-গৃহে অভিভাবকগণের দৃষ্টি এড়াইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। যে ভাষায় তার পূর্ব্বপিতামহগণ একদিন বিশ্বের প্রথম প্রভাতে বিশ্ব-তপোবনের দ্বারে পূজারীর বেশে দাঁড়াইয়া বিশ্বেশ্বরের বন্দনা গান প্রথম উচ্চারণ করিয়া জীবনের প্রতি কর্ম্মে ও প্রত্যেক ছোট-বড় সুখ-দুঃখের মধ্যে তাঁহাকে আবাহন করিয়া লইয়াছিলেন, যে ভাষা সেই তুষার-বিগলিত নির্ম্মল জাহ্নবী-জলধারার গঙ্গোত্রী নিঃস্রাবের মত গম্ভীর ঝঙ্কারময়ী এবং সেই পুণ্যস্রোতা সলিল ধারারই মত যে প্রতি চিত্তের কলুষ হরণ করিয়া একই মহা সমুদ্রের দিকে পরিচালিত করিবার জন্য বেদ উপনিষদ সমূহের মধ্য দিয়া নিয়তই প্রবাহিত রহিয়াছে,—সেই তাদের নিতান্তই আপনার ধন, মায়ের স্তন্য-দুগ্ধের মতই যাহা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই তাদের স্বতঃপ্রাপ্য, সে যখন তার উৎসাহপূর্ণ চিত্তে চির পরিচিতের মত তারই বক্ষলীন হইতে গেল, তখন সে দেখিল সে তো তাকে স্নেহভরা মাতৃবাহুর মত সাগ্রহে বক্ষে টানিয়া লইল না! তারা অতি নিকটতম আত্মীয় হইয়াও ব্যবধান বশে পরস্পরের নিকট অত্যন্ত দূরবর্ত্তী একান্ত পর। কালিদাসের গ্রন্থাবলী আলমারীর মাথায় লুকাইয়া রাখিয়া সে সংস্কৃত শিক্ষা প্রথম পাঠ ও তার অর্থপুস্তক কিনিয়া আনিল। বালিকার চিত্তে তার ব্যর্থশিক্ষার সংঘাত-বেদনা দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল!

চুপি চুপি সে একমাত্র সঙ্গী দাদাকে একদিন এই শুভ সংবাদ প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদের সহিত বলিল,—"ইংরাজেরা তাদের দেশকে কত

ভালবাসে, ওদের ভাষা থেকে তার প্রমাণ পাচ্ছ তো? অমনি ক'রে আমাদেরও আমাদের দেশকে ভালবাসতে হবে। আমার মনে হচ্ছে যা' এতদিন ধ'রে চাচ্ছিলুম, তা' আমি এখন ঠিক ধরতে পেরেচি। আমাদের সাহিত্য, আমাদের ভাষাকে ছেড়ে আমাদের দেশকে কি ভাল ক'রে কাছে পেতে পারি? আগে তার জীবন-সাহিত্য আপনার প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে, তবে না তাকে পাবো! আমরা যে তাকে চিনিই না।" তার কণ্ঠে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা বিচিত্র সুরে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। অল্পদিনের মধ্যেই সে প্রত্যক্ষ করিল, সে যে দেশের কাজে তার সুখে দুঃখে নিজেকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছে, দেশের সাহিত্যই সে মিলনের তোরণ-দ্বার।—সেখানে যাইতে হইলে তোরণের ভিতরকার সুবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র যাহার মাপ ও পরিধি ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের হিসাবে প্রায় উনিশশত মাইল, তাহারই ভিতর দিয়া তার ত্রিশ কোটী সহযাত্রীর সহিত এই সাহিত্য দ্বারাই পরিচিত হইতে হইবে। যেখানে প্রেমের গন্ধপুষ্প ও সম্মিলনের অর্ঘ্য-পাত্র হস্তে না লইয়া যাইতে পারা যায় না, সেই মাতৃ-মন্দিরে অপরিচিত হইয়া প্রবেশ করা চলে না।

রাত্রে দুই ভাই বোনে তাদের শয়ন-কক্ষের দ্বারে পর্দ্দা টানিয়া অর্থ-পুস্তকের সাহায্যে বাংলা-সংস্কৃত শিক্ষা করিত। কিন্তু বেশি দিন তাদের এই লুকোচুরি চলিল না, শীঘ্রই শিক্ষক মহাশয় তাদের এই অপরাধ ধরিতে পারিলেন এবং সেইদিনই তাদের পিতৃদেব কি ভাবিয়া তাদের যথেষ্ট ভয়-ভাবনার মধ্যেই একজন স্কুলের পণ্ডিতকে তাদের বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এ সম্বন্ধে ভালমন্দ কোন কথাই বলিলেন না। পণ্ডিতটিকে ডাকিয়া নাকি সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, তাদের সঙ্গে কোনো রকম ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনা যেন না করা হয়। কাহিনীটি যামিনীর জানা ছিল। অত বাঁধাবাঁধির মধ্য দিয়া যে অণিমা একটা

উন্নতি লাভ করিয়াছে এটা হয়ত সে ভাবে না[illegible] সেদিন যামিনী আসিলে চায়ের আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে মালী তাজা [illegible]র একটা বড় তোড়া লইয়া ঘরে ঢুকিতেই বিমুগ্ধ যামিনী বলিয়া উ[illegible] যিনি এই সুন্দর ফুলে স্বর্গীয় সুরভি দান ক'রে জীবনকে তাদের [illegible]ক করেছেন, তিনি আমাদের কর্ম্ম-সাফল্য দিয়ে জীবনকে তেমনি সার্থ[illegible]ন করুন।" সকল-কার মাথাই আপনা হইতে নত হইয়া আসিল, মনের [illegible] গুঞ্জনের মত এক সুর অলক্ষ্যে বাজিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মাত্র—পরক্ষণে [illegible] করিয়া মাথা তুলিয়া অনিমা ঘোর অবিশ্বাসে তীব্র বিদ্বেষে অস্বীকা[illegible] করিয়া উঠিল, "কে দিয়েছে এ সৌন্দর্য্য? এ সুগন্ধ ওকে কে' দিয়েছে? শুধু প্রকৃতি, —শুধু ভূতসমূহ,—আকাশ, বায়ু, জল, তেজ, পৃথিবী। যদি তা ছাড়া আর কেউ দেবার থাকতেন, তবে কিসে এ সৌরভের অধিকার পেলে আর শিমুল কেনই বা পেলে না? বন শেওড়া, কালকাসন্দা, তাঁর কাছে কি অপরাধ করেছিল? এত বড় পক্ষপাত এ কি ন্যায়বান্ ঈশ্বরের? না না—ঈশ্বর কোথায়? সত্য, ধর্ম্ম, ন্যায়, ত্যাগ ও দয়া এই মানবীয় ভাবগুলিই ঈশ্বর। দৃঢ়তা ও একাগ্রতাই এর সাধন-সোপান।"

অনিমার আকস্মিক ভাব-বিবর্ত্তন যামিনীর কাছে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু এর কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না। বিস্ময়ে সে বারং[illegible]র তার পানে চাহিয়া দেখিল। মনে হইল অকস্মাৎ চাঁদের উপর মে[illegible] আসিয়া পড়িয়াছে।

গল্পের সঙ্গে সঙ্গে চা-পাত্রগুলা শূন্য হইয়া গেল। অনিমা আবার তাদের কথায় যোগ দিয়াছে, প্রয়োজন-স্থলে হাসিতেও ছিল, কিন্তু কেমন যেন বিমনা ও বিমূঢ়ের মত।

কিছু পরে রমেন্দ্র কাজ আছে বলিয়া উঠিয়া গেল এবং মৃণালিনীও সংসার-ধর্ম্ম দেখিতে গেল। সে-ই এখন গৃহকর্ত্রী।

উঁহারা বিদায় লইলে যামিনী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সন্দিগ্ধ স্বরে কহিল, "আমি বোধ হয় কোন রকমে আপনাকে বিরক্ত ক'রে ফেলেছি।" বলিতে বলিতে উৎসুক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

অণিমার মুখে যতখানি রক্ত আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই পরিমাণেই তাহাকে বিবর্ণ করিয়া দিয়া সরিয়া গেল। নতনেত্রে মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "না, প্রকাশবাবু আপনি দুঃখিত হবেন না, আপনার কোন কথায় আমি দুঃখ পাইনি।"—এই বলিয়া সে একটা গভীর নিঃশ্বাস মোচন করিল, "জানি না কেন আমি এমন শান্তিহীন। থেকে থেকে প্রাণের মধ্যে কি একটা অশান্তি যে জেগে ওঠে, তাকে সব সময় জয় করতে পারিনে। মনটা এমন বিগড়ে যায়।"

সে বিস্মিত শ্রোতার মুখের দিকে ব্যথাভরা নেত্রে চাহিল। যামিনীর কণ্ঠ হইতে একটা মুক্তির নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। অণিমার এই অপরিচিত অভিব্যক্তিতে ও সুপ্রচুর বেদনার বাষ্পে ভরা কণ্ঠে তাহাকে আজ সহসাই একটা আনন্দ-মিশ্রিত বেদনার আঘাত হানিল। এ মেয়ে কোন দিন তার মনের দুয়ার হয়ত কাহারও কাছেই খোলে নাই, আজ এই মানসিক অভি-ব্যক্তির পিছনে কি আছে? সে নিজেকে সাবধানে সংযত রাখিয়া উত্তর করিল, "মনে যদি কিছু না করেন, বোধ করি অন্ততঃ আন্দাজ করতে পারি।"

আবার অণিমার স্নায়ুজাল উত্তেজিত করিয়া আভ্যন্তরিক রক্তস্রোত তার শুভ্র বর্ণকে রঞ্জিত করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং কি যেন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় বক্ষের স্পন্দন দ্রুত তালে নাচিয়া উঠিল। কোন মতে কহিল, "বলুন আপনি।"

যামিনী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আপনার ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই। যদিও আপনি ঈশ্বর মানেন না এ আমি বিশ্বাস করিনে, কিন্তু আপনার নিজের মনে এই ধারণাটা আছে বলেই আপনি সন্দেহে শান্তি পান না।"

অণিমা চমকিয়া উঠিল, কথাগুলি যেন তার প্রাণের অতি গভীরে প্রবিষ্ট হইল। সবেগে বলিয়া ফেলিল, "আপনি ও কথা বিশ্বাস করেন না? কিন্তু কেন?"

মৃদু হাসিয়া শান্তস্বরে যামিনী বলিল, "আপনি হয়ত কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমত গ্রহণ করতে পারেন নি! কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন,—এ সম্ভব নয়। আমার কথা বিশ্বাস করছেন না?" যামিনী পুনশ্চ হাসিয়া বলিল, "যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না, সে কি সত্যকে এমন দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে পারে? দয়া ধর্ম্মকে সে এত উচ্চে স্থান দেয় কখনও? গভীর করুণায় সে সারা জগৎকে তার আপন করে নিতে চায়? আপনার নিজের জীবনের মহত্বই তো প্রমাণ করে দিচ্ছে আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন ন'ন। আপনার ঈশ্বর-প্রেম আপনার অন্তরে মানব-প্রেমের মধ্যে সুপ্ত আছে, একদিন তা' স্ব স্বরূপে জাগ্রত হয়ে উঠবে।"

অণিমা গভীরতর শ্বাস মোচন করিল, "আপনি যা' বল্‌ছেন তা যদি হতো প্রকাশবাবু! বোধ করি ভালই হতো। লোকে কেমন সরল বিশ্বাসে এই ভীষণ পক্ষপাতদুষ্ট সংসারকে কোন্ এক অজানা অধীশ্বরের প্রেমরাজ্য-রূপে কল্পনা ক'রে ভক্তি বিস্ময়ে গদগদ হয়। এই জন্মমৃত্যুর খেলা (যদি জন্মান্তরই মানা যায়) ক্ষুদ্র কীটাণু হতে আরম্ভ ক'রে জীবশ্রেষ্ঠ মানবকে শুদ্ধ বারংবার নিষ্ঠুর নৃশংসতার সঙ্গে আবর্ত্তিত ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছে,—বিশ্রাম নেই—তার এতটুকু বিরাম নেই, একি কোন করুণাময়ের অধিষ্ঠানকে সপ্রমাণ করছে, যিনি এই মহাশক্তির নিয়ামক? একান্ত ঈশ্বর-বিশ্বাসী সন্তানের মৃত্যু-শয্যায়, প্রিয়তম আত্মীয়ের বিপদের দিনে প্রাণপণে তাঁকে আহ্বান ক'রেও তাঁর সাড়া না পেয়ে ভগ্ন হৃদয়ে চিরদিনের সমস্ত বিশ্বাসকে হারিয়ে ফেল্‌তে বাধ্য হয়েছে, এ ও তো আমি অনেক দেখেছি প্রকাশবাবু! তবে কেমন ক'রে বিশ্বাস করবো জড়শক্তি ভিন্ন আরও

কোন জীবন্ত শক্তি তাঁর অপরিসীম করুণা এবং ন্যায়দণ্ড হাতে নিয়ে বিশ্বের নিয়ন্তারূপে সদাসর্ব্বদা জাগ্রৎ রয়েছেন? জগতে তো কাকেও তাঁকে ঐকান্তিক নিষ্ঠা পালন করেও সুখী দেখতে পাইনি। এই দুঃখের পৃথিবীই কি তাঁর অপরিসীম দয়ার দান?"

যামিনী তার যুক্তি শুনিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিল। একটুখানি বেগের সহিত কহিল, "আপনি যে সেকালের ক্রিশ্চানদের মতন বিশ্বাস নিচ্ছেন। তাদের সুসমাচারে লেখা থাকে, অবিশ্বাসী রাজা ভক্ত ক্রিশ্চানকে আগুনে ফেলে দগ্ধ করতে কিংবা সিংহের মুখে নিক্ষেপ ক'রে বধ করতে গেলে অকস্মাৎ নির্ম্মেঘ আকাশ হ'তে বৃষ্টিপাত হয়ে অগ্নি নির্ব্বাপিত ক'রে দিয়েছে, সিংহ তার পদতলে মাথা নত ক'রে হিংসা ত্যাগ করেছে, আর অবিশ্বাসী উৎপীড়ক তৎক্ষণাৎ ভক্তিবিশ্বাসে মুগ্ধ হয়ে ক্রিশ্চানিটি গ্রহণ করেছে। আমাদের মঙ্গলকাব্যেও এ কাণ্ড ঝুড়ি ঝুড়ি দেখতে পাবেন। তেমন জোরালো বিশ্বাস থাকলে কিছুই হয়ত জগতে এমন কোন অসম্ভব ঘটনা নেই যা' না ঘটতে পারে, এ দেশের যোগীপুরুষদের অনেক অলৌকিক কাণ্ড থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আজকাল যেটাকে 'উইল পাওয়ার' ব'লে পাশ্চাত্য যোগীরা আবার প্রচার করছেন। প্রহ্লাদের কাহিনীও ঐ পূর্ণ বিশ্বাসের একটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। কিন্তু সে সব কথা ছেড়ে দিন, কোন এক ব্যক্তির আবেদনে তাঁর চিরশৃঙ্খলিত নিয়মপদ্ধতির ব্যতিক্রম হওয়াই কি আপনি তাঁর করুণাময়ত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বোধ করেন? আমি এ সম্বন্ধে বড় বেশী ভাবি নি, আমার জ্ঞানও অল্প, তবে এইটুকু বলতে পারি, আমাদের নম্রভাবে কেবল তাঁকে মেনে যাওয়াই কর্ত্তব্য এবং একমাত্র তাতেই আমরা জীবনে শান্তিলাভ করতে পারি। যুক্তি তর্ক কিছু না—তিনি আছেন, তিনি আমাদের পাপ পুণ্যের ফলদাতা, নিয়ন্তা, প্রভু, আমরা তাঁর মঙ্গল-বিধানের বশে যে যে অবস্থা

পেয়েছি, তাই তাঁর শুভ আশীর্ব্বাদ ব'লে মেনে নিয়ে সুখী হ'তে চেষ্টা করবো।—ভেবে দেখুন, মায়ের কাতর আবেদন উপেক্ষা ক'রে তাঁর কোল থেকে তিনি সন্তানকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিলেন, কে' বলতে পারে যে এর ভিতর কোন মঙ্গল-উদ্দেশ্য তাঁর ছিলই না? কে বলতে পারে ঐ শিশু যে জীবন ভোগ করত তার চেয়ে সে অধিকতর সুখী হ'তেই এখান থেকে চ'লে গেল? তার মায়ের তার জন্যে—তার ভাল হ'বার জন্যে ব্যাকুল প্রার্থনায় সে হয়ত অধিকতর সুখীই হ'তে পারলে, তার প্রকৃত যা ভাল তা-ই হয়ত লাভ হ'লো,—এ'ও তো হ'তে পারে? এ পৃথিবীটা এমন কিছু ভাল জায়গা নয়, যে এখানে ধ'রে রাখতে পারাটাই সবার পক্ষে সকল সময় চূড়ান্ত লাভের।"

অণিমা বিস্মিত আগ্রহে কথাগুলি মন দিয়া শুনিল, তারপর একটু বিচলিত ভাবে বলিল, "আপনার কথা হয়ত সত্যিও হতে পারে,—কিন্তু আমার মনে এ সব যুক্তি যেন খাপ খায় না। ছোটবেলা থেকে কখনও ঈশ্বরের নামও শুনিনি।—কেউ কখনও আমাদের বলেনি। মনের মধ্যে কি জানি কি যে সন্দেহ কি যে অভাব, পোষণ করে এসেছি, কিসের সে অভাব তাও কখনও বুঝিনি। ইদানিং প্রায় সব দেশেরই বিভিন্ন ধর্ম্মমত পড়ে দেখেছি, পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করেও দেখেছি, হয়ত আমার ভুল হ'তে পারে, কিন্তু আমার বাবা যেমন বুঝিয়েছেন,—মাস্টার যেমন বুঝিয়েছেন, তাতে আমার বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে, সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবাণী সবই ভ্রান্ত। একটা মোহময় অন্ধ বিশ্বাসের উৎস মানুষের ভিতরে চির-প্রবাহিত আছে। জাগতিক কতকগুলো প্রাকৃতিক ব্যাপারকে নিয়েই বংশের পর বংশ, জাতির পর জাতিতে সংক্রামিত করে। সেই প্রকাণ্ড অন্ধ বিশ্বাসটাকে প্রশ্রয় দিয়ে আজ তাকে অভ্রভেদী করে তুলেছে। তারপর দেখুন, কারো সঙ্গে কারো সামঞ্জস্যও পাওয়া যায় না। সকলেই

পরস্পরের মতবাদকে খণ্ডন ক'রে নিজের মতকেই একান্ত সত্য বলে প্রচার করতে চায় এবং যারা তাদের মতের বাহিরে থাকে, তাদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার এবং কঠোর অভিসম্পাত করতে একটুকুও কুণ্ঠানুভব করে না। এই সব নানা কারণে আমার বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেছে, কোন ধর্ম্মমতেই যথার্থ সত্য নেই। বাবা বলতেন, 'ধর্ম্মমতগুলিই জগতের পক্ষে তীব্র অভি-সম্পাত। ওরাই মানুষকে মানুষের সঙ্গে এক হতে দেয় না, চারিদিক থেকে তাদের সম্মিলনের পথে বেড়া বেঁধে পৃথক ক'রে তোলে।' সত্যি কথা বলতে কি, যে সব ঘটনায় লোকে ঐশ্বরিক ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়, আমি তাতে কেবলমাত্র জড়শক্তির লীলাই দেখতে পাই।" ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে নীরব হইল।"

যামিনী ব্যথিতভাবে কহিল, "বড় দুঃখিত হচ্চি। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি আমি দার্শনিক নই। তর্ক করে আপনার চিরকালের বিশ্বাস খণ্ডন করতে আমি পারবো না, তবে আমার যা মনে হয় তাই আপনাকে বলছি। মানুষের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে নীরব ঔদাসীন্য আপনার কাছে ঈশ্বরের অনধিষ্ঠান সম্বন্ধে একটা মস্তবড় প্রমাণ তো? ভেবে দেখুন, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কাছে মানুষ কতটুকু? এই বালুকণা-তুল্য ক্ষুদ্র জীব কি কোন মহাশক্তির আশ্রয় ভিন্ন জড়শক্তি দ্বারা এত বড় হয়ে উঠতে পারে? যদি বিশ্বের অসীমত্বে সন্দেহের লেশ থাকে, অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ পরিশোভিত নৈশাকাশে চেয়ে দেখলেই সব সন্দেহ দূর হয়ে যাবে এই আমার বিশ্বাস। কে এমন করে অনাদি কাল থেকে এদের শৃঙ্খলার সঙ্গে চালাচ্ছে।"

অণিমা বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িল, "কাণ্ট তাই বলেছেন বটে, কিন্তু দেখুন সৃষ্টির প্রধান ঐশ্বর্য্য এই মানব, শুধু তার বাহ্যমূর্ত্তিতে নয়,—তার জ্ঞানে কর্ম্মে শক্তিতেও সে কত বড়। তার আকার ও সংখ্যাকে অগ্রাহ্য করলেই বা চলবে কেন? তার সুখদুঃখও তো তুচ্ছ নয়।"

যামিনী একটু হতাশাপূর্ণ বিরক্তির সহিত তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী অত্যন্ত সুরূপা এই বিশ্বাসবিহীনা নাস্তিকা নারীর দৃঢ়তাপূর্ণ মুখের দিকে চাহিল। পূজামণ্ডপে খাড়া করা, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা না করা অসাধারণ সৌন্দর্য্যমণ্ডিত প্রতিমা। ইহাকে জড়বাদ হইতে ঈশ্বর-বিশ্বাসে উন্নীত করিয়া সজীব করিতে একান্ত আগ্রহ জাগিলেও—সে বুঝিয়াছিল যে সকল যুক্তি ও উদাহরণ দিয়া সাধারণ নারীকে বুঝাইয়া স্বমতে আনিতে পারা যায়, এর সম্বন্ধে তা খাটিবে না।

অণিমা তার পিতার নিকট পাশ্চাত্য নাস্তিকদর্শন ভাল করিয়াই পড়িয়াছে। জড়বাদ তার বিবেক গ্রহণ করিতে না চাহিলেও বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপেই গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। তার মত খণ্ডন করিতে হইলে তাকেও ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ প্রধানত সংস্কৃত-দর্শনসমূহকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই জড়বাদেও সুশিক্ষিত হইতে হইবে। কিন্তু যামিনী এদের সঙ্গে সামান্য পরিচিত।—প্রকাশ্যে শান্তস্বরে কহিল,—“বিশ্বাসের দৃষ্টিতে সকল কাজেই যে চৈতন্যময়ের মঙ্গলী হস্ত দেখতে পাওয়া যায়, অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তা পাওয়া যাবে না। যুক্তি তর্কে যদি প্রমাণ চান, জড়শক্তি ভিন্ন বিরাট বিশ্বকার্য্যে চৈতন্য শক্তির আবশ্যকতা আছে, অনুরোধ করছি হিন্দু দর্শনগুলিও একবার করে পড়ুন। আমরা যখন নিজেদের বুদ্ধিতে সন্দিগ্ধ হই তখন একজন বিশ্বাসী পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন থাকে। সেই পথপ্রদর্শক হয় কোন ঐশীশক্তি-সম্পন্ন মানুষ অথবা রত্নাকর-তুল্য শাস্ত্রবাক্য। ছোটবেলা থেকে আমরা ‘ঈশ্বরবিশ্বাসী’ হতে শিখেছিলুম বলে ‘ডারুইন’ ‘হক্সলী’র ফাঁদে পড়িনি। হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের ‘ফার্স্ট প্রিন্সিপ্‌ল’ নিশ্চয়ই পড়েছেন?”

“তাঁর কথাটা বরং মনে লাগে। তাঁর মতে যদিই ঈশ্বর থাকেন, তাঁকে কেউ জানতে পারে না। তাই না বলেছেন?”

যামিনী হাসিয়া বলিল,—"আমাদের বেদান্তেরই কাছাকাছি এসে পৌঁচেছেন, দেখছেনই তো। 'অবাঙ্‌মনসোগোচর'ই হ'ল, তার মানে।"

অণিমাও ঈষৎ হাসিল,—"সেই জন্যেই তো বলছিলুম ধর্মমত থেকে কিছু ঠিক পাওয়া যায় না। বেদান্তের মত শুনে মন্দ লাগেনি, কিন্তু যে মুহূর্তে দেখলুম—কর্ম ধর্মের বিরোধী বলে বেদান্ত কর্ম ত্যাগ করতে বলেছেন, সেই মুহূর্তে সমস্ত ভক্তি শ্রদ্ধা ফুরিয়ে গেল। ধর্ম যদি কোটি অনাথের আর্তনাদ উপেক্ষা করে, বুভুক্ষিতের করুণ প্রার্থনায় রুদ্ধকর্ণ থেকে গুহা-গৃহে ধ্যান মগ্ন থাকতে উপদেশ দেয়, অধর্ম তবে কি বলবে? ধর্ম তো তা হলে মানুষের পরম শত্রু। সে হয়ত মুক্তি দিতে পারে (যদি পর-জন্ম থাকে) কিন্তু সে মুক্তির চেয়ে অনন্ত বন্ধনও বোধ করি খারাপ জিনিষ নয়! খদ্যোতের মত নিজের ক্ষীণ আলোতে জলার চেয়ে সূর্য্যের যে ভেদ-নীতি-হীন আলো ক্ষুদ্র পরমাণু থেকে মহামহীধরকে পর্য্যন্ত সমান আদরে কিরণ দান করছে তারি মধ্যে বেঁচে থাকা ভাল।"

যামিনী তার প্রশংসিত সেই পুষ্পগুচ্ছের সম্মান ভুলিয়া আত্মবিস্মৃতভাবে সুন্দর তোড়াটি হইতে একটা ফুটন্ত রক্ত গোলাপ লইয়া তার পাপড়ি ছিঁড়িতেছিল। অণিমার কথার শেষে সে তার মুখের দিকে নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিল। বিশ্বের বেদনাভার বক্ষে বহিয়া মূর্ত্তিমতী মমতা যেন তার সম্মুখে আবির্ভূতা। এই কি সেই নাস্তিকা নারী, যার চিত্ত ঈশ্বর-প্রেমের জ্যোতিঃহারা?

অণিমার সমস্ত দেহে গোধূলি আলোকের রক্তোজ্জলচ্ছটা বিকীর্ণ হইয়া স্বপ্নমায়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। হৃদয়ভাবের উচ্ছ্বাসে ঈষৎ আনত নেত্রে করুণার ধারা জাহ্নবীপ্রবাহের মত ঝরিয়া পড়িতেছে। অপার করুণার রাগিণী তার চিত্ত-বীণার তারে ঝঙ্কৃত হইতেছে। যামিনী কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, গভীর শ্রদ্ধার সহিত নিরুদ্ধ আনন্দে তার বক্ষ

স্পন্দিত হইল। রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিল,—"যদিও উপনিষদের মত সম্বন্ধে আপনি মস্তবড় ভুল বুঝেছেন, কিন্তু আপনার কারো কোন মত গ্রহণ করবার দরকার নেই। আমরা বিশ্বেশ্বরকে ধ্যান-নেত্রে দেখতে চাই, তাঁকে বিশ্বের ভিতর দিয়ে দেখিনে! আপনি যা' পড়েছেন ভুলে যান, যা' করছেন তাই করুন। ভারতবর্ষের লুপ্ত শক্তি আপনাদের আবাহনে জেগে উঠুক। যে কথা এই মাত্র বল্লেন সেই কথাই তো ভারতবর্ষের মর্মকথা। বেদান্তবাদ মানুষকে কর্মত্যাগ করতে বলেনি, গীতার ঐ মহাবাণীই তার শেষ কথা, কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

কখন গাড়ি-বারান্দায় একখানা গাড়ি আসিয়া থামিয়াছিল তার সাড়া তারা পায় নাই। মিলি যখন হাসিমুখে একগোছা জুঁই ফুল নাড়িতে নাড়িতে প্রবেশ করিল তখন তাদের চমক ভাঙ্গিল। অণিমা স্বপ্ন-জাগ্রতের মত নিজেকে সংযত করিয়া লইল এবং যামিনীর উচ্চারিত কথাগুলো মনে করিয়া লজ্জা বোধ করিল। মিলি তাদের ভাব দেখিয়া মনে মনে হাসিল।

অণিমার ঈষৎ অপ্রতিভ ভাব লক্ষ্য করিয়া সে খুশী হইল। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সুসঙ্গতার মৃত্যুতে নিশ্চিন্ত যামিনী অণিমার নিকট তাহাদের বিবাহ-প্রস্তাব তুলিতে বেশি দেরি করিবে না। শুধু যামিনী বলিয়া নয়, সকল পুরুষেই এই রূপ করে। বিশ্বাস ছিল অণিমাও তাহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবে না, কিন্তু সে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হইল। সুসঙ্গতার মৃত্যুর পর বেশি দিন গত হয় নাই, এরি মধ্যে যদি যামিনী তার কাছে প্রস্তাব করিয়া ফেলে তবে কি সুবিধা হইবে? অণিমা মেয়ে তো সোজা নয়। যামিনীর দিকে চাহিয়া তাহাকে বেশ প্রফুল্ল মনে হইল। তবে তো শুভ লক্ষণই! আপাততঃ আশার লোভ সম্বরণ করিয়া অণিমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"ইন্দ্রনাথ বাবুর মেয়েরা

আর তাঁদের সঙ্গে অন্য বাড়ীর মেয়েও এসেছেন, তাঁদের ওপরে বসিয়ে এসেছি। তুমি যাও আমি এখানে বসছি।"

মিলি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই যামিনী হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—"আপনাকে বলতে ভুলে গেছলুম—তাঁদের এখানে আসবার কথা ছিল।"

অণিমা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বলিল,—"তবে আমি ওঁদের কাছে যাই, কালকে এসে আপনার এ তর্কের মীমাংসা করে যেতে হবে, প্রকাশ-বাবু!" এই বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া গেল, যামিনীর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিল না, করিলেও হয়ত পাইত না। সেও বিষণ্ণভাবে একটু হাসিল। অণিমা তবে তার শেখা তর্ক-যুক্তি ছাড়িবে না, চিরকাল এমনি যুদ্ধ করিয়াই কাটাইবে? মনের সহিত মিল না হইলেও শুধু জিদ ধরিয়া নিজের মতকে বজায় রাখিয়া চিরদিনই সে নিজেকে বঞ্চনা করিবে? ইহা ভাবিয়া বেশ কিছুটা অশান্তি অনুভব করিল। নিজে সে ধর্ম্ম-তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ লইয়া উৎকণ্ঠিত আছে তা কিছু নয়, এই সুনিয়ন্ত্রিত সুশৃঙ্খল জগৎ, এই লক্ষ লক্ষ সৌরজগতের বিপ্লববিহীন নিয়মানুবর্ত্তিতা, ষড়ঋতুর ক্লান্তিহীন চিরসংক্রমণ, বিশ্বের মহাতাপসগণের অখণ্ড তপ-সাধন যে বিশ্ব-মন্দিরের অভ্যন্তরে এক বিশ্বদেবতার অধিষ্ঠানকে অনাদি কাল হইতে নিঃসন্দিগ্ধ অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছে, সে তাদের কোনক্রমেই অস্বীকার করতে পারে না, এ লইয়া যে কেনই বাদ-বিতণ্ডা ও তর্কের কচকচি ওঠে তাই সে বুঝিয়া উঠিতে অসমর্থ। মৃণালিনীর কাছে বিদায় লইয়া সেও তখনই উঠিয়া পড়িল। মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিশ্বরাজের অব্যাহত রাজশক্তির বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ তার রাজদ্রোহের মতই গুরুতর অপরাধ-জনক বলিয়া মনে হইল।

সন্ধ্যার পরে ইন্দ্রনাথ বাবুর কন্যাগণ বিদায় গ্রহণ করিল। ইতিমধ্যে

মিলি জ্যোৎস্নার গান শুনিল এবং অমলার বিশেষ অনুরোধে ও মিলির তাগিদে বহুদিন পরে অণিমার কণ্ঠও তার কণ্ঠশব্দ-বিস্মৃত গৃহাকাশকে বারেক চকিত করিয়া তুলিয়াছিল। যাইবার সময় অমলা যেন মুগ্ধ হইয়াই গেল।

অমলা জ্যোৎস্নাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মিস্ দত্তকে কেমন লাগল রে জ্যোতি ?"

জ্যোৎস্না মুখখানা বেজায় গম্ভীর করিয়া কহিল,—"বড্ড ভাল।" কথাটায় ঈষৎ যেন অনুযোগের আভাস ছিল।

অমলা হাসিতে লাগিল,—" 'বড্ড ভাল' হওয়াটা নিন্দের বিষয় নাকি রে ?"

মাথার বেণী দুলাইয়া জ্যোৎস্না উত্তর দিল,—"কি জানি, আমার যা' মনে হ'ল তাই বল্লুম। অত ভালর সঙ্গে কথা কইতেও যেন ভয় ভয় করে। ওঁর বিয়ে হয়নি কেন দিদি ?"

অমলা তার অপূর্ব্ব যুক্তি শুনিতে শুনিতে হাসিতেছিল, উত্তর দিল,—"বড্ড ভাল ব'লেই বোধ হয়।"

"তাই হবে। ওঁর উপযুক্ত বর কোথায় পাবেন ?—তাই,—না ?"

এবার অমলা হাসি থামাইয়া কহিল—"সম্ভব।"

ক'দিন এই নূতন কাজটার উৎসাহে কাটিয়া গেল। যামিনীও ইহার ব্যবস্থাপনার কার্য্যে রীতিমত উৎসাহের সঙ্গেই ব্যাপৃত রহিল, তাদের সেদিনকার তর্কটা তাই বর্ত্তমানে বা নিকট ভবিষ্যতে উঠিবার সম্ভাবনা রহিল না।

বাইশ

হিতসাধিনীর ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন যথাসময়ে সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু যতটা আশা ছিল ততটাই সুসম্পন্ন হইয়া উঠিল না।

ইন্দ্রনাথ বাবুর বন্ধু করুণাসিন্ধুর বাড়ীতে তাহার অনতিপ্রশস্ত উঠানে সামিয়ানা খাটাইয়া খানকতক কেদারা ও বেঞ্চ পাড়া হইতে চাহিয়া আনিয়া বসিবার স্থান করা হইয়াছিল। ছোট মেয়েটি শৈশব অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পদার্পণ করিলে সে যেমন অল্পদিনেই নূতন শ্রী ধারণ করে, 'হিত-সাধিনী'ও কিশোর বয়সে পা দিয়া তেমনি একটা অভিনব সৌন্দর্য্য লাভ করিল। অন্য বৎসর এই বাড়ীরই অপ্রশস্ত বৈঠকখানা ঘরে যে কার্য্য সম্পন্ন হইত এবারে উঠানটি তাহার স্থান অধিকার করিয়াছিল। সভার ভবিষ্যৎ আশার সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান চেহারাও বদল হইয়াছিল। সামিয়ানার বাঁশের খুঁটিগুলায় লাল সালু জড়াইয়া তার উপর দিয়া দেবদারুর পাতা ও বেলফুলের মালা জড়ানো হইয়াছিল। মাঝখানে একটি ছোট টেবিলের শুভ্র আস্তরণের উপরে কাচের ফুলদানিতে ফুলের তোড়া রাখা হইয়াছিল। মোটের উপর সভার অধিবেশন-স্থানটি দেখিতে নেহাৎ মন্দ হয় নাই। অনতিদূরে গ্রীষ্ম অপরাহ্ণের সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত-বক্ষ গঙ্গা, কর্ম্মীর কর্ম্ম-ক্লান্তি স্নিগ্ধ বাতাসে বিদূরিত করিয়া তাদের চঞ্চল তরণীগুলি গৃহপানে বহন করিতেছে। গোধূলির রাঙা আলোয় রঞ্জিত শুভ্রফেনপুঞ্জ-মুকুট ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ অস্ফুট রোলে ছুটিয়া আসিয়া তীরপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া যেন রূপার কাঠি স্পর্শিত দৈত্যপুরবাসিনী রাজকন্যার মত মুহূর্ত্তে মূর্চ্ছিতময় হইয়া পড়িতেছে। ঘাটে ঘাটে আসন্ন সন্ধ্যার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া গ্রাম্য নারীদের অলঙ্কারশিঞ্জন ও চঞ্চল হাস্য বাতাসের গায়ে সঙ্গীতময় শিহরণ তুলিতেছিল।

যার উদ্দেশ্যে 'হিতসাধিনী'র জীবন-পল্বলে নব-ধারা-জল বর্ষিত হইল, সে যখন সেই শান্ত মুক্তাকাশের তলায় সতোমথিত সমুদ্র-সলিলোত্থিতা কমলার মত তীরভূমে দাঁড়াইল, ঘাটসুদ্ধ লোক তো বিস্ময়ে কৌতুকে তার পানে চাহিয়া থাকিলই, কলিকাতা হইতে নবাগত যে বাবুর দল সদর্পে ধূলি উড়াইয়া এসেন্সের গন্ধে সলিলার্দ্র বায়ু-স্তরকে ভারাক্রান্ত করিয়া ত্রস্ত পথিককুলের চকিতনেত্রপটে বিস্ময়-রেখা অঙ্কিত করিতে করিতে খেয়াঘাটের অভিমুখে আসিতেছিল, তারাও মুগ্ধ বিস্ময়ে শৈবালবদ্ধ জলস্রোতের মত তারই পানে সকৌতুকে চাহিয়া দাঁড়াইল।

স্বপ্নবিভোর শিশু যেমন তার চারিদিকের সংসারকে কতটুকু আনন্দ বিস্ময় দান করিতেছে সে সংবাদে উদাসীন এবং নিজের সুখস্বপ্নে বিভোর থাকে, অণিমার চিত্ত তেমনি নিজের মধ্যে নিজে মগ্ন থাকিয়া তার চারি-পাশের সুখ-মোহ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। যে ইচ্ছা তাহার মনে তাহার জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে বহুকাল ধরিয়া উৎসের মতই হৃদয়ের চারিধার প্লাবিত করিয়া মুক্ত প্রবাহের আকারে বিশ্ব প্লাবিত করিয়া দিতে বাহির হইবার জন্য অন্তর ভেদ করিতে চাহিতেছিল, অথচ পাথর কাটিয়া পথ বাহির করিয়া লইতে পারিতেছিল না, আজ সেই উদ্দাম জীবনীধারা বাহিরে আসিবার পথ পাইয়াছে, কোন্ মৃত্তিকা-স্তরে তাহারি স্নিগ্ধ জলকণা সম্পাতে নবীন তৃণাঙ্কুর শিহরিয়া জাগিতেছে, কোন্খানে কোন্ উষর বালুর ধূসর কান্তি তারি পদস্পর্শে মুহূর্ত্তে সরসক্ষেত্রে পরিণত হইয়া উঠিতেছে, এ সংবাদ রাখিবার কি তার অবসর থাকে ?

আপনার অন্তরের সকুণ্ঠ সভীত হর্ষোচ্ছ্বাস লইয়া চঞ্চল সন্ধ্যাতারার মত সে যখন সেই তরুলতা-সমাচ্ছন্ন, দিবসের শেষ আলোকরেখাকীর্ণ বাঁকা পথে ফিরিয়া বিচ্ছিন্ন বনজালের মত অদৃশ্য হইয়া গেল এবং তার পশ্চাতের তারকা জলে স্থলে আকাশের নীলিমায় সর্ব্বব্যাপী হইয়া রহিল, তখন সেই

মোহিনীদৃষ্ট লম্বুঞ্চিত কেশকুন্তলের মধ্য হইতে একটা লঘু হাস্য ও নেত্র-ইঙ্গিতের বিদ্যুৎ সঘনে স্ফুরিত হইয়া উঠিল। এই বাবুর দল মফঃস্বল হইতে মাসখানেক হইল শিয়ালদহ স্টেশন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং একটি মাসে গ্রাম্যতা-দোষ মুক্ত হইয়া অনেক কীর্ত্তিই করিয়াছেন। এঁরা এখানে অনেকের কাছে অপরিচিত হইলেও আমরা এঁদের চিনি—এঁরা কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণ এবং কোম্পানি।

দীপ্তশিখা তারকাটি মেঘের অন্তরালে মিলাইয়া গেলেও মুগ্ধ শিশু যেমন ব্যাকুল নেত্র সহসা ফিরাইয়া লইতে পারে না, তেমনি সেই অতর্কিত-দৃষ্টা তরুণী মূর্ত্তি দৃষ্টির অন্তরালে অন্তর্হিতা হইয়া গেলেও বরেন্দ্রকৃষ্ণ সেই বনবীথির পানে বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাঁর মাথার মধ্যে সেই যুগল চরণের প্রতিধ্বনি যেন সঙ্গীতময় সেতারের তারের মত রিম্‌ঝিম্‌ করিয়া বাজিতেছিল।

পারিষদগণ পরস্পর হাসাহাসি করিতেছিল। তাদের পানে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমরা বাড়ী যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি। ভূষণচন্দ্র, তুমি আমার সঙ্গে থাক।" ভূষণ সগর্ব্ব-হাস্যে সঙ্গীদের পানে চাহিয়া ইঙ্গিত করিল, খুব একটা হাসির হিল্লোল পড়িয়া গেল।—সে হাস্যে পাখীরা নীড়ে ফিরিতে ফিরিতে চমকিয়া উঠিল।

শুভ্রকেশ-বৃদ্ধ দুজনেই স্মিত গম্ভীর মুখে অগ্রসর হইয়া নবীনা অতিথিকে বরণ করিয়া লইলেন। শুভ্রবসনা অমলা আসিয়া তার হাত ধরিয়া সভা-নেত্রীর আসনের নিকটে লইয়া গেল। ক্ষুদ্র তপোবন-গৃহে যেন এতক্ষণ এই সিদ্ধির দর্শন মাগিয়াই এই কয়টি পুরাতন ঋষি মিলিয়া এতদিন কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। আজ শুভক্ষণে শুভ-অবসরে যজ্ঞদেবের পূর্ণাহুতি-প্রাপ্ত প্রসন্ন যজ্ঞেশ্বর সেই হোমানলশিখার মধ্য হইতে মধুর হাস্যতরঙ্গ

শ্রীরূপিণী হইয়া আবির্ভূত হইলেন। ভক্তি-স্নেহে ভাবুক ইন্দ্রনাথের উভয় নেত্র অশ্রুভারে রুদ্ধদৃষ্টি হইয়া আসিল। প্রণতা অণিমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অঙ্গনের দিকে চাহিয়া গদ্‌গদস্বরে কহিলেন, "মঙ্গলাচরণের যে নিয়ম আছে, আমরা এই প্রত্যক্ষ ভারতীকে বন্দনা ক'রে সেইটি পালন করলুম। বড় সুখী হয়েছি মা।"

অণিমা লজ্জায় ছল ছল নেত্রে আরক্তগণ্ডে মুখ নত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তার কুন্দধবল ও অকুণ্ঠ কুমারী মূর্ত্তি জ্ঞানালোকদীপ্তা অনাদি জননীকেই যেন মুহূর্ত্তের জন্য স্মরণ করাইয়া দিল। নম্রস্বরে সে কহিল, "আমায় ঘরের মেয়ের মতন ক'রে কাছে ডেকে নিন বাবা। অতদূরে ঠেলে রাখবেন না।" পিতৃ-সম্বোধন করিতে সহসা তার চোখ দুটি জলের আভাসে ঈষৎ আর্দ্র হইয়া আসিল। পিতৃস্নেহ সে হারাইয়াছে ভাবিয়াছিল—বুঝি জন্মের মতই হারাইয়াছে। কিন্তু না, আজ তার মনে হইল যা থাকে তা' একেবারেই ফুরাইয়া যায় না, তা যদি যাইত তবে এই পিতৃবয়সী বৃদ্ধের ক্ষীণনেত্রে সেই স্নেহ-কোমল দৃষ্টি, কণ্ঠে সেই একই স্নেহের আভাস কেন ?

সভার সামান্য কার্য্য। এই সমিতিটির মধ্য দিয়া বালিকা বিদ্যালয় গঠনের বিষয়েই কথাবার্ত্তা হইল।

করুণাসিন্ধু বাবু তানপুরা সহযোগে প্রারম্ভিক প্রার্থনার গান করিলে সকলে যামিনীকে প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইবামাত্র সবেগে দ্বারে করাঘাত করিয়া কেহ উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "করুণাসিন্ধু বাবু বাড়ী আছেন ?"

যামিনী তখনও আসন গ্রহণ করে নাই, সে-ই দ্বার খুলিয়া দিতে গেল।

দ্বারে দাঁড়াইয়া যে ডাকাডাকি করিতেছিল সে ভূষণ। যামিনী দ্বার খুলিতেই সে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল, "আপনি করুণাসিন্ধু বাবু ? আচ্ছা

তা নাই হোন। এই গলির মোড়ে কুমার বাহাদুর দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে ডেকে নিয়ে আসুন। অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছেন আপনারা।" স্বরটা আদেশের এবং অসন্তুষ্টির।

বিস্মিত যামিনী লোকটার আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কুমার বাহাদুর! কে, তিনি? এখানে তো আজ কোন কুমার বাহাদুরের আসবার কথা ছিল না।"

আগন্তুকটি বিরক্তিতে অধীর হইয়া উঠিতেছিল, অপ্রসন্নভাবে হাসিয়া কহিল, "কথা না থাকলে কি আর আসতে নেই? আপনাদের পরম সৌভাগ্যি যে আজ এখানে কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের পায়ের ধূলো পড়ছে। জমিদার বরেন্দ্রকৃষ্ণর নামটা অবশ্য শোনাই আছে? কেমন, না?"

কুমার বাহাদুরের পরিচয় দিয়া ভূষণ সগর্ব্বে যামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। সে ভাবিয়াছিল শ্রোতা এবার নিঃসন্দেহ ভক্তিবিস্ময়ে তটস্থ হইয়া ছুটিবে, কিন্তু সেরূপ কোন উদ্যোগ না দেখাইয়া যামিনী একটু বিরক্তভাবেই বলিল, "আপনারা বোধ হয় জানেন না এখানে আজ একটি বিশেষ প্রাইভেট সভার অধিবেশন হয়েছে। এই ঘরে বসুন একটু, আমি করুণাসিন্ধু বাবুকে পাঠিয়ে দিচ্চি।"

যামিনীকে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া ভূষণচন্দ্র একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আরে যাও কেন, শোনই না কথাটা। এখানে মেয়েমানুষের বক্তিমে হচ্ছে শুনে আমাদের কুমার সাহেব দেখ্‌তে এয়েছেন। করুণাসিন্ধুকে নিয়ে আমরা কি করবো?"

মুহূর্ত্তে যামিনীর মুখ গভীর ঘৃণাপূর্ণ অবজ্ঞায় রক্তিম হইয়া উঠিল। সে সবেগে বলিয়া উঠিল, "মশায় ভদ্রমহিলার নাম কি ক'রে উচ্চারণ করতে হয় তাই যখন জানেন না, তখন কোন্ সাহসে তাঁদের সামনে যেতে

চাইছেন ? এটা ত সাধারণের সভা নয়, ভদ্রলোকের বাড়ী”,—বলিয়া সে দ্বার বন্ধ করিতে গেল।

জমিদারের স্নেহপুষ্ট দুর্দ্দান্ত ভূষণ জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্তই তাদের পল্লীগ্রামে সাধারণের কাছে বাহ্যিক পূজা ও উচ্চসমাজে আন্তরিক গালি খাইয়া আসিতেছে, তার উদ্ধত চরিত্র ও অবাধ মুখরতার ভয়ে বড় কেহ কখনও তার মুখের উপর তাকে কোন কথা বলে না, বা কোন অসম-সাহসিকতা হইতেও বাধা দেয় না, চোখ লাল করিয়া সে সদর্পে বলিয়া উঠিল, “হ্যা ! সভায় দাঁড়িয়ে বক্তিমে করছেন যিনি, তিনি নাকি আবার ভদ্দরমহিলা ! রেখে দাও তোমার ভদ্দরয়ানির ওসব চালাকি।”

যামিনী ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িল। প্রহৃত ব্যক্তি আততায়ীর প্রতি যেমন উন্মত্তরোষে দণ্ড উদ্যত করিয়া ফিরিয়া দাঁড়ায় তেমনি করিয়াই সে ফিরিয়াছিল, কিন্তু তখনই গভীর ঘৃণায় একবারমাত্র তার পানে তীব্র কটাক্ষ হানিয়া সবেগে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। এত নীচ যে তার সঙ্গে কি হইবে তর্ক করিয়া !

দ্বারের বাহির হইতে অপমানিত ভূষণচন্দ্র শাসাইল, “বুঝেছি মশাই ! এখানে একটা গুপ্ত সভা বসেছে। আচ্ছা, আমরাও দেখে নোব ’খন। এ বড্ড হেঁজিপেঁজি পাওনি বাবা ! পুলিসথানায় যাচ্ছি।”

যামিনীর একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সংবাদটা ইন্দ্রনাথবাবু ও করুণাসিন্ধুকে দিতেই হইল। শুনিয়া ভালমানুষ ইন্দ্রনাথ বলিলেন, “তা’ না হয় আ একবার বাড়ীর মধ্যে যান, ওরা আসে তো নয় আসুক, মিথ্যে একটা গোলমাল করতে পারে। ঐ কথা যদি সাতটা করে পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের কানে তোলে কি হতে কি হয়ে যাবে।” করুণাসিন্ধুও তাঁর রজতকেশমণ্ডিত মস্তক আন্দোলন করিয়া সায় দিলেন, বলিলেন “দিনকাল বড়ই খারাপ পড়েছে হে। এনার্কিস্ট আতঙ্কগ্রস্ত কর্তারা সব কিছুর মধ্যেই ওর গন্ধ পান।”

অণিমা ও অমলা যামিনীর মুখের দিকে চাহিল। দু'জনকারই দৃষ্টিতে বিরক্তিপূর্ণ কৌতূহলের আভাস ছিল। যামিনী ভ্রূকুঞ্চিত করিল। তার ললাট গাঢ় রক্তিমায় কালো হইয়া উঠিয়াছিল। দৃঢ়স্বরে কহিল, "কোন-মতেই না, যাক্ পুলিসে, অতবড় ছোটলোকদের বাড়ীতে ঢুকতে দিতে আছে?"

দুইটি নারীর চারিটি উৎসুক নেত্রই প্রশংসায় উজ্জল হইয়া উঠিল।

কিন্তু সেই যে সাংঘাতিক শাসনে ভূবণচন্দ্র শাসাইয়া গেল বৃদ্ধের দল সে শাসানি ভুলিতে পারিলেন না। একটু পরেই একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা হইয়া সেদিনকার অধিবেশন সমাপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু প্রার্থনারম্ভেই যে অণিমা তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গিয়াছিল ইন্দ্রনাথ বাবু বা তাঁর বন্ধুরা লক্ষ্য না করিলেও যামিনী এবং অমলা উভয়েই উহা লক্ষ্য করিয়াছিল এবং এই পর্য্যবেক্ষণের ফলে অমলা বিস্মিত ও যামিনী দুঃখিত হইল। বিদায়-কালে অমলা তাহার সঙ্গে আসিতে আসিতে মৃদুস্বরে তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল, "আপনি কি হিন্দু?" অণিমা অন্যমনে বাঁশপাতার মর্ম্মরের সহিত মিশ্রিত সান্ধ্য বায়ুর অস্ফুট আলাপ শুনিতেছিল। সন্ধ্যারাগিণীর ইমন কল্যাণে সে যেন আজ তার কণ্ঠ মিলায় নাই। শয্যা-তলে শায়িত শিশু চিত্তকে কৌতুক বিস্ময়ে পূর্ণ করিয়া ঠাকুরমার মুখে যেমন অসম্ভব রূপকথার স্রোত বহিতে থাকে, তেমনি করিয়া সে বংশ-শিশুদের মধ্যে অনর্গল যেন কৌতুক-কাহিনী বকিয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যা দেবী নদীতীরে দাঁড়াইয়া অনিমেষ নেত্রে শান্তিভরা জগতের পানে চাহিয়া ছিলেন। ক্লান্তিমগ্ন সমস্ত বিশ্বচরাচর যেন বিরাম মাগিয়া তাঁরই পদপ্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছে। গ্রামের মেয়েরা ঘাট ছাড়িয়া ধূম্র-মলিন রান্নাঘরে বিশ্রম্ভালাপ ও কৌতুকহাস্য অসঙ্কোচে উৎসারিত করিয়া দিয়াছে এবং পারের যাত্রীগণ খেয়া নৌকায় পারের দিকে বাহিয়া চলিয়াছে। সে ঈষৎ চমকিয়া মুখ

দিয়াছিল। আপনাকে সে এতক্ষণ যেন প্রকৃতির মতন অনন্তের মধ্যে লয় করিয়া রাখিয়াছিল, শান্ত প্রাকৃতিক সন্ধ্যার স্নিগ্ধ-অঞ্চলের তলে বিলীন করিয়া দিয়াছিল এবং তার হৃদয় যেন সেই বিশাল বিশ্বের বিস্তৃতা প্রকৃতিরই অদৃশ্য কল্যাণ্‌শ্রী-স্পর্শ লাভ করিয়া তাঁরই মত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এই প্রশ্ন এক মুহূর্ত্তেই সেই অভ্যন্তরীণ উল্লাস-স্রোতকে থমকিয়া থামাইয়া দিল।

সে ধীর কণ্ঠে কহিল, "না, আমি হিন্দু নই।"

অমলা একটু প্রফুল্লভাবে কহিল, "তা' হ'লে বোধকরি আমাদের মতন ব্রাহ্মই আপনিও?"

একটা কিছু হইতেই হইবে? মানুষ শুধু মানুষ থাকিতে পাইবে না? কেন? সে তো হিন্দুকেও আপন ভাবিতে কোন দিন দ্বিধা করে নাই, ব্রাহ্মকেও না। তবে তারাই বা তাহাকে লইয়া এমন করিয়া ভাগ বাঁটো-য়ারা দলাদলি করিতে চায় কেন? তার ভেদনীতি-বিহীন বিশাল প্রেমকে গণ্ডি দিয়া বাঁধিবার জন্য জাহ্নবীর পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র পুষ্করিণী নির্ম্মাণ করিবার এ প্রয়াসের—এ উদ্যমের কি কিছুমাত্র আবশ্যকতা আছে? হিন্দু হিন্দুই থাক, ব্রাহ্ম যা তাহাই থাকুন সে কেবল মাত্র প্রকৃতি দেবীর হস্তবিরচিত একটি ক্ষুদ্র তুচ্ছ মানবসন্তানই থাকিয়া গেলে সমাজ-সংসারের কতটুকুই বা ক্ষতি? সন্ধ্যার লক্ষ লক্ষ উজ্জ্বল তারকার মধ্যে বৃহৎ একটি তারকা তার মুখের উপর সমস্ত করুণাকিরণটুকু উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিল, অদূরবর্ত্তিনী গঙ্গায় সান্ধ্যবায়ুর কলতান উঠিয়াছে, অণিমা দাঁড়াইয়া পড়িল নক্ষত্রা-লোকে অমলার মুখের দিকে চাহিয়া সে সহজ স্বরেই তার প্রশ্নের উত্তর দিল, "আমি ব্রাহ্ম নই।—খৃষ্টান, বৌদ্ধ মুসলমান কিছুই আমি নই, শুধু একজন ভারতীয় নারী—এইটুকুই আমার সমস্ত পরিচয়।"

অমলা নির্ব্বাক্ হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, সে মনে মনে

একমনে একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা করিয়া বসিয়াছিল, সেই মুহূর্তেই বুঝিল তার কোন ভিত্তি নাই। মনে মনে বিস্ময়ানুভবও করিল, নারী? নারী কি এমনি পাষাণী হয়? মনে যার কোন ধর্মের স্থান নাই!

তেইশ

ভূষণ যখন বরেন্দ্রকে হুগলীর পরিত্যক্ত পৈতৃক বাগানবাড়ীতে আনিয়া আবদ্ধ করিয়াছিল তখন সে স্বপ্নেও জানিত না যে তার মৃত্যুবাণ ইহার পাশাপাশিই অবস্থান করিতেছে! মাষ্টারমশাই ছেলের এবং তার পরে-পরেই আরও দু একটি ছেলেমেয়ে এবং পত্নীর টাইফয়েডের জন্য সেখানে জড়াইয়া পড়িলেন। পৈতৃক গৃহটি নষ্ট হইতে বসিয়াছে তাহাকে সংস্কার করিতে উৎসুক হওয়ার মধ্যে তিনি কোন অন্যায় দেখিতে পাইলেন না এবং হুগলী কলেজে ভর্ত্তি হওয়াতেও আপত্তিজনক কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া খুশী হইয়াই ইহাতে সম্মত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই এর জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দেশে ম্যালেরিয়া এবং রাজসাহীর বাসায় থাকার চাইতে খোলা গঙ্গাতীরের মুক্ত বায়ুতে নিজ গৃহে থাকা তার শরীর-মনের পক্ষে উপকারী হইবে এই ভাবিয়া তিনি বরঞ্চ মনে মনে খুবই তুষ্ট হইলেন। কলিকাতার প্রলোভনের ও ভিড়ের বাহিরে এ স্থান যথেষ্টই ভাল।

এদিকে ভূষণ এখানে নূতন বিপদের সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সেদিন অকস্মাৎ অনিমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর হইতেই বরেন্দ্রর ভাব-গতিক তার বড় ভাল ঠেকিতে ছিল না, এবার বরেন্দ্রের মত শিক্ষিত ছেলের প্রাথমিককার নূতনত্বের চমকটাও যেন স্তিমিত হইয়া আসিতেছে, সে

আর ডালিমের জন্ত উৎসুক হয় না, বেশ বুঝিতে পারে তাদের সঙ্গও তাকে আর যেন তেমন করিয়া আকর্ষণ করে না। একদিন মরীয়া হইয়া গিয়া বলিল, "পিত্তেযোর তৈরী একটা ভূতুড়ে বাগানবাড়ী জুটে গেছে বলে সেইখানেই কি শেকড় গেড়ে বসতে হবে না কি? এর কোন মানে হয়? কলকাতার পার্ক স্ট্রীটের বাড়ীটাই বা কি অপরাধ করলে শুনি।— মুটিস দিয়ে ভাড়াটে উঠিয়ে দিন, যদ্দিন না ক্লীয়ার হচ্চে, অন্য ভাল বাড়ী দেখে চলে চলুন। এখেনে আছে কি! ডালিমকে হপ্তায় দুদিন এদ্দূরে টেনে আনার খরচা কিছু কম লাগচে?"

বরেন্দ্র চিন্তিতমুখে উত্তর করিল, "নাঃ, এবার আমায় দেশে ফিরতেই হবে ভূষণ! মাষ্টারমশাই বড় দুঃখিত হয়েছেন। এই দেখ না, আজ সকালেই চিঠি পেয়েছি। চিঠিখানা তাঁর চোখের জলে ভেজা, লেখা জায়গায় জায়গায় জেবড়ে গেছে। বাস্তবিক ভাল তো আমায় কম বাসেন না, আমায় আদর্শ জমিদার, আদর্শ মানুষ তৈরী করবার সাধ তাঁর কি প্রচণ্ড তাও তো আমি সবই জানি। তাঁকে কষ্ট দেওয়া আমার সঙ্গত হবে না। আমি বাড়ীই ফিরে যাই।"

ভূষণ মুখভঙ্গী করিল, "তাতো সত্যি! ভালো তিনিই একা বেসেছেন! আমরা গরীব, আমরা মুখ্যু, ভালবাসাবাসির কি ধার ধারি! আমাদের তাঁর মতন আপনাকে উচ্ছুগ্যু করে পয়সা লোটারও সুযোগ ছিল না, আজও নেই। ম্যানেজারী তো আর আপনার এস্টেটে আমাদের জুটবে না, বড় জোর একটা কারপরদাজীই জুটতে পারে, পিওন হতে পারি হয়ত। বেশ তাই যান। ওঁর পিছে পিছে পোষা মেনি বেড়ালটির মতন ঘুরে বেড়ান গিয়ে,·চাকরী ওঁর বজায় থাক। ছাতটির মুঠো যেন না খুলতে হয়, বজ্র-আঁটুনি দিয়ে রাখুন বেঁধে আপনাকে।"

বরেন্দ্র কি ভাবিল। সত্যই তো! এই স্বাধীন ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন-

যাত্রার তীব্র স্বাদ পাওয়ার পর আবার সেই নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন! সে কি আর সে পারিবে! বলিল, "তা তুমি বড় মিথ্যেও বলোনি, না? আমার চাইতে চাকরীর উপরই তাঁর মায়াটা বেশী, না? চিঠিতেও তো খালি খালি ঐ সব কথা, খরচপত্রের কথাই বেশী করে লেখেন। যেন চান, আমি তেমনি মোটা সুতোর ধুতি কামিজ পরে বই নিয়েই ডুবে বসে থাকি, আর ওঁর হাত-তোলাতেই জন্ম কাটাই, তাই না?"

ভূষণ ডানহাতটা ভঙ্গী করিয়া উল্টাইল, "আমি আর কি বলবো! সে নিজেই আপনি বুঝে নিন না। এ তো আর রক্তের টান নয়, অর্থের টান। আপনার চোখ দুটি যাতে না খুলতে পারে তারই চেষ্টা। ওখানে গেলে ঘুষ খেয়ে মতিরামপুরের জমিদার-কন্যেটির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে গেরস্থালী পাতিয়ে দেবেন। সে বাড়ীর কর্ত্তাটিকে তো চেনেন? ম্যাষ্টেরেরও বাবা! জামাই বলে রেয়াত করবে? মেয়ে তো তার জগদম্বা!"

বরেন্দ্র বিব্রত হইয়া উঠিল, "তাই নাকি। কই সে কথা তো আমায় কিছু লেখেননি। না না।"

"হ্যাঁ! হ্যাঁ! লিখবেন কি জন্যে? আপনি তো তার হাতের গোলাম! একেবারে তুরুপ মেরে দেবেন, কানটি ধরে নিয়ে গিয়ে। নৈলে, বলে, 'মাছ মরেছে বেড়াল কাঁদে, শাস্ত করলো বকে! আর বেঙের শোকে সাঁতার পানি দেখি সাপের চোখে।' হুঁঃ যত সব!"

বরেন্দ্র উত্তেজিতভাবে বলিল, "নাঃ, সে সব হবে-টবে না! বিয়ে আমি ওদেশে করবো না, তাহ'লে এখন সেখানে ফেরা আমার পক্ষে নিরাপদ নয় দেখছি। মুখোমুখি হয়ত ওঁর সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে পারবো না, হয়ত—"

ভূষণ চোখ পাকাইল, "আলবৎ পারতে হবে! কিসের দুঃখে পারবেন না শুনি? ওঁর কি চ্যারিটি বয় ছিলেন না কি এ যাবৎ? খাইয়ে পরিয়ে এত বড়টা করেছেন বুঝি?"

মাষ্টার দ্বিতীয় দফা প্রবেশ করিলেন, প্রথম সম্ভাষণের কুশল-মঙ্গল বার্তা বিনিময় শেষ হইতেই বিলম্ব না করিয়া [illegible] কণ্ঠে সহজ ভাবেই কাজের কথা পাড়িয়া বসিলেন, বলিলেন, "বেশ বরেন! সবই তো তোমায় দিয়েছি। ম্যানেজার মশাইএর হঠাৎ কাল হওয়ায় কালেক্টার সাহেব আমায় ডাকিয়ে সব আদায় তো আমার ঘাড়েই ফেলে দিলেন। ইদানীং পিতুড়ী মশাই তো বড্ডই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। জমিদারীর আদায়-টাদায় গত সন থেকে ভাল রকম হয়নি, তার উপর এ বছরের বন্যা গেল। বুঝছ ত কী ব্যাপার! এখানে আর দেরি করবার সময় নেই, আমরা আজকের আসাম মেলেই এসো রওনা হয়ে যাই। বাড়ীতেও সব রোগে ভুগছে। নেহাৎ তোমার বড্ড দেরি দেখে আর চুপ করে বসে থাকতে পারলুম না, ছুটে এলুম।"

ভূষণ তাঁহাকে একটুখানি আড়াল দিয়া ভেংচি কাটিল, "বেশ তো, আপনার কাজের তাড়া, বাড়ীর অসুখ, আপনিই না হয় আজকে ফিরে যান না, ওনার তো আর বাড়ীর অসুখও নয়, আর তশিলদারীও করবেন না, দুদিন পরেই নয় ধীরে সুস্থে যাবেন।"

মাষ্টার সরোষে কহিলেন, "তুমি চুপ কর ভূষণ!" বরেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "শোন বরেন, সত্যি কথাই বলছি, এদের হাতে তোমায় আমি এমনি অসহায় করে ছেড়ে যেতে পারবো না। এখানে পা দিতে না দিতেই অনেক কথা আমার কানে এসে পৌঁছেচে, তোমায় যেতে হবে।"

বরেন্দ্র বিব্রতভাবে মাথা চুলকাইয়া বলিল, "আজই? সে কি করে হবে।"

ভূষণ চোখ পাকাইয়া বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে ধমকের সুরে কহিয়া উঠিল, "উনি আর আপনার হাতের ওয়ার্ড নন, এখন আপনার মনিব। ওঁকে টিকি ধরে বা কান ধরে টেনে নিয়ে যাবার কোন্ অধিকার আপনি দাবী

করেন ? এদের হাতে না [illegible] আপনার হাতে থাকছেন [illegible] আর বাধ্য নন, [illegible]।"

মাষ্টার মশাই চমকিয়া উঠিলেন, "বরেন ! তুমি কি ওকে এমন কথা আমায় বলতে অধিকার দিয়েছ ?"

বরেন্দ্র লজ্জিত অথচ বিপন্নভাবে বিজড়িত কণ্ঠে অস্পষ্টভাবে উত্তর দিল, "না না, ঠিক তা নয়, তবে আজই যাওয়া—।"

মাষ্টার নিষেধের ভঙ্গীতে হাত তুলিলেন, "থাক আর বলতে হবে না। এমন করে মানুষের মতন মানুষ করে এতখানি অধঃপাতের পথে তোমায় ছেড়ে যেতে প্রাণ আমার হাহাকার করে কাঁদতে চাইছে কিন্তু উপায় নেই ! ভূষণ আমায় মনে করিয়ে দিয়েছে, আমি এখন তোমার গার্জেন নই, মাইনে খাওয়া চাকর ! দেখতে পাচ্ছি এ পথের অনেকখানিই তুমি এরই মধ্যে এগিয়ে গিয়েছ ! যাক্ ভগবান তোমায় রক্ষা করুন ! ফিরে গিয়েই তোমার অধীনের এই চাকরী থেকে রিজাইন দোব, তোমাকেও জানিয়ে গেলুম। আশীর্ব্বাদ করি শীগ্ গিরই তোমার সুমতি ফিরে আসুক, নিজের ভুল বুঝে এইসব জম্বুকদের হাত থেকে তুমি যেন আত্মরক্ষা করতে পার। আমি চল্লুম।"

ভূতপূর্ব্ব অভিভাবক চলিয়া গেলেন। বরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল, ব্যগ্রস্বরে ডাকিয়া উঠিল, "কাকাবাবু ! কাকাবাবু ! যাবেন না, যাবেন না।" চলিতে উদ্যত হইয়া পা বাড়াইল,—"শুনে যান কাকাবাবু !—"

ভূষণ হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল, "আহা হা ! বসুন না, অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? যাচ্ছেন আবার কোথায় ? ম্যানেজারির ফাঁদে পা বেঁধে রেখে এসেছেন, যাচ্ছেন ঠিক সেইখানেই। সে নাকি আবার ছেড়ে দেবেন। ছোঃ—"

উত্তর দিকের বাড়ীর বারান্দার দিকে চাহিয়া চলিতে উদ্যত চরণ

নামাইয়া বরেন্দ্র সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল, "ভূষণ! ভূষণ! দেখ দেখ, সেই মেয়ে না? যাকে একদিন মহিলা সমিতিতে বক্তৃতা দিতে যেতে দেখেছিলুম?"

অনিমার বাড়ীর বারান্দায় খোলা চুলে পারিপাট্য-বেশভূষণে অণিমা দাঁড়াইয়া ছিল, এদিকে চোখ পড়িতেই সে গায়ে পিঠে কাপড় টানিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

বরেন্দ্র বিমুগ্ধভাবে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, "এ কে ভূষণ! অপূর্ব্ব রূপ! যেন সরস্বতীর প্রতিমা!"

ভূষণের মনটা বিগড়াইয়া ছিল, সেটা আরও বিগড়াইয়া গেল, "কে আবার! একটা বিলাত-ফেরতা জজের মেয়ে। ধুম্বী ধাড়ী মাগী একটা, বিয়ে করেনি, যত সব ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে ভাব করে করে বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে বেড়ায়। কলকাতায় অমন ঢের আছে। চলুন না, সব দেখাবো, পরিচয় করিয়ে দেব, কত চান?"

বরেন্দ্র স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে আত্মগত কহিতেছিল, "মাষ্টার মশাই আমার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন। হ্যাঁ আমি বিয়ে করব। হলেই বা বিলাত-ফেরৎ, এখন ওসব আর মানামানি নেই। ডাকো, ডাকো তাঁকে, ভূষণ ছুটে যাও, ডেকে আনো মাষ্টার মশাইকে।"

ভূষণ বরেন্দ্রের হাত চাপিয়া ধরিয়া থাকিয়া জবাব দিল, "কেন ডাকব! ডাকের ওপর মন্‌সার ঘটটিও দিয়ে দিতে? ঘটকালি যদি করতেই হয়, আমি করতে জানিনে? নয় ঘটকালির পয়সাটা ওঁর মারাই গেল, গরীব ভূষণই নয় সেটা ট্যাঁকে পুরলো। আপনার লোকসানটা কি?"

বরেন্দ্র ব্যগ্রভাবে ভূষণকে জড়াইয়া ধরিল, "সেই ভাল, সেই ভাল, ওঁরা পুরানো স্কুলের লোক, হয়ত বিলাত-ফেরৎ বলে মত করবেন না। তা' বটে! কিন্তু ওকেই আমি বিয়ে করব, না হলে আর করবই না জেনে রেখো।"

"হুঁ। বলে 'বেঁচে থাকুক চূড়োবাশী, কত শত মিলবে দাসী।' হুকুম করুন না, ক'গণ্ডা অমন মেয়ে চান? দেখুন না কদিন লাগে।"

"না না, গণ্ডা-কণ্ডা নয়। ওই ওঁকেই আমি চাই। ওঁকেই আমি চাই। পারবে তুমি ভূষণ? তাহলে এখন থেকেই খোঁজখবর করতে থাকো। আমার দেরি সইবে না।"

ভূষণ হাসিল, "হয়ে যাবে মশাই! হয়ে যাবে। আপনিই না সেদিন বলছিলেন, সেই কি একটা ইংরেজী গৎ, 'নন্ বট্ ব্রেভ্ ডিজার্ভ দি ফেয়ার!' তাই না?"

বরেন্দ্র আনমনাভাবে সেই বারান্দাটার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অস্পষ্ট-স্বরে ডালিমের মুখে শোনা গানের একটা কলি মৃদু মৃদু গাহিয়া উঠিল,—

"ভাল করি পেখন ন ভেল,—
মেঘমালা সঙ্গে তড়িতলতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল।"

চব্বিবশ

চেষ্টা যখন কর্ম্মের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে এবং সেই কর্ম্ম যখন সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন শ্রান্তিহীন আনন্দ মানুষকে আপনা-আপনিই টানিয়া লইয়া চলে।

বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাথমিক কার্য্যারম্ভ স্বল্প দিনের মধ্যেই হইয়া গেল। একটি ট্রেনিং পাশ এবং একটি প্রবেশিকা অনুত্তীর্ণা শিক্ষয়িত্রী সেখানে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু এ দিকের ব্যবস্থাদি হইয়া উঠিলেও হাইস্কুল খোলার জন্য মেয়ে সংগ্রহের সম্বন্ধেই বিশেষ বেগ পাইতে হইল। অণিমা অনিচ্ছুক ও বিরক্তচিত্ত মৃণালিনীকে সঙ্গে লইয়া লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিল

এবং অধিকাংশ স্থলেই কাটা কাটা উত্তর পাইতেও লাগিল, কিন্তু এবার সে দমিল না।

যেখানে নিজেকে অপমানিত বোধ হইত, সমস্ত ভারতবর্ষের মানচিত্র-খানাকে চোখের সম্মুখে আনিয়া মনের আসনে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া ইষ্টদেবতার মূর্ত্তির মতন প্রাণপণে তাহারি পানে চাহিয়া দেখিত। দুই হাত মনে মনে যুক্ত করিয়া তাহাকে দেবী বলিয়া, মা বলিয়া ডাকিত এবং দেশের জন্ম যদি এটুকু সে সহিতে না পারিবে, তবে দেশের প্রতি তার ভালবাসা কোথায়,—এই বলিয়া নিজেকে তীব্র অনুযোগে বারংবার ধিকৃত করিয়া অনুতপ্ত ক্যাথলিকের মত আপনাকে কঠিন করিয়া লইত।

যামিনীও মেয়েদের পুরুষ অভিভাবকদিগের নিকট ধর্ণা দিতে অবশ্য কসুর করে নাই, তবে কাজ উভয় স্থলেই খুব বেশী অগ্রসর হইত না। আত্মাভিমানকে সম্পূর্ণরূপে বলি দিতে না পারিলে যে দেশকে ভালবাসিতে পারা যায় না, এ বিশ্বাস অবশ্য তাদের দুজনকারই ছিল এবং উহাই তাদের মনোবলকে অটুট রাখিয়া ছিল।

অণিমা মিসেস্ বিংহামকে একখানা পত্র লিখিল। বিংহাম সাহেব হুগলীতে অল্পদিন মাত্র আসিয়াছেন। খুলনায় থাকিতে মিসেস্ বিংহামের সহিত অণিমার পরিচয় ছিল। তাঁরা যে সম্প্রতি এখানে আসিয়াছেন, সে সংবাদ সে জানিত, কিন্তু তাঁহারা তার বর্ত্তমানের সংবাদ জানিতেন না। পত্রের উত্তরে আগ্রহপূর্ণ নিমন্ত্রণ আসিল।

অণিমা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ী গিয়া তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং সে যে উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছে ইহা জানাইয়া তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করিতেও সে এবার আর কুণ্ঠা বোধ করিল না। স্কুলের সহিত ম্যাজিস্ট্রেট-পত্নীর সংস্রব থাকিলে যে তাহার শ্রী বদলাইয়া যাইবে, সে কথা সে জানিত এবং যামিনীও তাহাকে এই কথা বলিয়াছিল, কিন্তু সূক্ষ্ম একটা

আত্মাভিমান এতদিন ধরিয়া তাহাকে এই সহজ উপায়টুকু অবলম্বন করিতে দেয় নাই, বরং যামিনী এ কথা পাড়িতে গেলে সে বিরক্তির সহিত হাসিয়া বাধা দিয়া থামাইয়াই দিয়াছে। তাদের মাতৃ-পূজায় বিদেশী শাসনকর্ত্তার শাসন-হস্তকে সে কেন ভিক্ষা করিতে যাইবে? নিজেরা কি এতই অক্ষম? এতটুকু সামান্য শক্তিও কি তাদের মধ্যে নাই, যে এত ছোট একটি সাধারণের কাজের জন্য জয়চাঁদের মত বিদেশীয় শক্তিকে আহ্বান করিয়া সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক প্রতিবেশীদের জোর করিয়া স্ব-মতে আনিবে? এতদিন তার যুক্তিটা এইরূপই ছিল। যারা নিজেদের ভালকে ভাল বলিয়া চিনে নাই, বলপ্রয়োগেও তাদের তা বুঝানো হয়ত অনুচিত না-ও হইতে পারে, শিশু অগ্নিকে ক্রীড়া-বস্তুবোধে দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে যায়, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে কাঁদাইয়াও কোলে চাপিয়া ধরিতে হইবে, না, হাত পুড়াইতে ছাড়িয়া দিতে হইবে? এতে ক্লাইভ বা মহম্মদ ঘোরির দ্বারা স্বদেশীর প্রতি প্রতিশোধ ব্যাপারের মত হীন কার্য্য করা হইবে না, এ কথাও সে অনেকবার ভাবিয়াছে, কিন্তু তথাপি স্বাবলম্বনে যে একটা উগ্র আত্মমর্য্যাদার লোভ আছে, তাহারই উচ্ছ্বাসে সে এ অধীনতা কিছুতেই যেন স্বীকার করিতে পারে নাই। নিজেদের ক্ষমতার ও একতার একান্ত অভাবে শেষে একদিন তাকে বাধ্য হইয়াই এ অবস্থা মানিয়া লইতে হইল।

হৃদয়ের এই বুভুক্ষা লইয়া পাশের বন্ধ-করা জীর্ণ দ্বারের পানে চাহিয়া পড়িয়া না থাকিয়া যদি একটু দূরে যার তাকে দিবার মত শক্তি আছে, তারই দ্বারে গিয়া দাঁড়ায়, তবে তো অনায়াসে সে নিজের সঙ্গে তার চারিদিককার তীব্র বুভুক্ষার কথঞ্চিৎও দূর করিতে সমর্থ হইতে পারে।—এতে দোষই বা কি এমন? আর সেই ভিক্ষার তণ্ডুল-মুষ্টি তো আর বিদেশের আমদানী নয়, তারই পড়শীর ক্ষেত্রোৎপন্ন।

এই প্রকারে নিজেকে সে ভুলাইল, কিন্তু একটু দ্বিধা কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না, যদি সে প্রত্যাখ্যাত হয়। দেশের লোকের জন্য সে তাদের দ্বারে শতবার গিয়া হাত পাতিতে লজ্জাবোধ করে না, কিন্তু বিদেশীর কাছে যদি মান খোয়াইয়াও ভিক্ষাপাত্র শূন্য লইয়া ফিরিতে হয়, সে বড় সাংঘাতিক। অহংটা এখনও যে ঘাড় বাঁকাইয়া ওঠে।

মিসেস্ বিংহাম অণিমার উদ্দেশ্যের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তার সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। তারপর হঠাৎ তিনি তাঁহার প্রফুল্ল নেত্রদ্বয় তাহার সুকৃষ্ণ নেত্রের ছায়াতলে স্থির করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমি মনে করেছিলাম, এতদিনে তুমি মিসেস্ রায়ে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছ। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট—কি যেন রায়,—তোমার সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা চলছিল না সেই সময়ে ?"

অণিমার সদ্যোবিকশিত গোলাপের মত গণ্ডদ্বয় মুহূর্ত্তে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই তাহা পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর রক্তিম হইয়া উঠিল, কিন্তু কথার স্বরে সে তার মানসিক চাঞ্চল্য কিছুমাত্র প্রকাশ করিল না, সহজ স্বরেই বলিল, "তিনি এখন এইখানেই আছেন। তাঁর একটি ছোট্ট মেয়ে আছে, তাকে একদিন নিয়ে আসবো, আপনার কিটির সঙ্গে খেলা করবে।" এই বলিয়া সে ম্যাজিস্ট্রেট-পত্নীর বাহুবেষ্টনে বদ্ধ এবং তাহারই পানে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে নিবদ্ধদৃষ্টি মোমের পুতুলের মত ফুটফুটে মেয়েটির সোনালী রং-এর চুলগুলির উপর সস্নেহে হাতখানি রাখিয়া তার সমুদ্র-জলের মত স্বচ্ছ নীল চোখের পানে সস্নেহে চাহিল।

ইংরেজের মেয়ে যদিও নির্ভীক ও চটপটে, তথাপি কিটি এই কালো চোখের দৃষ্টিতে সঙ্কুচিত হইতেছিল। মা হাসিয়া মেয়েকে চুম্বন করিয়া উহাকে অণিমার দিকে একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "কিটি যাও, তোমার

মাসীমার কাছে যাও, তুমি এঁকে কখন দেখনি, তাই চেনো না, ইনি আমার পুরনো বন্ধু।"

তিনি অণিমার ঐ কথাতেই তাঁর প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছিলেন। কিন্তু যামিনী রায় যে কেন তাহাকে ত্যাগ করিয়া দারান্তর গ্রহণ করিলেন, ইহা তাঁহাকে কৌতূহলী করিয়া তুলিল। মনের সরল ভাব প্রকাশ করা তাঁদের শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, তাই প্রশ্ন করিলেন না।

বিদায়কালে সাগ্রহ কণ্ঠে মিসেস্ বিংহাম পরদিনই অণিমার গৃহে যামিনীর সহিত স্কুল সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

মিসেস্ বিংহামের অতি সামান্য চেষ্টাতেই আশাতিরিক্ত ফল ফলিল। স্কুল চলিবার মত মেয়ে স্বল্প দিনেই স্কুল-বাড়ীকে কলরব-মুখরিত করিয়া তুলিল। অণিমা স্কুলটিকে হিন্দু মেয়েদের জন্য বিশেষভাবে বিশিষ্টতা দিতে অভিভাবকদের মনস্তুষ্টির জন্য একটি নারী-সমিতি গঠন করিবার প্রস্তাব করিল, কিন্তু কমিটির সভ্য হিসাবে অণিমা, অমলা এবং নামে মাত্র মৃণালিনী ভিন্ন আর কাহাকেও পাওয়া গেল না। একজন হিন্দুঘরের মেয়েকে ভিতরে রাখিবার ইচ্ছায় অণিমা যামিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া এখানের বড় উকিল নবীনবাবুর স্ত্রীকে গিয়া ধরিল।

যখন তারা নবীনবাবুর বাড়ী আসিল, তখন দিবানিদ্রা সারিয়া সদ্যো-নিদ্রোত্থিতা গৃহিণী তাঁর সোনার শাঁখা রুলি ও দশগাছা রাধা-বিনোদিনী প্যাটার্নের চুড়ি-পরা মোটা হাতখানির উপর মাথার ভার রাখিয়া অর্দ্ধ-শায়িতাবস্থায় রূপার ডিবা হইতে অনেক রকম মশলা দেওয়া চৌকা করিয়া মোড়া একটি সাজা পান তুলিয়া লইয়া তাহাতে একটি সুগন্ধি সুর্ত্তি গুলি স্থাপন করিতেছিলেন। পিছন দিকে একটি বিধবা আত্মীয়া বসিয়া স্বল্প কয়গাছি গন্ধতৈল-সিক্ত কেশ নাড়িয়া দিতে দিতে ছোট বধূর বিবিয়ানী ও ছোট কর্ত্তার বউ লইয়া আদিখ্যেতার নিন্দা করিয়া শ্রোত্রীর আনন্দ

বর্জন করিতেছিল। অদূরে একটি ধরুখকে মাজা পিক্দানি ও ভিজা গামছা রক্ষিত আছে। দাসী সঙ্গে করিয়া একেবারে সেই ঘরেই তাদের লইয়া আসিল। মৃণালিনী তাকে খবর দিতে বলায় দাসী একটু সৌজন্যের হাসি হাসিয়া কহিল, "নাগো, তোমরা আসুন, মা ঠাকুরুণ কিছু বল্‌বেকনি। সে সেই সঞ্জেবেলা উঠে কাপড় কাচ্‌বে, এখন কি সে ওঠে। তাদের দেখিয়া একটি ছোট মেয়ে দৌড়িয়া গিয়া দলে খবর দিল, একটুখানি পরেই রঙীন ও ডুরে সাড়ী ও ছিটের জ্যাকেট পরিয়া পরিয়া অনেকগুলি মেয়ে ও বউ তাদের দেখিতে জড়ো হইল। কাহারও ললাটের সবটুকু ঢাকিয়া চুল নামাইয়া পিছনে সোনার চিরুনি দেওয়া বৃহৎ কবরী রচনা হইয়া গিয়াছে, কাহারও এলো চুল তখনও অবেণী-বদ্ধ, ললাটখানিকেই পাতা কাটিয়া ঢাকা দেওয়া হইয়াছিল, সেই অবস্থাতেই কৌতূহল চরিতার্থ করিতে আসিয়াছে। কালো রংয়ের একখানি করিয়া সিকি পয়সার মাপের পাথুরে পোকার টিপ সব মেয়েগুলিরই ললাটপটের শেষ চিহ্নটুকুকেও ঢাকিয়া রাখিয়াছে। গৃহিণী ততক্ষণে বুকের উপর স্খলিত অঞ্চল টানিয়া এবং মুখের মধ্যে পানটি পুরিয়া সোজা হইয়া বসিয়া গলার কেবল্ প্যাটার্নের মোটা নেক্‌লেস্-গাছিকে সোজা করিয়া দিতে দিতে তাদের দিকে চাহিয়া আপ্যায়িতের স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি, মেম সাহেব যে! এসো, এসো, কি ভাগ্যি! কোন্ ঘাটের জলে আজ মুখ ধুয়েছিলুম গো। ওরে দুটো কেদারা নে'আয়,—সেই লাল মখমলের কুশন-আঁটাগুলো"—অণিমা ঈষৎ অগ্রসর হইয়া বলিল, "থাক না, এইখানেই বসছি আমরা।" গৃহস্বামিনীর বহুবিধ ব্যগ্র নিষেধ সত্ত্বেও তাহারা ভিতরের প্রকৃত তত্ত্ব না বুঝিয়াই ভেলভেট কেদারার লোভ ছাড়িয়া তাঁহার বিছানার একটি প্রান্তে বসিয়া পড়িল। ইতঃপূর্ব্বেই সঙ্গের সেই পথ-প্রদর্শিকা দাসী ঊর্দ্ধশ্বাসে কেদারা আনিতে বহির্বাটীতে ছুটিয়াছিল।

গৃহিণী পিকদানিতে পানের ছোপ ফেলিয়া গামছা দিয়া মুখ মুছিয়া হীরার নাকছাবিটি ঠিক করিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর? কি মনে করে মেম সাহেব? ইস্কুল তো তোমার ভালই চলছে? আমার ছোট খুকি পড়চে কিনা,—সে এসে তোমার কত গল্পই যে করে, বড্ড সে তোমায় ভালবাসে। ঐ যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসচে। নে আয় না, কাছে এসে বোস।"

অণিমা সেই দিকে চাহিতেই একটি হৃষ্টপুষ্ট কালো কোলো আট বছরের মেয়ের হাসিভরা দুটি চোখের উপর চোখ পড়িয়া গেল। মেয়েটি মুখে কাপড় দিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল, সে ডাকিলে কাছে আসিল না, তার পাশের দশ বছরের দিদিটির পিছনে গিয়া মুখ লুকাইয়া হাসির মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া দিল। সব মেয়েগুলিই আপনাদের মধ্যে চুপি চুপি কি বলাবলি করিতে করিতে তাদের দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল। মিলি জিজ্ঞাসা করিল, "ও মেয়েগুলি সবই আপনার? পাঁচটি মেয়ে বুঝি? ওঃ—ছেলের বউ দুটি? তা ঐ দুটি মেয়েও তো ছোট্ট আছে, ওদের স্কুলে দেননি কেন?"

যাদের লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা হইল, তাদের একজনের বয়স দশ এগার ও অন্যের বছর তের চোদ্দ হইবে। দুজনেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বড় মেয়েটির কোলে একটি মাস তিনেকের ছেলে। ছেলেটি কেবলি কাঁদিতেছে, বোধ হয় অসুস্থ বলিয়া। নিতান্ত দুর্ব্বল।

মেয়েরা এই কথা শুনিয়া লজ্জায় মুখ লুকাইল। মা আশ্চর্য্য হইয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "ওরা ইস্কুলে যাবে কি গো! পটলির তো কোলে ঐ কচি ছেলে, তার রোগা।—নিজেরও রোগ নানানখানা। আর হাবিরও তো এই বে হয়েছে। বে হলেও অনেকে যায়। তা ভাই যে যে যায় সে যায়,—আমাদের ঘরে সেটি হবার যো নেই। বাব্বা!

বেয়াই কি তা হ'লে আমাদের আর আস্ত রাখবেন! তাঁরা খুব বড় লোক কি না,—আর সমস্ত বনেদী ঘর। পাল্কীর চারধারে দরওয়ান ঘিরে তবে বউ পাঠান। বাবুকে নিজে গিয়ে আনতে হয়। বাড়ীর ভেতর একটি বারো বছরের ছেলে শুদ্ধ ঢুকতে পায় না, এমনি ওদের কড়াকড়ি। ছোট বউমা! যাও না মা! গোটাকতক ছাঁচি পান সেজে নিয়ে এস দেখিনি বাছা, এঁদের জন্যে। সেই কটকী রূপোর সোনার কলাই দেওয়া ডিবেটায় ক'রে এনো। বার করাই আছে। আর দাসীদের কাউকে বলো আমার 'বাবু গড়নের' রূপোর ঘটিতে ক'রে ঠাণ্ডা খাবার জল এনে দিক।"

ছোট বধূ রূপার ডিবেয় পান আনিতে চলিয়া গেল। দশ বছরের মেয়েটি এই সময় মার কাছে আসিয়া তাঁর কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি একটা কথা বলিয়াই লজ্জায় আড় হইয়া তাঁর কোলের উপরে মুখ লুকাইল। মা হাসিয়া অণিমার মুখের দিকে চাহিলেন,—"শোন একবার মেয়ের কথা! ওঁর বাজনা শেখবার সাধ হয়েছে, তা ভাই তুমি যদি রোজ না প্যার, একদিন অন্তর করে এসেও না হয় ওকে একটুখানি শিখিয়ে যাও তো হয়। আমি গাড়ী পাঠাব 'খন, তোমার ভাই তা বল্লে গাড়ী ভাড়া লাগবে না। আমার পাঁচটা ঘোড়া তিনখানা গাড়ী, দরকার হলে বরং তুমি অন্য সময়েও চেয়ে পাঠিও, তাও একখানা পাঠিয়ে দোব। কোন্ সময় আসতে পারবে তাহ'লে? আমাদের তো খাওয়া-দাওয়া চুকতে দুটো বেজে যায়।"

অণিমা কিছু বলিবার পূর্ব্বে মিলি সবেগে বলিয়া উঠিল, "ওকি রোজ কখন্ বাজনা শেখাতে আসতে পারে? শিখবে যদি তা হলে বরং আমরা যে অন্তঃপুর-শিক্ষা-সমিতি করবার চেষ্টা করছি সেটা করে ফেলি। আপনারা আরও দু'চারটি মেয়ের বন্দোবস্ত করুন না, একটি শিক্ষয়িত্রী

বাজনা সেলাই পড়া সবই শেখাতে পারবেন। মাসে মাসে প্রত্যেক ঘর থেকে পাঁচ টাকা ক'রে দিলেই হবে।"

গৃহিণী ঈষৎ চিন্তিতভাবে উত্তর দিলেন, "তা'কি আর বাবুরা মত করবেন! ও রকম চটিজুতো-পরা গুরুমাগুলো বাড়ী আসা পছন্দ করলে হয়। তোমরা তবু ভদ্রলোকের মেয়ে, তাই বলছিলুম। আচ্ছা জিজ্ঞেস করবো 'খন—খাও না ভাই, পান খাও না, ছোট বউমা বেশ পানটি সাজেন। খুব বড় লোকের মেয়ে বটে, তবু কাজের খুব। আমার বাড়ী আর কাজ কি যে করবে? ঐ ব'সে ব'সে দরজির মেয়ের মতন সেলাই-ফোঁড়াই করে! এঁরাও তাই দেখে ঝুঁকে পড়েন, তা' আমি ওদের বলি—না বাপু সেলাই শিখে কি হবে, ও সব তো বাজারেই কিনতে পাওয়া যায়। বাবুর আমাদের বড্ড সাহেবী ধরণধারণ কি না, লেডলার বাড়ী থেকে নিত্যি সব পোষাকপত্তর খোসবো-টোসবো সমস্ত আসচে। শুধু শুধু আঙ্গুলগুলোয় ছুঁচ ফুটিয়ে হাতে কড়া পড়িয়ে ছোটলোকের মেয়েদের মতন শক্ত ক'রে তুলতে হবে না।"

অণিমার মনে কার্য্যসিদ্ধির আশা ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, তথাপি সে এইবার চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া এক নিশ্বাসে তার বক্তব্যটা বলিয়া ফেলিল। তাঁহাকে কিছুই করিতে হইবে না, শুধু নারী-সমিতির মাসিক অধিবেশনে একবার স্কুল গৃহে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়া একটা হাঁ, না—বলা মাত্র, অথচ ইহা হইতেই তাদের এই প্রাণান্ত পরিশ্রমের ফল স্কুলটির উন্নতি হওয়া সম্ভব। শুনিয়া নবীন বাবুর স্ত্রী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কপালে তুলিলেন, "আমি! তবেই হয়েছে! শোন কথা! আমি কি স্কুলে যেতে পারি! ও মা! তা'হ'লে আমার জামাই কুটুম সব বলবে কি গো! বলবে না কি, বুড়ো বয়সে এ মাগির ধেড়ে রোগে পেয়েছে। তারা যে সব মস্ত মস্ত লোকগো! তা ছাড়া ভাই সেখানে তোমাদের

পুরুষবন্ধুরা যায় শুনতে পাই, মেয়েরা সব আসে,—আমি তো বুক ধড়ফড় করে ব'লে শীতকালেও গায়ে একটা জামা রাখতে পারিনে, আমায় তোমরা ছেড়ে দাও ভাই। আমাদের কি তোমাদের মতন মেম হ'লে চলে ? মনে করতেও হাসি পায়। ও মা! কি কথা বলো মেম সাহেব! হেসে মরি যে।"

গৃহিণী হাসিতে হাসিতে পানের ছোপ ফেলিয়া আর একটি পান লইয়া মুখে দিয়া আশ্রিতা বিধবাটির পানে চাহিলেন—"যাও না গো খুড়ি! হাঁ করে বসে আছে কেন, এঁদের জন্যে দু থাল খাবার সাজাওগে না। সাদা পাথরের বাসনে দিও না, লোহার সিন্দুকে সব কত্তি কত্তি রূপোর বাসন ঠাসা রয়েচে, বড় বউমাকে বলো বা'র ক'রে দেবে। কোল্‌কাতার খাবার আছে সেই সব দিও, আর আঙ্গুর-টাঙ্গুর বেশি ক'রে দিও,—কোল্‌কাতায় আমাদের বারো মাস ত্রিশ দিন লোক যাচ্ছে আস্‌চে শুধু ঐ জন্যেই। বাবু এখানের খাবার খেতে পারেন না, আর কাউকে খেতেও দেন না। এখানে ভাল কিইবা পাওয়া যায়।"

খুড়ী চলিয়া গেলেন, কিন্তু কলিকাতার খাবার খাইবার লোভে ইহারা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, অণিমাকে একটু টিপিয়া দিয়া মিলি একেবারে সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এমন সময় খাওয়া আমাদের অভ্যাস নেই। না, না, আজ আর খাবো না, বড্ড জরুরী কাজ আছে, আমরা আজ যাই।" এই বলিয়া সে অণিমার হাত ধরিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। "না, না তা কি হয়।—একটু মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়বো না ভাই।" বলিতে বলিতে গৃহিণী তাঁর স্বর্ণমণ্ডিত স্থূল দেহখানি শয্যা হইতে উত্তোলন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিলেন। "এসো না ততক্ষণ বাড়ী ঘর সব দেখো। এই তো প্রথম এলে। ঐ দিকটা নূতন হয়েছে, দুই ছেলের জন্যে, এই দিকে আমরা সব থাকি। মেয়েরা আমার দিকেই

থাকে। এসো বৈঠকখানা দেখিয়ে আনি। কর্ত্তা তো আজ বাড়ী নেই। এই সব নূতন ছবি জাপান থেকে, ইটালি থেকে আনানো হয়েছে। এ ঘরের ঐ সব বড় বড় আয়না, কেদারা, কোচ সবই নূতন কেনা হয়েছে। পুরনোগুলো বড় ছেলেকে দিয়ে দিয়েছেন। পনেরো হাজার টাকার জিনিসই কেনা হ'ল। হাবির বে'র সময় তাদের সব খাওয়াবো বলে এক সঙ্গে ডজন হিসেবে রূপোর বাসন গড়িয়েছি। তারা খুব বড় লোক কিনা, গয়নায় মেয়েকে সর্ব্বাঙ্গে ঢেকে দিয়েছে। তোমার মতন 'বুরুজ' ওর চেয়ে ঢের ভাল ভাল গোটা দশেক দিয়েছে। সবই হীরের আর মুক্তোর। এক গাছা হীরের কণ্ঠি দিয়েছে, তার দাম বাবু বললেন, পঁচিশ হাজারের কম হবেই না। দেখা না লো হাবি। ওঁদের বার করে সব দেখা না, দিব্যি জিনিসটি না? সবই কমল হীরে। শুনলুম এক রত্তির কম ওজনের একটাও নেই। কায়েমী জিনিস একেবারে। এর নাকি কক্ষনো বাজার দর কমে না।"

অণিমা মৃদু হাসিয়া কহিল, "আজ বেলা গেছে, আজ আর সবই একসঙ্গে দেখবো না। একদিন ওকে বরং পরিয়ে নিয়ে যাবেন। যাবেন তো একদিন আমাদের বাড়ী?"

"তোমাদের বাড়ী? তা দোষ নেই তো কিছু যাবার, না হয় যাবই না। তবে শুনতে পাই আজ কাল যামিনীবাবু নাকি ওখানেই চব্বিশ ঘণ্টা থাকেন—"

অণিমা অপমানিত, লজ্জায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল। মৃণালিনীও ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, সে তীব্রভাবে কহিল, "চব্বিশ ঘণ্টা কেমন করে ওখানে পড়ে থাকবেন? তাঁর নিজের কি কোন কাজ-কর্ম্মই নেই? মধ্যে মধ্যে আসেন বই কি। উনিই তো এর সম্পত্তির একজিকিউটার।"

গৃহিণী একটু মুচকি হাসিলেন, "তাতেই বা দোষ কি? তোমাদের

তো অমন হয়েই থাকে ভাই। তা বিয়েটা এবার হবে কবে ?"

"কার ?" বলিয়া মিলি বিরক্তি-মিশ্রিত বিস্ময়ের সহিত তাঁর মুখের পানে চাহিল, অনিমা তাঁর কথার নিগূঢ় অর্থ বুঝিয়া লজ্জাতে আরক্ত মুখ নত করিল। তাদের চারিদিক ঘেরিয়া মেয়ে ও বউগুলি পরিহাসের স্ফুট ও অস্ফুট হাসি হাসিতেছিল।

নবীনবাবুর স্ত্রী একটি রূপার ফুলদানি আঁচল দিয়া মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "কেন, এঁর সঙ্গে যামিনীবাবুর বিয়ে হবে না ?"

"কে বললে ?" বলিয়া মিলি ঈষৎ ক্রোধের মধ্যেও একটা অদম্য কৌতূহলের সহিত অনিমার গম্ভীর মুখের দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিল। গৃহস্বামিনী হাসিয়া কহিলেন, "ওমা! এ ত দেশ সুদ্ধ লোকেই বলচে, কে না জানে তাই বলো ? এতো আর লুকো-ছাপা নেই।"

পঁচিশ

স্কুল চলিতে লাগিল। অনিমার কাজের দুঃখ মিটিয়া গেল, তথাপি তার চিত্তক্ষোভ ঘুচিল না। ধূপ আপনার গন্ধ-সম্ভারের সহিত আপনাকেও যেমন করিয়া নিঃশেষে বিলাইয়া দেয়, তার নূতন কর্ম্মাস্বাদ-প্রাপ্ত চিত্তও যেন তেমনি করিয়া তার সবটুকু সঞ্চয়কে বিশ্বপূজা-গৃহের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া দিতে চাহিতেছিল, কিন্তু তেমন সুপ্রশস্ত কর্ম্মভূমি পাইতেছিল না। 'দুধের স্বাদ ঘোলে মেলে না'—কথাটা মিথ্যা নয়। বলাই বাহুল্য লেডিস্ কমিটির প্রেসিডেন্ট হইলেন ম্যাজিস্ট্রেট-মহিষী। তিনি যেদিন প্রথম স্কুল দেখিতে আসিলেন, একটুখানি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন স্কুলের মেয়েদের বেশভূষা দেখিয়া। পূর্ব্বদিন মেমসাহেব আসিবেন বলিয়া

মেয়েদের একটু পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিতে বলা হইয়াছিল, তাহারা সেদিন তাদের ঘরে যার যা কিছু নিমন্ত্রণের সজ্জা সঞ্চিত ছিল সমস্তই পরিয়া আসিয়াছে। গালে মেজেন্টা রংএর আলতার চক্র এবং সোনালী জরি-মোড়া আঁটা-সাঁটা খোঁপার উপর কাপড়ের কৃত্রিম ফুল পাতা ও পুঁতি-লাগানো জরির কাজ-করা জাল। কাহারো ঘন গোলাপী, সবুজ, বড় জোর ফিরোজা রংএর জাপানী সিল্কের হাতে-কোঁচা-লাগানো জরি-লেস দেওয়া জ্যাকেট, সাড়ী। কাহারো বা ফ্রক পরা, তারই উপর চওড়া একটা যে-কোন জিনিষের কোমরবন্ধ। পায়ে মল ও মলের নীচে জুতা মোজা। কোন কোন মেয়ের গলায় তার মায়ের গলায় ডায়মণ্ড কাটা চিক ও উপর হাতে জামার উপর তাবিজ এবং নীচে হাতে চারগাছা করিয়া চওড়া কলিপাতা প্যাটার্নের চুড়ি। চুড়িগুলির কল্যাণে ঊর্দ্ধবাহু ঋষির মত মেয়েটির হাত দু'খানি উঁচু করিয়াই রাখিতে হইয়াছে, যেহেতু তার কৃশ হস্ত হইতে চুড়ি-গুলি যে কোন মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়িতে পারে। মিসেস্ বিংহাম সকৌতুকে তাদের বেশভূষা দেখিতেছেন দেখিয়া অণিমা লজ্জাবোধ করিল।

তিনি এক সময় তার কাছে আসিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "মেয়েরা স্কুলে এসেছে না 'বল'-এ এসেছে ?"

সে অবশ্য গম্ভীর মুখে চুপ করিয়াই রহিল। তাঁর সঙ্গে হাসিতে যোগ দিতে পারিল না। মনে তার লজ্জার বড় বহিতেছিল। আসিবার সময় মেয়েদের ডাকিয়া বলিয়া দিল, "যেদিন মেম বা কেউ স্কুলে আসবেন, তোমরা সাদা কাপড় ও সাফ জামা পরে এসো, এত সেজে এসো না।

শিক্ষয়িত্রী কহিলেন, "দেখুন তো। আমি তো এদের বলে বলে হায়রান হয়ে গেছি, তবু কোনমতেই এদের সঙ্গে পারি না। সেদিন কুমুদের মা এসেছিলেন, তাঁকে এই কথা বলাতে তিনি চটে গিয়ে বললেন, যাতে মেয়েকে একটু ভাল দেখাবে, সেই রকম করেই সাজাতে হবে তো, মেয়-

সাহেব আসবেন। কুসুম—সেই চুড়িপরা মেয়েটি—একটু লজ্জিত ভাবে হাসিয়া মুখ নীচু করিল। মিলি টিপিয়া বলিল, "আপনি বললেন না কেন সে তো আর মেয়েকে ক'নে দেখতে আসছেন না।"

সকলেই হাসিতে লাগিল। জনকতক মেয়ে হাসিয়া একেবারে গায়ে গায়ে লুটাইয়া পড়িল, কুসুমই শুধু আঁচল দিয়া মুখ ঢাকিল। শিক্ষয়িত্রী তাড়া দিলেন, "স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারো না তোমরা এক তিল।"

অণিমা রাগ করিল না, তাদের পানে চাহিয়া স্নেহপূর্ণ অনুযোগের সহিত মৃদুস্বরে কহিল, "অমন ক'রে কি হাস্‌তে আছে।" কিন্তু তথাপি সেই উৎকট হাসি থামাইতে পারা গেল না।

বেলা পড়িয়া আসিলেও সূর্য্য তখনও অস্ত যায় নাই। ভৈরবের মস্তকস্থ জ্যোতির্ম্ময় জটাজালের মত তাঁর সহস্র রশ্মি দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। গঙ্গার চলন্ত স্রোতের মুখে মুখে সেই প্রদীপ্ত কিরণরশ্মি শত সহস্র তড়িৎ-স্ফূর্ত্তির মত চঞ্চল হইয়া জ্বলিতেছে। ওপারে গৌরীপুর মিল সারাদিন ধরিয়া অশ্রান্ত পরিশ্রম চালাইয়া বিশ্রামের অবসর করিয়াছে। গঙ্গাতীরের গাছপালার মধ্য দিয়া ঘাটের সিঁড়িগুলি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে, প্রায় তা জনবিরল।

সেদিন মিলির হঠাৎ নৌকাভ্রমণের সখ হইল। নলিনীকে লইয়া যামিনী আসিয়াছিল তাহারই চায়ের নিমন্ত্রণে। সে প্রস্তাব করিল একটুখানি নৌকায় বেড়িয়ে ফিরে এসে চা-পর্ব্ব করা যাবে। রমেন তখনও কোর্ট হইতে আসে নাই। নৌকাখানি খোলা, ছপ্পর ছাওয়া নৌকা নয়, পানসী। নৌকার ভিতর অণিমা নলিনীকে তার কোলের কাছে টানিয়া লইল এবং নলিনীও তার সুললিত বাহুটির উপর তেমনি আদরে গলিয়া হেলিয়া পড়িয়া তার অর্দ্ধ অনাবৃত শুভ্র বাহু জড়াইয়া ধরিল। মিলি গৌরীপুরের সুবৃহৎ কল-বাড়ীর

দিকে চাহিয়া তার প্রকাণ্ড চিমনির মধ্য হইতে নিঃসৃত বৃহৎ একটা অজগর সর্পের স্থায় ধূম-কুণ্ডলীর তির্য্যক গতি-লীলা দেখিতেছিল। যামিনীর দৃষ্টি হঠাৎই যেন ঘুরিয়া একটি পুষ্পিত লতার উপর আর একটি আশ্রিত ক্ষুদ্রতর লতার আশ্রয় মুগ্ধনেত্রে দেখিল। এদের পরস্পরের এই নৈকট্য-নির্ভরতা তার মনে একটা আকস্মিক অপূর্ব্ব স্পন্দনে বিদ্যুদ্গর্ভ মেঘের দিকে চাহিয়া ময়ূরের মত নাচিয়া উঠিল। এই দুখানি বাহুই তার জীবনের দুই দিক হইতে কর্ম্ম, প্রেম ও আনন্দ লইয়া লতাইয়া উঠিয়াছে, এমন ধারণা সহসা উদিত হইয়া তাকে যেন চমকাইয়া দিল। একি অনুভূতি এর মধ্যে এমন স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। কেন? কেন? আজ সে তার এই অধিকার স্বভাব-লব্ধ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল এবং ইহাতে তার বুকের ভিতর আতঙ্কের আকস্মিক ছায়া ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। এই মেঘছায়া তার শরীরে বিদ্যুৎ সঞ্চার করিতে লাগিল। সেকি সুখের না দুঃখের, না ব্যথার না আনন্দের তাতো জানা গেল না। জানিবার মত শক্তি ছিল না মনে। স্কুল-প্রতিষ্ঠার সাহায্য এবং ইত্যাদি সে তো আজ নয়, অনেকদিন হইতেই করিয়া আসিতেছে। সে তো তার পাঠাবস্থাতেই টিউটারীও করিয়াছে, তারপর—যাক সে কথা, এ সবই তার পক্ষে যথেষ্ট গৌরব ও ঈপ্সার হইলেও নূতনত্ব ছিল না। বিপদের দুর্দ্দিনেও সে তার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং সেও পরিবর্ত্তে তারও জীবনের দুঃখভার নিজের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার জন্ম ব্যথিতচিত্তে তার পাশে আসিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এই দুই কর্ম্মসঙ্গী কর্ম্মাবসানে বিশ্রাম অবসরে কোনদিনই তো প্রবিষ্ট হইতে অবসর বা সুযোগ লাভ করিতে পারে নাই। সে চিরদিন তাকে ব্রতচারিণী কুমারীর মূর্ত্তিতেই দেখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কল্যাণমণ্ডিতা নারীরূপে কোন্‌দিনই বা দেখিতে পাইয়াছে? তাদের বিবাহের কোর্টশিপ বা যাই বল, কথা যখন

উঠিয়াছিল, তখনও কি এই রূপ তার চোখে পড়িয়াছিল,—না। তখন দেশের কথা দশের বার্ত্তাতেই তারা মশগুল ছিল, নিজেদের হৃদয়-বার্ত্তা কে রাখিয়াছে। জীবন-বিনিময়পণবদ্ধ হইয়াও হৃদয়-বিনিময়ের অবসর কি তাদের ঘটিয়াছিল? কে জানে! তাই আজ যখন এই জাহ্নবীর কিরণমণ্ডিত শ্বেতধারার উপরে শ্বেতপক্ষ-বিস্তারিত পাখীটির মত পান্সী-খানির মধ্যে অণিমা তাহার মাতৃহীনা মেয়েটিকে নিজের মাতৃ-হস্ত দিয়া স্নেহমাখা করুণায় টানিয়া কোলের কাছে গ্রহণ করিল, তখন হঠাৎ সে একটা আকস্মিক নূতনত্বে বিস্মিত হইয়া নূতন শ্রদ্ধায় তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল। কুমারী বাণী যেন সহসা মধ্যাহ্ন-লক্ষ্মী রমায় পরিবর্ত্তিতা হইয়াছেন। আজ তাহার এই স্নেহ-ব্যক্ত ভাবখানিতে এই শরতের নির্ম্মল সন্ধ্যায় কি নূতন উজ্জ্বলতা, কি মাধুর্য্য তাহার সেই শান্ত মুখশ্রীতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যাহা সে তাহার বুদ্ধিতে উজ্জ্বল ও কর্ম্মেচ্ছায় উদ্দীপিত মুখে আর কখনও দেখে নাই। সমস্ত অবয়বে সেই একই শান্ত দৃঢ়তা, একই সুসংযত কল্পনা-প্রবণ ভাব, কিন্তু এখন তাহার মধ্যে কর্ম্মোদ্দীপনার দীপ্তি-টুকু না থাকাতে তাহা যেন সেই শরৎ-সায়াহ্নের মৃদু উজ্জ্বলতার সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। যামিনীর হৃদয়ের মধ্যে এই জল ও বায়ুর হিল্লোলের মতই একটা আনন্দের হিল্লোল যেন অস্ফুট কাকলীতে মৃদু মৃদু আঘাত করিতে লাগিল। বসন্তের পুষ্প মুকুলটির মত তাহারি স্পর্শে যেন তার মুদিত চিত্তের পাপড়িগুলি আপনা আপনি খুলিয়া আসিতেছিল। সে বিস্ময় বোধ করিল।

জলের ধার ঘেঁষিয়া জল-তরঙ্গের মত কাশ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। বাতাসে সেগুলো ঢেউয়ের মতই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, নদী-তীরের অশ্বত্থ বট পাকুড় আম তেঁতুল প্রভৃতি গাছে গাছে নানা জাতীয় পাখী ডাকিয়া উঠিতেছে। রাশি রাশি কদম্ব ফুল গাছের মাথা ভারী করিয়া

নিম্ন মুখে ঝুলিয়া থাকিয়া স্থানটাকে যেন রাসমণ্ডপের মত অনির্ব্বচনীয় রূপ দিয়াছে। জলে স্থলের সেই অপূর্ব্ব নির্জ্জনতার উপর দিয়া যেন একটি কর্ম্মাবসানের বাঁশী কোন্ অদৃশ্য কুঞ্জ-বিতানের মধ্য হইতে তার চির পুরাতন সুরটি ধরিয়া গৃহমুখীন পল্লী-বধূদের সজল চরণচিহ্ন মৃত্তিকা-পটে অঙ্কিত করিতেছিল।

এই সম্মোহন হইতে মিলি যেন চমক ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিল, সে তার সঙ্গীদের পানে চাহিয়া দেখিল। কাহারও মুখে কথা নাই, ওই ধ্যানস্তব্ধ প্রকৃতির মত তাদেরও মুখে প্রশান্তির অনির্ব্বচনীয়তা ফুটিয়া রহিয়াছে। অণিমার ললাট ঘেরিয়া কোন এক সুকুমার চিন্তার ছায়া নদীজলে সূর্য্যাস্তের রক্তাভার লীলা-নর্ত্তনের মতই কাঁপিতেছিল, আর যামিনীর প্রাণের আভা যেন সেই আলোটুকুর ভিতর দিয়া প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তার বুদ্ধিতে, উজ্জ্বল নম্রতায় কোমল ছুটি চোখের তারা সেই চিন্তিত মুখখানির সমস্ত মাধুর্য্যের মোহমন্ত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। মেয়েটি চুপ করিয়া এদিক ওদিক দেখিতেছে। ক্বচিৎ এক একটা কৌতূহলসূচক প্রশ্ন করিতেছে। সে মুখ টিপিয়া একটু হাসিল।

নৌকা বাড়ীর দিকে ফিরিল। মিলির একটা তরল পরিহাসে তাদের ভাবুকতার প্রতি শুধু আক্রমণ থাকিলেও যামিনী সহসা রঞ্জিত হইয়া উঠিয়া দেখিল, কোন একটা অচ্ছেদনীয় শক্তির আকর্ষণে এতক্ষণ তার চিত্ত সত্যই অনেক অনেক দূরেই তলাইয়া গিয়াছিল। নির্ম্মল নীলাকাশের নীচে ছুইটি গভীর কালো চোখের পল্লবিত ছায়া ও একটি স্নিগ্ধ-মধুর শিশু-স্নেহে ভরা সুখ ছুঃখে গঠিত নারী-চিত্তের অভাবনীয় পরিচয় তাহাকে যেন অকস্মাৎ একটা অনাস্বাদিত তীব্র মদিরা-পানের সুখ-বিহ্বলতা দান করিয়াছিল। প্রকৃতির মতই বিশালতা ও বিচিত্রতা সেই হৃদয়খানিকে অতুল গরিমা-মণ্ডিত ও মহিমময় করিয়া শরৎ-সায়াহ্নের স্বর্ণ-যবনিকা তুলিয়া আজ তার অন্তর্দৃষ্টির

সত্যের সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত করিয়াছে। তার সারা দেহে পুলক-শিহরণ বহিয়া গেল। এই নূতন অনুভূতি তাহাকে একটি মুহূর্তেই বুঝাইয়া দেয় পৃথিবীর সকে সত্যের উদ্ভাব যথেষ্ট সুগোচর হইলেও তাহা বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক সত্য নয়,—সূর্য্য অবিচল, পৃথিবী অচলা নয়, সচলা।

সেদিন বাড়ী ফেরার পর রমেন একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিল। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তার কাছারী-ফেরৎ সাক্ষাৎ হইয়া যায়। সে গায়ে পড়িয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিল, তখন তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়াই মনে হইয়াছিল বটে, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারিল, লোকটির সম্বন্ধে সে ভুল করিয়াছে।

সে দু-এক কথার পরই বলিল,—"আপনাদের সমাজটা কি উচ্ছৃঙ্খল! এ রকম বোধ করি আর কোন সমাজই নয়।"

রমেন লোকটির এতটা স্পষ্ট কথায় অপমানিত হইয়াও বিস্ময়ের দরুণ প্রথমটা রাগ করিতে পারে নাই, কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কোন্ সমাজ? আর কিসে দেখলেন?"

লোকটি একটুও ইতস্ততঃ করিল না। সোজা তার মুখের দিকে চাহিয়া সপ্রতিভ ভাবেই কহিল, "এই দেখুন না, আপনার এত বড় অবিবাহিত আত্মীয়া—শালীই যেন,—বয়স তো প্রায় এক কুড়ির উপরই উঠে গেছে, —একজন অপর লোকের সঙ্গে নৌকো করে স্বচ্ছন্দে নদী-শিকার করে বেড়াচ্ছেন,—যেথানে খুশি চলে যাচ্ছেন, এও তো সমাজ চুপটি করে বসে বসে তাকিয়ে দেখ্‌চে। হত আমাদের পাড়াগাঁ! বিলেত গেলেই কি একেবারে লজ্জা-ঘেন্নার মাথা খেতে হয়?"

একথা শুনিয়া তার যে কি রকম অপমান বোধ হইয়াছিল, সে বোধ করি বলিবার আবশ্যক করে না!

মৃণালিনী ইহা শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল, "এ একেবারে অসহ্য! না! কিছুতেই এ রকম অপমান বরদাস্ত করতে পারিনে।" এই বলিয়া সে অত্যন্ত চঞ্চল ভাবে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, যেন এখনি সে এই অন্যায় নিন্দার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাই বা করিতে চলিল।

নির্বিরোধী রমেন তার মনের রুদ্ধ বাষ্পটা ছাড়িয়া দিতে পারিয়াই হাল্‌কা হইয়া গিয়াছিল, তাই স্ত্রীর উত্তেজনা নূতন করিয়া তাহাকে উত্তেজিত করিতে পারিল না। সহিষ্ণুতার সহিত কহিল, "না পারলেই বা উপায় কি? লোকের মুখ বন্ধ করবে কেমন করে? তবে আমি এই কথাটা ভাবছি যে যামিনী কি অণিমার কানে যদি এ সব কথা ওঠে, তা হলে তারা কি করবে!"

মিলি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "কক্ষনো তারা চুপ করে সহ্য করবে না। তুমি এর একটা উপায় কর।"

রমেন স্ত্রীকে চিনিত। সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ওগো তুমি যেন অত তাড়াতাড়ি উপায় করতে যেও না। এখন উপায়টা কি রকম করে করতে হবে, তারি জন্য তোমার পরামর্শই তো চাইছি। এই রকম একটা কথার কানাকানি হিন্দু সমাজ ছাড়িয়ে উঠছে, সেটা আমিও দেখেছি। কল্‌কাতা থেকে একটি ব্রাহ্ম-বন্ধু সেদিন এসেছিলেন, তিনিও আমায় সেদিন জিজ্ঞাসা করছিলেন, 'দত্ত সাহেবের মেয়ে নাকি শীঘ্রই ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে আসছেন?' এখন কথাটা হচ্ছে কি জানো মিলি! ব্যাপারটা অতি সহজ, কিন্তু পাছে এই সব পাঁচ রকম কথা শুনে তোমার অণিমা বোনটি হঠাৎ বেঁকে বসেন, কিংবা যামিনী বেচারা অপমানিত হয়ে সরে দাঁড়ায়, সেই একটা ভয়।"

যাহারা পরের ঘরের ভাল মন্দ বিচার করিবার জন্য অনিদ্রা রোগে

ক্লেশভোগ করিয়াই বাঁচিয়া আসিয়াছে, সেই সব লোকের উপরেই এতক্ষণ মিলির রাগটা পড়িয়াছিল, এইবার তার ক্রোধের গতি পরিবর্তিত হইয়া আসিতে লাগিল। যামিনীর প্রতিও যে এই ব্যাপারে কতকটা রাগ করিবার কারণ বর্তমান আছে, সেইটা তার মনে পড়িয়া গেল। অসহিষ্ণু ভাবে কহিল, "যামিনী বাবুর এতদিন এ সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করা উচিত ছিল। সেই যখন তিনি অণিকে বিয়ে করবেনই, তখন একটুখানি আগেই কেন—"

রমেনের গম্ভীর মুখে হাসির আভাস দেখা দিল, কিন্তু না হাসিয়াই কহিল, "আগে আর সময় কখন পেলে? এই তো বছর খানেক—" তারপর অঙ্গুলী গণনা করিয়া বলিল, "তেরো মাস, দশ দিন, আঠারো ঘণ্টা মাত্র তার স্ত্রী মরেছে! এর আগে যদি—তাহ'লে কি তোমরাই তাকে ক্ষমা করতে?"

মিলি রাগ করিয়া বলিল, "তুমি আর জ্বালিও না বাপু, আমার একটুও যদি ভাল লাগচে।" কিন্তু নিজেই সে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না এবং রমেনের মন্তব্যটা যে মিথ্যা নয়, ইহাও মনে মনে স্বীকার করিয়া লইল।

অনেকক্ষণ দু'জনে চুপ করিয়া রহিল। কি করিয়া তারা এই দুটি আত্ম-বিস্মৃত নর-নারীর স্বাধীন চিন্তাস্রোতকে আল দিয়া বাঁধিবে এই কথাই দু'-জনে একত্র বসিয়া ভাবিতে লাগিল। রমেন অনেকক্ষণ পরে একটা পরামর্শ দিল, তাহা মিলির তেমন পছন্দই হইল না, আবার মিলি যখন "আচ্ছা, এই রকম করে যদি—" বলিয়া একটা নাটকোচিত উপায় খুব উৎ-সাহের সঙ্গেই বলিয়া গেল, তখন রমেন্দ্র তাহার সূক্ষ্মাগ্র গুম্ফদ্বয়ের প্রান্ত পাকাইতে পাকাইতে গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "উঁহু, ও ঠিক নয়!" তারপর আবার নূতন করিয়া মন্ত্রণা আরম্ভ হইল এবং যখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়া তাদের পরস্পরের চোখের সম্মুখ হইতে পরস্পরের মুখের

মুখ ঢাকিয়া ফেলিল এবং [illegible] ঈষৎ ঠাণ্ডা হাওয়া [illegible] [illegible] [illegible] পিচকারীর মত [illegible] [illegible] [illegible] বসিতে লাগিল, [illegible] তাদের [illegible] কোন একটি উপায়েই ঠিক মনের মত হইয়া গড়িয়া উঠিল না।

ছাব্বিবশ

সেদিন নৌকা হইতে নামিয়া যামিনীর ত্বরিৎ প্রস্থান ও বাড়ীতে প্রবেশ করিবা মাত্র তাদের ফিরিবার বিলম্ব লইয়া রমেনের ঈষৎ শ্লেষ প্রকাশ, এই দুইটায় মিলিয়া অণিমার দ্বিধাহীন চিত্তে সহসা একটা অজ্ঞাত সঙ্কোচ জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

যামিনীকে সে এ পর্য্যন্ত তার নারীত্বের দ্বারা অভিশপ্ত জীবনগণ্ডীর সীমা-প্রসারণের যন্ত্র স্বরূপেই দেখিয়াছে। তার স্বাতন্ত্র্য, তার মানবীয় কোন ভাবের সঙ্গেই সে এ পর্য্যন্ত সম্যকরূপে পরিচিত ছিল না। তাদের প্রথম পরিচয়ের সময় সে এমনই সংসারানভিজ্ঞ শিশু-চিত্ত ছিল যে, সেই ডবল অনার্স পাশ শিক্ষককে তার তরুণ কোমলমূর্ত্তি সত্ত্বেও প্রথম হইতেই গৃহ-শিক্ষকের সম্মান প্রদান করিয়া বসিয়াছিল। যে সময় তার সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হইয়া গেল তখন সে তাকে তার ভবিষ্যৎ স্বামীকে জীবনের সখারূপে মনে না করিয়া নিজের অন্তর্নিহিত দেশহিতকর কাজের সাথীরূপেই ভাবিতে লাগিল। শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের অধিকারী শিক্ষকের চির-নৈকট্য তাঁর ছাত্রীকে যে আনন্দ-মিশ্রিত গর্ব্ব প্রদান করে, এই বিবাহ-প্রস্তাবে অণিমার মনেও সেই রকম একটা সুখানুভূতি হইয়াছিল। নিজের বিবাহিত জীবনটাকে লইয়া যখনি সে

কল্পনা করিতে গিয়াছে, তখনি নিজেকে সে একটি নির্জ্জন গৃহে শ্বেত-আস্তরণাবৃত টেবিলের পার্শ্বে একখানি চৌকির উপর স্তব্ধ ধ্যানাসীনারূপেই দেখিতে পাইয়াছে। সে চৌকিখানার ঠিক সম্মুখেই গোল টেবিলটার অপর দিকে দ্বিতীয় চৌকি অধিকার করিয়া যামিনী তাহাকে সাহিত্য, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিশেষ সতর্ক চেষ্টার সহিত বুঝাইয়া দিতেছেন। আর তার দুই বিস্ফারিত নেত্রের একান্ত মনোযোগপূর্ণ দৃষ্টি সেই দীপালোক-রঞ্জিত উৎসাহদীপ্ত মুখের উপরে নির্নিমেষে সংস্থাপিত হইয়া আছে। কখনও সে কল্পনা করিয়াছে, সে যখন তাদের বাড়ীর নীচের তলায় ছোট ছেলেমেয়েদের পাঠশালায় নীতি-শিক্ষার ক্লাসে নীতি-কবিতার আবৃত্তি গ্রহণ করিতেছে, এমন সময় যামিনী আসিয়া তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার জন্য ইংরাজী নীতি-কবিতার একটি সরল বঙ্গানুবাদ ছেলেদের দান করিল। যখন সেবাব্রতধারী তারা দুই ভাই বোনে অনাথালয়ের মধ্যে কল্যাণপূর্ণ সেবা-বিতরণ দ্বারা শত শত হতভাগ্যের দুঃখ ক্লান্তি দূর করিয়া যুগ্ম মঙ্গল-গ্রহরূপে তাদের কৃতজ্ঞ নেত্রের ক্ষীণ তৃপ্তি গ্রহণ পূর্ব্বক কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যামিনী তখন একটি ক্ষুদ্র শিশুর পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে নার্সকে সাহায্য করিতেছে। তারপর পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার—উঃ কি হিরোয়িক ব্যাপারই হইবে সেটা! যখনি সে তার ভবিষ্যৎ-স্বামীকে সে দেখিয়াছে, এইভাবেই তাদের কর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত করিয়া তাদের ছায়ার মধ্য দিয়াই দেখিয়াছে। তাকে স্বতন্ত্ররূপে একজন হৃদয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষরূপে প্রিয়সখারূপে কখনও দেখে নাই। তারও যে একটা কর্ম্মশক্তি, ইচ্ছাশক্তি স্বতন্ত্র-ভাবে তার মধ্যে কার্য্যনিরত রহিয়াছে, তার সর্ব্ব শক্তিই যে তাদের গৃহীত স্বদেশসেবার সঙ্কল্পের সঙ্গে নিবদ্ধ করা না করা তার ইচ্ছাধীন, এ সন্দেহ তার একেবারেই মনে জাগে নাই। তারপর সমস্ত কল্পনাজাল ছিন্ন করিয়া সে তো অনেক, অনেক দূরেই চলিয়া গেল।

অণিমার মনে হইল, যামিনীকে সে যতখানি বেদখল করিয়া রাখিয়াছে হয়ত তাহা তার পক্ষে সঙ্গত না হইতেও পারে। তার নিজস্ব কর্ম্ম আছে, গৃহ আছে, বিশ্রাম আছে, সে সমস্ত ভুলিয়া সে যে তাকে ক্রমাগত তার নিজ স্বার্থে টানিতেছে, হয়ত সে মুখে কিছু না বলিতে পারিলেও মনের মধ্যে সব সময় ইহা পছন্দ না করিয়া উপদ্রব বলিয়াই ভাবে। হয়ত বা এতে কাজ-কর্ম্মের ব্যাঘাতও তার ঘটে, হয়ত ভালও লাগে না।

কিন্তু শেষকালের যুক্তিটাকে কিছুতেই সে তার মনের মধ্যে স্থান দিতে পারিল না। দেশের কাজ যে একবার মনের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছে, সে যে তার ভাল না লাগিতে পারে, এমন কথা বিশ্বাস করা কঠিন যে। কর্ত্তব্য বলিয়া যাকে মাথায় তুলিয়া লইয়াছে, ইহার মধ্যে তার ভারে ক্লিষ্ট হইয়া মাথার ধনকে পায়ে ফেলিয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইবে, তার প্রতি এ অবিচার করিতে তার দারুণ কষ্ট বোধ হইল। যামিনীর জীবনের যেটুকু সংস্পর্শ সে পাইয়াছিল, তাহাতে এমন অপবাদ তাকে দেওয়া চলে না। তবু কিছু যে একটা ঘটিয়াছে, এ কথাও অনস্বীকার্য্য।

সদাজাগ্রত বিশ্বাত্মার মতই বড় ঘড়িটা মাত্র জাগিয়া আছে। তেল-বাতির কম করিয়া রাখা আলোটা ক্ষীণ হইতে হইতে কোন্ সময় নিজেকে দানের আনন্দে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া ছিল। আকাশের প্রান্তে খণ্ড খণ্ড মেঘ দিয়া ক্রমে সারা আকাশে সেটা সংযুক্তরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। খোলা জানালার মধ্য দিয়া চপলার ক্ষণচমক মশারি ভেদ করিয়া অণিমার চোখের উপর আসিয়া পড়িয়া তাহাকে চোখ মুদিতে বাধ্য করিল। মনের মধ্যে যেন একটা অনির্দ্দেশ্য বেদনা তাকে পীড়া দিতেছিল। মনে হইতেছিল, কোথায় যেন কি একটা গলদ ঘটিয়াছে। সহ্য করিতে না পারিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল। বিদ্যুতালোক-চকিত জানালার কাছে দাঁড়াইতেই

আর একদিনের কথা মনে পড়িল। ঘাটের সেই নাগা সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়িতেই সে অন্যমনা হইয়া গঙ্গাতীরের দিকে উৎসুক নেত্রে একবার না তাকাইয়া পারিল না। যেখানে শিশুর খেলনাটি হারাইয়া যায়,—পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই জানিয়াও সে সেইখানেই ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখে, অণিমাও তেমনি মধ্যে মধ্যে সেই দিকে তাকাইয়া কি যেন খুঁজিত। আজও সে উৎসুক দৃষ্টি বিদ্যুতালোকের মাধ্যমে সেখানে প্রেরণ করিল। কতকগুলো কাঁটাগাছ এবারকার বর্ষায় সেইখানটিতে ঝোপ তৈরি করিয়াছে। বর্ষা-বর্দ্ধিত জলের ঢেউ তার তলায় মৃদু মৃদু আঘাত করিতেছিল। নিশ্বাস ফেলিয়া সে চোখ ফিরাইয়া লইল। বন্যার স্রোতের মত প্রচণ্ড প্রবল ভক্তির স্রোত সেই বলিষ্ঠ শরীরের ভিতর দিয়া নিঃশঙ্ক গৌরবে এমনই বহিয়া চলিয়াছে,—সেখানে অন্যের সহায়তার কোনই প্রয়োজন নাই,—কোন যুক্তিতর্কেরই আবশ্যকতা করে না। সুদূর বিশ্বাসের হাতে আপনাকে শিশুর মত একান্তভাবে সমর্পণ করিয়া দিয়াই সে নিশ্চিন্ত। সে বিচার করিয়া দেখিতে লাগিল,—তার প্রকৃতির সঙ্গে সেই আধুনিকতার বহির্ভূত লোকটির কি অসামান্য অসামঞ্জস্য! কি প্রবল ভাবোন্মাদনার সঙ্গেই সে তার সেই ছোট্ট পটখানিকে একান্তভাবে ভালবাসে! তার মনে কোন কাল্পনিক দেবতার না হোক, দেশমাতার আসন তো পাতা আছে—কিন্তু সে কি তাঁকে অমন আত্মবিহ্বল প্রেম দান করিতে পারিয়াছে? অমন করিয়া তাঁরও পায়ের নূপুর তার বক্ষ-শোণিতের তালে তালে রণিত হইতে থাকে? না—তা তো হয় না! তা যদি হইত তবে তার প্রাণের এ বুভুক্ষু ক্ষুধাকীট খোরাকের অভাবে তার চিত্ত-কুসুমের দলগুলিকে কাটিবার চেষ্টা করিবে কেন? নিজের আনন্দে সে তার মতই তো বিভোর হইয়া থাকিতে পারিত। সর্ব্বস্ব সমর্পণের আনন্দেই তো মগ্ন হইতে পারিত।

পাশের ঘর হইতে একটা চৌকি লইয়া আসিয়া জানালা ঘেঁষিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। যামিনীকে তার কাজের মধ্যে সর্ব্বদা টানিয়া তাঁর প্রতিষ্ঠার পথ হইতে সরাইয়া রাখা তার পক্ষে সঙ্গত হইবে না। মিহিরের প্রতি রাগ করিয়া তার দূরস্থ মূর্ত্তিটা মনের মধ্য টানিয়া আনিয়া সাভিমানে বলিল, "তোমার কি আর ফেরবার ইচ্ছা করে না? তুমি কাছে থাকলে আমার কাকেই বা দরকার ছিল?" তারপর হিসাব করিয়া দেখিল—তার ফিরিতে আরও চার মাস বাকি আছে। তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ নূতন একটা আনন্দের উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দূরাগতপ্রায় মিহিরের আশালোকে উজ্জ্বল মুখের ছবি হৃদয়-ফলকে প্রতিবিম্বিত হইয়া মনের মধ্যে এতক্ষণকার চিন্তাদাহ জুড়াইয়া স্নিগ্ধ প্রাণে শান্তিজল ছিটাইয়া দিল। সে নিজেকে সান্ত্বনা দিবার ভাবে আত্মগত বলিল, "চারটে মাস বৈ ত নয়, তারপর দাদা আস্‌ছে, সে এলে যামিনী বাবুর সাহায্য না পেলেও চলবে। আমার দাদার মত আমায় আর তো কেউই বুঝবে না। সে যে দেশের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। দাদা যে আমার দেবতার মত পবিত্র ও সত্যাশ্রয়ী। যদি দেবতা কোথাও থাকে তবে একমাত্র তারই মধ্যে আছে। মানুষ যদি সত্যকে আশ্রয় করে তবে সে-ই ত মহান্ দেবতা।"

সেদিন মেল্ ডে ছিল। অণিমা পুরা দু'খানা চিঠির কাগজে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়া তার একমাত্র প্রিয়পাত্রর উদ্দেশ্যে বিচিত্র মায়াসূত্ররূপে প্রেরণ করিয়া তার পক্ষ হইতে যামিনীকে মুক্তি দিবার উপায় করা হইয়া গিয়াছে এই রকম একটা নিশ্চিন্ততা অনুভব করিল। যেখানে মিহির ভিন্ন আর কাহারও প্রবেশ কোন দিন সম্ভব ছিল না, সেখানে বাহিরের লোককে যে টানিয়া আনিতে হইয়াছে ইহা ভাবিতে তার একটু ক্লেশ বোধ হইল। যতই হোক্ সে একজন সম্বন্ধহীন পর মাত্র, মিহির যে তার সঙ্গে এক রক্ত এক মন এক শিক্ষায় শিক্ষিত, একাত্ম—কেবল দেহান্তরধারী মাত্র!

পূজার ছুটি পড়িয়াছে। আফিস বন্ধ, মেয়েদের স্কুলেরও ছুটি হইয়া গেল। কোন দায়িত্বের ভারই আর ঘাড়ে নাই। একটা জায়গায় সে শুধু একটু দায়ী বোধ করিতেছিল। দু'বার মিলির ঘরের কাছে গিয়া ফিরিয়া আসিল, ঘরের মধ্যে তাদের সম্মিলিত কৌতুকহাস্য শোনা যাইতেছিল। এর মধ্যে গেলে হয়ত বা অনধিকার প্রবেশ হইবে। ঘরে ফিরিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, বেলা চারিটা বাজে। মনের চঞ্চলতা রোধ করিয়া কোলের উপরে একখানা বাঁধানো খাতা রাখিয়া একটা কিছু লিখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু সেদিন এবং পরদিনও যামিনী যখন আসিল না তখন তার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল। নিশ্চয়ই কিছু একটা হইয়াছে। হয়ত অণিমারই কোন ব্যবহার, কি কোন কথা,—মনে করিয়া সে কুণ্ঠিত ও সংশয়াকুল হইয়া উঠিল। অবশেষে থাকিতে না পারিয়া মিলিকে গিয়া বলিল, "অনেকদিন প্রকাশবাবুর পিসিমার সঙ্গে দেখা হয়নি, আজ একবার ওঁদের ওখানে যাবে?" মিলি কি ভাবিতেছিল, একথা শুনিয়া কাঙ্গালের মত লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "এক্ষনি।"

সাতাশ

সন্ধ্যাবেলায় চাঁদ উঠিয়াছিল। গঙ্গাতীরের বড় রাস্তা হইতে যামিনীর বাড়ী যাইতে একটা চওড়া গলির ভিতর দিয়া খানিকটা যাইতে হয়। গলিটার প্রবেশ পথের ঠিক উপরেই একটা গানের আখড়া। আখড়া ঘরের বারান্দায় একটি মাদুর বিছাইয়া তাকিয়ার পাশে বসিয়া ইহার মধ্যেই সেতার লইয়া ওস্তাদজী তাঁর সুর মিলাইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং দুই

একটি সোজা-সিঁথিকাটা হাতে-চুনোট-দেওয়া পাঞ্জাবী গায়ে যুবক কেহ বারান্দায় কেহ ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়া মজলিসে বসিবার বন্দোবস্তে ব্যাপৃত রহিয়াছে। গলির ভিতর চাঁদের আলো ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণে বিস্তৃত হইয়াছিল। পথের দু'ধারে মধ্যে মধ্যে পাকাবাড়ীর আশ্রয়ে খোড়ো ঘর ও পরিত্যক্ত ভগ্নগৃহ শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিয়া গিয়াছে। সেই সকল গৃহ হইতে কোথাও সন্ধ্যার শঙ্খ বাজিতেছে, কোথাও শিশুগণের পাঠের শব্দ আসিতেছে এবং কোথাও নিস্তব্ধ অন্ধকার নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া আছে। মাটির ঘরের দাওয়াগুলিতে সদ্যপ্রকাশিত জ্যোৎস্নালোকে বাঁশের খুঁটির ছায়া বাঁকা হইয়া পড়িয়াছে। একটি আঙিনা হইতে সান্ধ্য-শেফালিকার প্রচুর গন্ধ বায়ুর সঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছে।

নৈহাটি হইতে ফিরিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে পিতা ও কন্যা চলিতে চলিতে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া চলিয়া নলিনী ডাকিল, "বাবা!"

যামিনী চমকিয়া উঠিল। স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা হইতে যেন জাগিয়া উঠিয়া বলিল, "কি?"

"বাবা, আমাদেরও কেন ওঁদের মত গঙ্গাতীরে বাড়ী হ'ল না বাবা?"

যামিনী তার হাতখানি একটু চাপিয়া ধরিয়া একটু হাসিয়া সংক্ষেপে বলিল, "হয় নি।"

নলিনী এ উত্তরে খুশী হইল না, সে আবার কিছুদূরে যাইবার পর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিল, "ঐ রকম বাড়ী একটা তুমি তৈরি কর না বাবা।"

"ওতে যে অনেক পয়সা লাগে মা!" যামিনী তার মুখে সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিল।

সাগ্রহকণ্ঠে বালিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কত পয়সা বাবা? আমার এখন তো ন আনা তিন পয়সা হয়েছে।"

যামিনী হাসিয়া উঠিল। অপ্রতিভ হইয়া নলিনী পিতার হাতের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া লজ্জায় ভাঙা ভাঙা করিয়া বলিয়া উঠিল, "বা—হ্যাঁ—তুমি বুঝি হাস্‌চো? তা' হবে না, যাও।"

যামিনী তবুও হাসিতে লাগিল, হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বল দেখি ন আনায় ক'টা পয়সা হয়?"

"আমি জানিনে বুঝি", বলিয়া নলিনী আবার পিতার সহিত চলিতে চলিতে সগর্ব্বে উত্তর করিল, "বারো পয়সা। হ্যাঁ হয় তো। দিদি দিয়েছে পাঁচটা, তুমি দিয়েছ সেই-ই চক্‌চকে পাঁচটা, নানা ছটা, আর এক আনি একটা, হ'ল না?"

"খুব হ'ল, তুই কাল থেকে আমার কাছে গুন্‌তে শিখ্‌বি।" এই বলিয়া যামিনী তাহাকে দুই হাতে চাপিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিল। তার মনের যে অস্পষ্ট ভাবটা আজ সহসা তাহার নিকটে স্পষ্ট-ভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে, তার আকস্মিক আবির্ভাবে সে যেন শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই দরিদ্র পল্লী দিয়া যাইবার সময়েও সেই স্মৃতির আলোড়নে এতক্ষণ এমনি আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিয়াছিল যে, সেই অপরিচ্ছন্ন পথটাকে পুষ্পমণ্ডিত উপবন-মার্গের মত উপভোগ করিয়াই চলিয়াছিল। এবং বৃক্ষ ও গৃহচ্ছায়ামুক্ত পীতাভ মৃদু জ্যোৎস্নালেখার মধ্যে একখানা অনিন্দ্যসুন্দর মুখের ছবি আজ তার চিত্তকে এমনি অভিভূত করিয়া তুলিতেছিল যে সে তার জীবনের একটিমাত্র সান্ত্বনা ও সুখের বস্তুটিকেও যেন ভুলিতে বসিয়াছিল। আজ তার জীবনের মধ্যে যেন আবার একটা বিশেষ সঙ্কটের দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এমনি আবছা ভয় তাহার মনের চারিপাশে যেন একটা অলক্ষ্য প্রেতযোনির মত নিঃশব্দপদে উঁকি ঝুঁকি দিতেছে এবং এই আশ্চর্য্য আবির্ভাবে সে ভীত শিশুর মতই ব্যাকুল হইয়া আলোক-রেখা খুঁজিয়া ফিরিতেছে, সে যাহা সন্দেহ করিতেছে তার পক্ষে তাহা সুখের

কিংবা দুঃখের সে কথা সে এ পর্য্যন্ত একবারও ভাবিয়া দেখে নাই। মনের ভিতর একটা সন্দিগ্ধ ভয়ই তাই প্রথমতঃ জাগিয়া উঠিয়াছে। কন্যাকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া সে বড় করিয়া একটা নিশ্বাস লইল। কোন সন্তানের পিতার পক্ষে তাহা গৌরবের তো নয়ই।

পরদিন ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বিছানায় বসিয়াই সে নিজের সারা দিনের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। অনেকদিন পরে পিতার উপাসনা-ঘরের দরজা খুলিয়া নত মস্তকে যখন তার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই শূন্যগৃহের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল ও তারপর ধীরে ধীরে নত হইয়া সেই বেদীর উপরে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, তখন তার মৃত পিতার স্মৃতি এবং তাঁর দৃঢ় ভক্তি, বিশ্বাসের অদৃশ্য বল বিক্ষিপ্ত চিত্তকে তার সংযমের পরম শান্তি ও বিশিষ্ট বল প্রদান করিতেছে বলিয়াই সে যেন সুস্পষ্ট রূপে অনুভব করিতে লাগিল।

এমনি করিয়া নিজেকে ভরিয়া লইয়া সে অনেকক্ষণ পরে ঘর হইতে বাহিরে আসিল এবং নলিনীকে খুঁজিয়া তার ললাটে ওষ্ঠে ও গণ্ডে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া হৃদয়ের নিগূঢ় আনন্দ প্রকাশ করিয়া ফেলিল। নলিনী তখন জানালায় জানালায় কাপড়ের পাড় বাঁধিয়া টেলিগ্রামের তার বানাইতে ব্যস্ত ছিল। পিতার আলিঙ্গন হইতে ঝাঁকিয়া বাঁকিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। তার অতখানি আদরের শোধ দিবার কোন দরকার আছে বলিয়া সে মনেও করিল না। বলিয়া গেল, "দাঁড়াও না, এখন একটা ইয়ে কর্‌তে হবে, আরও খানিকটা কালি চাই—" যেন এই কালি-সংগ্রহ কাজটির মত এত বড় দুরূহ কাজ আর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কাহারও ঘাড়ে কোন দিন চাপে নাই। মুখখানা এমনি গম্ভীর ও চঞ্চল চোখ দুটি এমনি উৎকণ্ঠিত করিয়াই কথাটা বলিল।

যামিনী একটু হাসিল, তথাপি সে একটু বেদনা-বোধও না করিয়া

পারিল না। সে তো আজ শুধু তাকে কন্যা বলিয়া আদর করিতে আসে নাই, তাহাকে জীবনের একমাত্র নির্ভর করিয়া ধরিবার জন্য তার মুখের আধ-আধ বুলিতে সংসারের শত প্রলোভনকে জয় করিতে সে যে নিজেকে তার ক্ষুদ্র দুইখানি করপুটে সঁপিয়া দিতেই আনিয়াছিল। সে কি তবে তাহাকে তেমন করিয়া লইতে পারিবে না? তার জীবনকে পিতৃ-কর্ত্তব্যে পূত করিয়া নির্ম্মল একাগ্র রাখিতে সারাজীবনে সে-ই যে তার একটিমাত্র অবলম্বন। যে স্বর্ণশৃঙ্খল আজ তার দুর্ব্বল মানবীয় চিত্তকে বাঁধিতে প্রসারিত হইয়াছে, সে-ই যে শুধু একমাত্র দিব্যাস্ত্র যাহা দ্বারা সে সেই শৃঙ্খলকে ছেদন করিতে পারে।

কিন্তু সেদিনকার সমুজ্জ্বল সূর্য্য-উদ্ভাসিত প্রভাতে সে তার উৎসাহের উত্তেজনাকে অবসাদের ভারে ভারী হইতে দিল না। যখন বিবিধ চেষ্টা দ্বারা তার ক্ষুদ্র অবলম্বনটিকে সে কিছুতেই খেলার দল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজের কাছে বাঁধিতে সক্ষম হইল না, তখন সে আত্মরক্ষার অন্য উপায় খুঁজিতে গেল। পিসিমা রান্না ঘরের দালানে বঁটি পাতিয়া আলু ছাড়াইতে ছাড়াইতে রাঁধুনীকে ভেটকি মাছের ঘণ্ট রাঁধা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিলেন, সেইখানে গিয়া সে তাঁর বঁটি কাড়িয়া লইয়া আসনপিঁড়ি হইয়া কুটনা কুটিতে বসিয়া গেল। সৌদামিনী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "দেখিস্ যেন হাত কাটিস্ নে।" কিন্তু মনে মনে অনেক দিন পরে ছেলেকে একটু কাছ ঘেঁষিয়া আসিতে দেখিয়া খুশীই হইয়াছিলেন। যামিনী [illegible] কহিল, "হাত অমনি কাটলেই বুঝি হ'ল। তোমাদের ভারি [illegible] কাজ, সারাদিন কি যে করো এ নিয়ে, এ আমি এক মিনিটেই সেরে দিতে পারি।" সৌদামিনী কহিলেন, "তা পারবিনে কেন বাবা! এত সব দুঃসাধ্য কাজ পারচো, আর এই সামান্য কাজটাই পারবে না।" বলিয়া সগর্ব্ব স্নেহে তার মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা আজ যে বেড়াতে

যাওনি ?" প্রশ্নটার কোন ইঙ্গিত ছিল না, কিন্তু যামিনীর অপরাধী মন ইহাতেই লজ্জানুভব করিয়া মরিল। সুবিধা পাইলেই সে যে বাড়ী হইতে কোন একটা উদ্দেশ্যেই বাহির হইয়া পড়ে ইহা পিসিমার মনকেও আকৃষ্ট করিয়াছে। হয়তো তিনি কি মনেও করিতেছেন। একটু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "কাছারী এখন বন্ধ হ'ল কি না, কাজ তো এখন আর কিছুই নেই—" এইটুকু বলিয়া তারপর হাসিয়া তাঁর দিকে চাহিয়া বলিল, "এখন দিন কতক আমি তোমার রান্নাঘরেই আসন পাতবো।" সৌদামিনীর চিত্ত বাৎসল্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি সকরুণ স্নেহে কহিলেন, "বেশ তো বাবা তাই থাকো না।" এই বলিয়া তার জন্ম একখানি পিঁড়ি আনিতে উঠিয়া গেলেন। সে যেখানটায় বসিয়াছিল, সেখানে একটু জল জমিয়া রহিয়াছে।

সমস্ত দিন ছেলেমানুষের মত পিসিমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া আবদার করিয়া সে তার গম্ভীর প্রকৃতিকে চপল করিয়া তুলিবার বহু চেষ্টাই করিতে লাগিল, কিন্তু বেশীক্ষণ ধরিয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ রাখিতে পারিল না। সন্দেশ তৈরী করিতে হাত ভারিয়া গিয়া হাতা চালনা বন্ধ করাতে সন্দেশ আঁটিয়া গেল, সুপারি কাটিতে হাত কাটিল এবং এমনি করিয়া কার্য্য-পণ্ড ও তিরস্কার লাভ করিয়া সে তখন কর্ম্মে ভঙ্গ দিয়া আইনের বই খুলিয়া বসিল। পিসিমা তার আসক্তিহীন চেষ্টার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। "বাছা আমার এই বয়সে বিবাগী হয়ে রইলো, পাঁচজনে মিলে যে ওকে বোঝাবে-সোঝাবে তাও তো কারও চাড় দেখি নে। আর ওর সত্যিকার কে-ই বা আছে। নন্দিনীও তো সেই হিল্লি-দিল্লী করেই বেড়াতে লাগলো, একবার এলোও না।"

তিনি নিজে ইতিমধ্যে অনেকবারই তাহাকে এই "বুঝানোর" চেষ্টা

করিতে গিয়া একটুখানি উদাসের হাসি মাত্র উত্তর পাইয়াছেন। সেইজন্য পাঁচজনের উপরেই রাগটা গিয়া পড়িয়াছিল।

যখন নূতন একটি আবির্ভাব উষার নব প্রকাশের মত উন্মুক্ত হৃদয়-দ্বারের মধ্য দিয়া সহসা আসিয়া নিজেকে আবরণ-মুক্ত করিয়া দেয়, তখন তাহাকে চাপিয়া রাখিবার জন্য যতই সবেগ চেষ্টা জাগিয়া উঠুক না তার সেই প্রকাশশক্তিকে নিরোধ করিতে পারে না। সে নিজেকে যতই ভুলাইতে চাহিয়াছিল যে, অণিমার প্রতি তার যে আকর্ষণ, সে কেবলমাত্র কর্ম্মের আকর্ষণ,—হৃদয়ের আকর্ষণ ইহার মধ্যে কিছুমাত্রও নাই,—ততই যেন তার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া অন্তরের অন্তরমধ্য হইতে কে যেন এ যুক্তিকে প্রবলভাবে অস্বীকার করিয়া বলিতেছিল, "না না শুধু তাই না, আছে, আছে,—আর কিছু আছে বই কি!" সঙ্কীর্ণ স্বার্থের কথা হইলে সেই প্রবল প্রতিবাদে যে সত্যের অংশ নিহিত ছিল, তাহাকে সে কোন মতেই অস্বীকার করিতে পারিতেছিল না এবং এই পরাভব স্বীকার করিবারও উপায় না থাকাতে ইহা তাহাকে সত্যই বিঁধিতেছিল।

রাত্রেও শয্যায় পড়িয়া সে এই নূতন ভাবনাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। অণিমার সহিত তার পরিচয় একদিনের নয় এবং এমনও সময় গিয়াছে, যখন সে তাহাকে নিজের জীবনের সহিত একত্র করিয়া তার সমস্ত অন্ত এবং বাহুকে বাঁধিয়া লইয়া উদ্দাম কল্পনা করিতেও কিছুমাত্র বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। জগতের যাহা কিছু সুন্দর সে অণিমাকে তাদের মাঝখানে স্থাপন করিয়া অনেক ছোট বড় কল্পনাই তো তার নিজের জীবনের সঙ্গে মিশাইয়া গড়াভাঙ্গা করিতে করিতে হঠাৎ একদিন আবার বিমানবিচ্যুতের মত সুদূর মর্ত্ত্যধামে স্খলিতও হইয়াছিল এবং তাহাতে আহতও বড় কম হয় নাই। কিন্তু আজ সে সেদিনকার কথা ভাবিয়া দেখিতে লাগিল এবং বুঝিতে পারিল, যতই যা হোক এ রকম সমস্যা তার

জীবনে ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও উপস্থিত হয় নাই। তখন অণিমার প্রতি তার যে আকর্ষণ ছিল, সে শুধু তার চরিত্রমাধুর্য্যের আকর্ষণ, উচ্চ হৃদয়ের মানবের স্বাভাবিক সম্ভ্রমপূর্ণ শ্রদ্ধা। তাই যখন পিতার আদেশে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও সে সুসঙ্গতাকে বিবাহ করিয়াছিল, হৃদয় তখন আহত হইয়াছিল খুব সত্য, কিন্তু সে আঘাতের ক্ষত দুরন্ত অভিমানের বশে ততটা সাংঘাতিক হয় নাই এবং কিছুদিন পরেই যখন সেই প্রেমবন্ধনহীন দম্পতির মধ্যে তাদের সমুদয় মনোমালিন্য ও প্রকৃতির অসামঞ্জস্যের সন্ধি স্বরূপে স্নেহের পুতুল নলিনীর অভ্যুদয় হইল, তখন হইতেই যামিনীর চিত্ত হইতে তার বুকের ভিতরকার তাপদাহ বহু পরিমাণেই জুড়াইয়া আসিয়াছিল। ইহার পরেও যে তাদের দাম্পত্যজীবন কিছুমাত্র সুখের হয় নাই তার জন্য প্রধানত ধরিতে গেলে সুসঙ্গতাই বিশেষ করিয়া দায়ী।

আজ কিন্তু তার এই নূতন মনোভাবকে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিয়া যখন এর প্রকৃত পরিচয় লাভ করিল, তখন সে একটুও খুশী হইতে পারিল না। অণিমার জীবনের ব্রতপালনের সহায়তা দ্বারা সে নিজের জীবনকে শুষ্ক কর্ম্মের সঙ্গেই শুধু নয়,—তার জীবনের সহিতও এমনি করিয়া জড়াইয়া ফেলিয়াছে, যে এখন তাহার মধ্য হইতে নিজের একটা কিছু বিলি করতে গেলে হয় সমস্ত বন্ধন কাটিয়া বাহির হইতে হইবে, না হয় তো সেই বন্ধনকে নিবিড় ভাবেই স্বীকার করিতে হইবে। বন্ধনটা সমুদয় মনে প্রাণে বড়ই আঁটিয়া বসিয়াছে!

পরদিন ভোরে উঠিয়াই সে আবার উপাসনা-ঘরে গিয়া অনেকক্ষণ রুদ্ধ দ্বারের মধ্যে পূজার আসনে বসিয়া রহিল। মনের ভিতর যখন অক্ষমতার বেদনা জাগিয়া উঠে, তখন সেই বেদনাক্রান্ত চিত্ত নিরুপায় ভাবে শান্তিময়ের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া দেওয়াতেই তো একমাত্র শান্তি। মনে মনে বলিল—সন্তানের পিতা আমি, আমার এ দুর্ব্বলতা সাজে না।

[illegible]

[illegible]

আহারান্তে ইন্দ্রনাথবাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা করিবে এইরূপই কল্পনা করিয়া লইয়াছিল। অণিমার সহিত বাহ্য সম্পর্ক কতকটা বিচ্ছিন্ন না করিতে পারিলে যে ভিতরের বন্ধন কাটিবার কোন ভরসাই করা যাইতে পারে না।

ইন্দ্রনাথবাবু বাড়ী ছিলেন না। যামিনী দুঃখিত চিত্তে ফিরিয়া আসিল, আর কোথাও এই মানসিক বিপ্লবের মধ্যে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না।

বাড়ী আসিতেই নলিনী ছুটাছুটি করিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, মাসিমারা অনেকক্ষণ হইল আসিয়াছেন।

"তোমার মাসিমা?" যামিনী অত্যন্ত বিস্মিত হইল। সুসঙ্গতার বোন সুদক্ষিণা কিছুদিন হইল চন্দননগরে আসিয়াছেন এবং তিনি ও তাঁর স্বামী মধ্যে মধ্যে নলিনীকে লইয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতেও ছিলেন। এ পর্য্যন্ত তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। এখন এই সংবাদে যামিনী কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সুসঙ্গতা নাই। না বাহিরে,— আর সত্য কথা বলিতে কি, না তার হৃদয়ে। সে তার প্রায়-অপরিচিত আত্মীয়ের নিকট নিজেকে অপরাধী বোধ করিতে লাগিল। মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মেসোমশাইও এসেছেন তো?" নলিনী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া তার আঙ্গুরগুচ্ছের মত কালো চুলের গুচ্ছগুলি সবেগে আন্দোলিত করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "দুটোইতো মাছিমা। মেছোমশাই আবার কে? তুমি যাও না।" এই বলিয়া সে লাফাইতে লাফাইতে আবার কোথায় চলিয়া গেল।

[illegible]

[illegible] অনুতাপের দহ হইতে যেন আপনাকে ছাড়া পাইয়া সে একটু উৎফুল্ল চিত্তেই গৃহে প্রবেশ করিল।

সৌদামিনী ও মিলি গল্প করিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে হাসিতেও ছিলেন। অণিমা তাদের কথায় যোগ দেয় নাই। সে তাদের নিকট হইতে অনেকটা দূরে একটা খোলা জানালার নিকট বসিয়া একখানি কি পুস্তক নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিতেছে। অল্প অল্প বাতাসে তার কপালের উপরকার চূর্ণ কুন্তলগুলি ঈষৎ নড়িতেছিল এবং তার নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত বক্ষের উত্থানপতন বক্ষবসনের উপর হইতেও ঈষৎ দৃগোচর হইতেছিল, ইহা না হইলে তাহাকে যেন একখানি মনোভিনিবেশের চিত্র বলিয়াই মনে হইত। যামিনীর পদশব্দে সে চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল এবং তার পুষ্পপেলবের মত ওষ্ঠ দুইটি ঈষৎ আনন্দের স্নিগ্ধ হাসিতে ভরাইয়া আগ্রহের সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া তার অনুশোচনা-পূর্ণ লজ্জার বেগ প্রশমিত করিয়া দিল। সেই সঙ্গে সে দুইদিন না যাওয়াতে অণিমা নিজেই যে তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে, ইহা মনে করিয়া একটা অননুভূত আনন্দের উচ্ছ্বাসে তার সমস্ত শরীর মন তার অজ্ঞাতেই শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

অণিমা যে বইখানা মাটিতে রাখিয়াছিল। হেঁট হইয়া সেখানা তুলিয়া লইতে লইতে যামিনী নিজের মনের হর্ষোচ্ছ্বাস দমন করিবার ইচ্ছায় একটা কিছু বলিবার জন্যই জিজ্ঞাসা করিল, "কি পড়ছিলেন?"

"রিলিজান্ এণ্ড ফিলোজফি অব দি উপনিষদস্'।"

অণিমা কিছু না বলিয়া কেবল তার মুখের উপর প্রফুল্ল নেত্র দুটি স্থাপন

করিয়া একটুখানি হাসিল।

যামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন লাগছে?" এই বলিয়া সে একটু উৎসুক নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, যেন এই জার্মান পণ্ডিতের আশ্চর্য্য ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি ইহার শ্রদ্ধার উপর তারও খুব একটা লাভ-লোকসান নির্ভর করিতেছে!

অণিমা কহিল, "আমি তো বেশী দূর পড়িনি, কিন্তু বোধ হচ্ছে লোকটি ভাল করেই হিন্দুশাস্ত্র পড়েছেন। আর পড়ে খুব মুগ্ধও হয়েছেন।"

যামিনী তাহার কণ্ঠে কেমন একটা আগ্রহহীনতা লক্ষ্য করিয়া একটু বিষণ্ণ হইয়া বলিল, "হ্যাঁ ডয়সন ম্যাক্সমূলারের চেয়ে অনেক ভাল ক'রেই উপনিষদ্ পড়েছেন। লোকটির প্রতিভা ও জ্ঞান চমৎকার! এ থেকে জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস না করে থাকা যায় না।"

অণিমা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল, "তা কেন?"

যামিনী কহিল, "এই দেখুন না, আমরা এই দেশে জন্মে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র ভাল করে বিশ্বাস করতে পারিনে, আর একজন বিদেশী ধর্ম্মে ও ভাষায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়েও এমনি দৃঢ়ভাবে এত সহজে এই ভারতবর্ষের ধর্ম্মকে আয়ত্ত করতে পেরে নিজেকে ধন্যবোধ করছেন! এ থেকে জন্মান্তরীণ সাধনার কথা মনে হয় না কি?"

কথাটার মধ্যে ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্ একটুখানি খোঁচা দেওয়া ছিল, অণিমার মনে সেটা বিঁধিল। সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া তারপর কি ভাবিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, "বইখানি আপনার পড়া হ'লে আমায় দেবেন তো।" সে এই জন্মান্তর প্রকৃতিভেদ লইয়া তর্ক করিল না। কেন যে করিল না সে কথা হয়ত সে নিজেই বলিতে পারিত না। কিন্তু সব চেয়ে তার যেখানে বাধে, আজ সেই খানেই বিরুদ্ধ পক্ষের খোঁচা খাইয়া সন্দিগ্ধ ভাবে সে চুপ করিয়া রহিল।

মৃণালিনী সৌদামিনীকে রান্নাঘরে যাইবার জন্য উঠিতে দেখিয়া এবং তিনি কচুরী করিবার বন্দোবস্ত করিয়া না রাখিলে তাদের লইয়া আরও একটু ক্ষণ বসিতে পারিতেন, এই কথা শুনিয়া হঠাৎ কচুরী শিখিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া বলিল, "চলুন, না আমিও আপনার কাছে ওটা শিখে নিই গে'। আমার খাস্তা কচুরী কেন জানিনে মোটে ফোলে না।"

সৌদামিনী এই মেয়েটির উপর প্রথম হইতেই খুশী ছিলেন, এখন আরও প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "এসো মা এসো, তোমরা শিখ্‌বে না তো এসব কে শিখ্‌বে বল। যার ভাল হয়, তার সবই ভাল।" এই বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া কচুরী তৈরির জন্য চলিয়া গেলেন। মিলি যাইবার সময় অণিমাকে বলিয়া গেল, "তোমাদের তো এখন কেবলই যত সব রাজ্যের বাজে কথাই হবে, আজ আবার যা' হাঙ্গামা বাধিয়ে এসেছ।"

তাহারা চলিয়া গেলে যামিনী একটু বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল, "মিসেস্ রায় কি বল্লেন? আর কিছু কি নূতন কাজের বন্দোবস্ত করেছেন নাকি?"

তাহার স্বরে যেন কেমন একটা ভয়ের আভাস ছিল। পুরাতন ভৃত্য মনিবকে নিত্য নূতন কর্ম্মের আমদানী করিতে দেখিলে খাটিবার ভয়ে যেমন ভীত হয়, সে রকম নয়, বন্ধু বন্ধুকে বিশ্রম্ভালাপ ছাড়িয়া আপিসের পোষাক পরিতে দেখিলে যেমন দুঃখিত হয়, হয়ত তেমনি ধারার কিছু। কিন্তু সেই আভাসটুকুতেই অণিমাকে তার প্রথম কর্ত্তব্যটা স্মরণ করাইয়া দিল, কিন্তু তখনি সে কথাটা না বলিয়া ভূমিকা করিল, "এই রকম তো আশা হচ্চে, আচ্ছা সবটাই তাহলে বলি শুনুন—" এই বলিয়া সে তাহাকে তার নূতন কার্য্য সম্বন্ধে যাহা বলিল তাহা মোটের উপর এইরূপ।—

তারা দুজনে এখানে আসিবার জন্য গাড়িতে উঠিতে যাইতেছে এমন

খবর মিসেস্ বিংহামের লোক চিঠি লইয়া আসিল, তিনি একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান আর সেটা এখনি হইলেই ভাল হয়, কেন না কাল তাঁহারা দার্জ্জিলিং যাত্রা করিবেন। ইহাতে কোন অসুবিধাই ছিল না, উহারা প্রথমে তাঁহার সহিতই সাক্ষাৎ করিল। মিসেস্ বিংহাম অণিমা যাইবামাত্র বলিলেন, "তোমার প্রস্তাবিত ও পরিকল্পিত সেই অনাথাশ্রমের জন্য খাটতে পারবে? অবশ্য তোমায় একা খাটতে হবে না।" সবিস্ময়ে সম্মতি জানাইলে মিসেস্ বিংহাম বলিলেন, "একজন বড়লোক তাঁর স্বামীর হাতে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছেন—অসহায়দের জন্য একটি অনাথাশ্রম গঙ্গার ওপারে তৈরি করাবার জন্য এবং তাঁকে তোমার কথা বলায় তিনি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কইতে বিশেষ উৎসুক হয়েছেন, কারণ আমি কিছুদিন তো এখানে থাকছি না, আর তিনিও নাকি শীঘ্র নিজের দেশে ফিরে যাবেন।"

অণিমা প্রথমে সেই অচেনা ভদ্রলোকটির সহিত সাক্ষাতে সম্মত হয় নাই, কিন্তু মিসেস্ বিংহাম তার আপত্তি বুঝিয়াই বলিলেন, "লোকটি খুবই ভাল, তিনি প্রায় মাসখানেক হতে যায়, সাহেবের কাছে মধ্যে মধ্যে আসছেন, এবং তিন দিন হলো তাঁর সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে। তাঁর সাক্ষাতেই কথাবার্ত্তা হতে পারে। তবে লোকটি অত্যন্ত অসহিষ্ণু দাতা, বিলম্ব সইতে পারবেন না। তা হোক্ এত টাকা যে দিয়েছে তার আবদারটা রাখাও তো উচিত।"

একথা সত্য, কর্ম্মে মানুষ দেবতাও হয়, পিশাচও হয়, আবার মানুষই থাকে। যে লোকটি মিসেস্ বিংহামের আদেশে সেই ঘরে প্রবেশ করিল, স একটি নেহাৎ অল্পবয়স্ক যুবক, সাজপোষাকও খুব তার জমকালো। কথাবার্ত্তা ধরণ-ধারণ অস্বাভাবিক নয়। একটু যেন নাটকীয় ভাবভঙ্গি, তাহা হইলেও সে তার দেশের সুপুত্র সেই লোকটির প্রতি প্রাণপণে

প্রথা ও বিলাস আনিবার জন্যই যত্ন করিয়াছে।

অণিমা তাকে বলিয়াছিল, "এত তাড়াতাড়ি কি কোন বড় কাজ স্থির করা যায়? ধীরভাবে পরামর্শ করে দেখা যাক্ না, এঁরা ফিরে আসুন।"

লোকটি—তাঁর নাম কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়চৌধুরী—বলিলেন, "না না 'শুভস্য শীঘ্রং' ব'লে শাস্ত্রে একটা কথা আছে, সেইটে মেনে চলাই ভাল। দেখুন এখানে এসে অবধি দেখছি, গরীবের বড় কষ্ট! এক এক সময় এ কষ্ট আমার তো অসহ্যই মনে হয়। এমন কি মনে হয় যে, নিজের যা কিছু আছে,—প্রাণ পর্যন্ত ওদের জন্য ঢেলে দিই।"

কথাটা যেন ধার করার মতন শোনাইল, তথাপি বড় উচ্চ অঙ্গের কথা। অণিমা আর "না" বলিতে পারিল না। সে মিসেস্ বিংহামকে তার যা বলিবার ছিল বলিয়া বিদায় লইয়া আসিয়াছে। শেষ কথা, কুমার বরেন্দ্র-কৃষ্ণ যামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাঁর পরামর্শ অনুসারে স্থান স্থির হইবে। প্রথমে কুমার বাহাদুর এ সম্বন্ধে একটু খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিলেন, তারপর ইহাতে মিসেস্ বিংহামেরও প্রবল ইচ্ছা দেখিয়া অগত্যা স্বীকৃত হইয়াছেন। কথা আছে তিনি কাল সকালে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ী যাইবেন, এবং সেই সময়ে যামিনী সেখানে গেলে স্বয়ং বিংহাম সাহেবের উপস্থিতি-কালে একটা কিছু স্থির করা হইবে। সদয়া মিসেস্ বিংহাম তাঁদের দার্জ্জিলিং যাত্রা একদিন পিছাইয়া দিয়াছেন।

যামিনী কিছুমাত্র বাধা না দিয়া সব কথা চুপ করিয়া শুনিল ও শেষ-কালে অণিমা যখন কথা শেষ করিয়া তার মুখের দিকে উৎফুল্ল-নেত্রে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে এই যে জড়াচ্ছি এতে তো আপনার ক্ষতি করচি না?" তখন হঠাৎ তার মনের মধ্য দিয়া একটা উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরির আকস্মিক গৈরিক নিঃস্রাবের মত বেগবান একটা তপ্ত ঈর্ষার তরঙ্গ এক মুহূর্তের মধ্যে এদিক হইতে ওদিকে বহিয়া গেল।

শিশু যখন প্রথম হাঁটিতে শেখে, তখনি তার অন্যের সাহায্যের আবশ্যক হয়, কিন্তু সে নিজের পদদ্বয়কে মাটির উপর দৃঢ় করিতে পারিলেই তার অপরের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া গিয়া একদিনের সেই অত্যাবশ্যক অবলম্বনকে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় করিয়া দেয়, তেমনি আজ অণিমা যাহাকে সহায় করিয়া তাহার ক্ষুধিত চিত্তের প্রথম গ্রাস সংগ্রহ করিয়াছিল, আজ নিজের পাত্র পূর্ণ দেখিয়া তাহাকে এমনি করিয়া দূরে ঠেলিয়া সরাইয়া দিতে চাহিতেছে! যামিনী নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। অকৃতজ্ঞ বলিয়া তাহাকে তিরস্কার করিবার ইচ্ছা চকিতের মতই মনে উদিত হইয়াছিল, কিন্তু তখনি আপনাকে সবলে সামলাইয়া লইল।

কিছুক্ষণ মাত্র পূর্ব্বেও সে অণিমার সঙ্গ হইতে মুক্তি ইচ্ছা করিয়া একটা কোনখানে নিজেকে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল, সে কথা এখন আর তার মনে পড়িল না, মনে মনে রাগ করিয়া ভাবিল, অকৃতজ্ঞ! এতদিন কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণ কোথায় ছিল?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া যাওয়াতে তখনই সহজ হইতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কুমার কি খুব কালো? একটু রোগা আর বেঁটে? আমি যেন কোথায় দেখেছি, না নামটা শুনেছি যেন।"

অণিমা মৃদু হাসিয়া কহিল, "ঠিক উল্টো।"

যামিনী চিন্তিত ভাবে কি একটা পুরাতন ঘটনা স্মরণের চেষ্টায় আপনার মনেই বলিল, "'কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়চৌধুরী' কোথায় যেন শুনেছি!" তারপর অণিমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "আমার সাহায্যের যদি দরকার না থাকে, তা' হ'লে অবশ্য আমি আপনাদের বিরক্ত করতে সাহস করবো না।"

অণিমা তাড়াতাড়ি বাধা দিল, "সে কি কথা। আপনাকে আমাদের দরকার নেই? এ কি বলছেন আপনি? আমার মনে হচ্ছিল আপনাকে

হয়ত আমি বড্ড বেশী খাটাচ্ছি। আপনার হয়ত এতে কাজকর্ম্মের ক্ষতি হচ্চে।"

অণিমার বিস্ময়পূর্ণ আগ্রহের স্বর তাহাকে যেন অনুতাপের কশাঘাত করিল। নতমুখে সে কহিয়া উঠিল—"মাপ করবেন।—আমি ভুল বুঝেছিলুম, না,—আপনি আমার কোনই ক্ষতি করেন নি।"—অণিমা মনে মনে পুলকিত হইল।

কচুরীর পুর ভাজিয়া কচুরীগুলি ফুলিয়া উঠিবার জন্য তাহাতে একটু-খানি সোডা বাই-কার্ব মিশানোই যে পিসিমার খাস্তা কচুরীর গোপন রহস্য, মৃণালিনী আজ এই আবিষ্কারে খুব খুশী হইলেও আসল কথাটা সে একবারের জন্যও ভুলিয়া যায় নাই। এমনি করিয়া কথাটা পাড়িল যে, যেন তাঁহারই নিসঙ্গ গৃহকার্য্যের একজন সহায় যতক্ষণ না জুটিতেছে ততক্ষণ তার চোখে নিদ্রা এবং মুখে অন্ন কিছুই রুচিতেছে না। সৌদামিনী একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"আমার কথা ছেড়ে দাও মা। ছেলে আমার যে মুখটি চুণপানা করে বেড়ায়, এ আমি আর সহ্য করতে পারচিনে'। তা' তোমরাই এর কিছু বিহিত কর না মা! আমার কথা তো সে হেসেই উড়িয়ে দেয়।" মৃণালিনী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিছুই বলেন না না কি? আপনি কেন জিদ করেন না? ইচ্ছে থাকলেও হয়ত উনি লজ্জা করে বলতে চান না।"

অন্ধকার ঘরের মধ্যে যে বসিয়াছিল, খুব কাছের জিনিষটিও তার চোখে সুস্পষ্ট ছিল না, কিন্তু যেই একটি শিশু দীপহস্তে গৃহে প্রবেশ করিল, অমনি সেই আলোক আসিয়া চক্ষুকে বস্তু প্রত্যক্ষ করাইয়া দিল। ছেলে-মানুষ হইয়াও তার বুদ্ধিবিবেচনার জন্য তাহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সৌদামিনী কহিলেন, "ঠিক কথা মা! ঠিক বলেছ। যেমন হোক একবার বিয়ে হয়েছিল কিনা, একটা লোক-লজ্জা আছে বই কি। বটে! নৈলে,—জান তো সবই তোমরা,—তোমাদের আর আমি কি বলবো। তোমার

বাবা যখন অনর্থক একটা ফ্যাসাদ বার করে বিয়েটা ভেঙে দিলেন, ছেলে আমার সে কি মনঃকষ্টই পেয়েছিল।"

মিলি কহিল—"তা দেখুন পিসিমা। ঈশ্বর যা করেন, তার উপর ত কারও হাত নেই। অনির বর যখন উনি, তখন মানুষের চেষ্টায় কি আর তা বদলাতে পারে? এখন আপনার হাতে ওকে সঁপে দিতে পারলে ওর জন্যে আমরা নিশ্চিন্ত হই। বড় হয়েছে বটে, কিন্তু স্বভাব এখনও যেন তেমনি কচি খুকীটি। অমন সরল প্রাণ আর কোথাও পাবেন না—এ আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি।"

সৌদামিনী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আহা, মা! আমাকে আর তা বলতে হবে না, তোমাদের দুটিকে দেখে আমার যেন প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। অণিমা আমার ঘরে এলে, আমার ঘরে একাধারে লক্ষ্মী-সরস্বতীর আগমন হবে, তা কি আমি জানিনে?"

বিদায়-কালে অণিমা সৌদামিনীর পদধূলি লইলে তিনি সস্নেহে তার চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিয়া কহিলেন, "কবে যে কাছে পাব মা! তা জানিনে। লক্ষ্মী মা আমার! এসো মা—মধ্যে মধ্যে।"

কথাটার মধ্যে কোন গূঢ়-তত্ত্বের অবস্থিতি সন্দেহ না করিয়াই সে অকুণ্ঠিত আগ্রহে শীঘ্র শীঘ্রই আসিবে আশা দিয়া বিদায় লইল। মিলি অলক্ষিতে যামিনীর মুখে তার সতর্ক দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দেখিল সেও ইহার দ্বিতীয় এবং প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধই রহিয়া গিয়াছে।

সে মনে মনে ভাবিল, "এরা দুটোই সমান!"

পরদিন রাত্রে শয়ন করিতে গিয়াও যামিনী তার নব-পরিচিত রমেন্দ্র-কুমারের কথা ভাবিতেছিল। মিসেস্ বিংহাম তাহাকে সাগ্রহে তাহার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন; এবং মধ্যে মধ্যে তার এই অযাচিত জোটা

যানটার উল্লেখ করিয়া প্রসন্নভাবে যদিও তাহাকে "বড্ড ভাল লোক! বিস্ময়জনক দয়ালুচিত্ত!" এই সকল বড় বড় বিশেষণে বিশেষিত করিতে লাগিলেন,—তথাপি সে তাঁহাকে কেমন যেন একটু অপছন্দর দৃষ্টিতে না দেখিয়া থাকিতে পারিল না। তিনি যখনি স্বরে এবং ভাবে আবেগ প্রকাশ করিয়া আমাদের "দেবীতুল্যা মিস্ দত্ত",—"সম্মানিতা মিস্ দত্ত,"—ইত্যাদি বলিয়া অণিমাকে উল্লেখ করিতে লাগিলেন, তখনি তাহার মনে খুব একটা বেসুরা ভাব বাজিয়া উঠিতে লাগিল।

আটাশ

যামিনী বৈকালে খানিকক্ষণ বাগানে পায়চারি করিয়া বেড়াইল। তারপর বেলা অবসানে রাস্তায় বাহির হইবার সময় মনে পড়িল আজ সকালে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ীতে অণিমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, আজ আবার সেখানে যাওয়া ভাল দেখাইবে না। সে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। বাড়ীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই নলিনী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে বাবা?"

যামিনী হাসিয়া বলিল, "তুমিই বা এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

নলিনী দুই হাতে তার একটা হাত ধরিয়া বলিল, "আমি দিদির কাছে ছিলুম, দিদি বললে এই,—এই আমার মাসিমা,—মাসিমা আমার মা হবেন।—হ্যাঁ বাবা, মাসিমা মা হবে—"

বিস্ময়ে যামিনী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া ডাকিল, "নলিনী!"

"বাবা" বলিয়া নলিনী সভয়ে চোখ নীচু করিল। তাহার ভিতর

বালকের মুখ দেখিয়া তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিয়াছিল।

"ছি, এসব কি কথা! তোমার মা তো স্বর্গে গেছেন।"

কাঁদ-কাঁদ মুখে বালিকা বলিল, "দিদি যে আমায় বললেন; ঝিকে, নেত্য পিসিকে সবাইকেই তো ওই কথা বললেন—"

যামিনীর মুখে গভীর বিরক্তি প্রকাশ পাইল। সে সেই রকমই তীব্র-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বললেন তিনি ?"

"এই—এই বললেন যে, এই অণিমা-মাসিমা তোর মা হবে।"

যামিনী তাহাকে ক্রন্দনোন্মুখ দেখিয়া হঠাৎ ক্রোধ সংবরণ করিল, তার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে সস্নেহকণ্ঠে কহিল, "ছি ছি কেঁদো না! এ সব কথা কারও কাছে বোল না যেন।"

নলিনী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা।" কিন্তু তার মনটা একেবারেই দমিয়া গেল। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই যামিনী উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "পিসিমা!" সৌদামিনী তখন ভাঁড়ার ঘরের হাঁড়ি-কুঁড়ি লইয়া ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, বলিলেন, "কিরে প্রকাশ ?"

"কোথায় তুমি ?" বলিতে বলিতে সে স্বাভাবিক অপেক্ষা একটু দ্রুতপদে সেইদিকে আসিল, দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "এসব কি কথা রটাচ্চো তুমি পিসিমা ?"

পিসিমা আকাশ হইতে পড়িলেন, "কি কথা রে ? কি রটাচ্চি ?"

"নলিনীকে কি বলেছ ? ছি ছি তিনি যদি শুনতে পান, কি মনে করবেন বল দেখি ? আমি তো তা হলে আর তাঁর কাছে মুখ দেখাতেই পারবো না।" বলিতে বলিতে সে যেন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, সেই তথা-কথিত দৃশ্যটা যেন তার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল।

সৌদামিনী এতক্ষণে কথাটা বুঝিলেন। তার মুখের জলদগম্ভীর ভাব দেখিয়া তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে একটুখানি করুণার হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন,

"তা বল্‌লুমই বা! তোর রকম দেখে আমার ভয় হয়ে গেছল, যে কি না জানি কিই বলেছি।"

যামিনী কহিল, "এটা কি একটা তুচ্ছ কথা হ'ল নাকি? আমি তাঁর অভিভাবক, আমার সম্বন্ধে এ রকম কথা ওঠা কতদূর অন্যায় মনে ক'রে দেখ দেখি, তাঁর ভাই-এর কানে যদি এ সব কথা গিয়ে পৌঁছোয়, তিনিই বা কি আমায় ভাববেন।"

সৌদামিনী কুলোয় করিয়া মৌরি ঝাড়িতেছিলেন, কাজ বন্ধ করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের আরক্ত মুখের দিকে চাহিতেই হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "কি ভাববে না কৃতার্থ হয়ে যাবে। তুমি যেমন হাঁদা ছেলে, এত লেখাপড়া শিখেও নিরেট মুখ্যু! এটা বোঝ না, তারা তোমার কাছে একটা কথা পাবার জন্যে কি রকম ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। কালই ত ওর বোন আমায় বল্‌ছিলেন—"

নিগূঢ় বিস্ময়ের মধ্যে যামিনীর মুখ আশাদীপ্ত হইয়া উঠিল, মুখ হইতে আচমকা বাহির হইয়া পড়িল, "কি বললেন?"

"যা বলা উচিত তাই বললেন। 'অণিমাকে তোমার হাতে দিতে পারলে তাঁরা নিশ্চিন্ত হন', এই কথাই বললেন। আর এ কথা কে না জানে যে অণিমা তোমারই জন্যে এতকাল বিয়ে করেনি!"

যামিনী একটু দ্বিধায় পড়িল। এ কথা সে-ও অনেকবার—তার স্ত্রীর মৃত্যুর পরে নহে—পূর্ব্বেই ভাবিয়াছিল। মন একটু যেন নরম হইল। কিন্তু ভিতরে যে সংশয় জাগিল, মুখে তাহা প্রকাশ না করিয়াই শুধু একটু-খানি ম্লান হাসিয়া বলিল, "তুমি পাগল হলে নাকি? ওসব তোমার মনের বাজে কল্পনা।"

পিসিমা একটু হাসিলেন। ঝাড়া মৌরিগুলি একটি হাঁড়িতে রাখিতে রাখিতে বলিলেন—"ওরে বাপু! পাগল তুই-ই হয়েছিস্,—আমি হইনি।

মেয়েটির মুখের দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখিস্ দেখি। তা বাজে কথা এখন রাখ, বলিস্ তো রমেনের স্ত্রীকে কাল একবার ডেকে এনে কথাবার্ত্তাটা পাকা করেই ফেলি। অঘ্রাণ মাসেই বিয়েটা হয়ে যায় তাহ'লে। এ ত আর নতুন কথা নয়।"

পিসিমা আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, সহসা যামিনী ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া মুখ ফিরাইল, আশ্চর্য্যের সহিত বলিয়া উঠিল, "পাকা করে ফেল্‌বে? বল কি তুমি? এ নাকি কখন হতে পারে? আমি তো বিয়ে করব না—"

"হ্যা? বিয়ে করবিনি! কেন বল্ দেখি অমন কথা তুই বলিস? কে না দু'বার বিয়ে করছে, যে তুই একেবারে সন্ন্যাসী হয়ে থাকবি? লোকে যে একবার ছেড়ে পাঁচবারও বিয়ে করে। এই সোমথ ছেলে তুই, কিসের বয়েস তোর? নাতি হয়নি, পুতি হয়নি, বিয়ে করবিনে আবার কি কথা।"

যামিনী বিরক্তি-মিশ্রিত কৌতুকের সহিত একটু হাসিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া বলিল, "আমার মেয়ে রয়েছে, আমার পক্ষে আবার বিয়ে করা সঙ্গতই নয়। যা হবে না, তার আলোচনা না করাই উচিত। ওসব কথা তুমি মন থেকে ছেড়ে দাও।" এই বলিয়া সে দুই চারি পা অগ্রসর হইল।

পিসিমা তখন চটিয়াছেন, ডাকিয়া বলিলেন, "তা ওরা জিজ্ঞেস করে তো কি বলব? কালই মৃণালিনী আমায় বলছিলেন কিনা, তাই জিজ্ঞেস করে রাখছি।"

যামিনী দাঁড়াইয়া দেওয়ালের গায়ে নখ দিয়া আঁচড় কাটিতে কাটিতে উত্তর করিল, "ঐ কথাই বলো, যা বললুম। বিয়ে করলে আমার মেয়ের প্রতি অন্যায় করা হবে। তাহার স্বরে দৃঢ়তা ধ্বনিত হইল।"

পিসিমা কহিলেন, "অণিমার সামনেই তা'হ'লে কথাটা বল্‌বো তো?"

তাঁর মুখখানা জমাট বাঁধা মেঘের মত কঠিন ও অন্ধকার হইয়া উঠিলেও ভিতরে ভিতরে একটুখানি বিদ্যুতের রেখাও যে খেলিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা এই টিপ্পনিটুকুতেই ব্যক্ত হইল। যামিনী হঠাৎ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। সে যেন চকিত হইয়া উঠিল। ভাবিল, যদি পিসিমার কথার মূলে কিছুমাত্র সত্য থাকে, যদি—না এ সব কথা বড় জটিল, এক মিনিটে কি ইহার মীমাংসা হইতে পারে? প্রকাশ্যে সে যথাসাধ্য সহজ কণ্ঠেই বলিল—"বেশ তো যদি কৌশলে কাজটা সারতে পার তো সবটা স্পষ্ট করে নাই বা বল্লে! আর তুমি যা' বলচো তিনি আমাদের ঘরে আসতে সম্মত আছেন, আমার সে কথা বিশ্বাস হয় না।"

এই বলিয়া সে চিন্তিত ভাবে চলিয়া গেল। শেষকালকার কথাটা সে খুব সন্দিগ্ধভাবেই বলিয়াছিল।' মন তখন এই কথাটা লইয়াই যে তোলাপাড়া করিতে চাহিতেছে, সে কি করিবে? মানুষেরই তো মন!

সৌদামিনী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তার গতিপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর সে দৃষ্টির অন্তরাল হইয়া গেলে চোখ ফিরাইয়া নিজের পরিত্যক্ত কার্য্য গ্রহণ করিয়া মনে মনে কহিলেন, "তোমার মন কি আমি বুঝিনে মনে করো! কতখানি মনঃকষ্ট চেপে তুমি বাপের হুকুমে সংসারী হয়েছিলে, তা যে ঐ দু'জনকে চোখে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। স্বভাবের তুলনা করতে গেলে তো আর কথাই নেই! যাই হোক, কেউ তো আর চায়নি, তবে ঈশ্বর যখন তাকে ডেকেই নিলেন, তখন আর কেন মিথ্যে-মিথ্যে কষ্ট পাওয়া। যে তোমার জন্যেই সৃষ্ট হয়েছে, তাকে কি কেউ তোমার কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে পারে? এ কি মানুষের হাত? এ দেখেও লোকে ভবিতব্য মানে না!" তারপর একটি নিশ্বাস ফেলিয়া আবার মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "তোমায় সুখী হতে দেখলেই এবার নিশ্চিন্দি হয়ে ভগবানকে প্রাণ ভরে ডাকতে, ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিতে পারবো।

সে বউ তো ঘর সংসারের এতটুকুন ভার নিলে না, সবই আমার গলায় গেঁথে রাখতে হ'ল। এখন তো আর কথাই নেই। এই করতে করতেই তো কেটে গেল, নিজের কাজ আর কিছুই করা হ'ল না। এবার এ বউ ঘরে এলে তাকে ঘরকন্না বুঝিয়ে দিয়ে এক পাশে বসে ঈশ্বরকে প্রাণভরে ডাকব, সংসারের আর কিছুই দেখবো না।"

সৌদামিনী এই কল্পনা করিয়া মনের মধ্যে ভারি আরাম পাইলেন এবং মৌরির হাঁড়িটি মসলার হাঁড়ির সারিতে সাজাইয়া রাখিয়া জিরামরিচগুলির কাঠি ও বালি কাঁকর ঝাড়িবার জন্য মোড়ক খুলিতে খুলিতে ঠিক করিতে লাগিলেন, যামিনীর বধূ আসিলে তাহাকে কি বলিয়া তাহার স্বামী কন্যার ভার প্রদান করিবেন এবং কি রকম করিয়া তখন তিনি ধর্মপুস্তক-পাঠ ও ধ্যানধারণা চুটাইয়া করিবেন। তারপর যখন মাসকাবারের জিনিসপত্রগুলি যথাস্থানে ঝাড়িয়া-বাছিয়া গুছাইয়া রাখিয়া ঘরটি ঝাঁট দিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, তখন সেই পরিচ্ছন্ন ঘরখানি দেখিয়া মনে হইল, হায় রে! বধূ কি আর এমন করিয়া তাহার ঘরকন্নাকে ঝরঝরে তরতরে রাখিতে পারিবে, না, সে এমন কাজের 'ব্যাম্মোত'ই জানে? তখন হলুদ খুঁজিতে ডালের হাঁড়িতে হাত পড়িবে, বড়ি দেওয়া এবং আচার তৈরী বোধ হয় বাড়ী হইতে উঠিয়া যাইবে। উহারা আবার নাকি ও-সব ঘরকন্নার কাজে পরিশ্রম করতে পারে? বিশেষ করিয়া অণিমা বধূ! তখন বিশৃঙ্খল সংসারের একখানা খণ্ড চিত্র সিলিমার নেত্রপথে নখ-দর্পণের মতই ভাসিতে লাগিল। সৌদামিনী তখন ঈষৎ নিশ্বাস ফেলিলেন, "উঁহুঃ, এ মেয়ে ও ঘর-সংসারের কাজ কর্ম কিছুই জানে না। মানুষটা খুবই শান্ত খুবই আস্তিক্যে আছে সেই যা ভরসা, শেখাতে শেখাতে তবে যদি শেখে। তা মেয়েটি [illegible], যেটি শেখাব কোন মতে না বলবে না। সেও কি কম কথা!

ঊনত্রিংশ

জোড়া পার হইয়া খানিকটা দূরে অনিন্দ্যদের গোটাকতক বাড়ীর পরেই একখানি হল্‌দে রং-এর বড় দোতলা বাড়ী অনেক দিন ধরিয়াই চাবি-বন্ধ থাকিত, মাসকতক হইল সেই বাড়ীতে একজন কমবয়সী ছেলে বাস করিতে আসিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে বাড়ীর ছাদে অশথ গাছ ও বিস্তর আগাছা জন্মিয়াছিল, দেওয়ালের গায়ে বড় বড় ডোরায় বৃষ্টি-জলের দাগ নামিয়াছিল। সে সব এখন সাফ হইয়া গিয়াছে। গঙ্গার দিকে দু'পাশে দুইটি বড় বড় খড়খড়িওয়ালা জানালাযুক্ত ঘর এবং মাঝখানে জলের ধার পর্য্যন্ত বাড়ানো মোটা কয়েকটা থামের মাথায় প্রতিষ্ঠিত একটি বারান্দা। সেই বারান্দাটি পুরোণো ধরণের খুপরিকাটা-প্রাচীর-ঘেরা ছিল। বাড়ীর অধিকারী কর্ম্মচারিকে ডাকাইয়া আদেশ দিলেন, "ওইগুলা ভাঙিয়া লোহার রেলিং বসাইতে হইবে। এবং কয়েক দিনের মধ্যেই সে আদেশ প্রতিপালিত হইয়া গেল।

যারা এই পরিত্যক্ত বাগানবাড়ীতে বাস করিতে আসিল, তাদের মধ্যে একজনকেই বাবু বলা যায়। বাকি কয়জন বাবুর বন্ধু বলিয়া উল্লিখিত হইলেও তারা তরুণবাবুর মোসাহেবের দল।

হয়ত বিশদ করিয়া না বলিলেও চলে এটি বরেন্দ্রকৃষ্ণেরই দল। বরেন্দ্র-কৃষ্ণের পিতামহের তৈরি এই বাগানবাড়ী ছাড়িয়া সে গ্রামে ফিরে নাই। এখানে স্থায়ীরূপে বাস করিতেছে। কিন্তু এ কি সেই বরেন্দ্রকৃষ্ণ ?

গঙ্গাতীরের বহুদিন পরিত্যক্ত এই বাগানবাড়ীটি আগাগোড়া মেরামত হইবার পর সে বাড়ী জমিদারবাড়ীর যোগ্যরূপে সাজানো চলিতে লাগিল। বরেন্দ্রর ইহাতে প্রথমটা খুবই উৎসাহ দেখা গেলেও বেশীদিন

ধরিয়া তাহা থাকিল না। এদের সঙ্গে তার ঠিক রুচির মিল খায় না। কেমন একটা অস্বস্তিবোধ হয় তথাপি সহ্য করিয়া যায়। ঘন পুরু গালিচা, বেলওয়ারি আয়না, লেসের ও সাটিনের পর্দ্দা, বিলাতি তালবৃক্ষ প্রভৃতিতে বাড়ীখানা যেন স্বপ্নপুরী হইয়া উঠিল। কলিকাতার সাহেব কোম্পানীর দোকান উজাড় হইয়া কত কিই না বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লইল এবং যতই আসবাবের চাপে বাড়ীখানা সৌন্দর্য্যহীনতায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল, ততই তার কোথায় কি ফাঁক রহিয়া গেল, তাই ধরিয়া মোসায়েবের দল খুঁৎ খুঁৎ করিতেই থাকিল। কেনাকাটা যত হয় ততই তো তাদের পকেট ভর্ত্তি হইবে। লম্বা বারান্দায় গালিচা বিছাইয়া তার উপর পাথরের টেবিল ঘেরিয়া কতকগুলি ফ্রেঞ্চ কেদারা পাতা। সেই টেবিলের উপরকার আস্তরণখানির মূল্যই এক শত টাকার কম হইবে না। রেলিং-এর ধারে ধারে 'পাম'গাছগুলা চিত্র করা চীনা টবে সাজানো। টেবিলের উপর রূপার ফুলদানীতে বড় বড় ফুলের তোড়ার মধ্যস্থ ফুটন্ত ফুলগুলা হইতে অপর্য্যাপ্ত সুগন্ধ ভাসিতে থাকে। প্রতিদিনই বরেন্দ্রকৃষ্ণ নূতন নূতন ফ্যাসানের পাঞ্জাবী জামা পরিয়া গিলাকরা কোঁচার প্রান্ত বাম হস্তে ধরিয়া সাবান-মার্জ্জিত দেহখানিকে মন্থরগতিতে বহিয়া আনিয়া সেই বারান্দার চেয়ারে নিক্ষেপ করেন, এবং প্রতিদিনই সন্ধ্যার অন্ধকারে ওপারের গাছ-পালা মসীমাখা হইয়া উঠিলে উজ্জ্বল আলোক-সজ্জার মধ্যে তাঁদের গানের আসর জমিয়া উঠে।

সম্মুখবর্ত্তী নদীর দৃশ্য দেখার মত। চক্ষের সম্মুখ দিয়া কত কত নৌকা, স্কুল কলেজের ছেলেদের গৃহের দিকে লইয়া যায়, কাছারী-প্রত্যাগত প্রৌঢ়-ও যুবকগণ কেহ হুঁকা লইয়া তামাক খাইতে খাইতে, কেহ রাজ-নীতি, কেহ সমাজ-সংস্কারসম্বন্ধীয় উচ্চ আলোচনা করিতে করিতে, কেহ বা বিমর্ষ চিন্তান্বিত ভাবে নীরবে তাঁর বারান্দার দিকে লুব্ধপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া

দেখে। বরেন্দ্রও বসিয়া বসিয়া সব দেখেন। গঙ্গার উপর ঘূর্ণাবর্ত্ত তৈরি করিতে করিতে শান্ত আকাশে নিকষকৃষ্ণ ধূমোদ্গিরণ করিয়া গৌরীপুরের পাটের কলের বোঝাই গাদাবোটকে টানিয়া ক্ষুদ্র স্টীমারটুকু সদর্পে বাঁশী বাজাইয়া গঙ্গায় যাওয়া-আসা করিতে থাকে। তাহার চক্রমথিত জলরাশি ধুনরির তুলা ধুনিবার যন্ত্র হইতে ছড়াইয়া পড়া পেঁজা-তুলার মত চারদিকে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, একান্ত অশান্তচিত্তে বরেন্দ্রকৃষ্ণ সেই সব চাহিয়া দেখেন! এমনি একলা বসিলেই কত কথা পুরানো কথা মনে পড়িয়া মনকে উতলা করিতে থাকে।

বরেন্দ্রকৃষ্ণ ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হইয়া সে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে একজন শিক্ষিত লোকের হাতে মানুষ হইয়াছে। সকলেই আশা করিয়াছিল তার ভবিষ্যৎ ভালই হইবে। বি-এ পাশ করিয়া আরও পড়াশুনা করিতে সে ইচ্ছুকও ছিল। কিন্তু মানুষ যা আশা করে অধিকাংশ স্থলে সে আশা অপূর্ণ থাকাই যেন বিধাতার বিধান! কোর্ট ওব্ ওয়ার্ডের অধীনতা কাটাইয়া ডিম হইতে বহির্গত পক্ষি শাবকের মত সুশীল জমিদার-পুত্র কতকগুলি স্বার্থপর দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া অকস্মাৎ একদিন মুক্ত আকাশে পাখা মেলিল। ভারতবর্ষের জল-হাওয়ার গুণেই বোধ করি এদেশের ধনি-সন্তানরা শতকরা নিরানব্বই জনই এই পথাবলম্বী হইয়া দাঁড়ায়। এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নিরীহ বরেন্দ্রের পতন কত সহজে কত শীঘ্রই ঘটিয়া গেল।

ভূষণচন্দ্রের হাতে পড়িয়া আজ সে কোথায় আসিয়া পৌছিয়াছে? ভূষণ তাকে বুঝাইত,—মানুষ মানুষের অধীন হবার জন্যে জগতে আসেনি। কুকুর বিড়াল, পাখীগুলাই শিকল পরে আর দাঁড়ে চড়ে মানুষের পোষমানা হয়ে থাকবে, তা বলে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষও কি অন্য একজন লোক,—তা সে না বাপ না মনিব, শুধু মাইনে করা চাকর মাত্র—দু'টা "সি-এ-টি ক্যাটে"র

মানে বলে দিয়েছে বলেই তাকে জন্মের মতন কিসে রাখবে নাকি? ভগবান পয়সা দিয়েছেন ভোগ করতে, তাই যদি না করবে তবে পয়সা হলেই বা কি, আর না হলেই বা কি? ছেলেপিলেরা ভোগ করবে? আরে বাপু! ছেলেপিলেই যদি ভোগ করলে, তবে আমি করলেই বা লোকের বুক চড়্ চড়্ করে কেন? আর কেউই যদি না ভোগ করে তবে 'যখ' দিলেই তো হয়!" উষ্ণ-মস্তিষ্ক যুবক ভূষণের কুপরামর্শের মোহ-জালে নিজেকে সঁপিয়া দিয়া দেখিতে দেখিতে নিজের ইহ এবং পর উভয় লোককেই নির্ম্মল করিয়া তুলিল।

সকল মানুষেরই জীবনে এমন একটা সময় আসে, এক মুহূর্ত্তে সে তার সমস্ত অতীতটাকে সর্প-নির্ম্মোকের মত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া নূতনরূপে বাহির হইয়া আইসে। অনেকদিন যে ঘুমাইয়াছিল তার ঘুম ভাঙ্গিতেই বহু দিনের চাপা ক্ষুধা তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতে চায়। তার এতদিন-কার সমস্ত পাওনা আদায় করিবার জন্য তাহা দ্রুত বাড়িয়াই চলে। বরেন্দ্র-কৃষ্ণ সেদিন সেই যে অণিমার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখিল, সেই মুহূর্ত্তেই যেন তার জীবন-নদীর গতি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়া গেল। প্রকৃতির মধ্যে সেদিন যে শান্তি যে সৌন্দর্য্য ছিল, তাহা তার ফেনাবর্ত্তময় জীবন-প্রবাহের উপর ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইল। অদৃশ্য মায়াময় রাগিণীর সম্মোহন সুরে সেই হৃদয়তন্ত্রী সঘনে স্পন্দিত হইল।

ভূষণচন্দ্র এ ব্যাপারে খুশী না হইলেও বাহিরে সে উৎসাহ দেখাইয়া এমনভাবে চলিল, যেন এই বিবাহ দেওয়া ছাড়া তার জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্যই আর বাকি নাই। এখানে খুব বড়লোকের মত থাকা প্রয়োজন, এ পরামর্শ ভূষণেরই দেওয়া এবং এই উপলক্ষ্যে সে দু'পয়সা হাত করিতে পারিতেছে, ইহাই তার উৎসাহের মূল। একটু একটু করিয়া বরেন্দ্রের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল, ভূষণ তাহা লক্ষ্য করিয়া চিন্তিত হইল।

মদও একটু আধটু সে তাকে ধরাইয়াছে। আজকাল বরেন্দ্র আর মদ পানে রাজী হয় না। নেহাৎ ভাবিন যেদিন আসে, হাতে করিয়া নেয়, দু' একটা চুমুক দিয়াই সে নামাইয়া রাখে।

একদিন নাচের মজলিস অসময়ে বন্ধ করিয়া উঠিয়া গেল। গভীর রাত্রে বিনিদ্র শয্যা ছাড়িয়া ভূষণের ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "ভূষণ!" নিকটে আসিয়া বলিল, "আর এ সব আমোদের আয়োজন কোর না ভাই! আমার আর ভাল লাগছে না।" তার কণ্ঠে একটা ব্যাকুল মিনতির সুর বাজিল। "বেশ"—বলিয়া ভূষণ বিরক্তভাবে মুখ ফিরাইল, ব্যঙ্গের স্বরে কহিল, "আপনি ডোর-কৌপীন নিয়ে সন্নিসী হবেন নাকি এবার? শ্যাম বঁধুয়ার তরে? ভাল! ভাল! তাই করুন। আমিও বাঁচি তাহলে। আপনার মনের অলি-গলিতে ঢোকা কি আমার মতন মুখ্যু মানুষের কাজ! কখন যে কি মতলবে থাকেন, তার হদিশই পাইনে।"

বরেন্দ্র মুখে কিছু বলিল না। কিন্তু মনে তার একটা গভীর অনুশোচনা জাগিয়া উঠিয়াছিল। জীবনটা কি তুচ্ছ, কি অপবিত্র ভাবেই কাটিতেছে! কোন উচ্চ লক্ষ্য নাই—কোন নির্ম্মল আনন্দ নাই, কেবল অসার অপবিত্র সঙ্গ লইয়া বীভৎস আমোদ! ভদ্রসন্তানের এ কি শোচনীয় অধঃপতন! মাষ্টারমশাই কি তাকে এরই জন্য অতখানি উচ্চাদর্শ দিয়া তৈরি করিয়াছিলেন। কেমন করিয়া সে এমন হইয়া গেল?

কিন্তু মানুষের প্রকৃতি অত শীঘ্রই বদল হয় না; বিবেক মনে জাগে আবার সে বিদায় লয়। সমস্তক্ষণ বাইনোকুলার হাতে সে জানালা ও বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়ায়, এইটাই যেন তার একমাত্র কার্য্য হইয়া দাঁড়াইল। উদ্দেশ্য হইল অণিমাকে দেখা। যামিনীর সঙ্গে সে অণিমাকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে পায়, দেখিতে পাইলেই তার মনে একটা জ্বালা ধরিয়া উঠে। রাগ করিয়া ভূষণকে বলে, "কই, কি করলে? তুমি কোন কাজের নও।"

ভূষণের অপরাধ নাই। সে রমেন্দ্রকে তো ঐকথা বলিতেই গিয়াছিল, ধমক খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। বলিল, "ওদের সঙ্গে কোর্টশিপ করতে হবে দেখছি, নৈলে সেকেলে ঘটকালিতে হবে না স্যার, এরা হাফ খ্রীষ্টান কিনা, হিঁদু ত নয় যে অপর লোকের মাধ্যমে বিয়ে করবে।"

এইখানেই তার সঙ্গে যামিনীর কত প্রভেদ! সে তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত বাহিরের লোক মাত্র, আর যামিনী তার সহিত এক নৌকায় বসিবার অধিকারী। এক টেবিলে বসিয়া তারা কাজ করিতে করিতে [illegible] যায়।

ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে ভূষণকে বলিল, "দেখ ভূষণ, আমি [illegible]লেক্টারের ওয়ার্ড ছিলুম, সাহেবদের ধাতধোত কিছু কিছু জানি, মেম সাহেব 'ওর' বন্ধু। তাঁদের টাকায় বশ ক'রে ফেলুব। একটা পরামর্শ করি এসো।"

ভূষণ দেখিল—যদি এ নাটক মিলনান্ত হয় তাতে [illegible]র টাকা, আর বিয়োগান্ত হইলে ত কথাই নাই। যাহোক একটা আপ[illegible] শান্তি হোক। উৎসাহ দেখাইয়া বলিল, "ঠিক কথা, টাকা যখন আছে ভা[illegible] কি! বলে 'বেঁচে থাকুক চূড়াবাঁশী'। টাকা দিয়েই কিনে ফেলুন, যা[illegible] একটা পেটী উকিল, ওর বাপ ঐজন্যেই ওর সঙ্গে বিয়ে দেয়নি, সে সব [illegible]মি লোকমুখে খবর পেয়েছি, নিশ্চিন্দি হয়ে বসে নেই।"

যে সুর অব্যক্তাবস্থায় বীণার তারে নিহিত থাকে, অব্যক্ত হইতে যখন সে ব্যক্ত হইবার প্রথম ধাপে পা দেয় ও তাহাতে প্রথম গুঞ্জন জাগিয়া ওঠে, তখন তা অস্ফুটবাক্ শিশুর প্রথম বাক্য-স্ফুরণের মত মৃদু কাকলীতে ধ্বনিয়া উঠিয়া নিজের চারি পাশে একটা স্পন্দন আনয়ন করে ও ক্রমে ব্যক্ত হয়।

সেদিন অপরাহ্নে অপ্রত্যাশিত ভাবে পিসিমার মুখে যামিনী যে কথা শুনিল তাহা তার চিত্তের সেই অব্যক্ত সুরেরই উপর আঘাত করিয়াছিল। দিগন্ত-প্রসারিত আকাশের গায়ে সূর্য্যের উদয়াস্তের আশ্চর্য্য মহিমা প্রতি প্রভাত-সন্ধ্যাতেই ব্যক্ত হইয়া আসিতেছে কিন্তু কোন্ এক [illegible] আমাদের প্রাণের তন্ত্রীতে যখন সেই সৌন্দর্য্যের মহান্ সুর পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তখনি তা এর প্রকৃত মহিমা অনুভব করাইয়া দেয়। যে জড় [illegible] আমাদের কর্ম্ম-জগতের প্রভু ছিল, এই জড় দেহের কর্ত্তা ছিল, সেই-ই সে-দিন সমাহিত চিত্তের অচঞ্চল ধ্যানের মধ্যে আনন্দ স্বরূপের পরিপূর্ণ মহিমা ব্যক্ত করে। মস্তক নত করিয়া দর্শক বলে "চিরদিনই তুমি পূর্ণ, আমার অজ্ঞানতাই আমার নিকট তোমার স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল।"

পশ্চিমাকাশের প্রান্তে তখনও সূর্য্যাস্তের অল্প ধূসর আভা লাগিয়া ছিল। সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধ শান্তি আকাশ ও বাতাসে গভীর হইয়া জাগিয়া আছে। পাখীর কাকলী তখন প্রায় থামিয়া গিয়াছে। এদিকে ওদিকে গাঢ় সবুজ গাছগুলি নিবুতি রাত্রের পল্লীগুলির মত স্তব্ধ হইয়া আসিতেছে। একটি সারি বক তার অতি শুভ্র ডানাগুলি মেলিয়া দিয়া অনেক দূরের কোন একটা জলার ধার হইতে চিত্রাঙ্কিতের মতই উড়িয়া

ঝলসিয়াছিল। নীল আকাশের কোলে যেন [illegible] একখানি সুবিস্তৃত [illegible] মালা।

যামিনী ছাদের আলসের গায়ে পিঠ রাখিয়া ঊর্দ্ধ মুখে আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। দিবা অবসানে পশ্চিমাকাশের গোলাপী আভা-যুক্ত পাটল ম্লানিমাটুকু তার চোখের সামনে আজ যেন একটি অপূর্ব্ব স্বপ্নের মত বিমোহন দেখাইল। আকাশের বিশালতা বিশালতর বোধ হইল এবং তার এই ক্ষুদ্রদেহে আবদ্ধ ক্ষুদ্রতম চিত্ত, প্রাণ আজ যেন সহসা সত্যের আলোকে নিজের বিশালতাকে উপলব্ধি করিয়া স্বয়ংপ্রভ হইয়া উঠিয়া এই সন্ধ্যাকাশের তলায় বিশ্বপৃথিবীকে সুন্দরতম ও আনন্দতমরূপে সন্দর্শন করিল।

সৌদামিনী বলিয়াছেন, "মেয়েটির মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখিস্ দেখি।" এই ক'টি কথা মাত্র! কিন্তু ঐ কথা ক'টিই যেন কোন অশ্রুত-পূর্ব্ব অপূর্ব্ব সঙ্গীতের রেশের মত তার হৃদয়-বীণার তারে তারে বিচিত্র লীলায় খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কি সে মুখ! স্বর্গের সুষমা ও পৃথিবীর কর্ম্মোদ্দীপনা মিলাইয়া গড়া সেই মুখে কি আছে? শ্রদ্ধা? প্রীতি? সহানুভূতি? এসব তো এই পৃথিবীর সমুদয় জীবের প্রতিই তার অন্ত-রের ধরিয়া সঞ্চিত আছে, সে কি তা জানে না? প্রথমদিন হইতেই তো আছে।

আর? আর 'প্রেম'? হাঁ নিশ্চয়ই তাই! তাদের মত [illegible]দের এ সব বিষয়ে হয়ত ভ্রম হইলেও হইতে পারে, কিন্তু পিসিমার মত বহুদর্শিনী প্রৌঢ়ার কখনও এই সতর্ক পর্য্যবেক্ষণ দৃষ্টি মিথ্যা হইতে পারে না।

তার অন্তরের মধ্যে বিশাল ও বিপুলভাবে "প্রেম"—এই একটিমাত্র কথা হৃদয়-স্পন্দনের তালে তালে রক্তের উচ্ছ্বাসের সহিত বাজিয়া বাজিয়া উঠিতে লাগিল। অণিমা তাকে ভালবাসে! তার এই জীবন, সীমিত বহু

[illegible] মার্বেল বোধ হইল। [illegible]
পর্যন্ত সে নীচে নামিল না দেখিয়া পিসিমা হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপরে উঠিয়া আসিলেন। তখন প্রথম শুক্লপক্ষের চাঁদ বক্ররেখায় আকাশের উপর দিয়া গড়াইয়াছে। সন্ধ্যার শুকতারা নির্নিমেষে তার মুখখানার উপর উজ্জ্বল দীপ্তিতে চাহিয়া দেখিতেছে। মৃদু জ্যোৎস্নায় চিলের ছাদের ছায়া দীর্ঘ হইয়া প্রায় আধখানা ছাদ জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে. সেই ছায়ার অর্দ্ধ অন্ধকারের মধ্যে তখনও সে তেমনি ছাদের আলিসায় ভর রাখিয়া দাঁড়াইয়া।

সৌদামিনী কাছে আসিয়া তার গায়ে হাত দিয়া ডাকিলেন। সে আহ্বানে যামিনী ঈষৎ চমকিয়া উঠিল; তার যেন অকস্মাৎ ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। লজ্জিত হইয়া বলিল, "কি পিসিমা!" সৌদামিনী তাহার চিন্তিত মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন, সস্নেহে গায়ে হাত দিয়া মুখের উপর গভীর করুণার সহিত দৃষ্টি স্থির করিয়া কহিলেন, "অনেক রাত হ'য়ে গেছে যে বাবা! খেতে যাবিনে!"

মনে মনে বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার কাছে তুমি লুকোতে চাও বাপধন! আমি কিরে বাবু আজকের মানুষ যে, তোর ওই কাঁচা গোপ-রাঙ্গানিতেই ভয় পেয়ে ঘাবড়ে যাবো!"

যামিনী সমধিক লজ্জিত হইয়া বলিল, "আর কাকেও ডাকতে পাঠালেই হ'ত। তুমি এই ছ'টো সিঁড়ি ভেঙ্গে নিজে এলে কেন পিসিমা!"

সৌদামিনী কহিলেন, "তা হোক গে বাছা! তাতে আমার কিছু কষ্ট হয়নি। ভয় হ'ল—কি জানি শরীর-টরীর খারাপ হ'ল না কি হলো।"

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে সৌদামিনী হঠাৎ বলিলেন, "বাবা প্রকাশ!" থামিয়া মুখ ফিরাইয়া যামিনী একটু বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা

করিল, "কি পিসিমা ?" সৌদামিনীর স্বরে একটা আবেদনের সুর ছিল। তিনি বলিলেন, "বাবা বুড়ো হয়েছি, আর তোদের ঘরকন্না নিয়ে চারকাল জবাই হতে পারিনে, লক্ষ্মী ছেলে, অণিমাকে ঘরে আনো, তুমিও সুখী হও, আমিও একটু পরকালের চিন্তে করি।"

মানুষেই মানুষকে এমনি করিয়া ক্রমাগত প্রলোভনের স্বর্ণ-শৃঙ্খলে বাঁধিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে ! আবার এই একটা শব্দভেদী বাণ নিক্ষিপ্ত হইল। যে অণিমা তার সাধনার ধন, সে তাহাকে ভালবাসে ? সেই ভালবাসা তার সেই অনিন্দনীয় সুন্দর মুখেও নাকি পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। এ নাকি তার কল্পনা মাত্র নয়,—প্রত্যক্ষদর্শী, নিরপেক্ষ, বিজ্ঞ সাক্ষীর হলপ-করা সাক্ষ্য ! তবে তার আর কি চাই ? এই মানব-জীবনের, এই পুরুষ-জন্মের পক্ষে এ কি কম পুরস্কার ! যামিনীর প্রথমকার অস্ফুট সন্দেহটুকু ক্রমেই নানা অনুকূল চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই সরিয়া যাইতে যাইতে একেবারে দূরীভূত হইয়া গেল। সে নিজে এ কল্পনা মনে স্থান দিতে চাহে নাই, এমন কি ও-সম্বন্ধে এতটুকু ইঙ্গিতের প্রশ্রয়ও সে নিজের মনকে ভুলিয়াও কখনও দেয় নাই। যেহেতু ইহাও এই মানবপ্রকৃতিরই একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ধর্ম্ম, যেখানে তার আকর্ষণ বেশী, সেইখানেই সে বেশী করিয়াই কুণ্ঠিত। সেই নবোদিত শুকতারার দিকে চাহিয়া সে মনে মনে বলিল, সে যে আমায় তার অযোগ্য মনে করেনি, সেই তো আমার এ জন্মের সমস্ত পুরস্কার। কিন্তু, কিন্তু এ কি সম্ভব ? এ কি সঙ্গত ? আমার আরও একটা কর্ত্তব্যও তো আছে। বিবাহ কখন দু'বার হয় না। যে আমার অন্তরের ছিল, সে মৃত্যুর পরেও তাই থাকবে, কিন্তু বাইরে যে স্ত্রী বলে পরিচিত ছিল, মৃত্যু তার সে অধিকার কি কেড়ে নিতে পেরেছে ? এ পৃথিবীতে আমরা পরস্পরের বন্ধু, সহচর সহায় মাত্র, আর কিছু না। এ হয় না। এ হবেও না।

এই চিন্তায় তার অন্তরে একটা ব্যথাভরা আনন্দও যেন জাগিয়া উঠিল। কামনাহীন, স্বার্থহীন, কি মহৎ, কি বিমল তাদের এই পবিত্র সম্বন্ধ! জগতের অপর কোন দুইটি তরুণ চিত্ত বোধ করি এমন নিঃস্বার্থ নির্মল বন্ধন নিজেদের মধ্যে স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই।

কিন্তু এই যে পিসিমাটি এটি একটি সামান্যা ন'ন! আর তাই বা কি বলব! এ তো ভাল।—জগতে কোন একটি ভাল কাজ, বড় কাজ সাধিত হইবার পূর্ব্বে বরাবর এই রকমই বিবিধ মূর্ত্তিধারিণীরা অথবা শব্দরূপী অমূর্ত্ত-প্রলোভন-জাল মানুষের চিত্ত-দুর্ব্বলতা পরীক্ষা করিতে কোন অদৃশ্য দেবতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া চিরদিনই কি আসেন না! এ যেন চিরন্তন বিধান! পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এঁদের হাত ছাড়াইতে না পারিয়া কত মহাতপা বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ, এমন কি স্বয়ং মহাযোগীন্দ্র মহাদেবেরও চিত্ত-চঞ্চলতা জন্মিয়াছিল, আর এই কলিযুগের একজন দুর্ব্বল প্রাণীমাত্র সে, তার মানসিক বল আর কতটুকু!

রক্তের উচ্ছ্বাস যামিনীর ললাটে মুখে সুস্পষ্টরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, মুখ নত করিয়া সে অল্প মৃদুস্বরে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "তুমি অত তাড়া ক'র না পিসিমা, কিছুদিন আমায় ভাবতে দাও।"

ক'টি মাত্র ঘণ্টা গিয়েছে, ইহারই মধ্যে এতখানি নরম সুর! এক মুখ প্রসন্ন হাসি হাসিয়া সৌদামিনী ভ্রাতুষ্পুত্রের চিবুকে হাত দিয়া তাহার মুখের চুম্বন গ্রহণ করিলেন, হাসিয়া কহিলেন, "সোনা রে আমার! তোর কষ্ট, এই বয়েসে এই উদাসীনের মতন টো টো ক'রে বেড়ানো, একি আমি চোখে দেখতে পারি! উপযুক্ত মেয়ে, বরমাল্য হাতে যখন তোমারই মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচে!"

গভীর নিদ্রায় সুখস্বপ্ন-বিভোরের মত যামিনী নিজের অজ্ঞাতে মুগ্ধ ও রঞ্জিত হইয়া উঠিয়া নত মস্তকে নীরবে নামিয়া গেল।

নলিনী তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শরতের নির্ম্মল রাত্রি; চাঁদ নিচের দিকে নামিয়া গেলেও নক্ষত্রপুঞ্জ-প্রেরিত জ্যোৎস্নালোক ধরণীবক্ষকে অন্ধকার-মুক্ত রাখিয়াছিল। খাটের কাছে একবার দাঁড়াইয়া মশারিটা তুলিতে গিয়া আবার কি ভাবিয়া যামিনী তাহা তুলিল না। মশারির সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করিয়া নিদ্রিত শিশুটির প্রতি একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া তারপর ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া জানালার নিকটে দাঁড়াইল। তার মুখের আনন্দপূর্ণ সহাস্য ভাব মুহূর্ত্তের মধ্যে সুগভীর সন্দেহপূর্ণ দ্বিধায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

পিসিমা সেই যে মধুর প্রলোভনটুকু তার লুব্ধ-লোচনের সম্মুখে 'বরমাল্য-হস্তা' রূপে—ঔদরিকের সম্মুখে পায়সের পাত্রের মত তুলিয়া ধরিলেন, সেই চিত্রখানি তার দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তকে সবলে পরাজয়ের দিকেই এতক্ষণ আকর্ষণ করিতেছিল। আহারকালে ও তারপর বিশ্রাম করিতে করিতে সেই শব্দ ক'টি দিয়া সে নিজের অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে একখানি ছবি আঁকিয়া দিল। আঁকিয়া কি দেখিল, তা ঠিক বলা যায় না, তবে ছবি একখানা ঠিক চিত্রিত হইয়া তার চোখের সম্মুখে ছায়া ফেলিয়া, তার বক্ষ-রক্তে আঘাত করিতেছিল, এটা সম্পূর্ণ সত্য! সেই ছবিতে যেন এক শুক্লবসনা শুভ্রবরণা জগদতীত নারী-মূর্ত্তি একগাছি কুন্দ কি মল্লিকার, জুঁই না চামেলীর গোড়ে মালা হাতে ধীরপদ-সঞ্চারে তার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়াছে। তার স্থির অচপল দৃষ্টি আজ হৃদয়ভারাবনত, ললাটের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বুদ্ধি-বিকাশের রেখাগুলির উপর নব-রক্তিমা,—পূর্ব্বাকাশের মত গোলাপী জ্যোতি ফেলিয়া নবজীবনের সূচনা করিতে বাধিত হয় নাই। সেই প্রার্থিত বিজয়মাল্য গ্রহণ করিতে কোন্ হতভাগ্য মূঢ় নিজের কণ্ঠ তাহার দিকে নীরবে অগ্রসর করিয়া না দিয়া জড় হইয়া থাকিবে?

কিন্তু এ যে এক সমস্যা! এ বড় কঠিন পরীক্ষা! ওই যে ঘুমন্ত মুখ

তার ইহজীবনের অবলম্বন, হৃদয়ের একমাত্র সুখজ্যোতি,—ও যার সজীব প্রতিকৃতি সে যে তার আর কেহই থাকিবে না—এ বিচার তো নলিনীর পক্ষে গৌরবের নয়। তার অন্তরে তার স্থান হয়ত তেমন করিয়া নাই, বাহিরে সে যে তার নলিনীর মা। বড় হইয়া হয়ত নলিনী সবই শুনিবে, হয়ত সুসন্ততার সহিত তার বিবাহের পূর্ব্বে অণিমার সহিত বিবাহের সম্ভাবনার কথাও শুনিতে তার বাকি থাকিবে না, তখন সে কি মনে করিবে না, তাহার মা তার পিতার কাছে প্রকৃত শ্রদ্ধা, ভালবাসার পাত্রী ছিল না? যখন তিনি তাহাকে লইয়া বাহিরে ঘর-সংসার পাতাইয়াছিলেন, তখনও মনে মনে ইহাকেই ভাবিয়াছেন, তাই আজ তাহার অবর্ত্তমানকে মুক্তি বোধ করিয়া ইহাকেই ঈপ্সিত স্থানে বরণ করিলেন? না, যামিনী সব সহ্য করিতে পারিবে, কিন্তু সে তার নিজ সন্তানের নিকট অশ্রদ্ধেয় হইতে পারিবে না। অথচ, অথচ—।

হ্যাঁ, অথচ যদিই পিসিমার সন্দেহ সত্য হয়? যদি অণিমা তাকে, নাঃ, এর কোন মীমাংসা করা যায় না!

একত্রিংশ

একদিন যাহা কল্পনামাত্র ছিল, যখন তাহাই বাস্তবরূপে দেখা দিল, তখনকার সে আনন্দের গভীর সংঘাত সহ্য করা সহজ হয় না। বরেন্দ্র-কৃষ্ণকেও প্রায় বিহ্বল করিয়া তুলিল তার এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য। যে দূরস্থিতার রূপবহ্নিকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া তার পতঙ্গ-হৃদয় এতদিন গুঞ্জরিয়া ফিরিয়াছে, আজ সে যখন তার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুই হাতের অঞ্জলি-ভরা নিজের সর্ব্বস্ব তারই পদপ্রান্তে উৎসর্গিত করিয়া দিল, তখন সেই মুগ্ধ মূঢ়

নিজের মধু পকের আর্দ্ধ পর্যন্তও জানিতে পারিল না, এ বহি তাকে দগ্ধ করিবে কি স্নিগ্ধ করিবে সে পর্য্যন্ত ভাবিয়া দেখিল না। সে যে তাহারই সোনালী আলোয় জ্বলিতে পাইয়াছে, ইহাকেই সে তার জীবনের সাফল্য-রূপে বরণ করিয়া ধন্য হইল। দেশী বিদেশী নাটক নভেলে যেমন প্রথম দর্শনে নায়িকার প্রতি গল্পের নায়কের প্রবল ও সতেজ প্রেম জন্মায় এবং নায়িকারও তথাকথিত অবস্থা ঘটিয়া ওঠে, তার এই ভালবাসাও সেইরূপ উৎকট ভালবাসা-ব্যাধির লক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিল। বিশ্বাস ছিল অণিমাও তাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না। যেহেতু চুম্বকধর্ম্মী প্রেমও নাকি প্রত্যাকর্ষণ করে। দিনের পর দিন দেখা সাক্ষাৎ ঘটিতে লাগিল, উপাসিতার মর্ম্মতলে তাঁর স্থান কতটুকু অগ্রসর হইল, এ সংবাদ মেরুপৃষ্ঠ-সংবাদের মত অনুদ্ঘাটিতই রহিয়া গেল।

অণিমা বড় একটা অপরিচিতদের সঙ্গ করা পছন্দ না করিলেও বরেন্দ্র-কৃষ্ণের সহিত কার্য্যানুরোধে মেলামেশা করিতেই হইল। রমেন্দ্রনাথ কিম্বা যামিনীর সাক্ষাতে ভিন্ন সে একাকী কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করে না। কিন্তু এই দুই পাহারাওয়ালার প্রহরার মধ্যে অল্প সময় কাজের কথা কহিয়া বিদায় লইতে বাধ্য হওয়ায় বরেন্দ্রের মনে একটা মস্তবড় খুঁত থাকিতেছিল। বিশেষতঃ যামিনীর অবস্থিতি যেন তাহাকে তপ্তশেলে বিঁধিত। যামিনী উহার সহিত এমনভাবে কথাবার্ত্তা কহিত,—তার মত অল্পবয়স্ক জমিদারপুত্রের পক্ষে দুর্লভ দানশক্তির উল্লেখে সাগ্রহ ধন্যবাদ দিত, তাকে নিজেদের মধ্যে পাওয়ায় যে খুব খুশী হইয়াছে, ইহাও প্রকাশ করিয়াছে, তথাপি তাহার মধ্যে এমন কিছু ছিল যাহা বরেন্দ্রকে তাহার সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ রাখিয়াছে। অথচ তার অপরাধের এমন কোন বাহ্যিক প্রমাণ তো ছিল না, যা লইয়া তাকে দোষ দেওয়া যায়। প্রথমদিককার সাক্ষাদভিলাষের আনন্দ-বিহ্বলতা কাটিয়া এখন একচ্ছত্র অধিকার স্থাপনের চিন্তা ক্রমশঃ

মনে জাগিয়া উঠিতেছে। মানুষ নিজের অবস্থায় সুখী হইতে তো পারে না।

অণিমার মনেও একটু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। প্রথম যেদিন সে এই লোকটিকে মিসেস্ বিংহামের গৃহে তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য অত্যধিক ব্যগ্র দেখে, তখন ইহাকে সে হাজার চেষ্টা করিলেও ভাল চোখে দেখিতে পারে নাই। এবং পুনঃ পুনঃ উঠিয়া যাইবার প্রবল ইচ্ছাকে দমন করিতেও বাধ্য হইয়াছে, কিন্তু এই আতুরালয় উপলক্ষ্যে যখন হইতে তাহার সহিত সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ ঘটিতে লাগিল, তখন একটু একটু করিয়া ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে তার মতটা বদলাইয়া যাইতেও আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে তার অস্বাভাবিক বিনয় বাক্য তার কানে যেন চাটুকারের ছন্দে বাঁধা স্তব-গানের মতই শুনাইত। এখন কিন্তু তা' আর ধার করার মত মনে না হইয়া শ্রদ্ধারই উচ্ছ্বাস বুঝিয়া তার মানবীয় চিত্তকে তাহার প্রতি—ভক্তের প্রতি দেবীর মতই কৃপাপরবশ করিয়া তুলিতেছিল। ইহার নারীর মত কোমল দেহ ও সুকুমার বেশভূষা মনের মধ্যে একটা অবজ্ঞার ভাব আনিয়া দিত। বিশেষত বহুমূল্য হীরার আংটি, সিল্কের চাদর, রেশমী পাঞ্জাবী, গিলা করা ধুতি ও সর্ব্ব সময়েই পারিপাট্যযুক্ত কুঞ্চিত কেশের স্তর, তার সাগ্রহ দরিদ্র-প্রেমের সহিত একেবারেই যেন খাপ খাইত না। বীণাকে ইমন কল্যাণের স্বর বাঁধিয়া- ভৈরবীতে গান ধরিলে অনভিজ্ঞের কানে যেমন নেহাৎ বেসুরা ঠেকে, তেমনি তারও এইখানটায় যেন গোলক-ধাঁধাঁর মত ঠেকিত। যে হস্ত সর্ব্বদা নিজেকে দেহের উৎকর্ষ সাধন করিতে নিরত থাকে, তা কেমন করিয়া আর্ত্তত্রাণ করিবে, ইহা সে যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। ভাবিয়া চিন্তিয়া ধরিয়া লইয়াছে ছেলেটি পাড়াগাঁয়ে থাকে, তাই সুরুচি-সঙ্গত, উন্নত চালচলন শিখিতে পারে নাই। এই জন্যই সে হয়ত নিজের অক্ষমতায় নিজেই মধ্যে মধ্যে জড়িত হইয়া পড়ে ও বাড়িয়া উঠে। এই জন্যই তার প্রতি উহার ভক্তির প্রাবল্য অস্বাভাবিক

ঠেকিতে থাকে ; ... লোকটির আর তো কোন দোষ নাই ! একটি বড় লোকের ছেলে, যে ইচ্ছা করিলে উৎসন্নের পথ ধরিয়া তার শেষ সীমানায় চলিয়া যাইতে পারিত, সে যে তা' না করিয়া এই ক্ষুরধারবৎ দুর্গম পথের যাত্রী হইতে আসিয়াছে, ইহাই না তার সমস্ত বড় খুঁৎ ধরা পড়িবার একমাত্র হেতু ? নহিলে সে যেখানে যাইত, সেখানের সঙ্গীরা তার মধ্যে কত সৎগুণের আবিষ্কারই করিতে পাইত, খুঁৎ খুঁজিয়া পাইত না।

'মাটি ঠিক তৈরিই আছে, গড়িয়া লইলেই হয়।' সেদিন যামিনীকে যখন এই কথা সে বলিল, তার চোখে মুখে একটা উৎসুক স্মিত আনন্দ ব্যক্ত হইল। সে শ্রোতার মুখ হইতেও এমনি একটা উৎসাহ যুক্ত প্রতিধ্বনির প্রত্যাশা করিতেছিল, কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত দেখিল, সেই সহানুভূতির ভাষাটা তাঁর ঠোঁটের পাশে অকস্মাৎ একটুখানি অবিশ্বাসের স্মিতহাস্যে বিকশিত হইয়াছে। ব্যথিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "হাসলেন যে ?"

রমেন্দ্র আগ বাড়াইয়া বলিয়া বসিল, "অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।"

"কেন প্রকাশ বাবু ? কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণ তো লোক মন্দ নন ?" যামিনীর বৃথা সন্দিগ্ধতায় অণিমার মনে একটু ব্যথা লাগিয়াছিল। রমেন্দ্রের প্রকাশ্য গ্লানিতেও সে এমন ব্যথিত হয় নাই। সে ... রমেনের মত যামিনী সহজে কাহারও বিরুদ্ধে কোন মত প্রচার করে না।

একটু দমিয়া বলিল, "তবে কি আপনি তাঁর ভদ্রতায় সন্দেহ কচ্চেন ? কিন্তু আমি তো ওঁকে খুবই ভাল মনে করি।"

যামিনীর একবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, তাঁহার সম্বন্ধে সে যতটুকু সংবাদ পাইয়াছে, তাহা বলিয়া দেয়। নৈহাটীতে যে এই বরেন্দ্রকৃষ্ণেরই সহচর

সেদিন সে রকম অভদ্রতা করিয়াছিল, তাহা বলিলে সে যে কি দরের লোক তাহাই প্রকাশ পাইবে। কিন্তু তার সুভদ্র মন ইহা করিতে তাহাকে নিষেধ করিত।

বরেন্দ্রের মত লোকের সহিত অণিমার ঘনিষ্ঠতা থাকা যে উচিত নয়, ইহাতে মনে তার দ্বিধা ছিল না, কিন্তু অপর পক্ষে তাদের সংস্রব যে বরেন্দ্রকৃষ্ণের পক্ষে একান্ত প্রার্থিত, তাহাও নিঃসন্দেহ। যদিই লোকটা ভালর ভান করিতে গিয়াও অংশতঃ শোধরাইয়া যায়, যদি এই উপলক্ষ্যে দু'দশটা দুঃখী লোকের একটু সাহায্য-প্রাপ্তিই ঘটে, তাহাতে বাধা দিয়া কি হইবে? নিজের অজ্ঞাতে মুখে যে ভাবটা বাহির হইয়া গিয়াছে, তারই জন্য ঈষৎ লজ্জিত হইয়া সে কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "সন্দেহ তেমন কিছু না, তবে ওঁর অপ্রকৃতিস্থ ধরণধারণে মনে হয় এই ভাবটা ওঁর ভিতর বেশী দিন স্থায়ী হবে কিনা কে জানে।"

এই যুক্তিকে সর্ব্বজন-প্রশংসিত আইনধ্যাপকের উপযুক্ত বলিয়া অণিমার মনে হইল না। সে নীরব রহিল।

যামিনীও বুঝিল মনের এই দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়া সে হয় ত কাজ ভাল করিল না, অথচ সন্দেহ বশে কাহারও বিরুদ্ধে কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করাও তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কিন্তু সে কুমারকে যতটা লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাতে দৃঢ় ধারণা জন্মিতেছিল তার এই দানচর্চ্চা ও ভদ্রতার খেলা এর সবটাই—অন্ততঃ সাড়ে পনর আনাই ভান। আসলে সে এ দরের লোক যে নয়, তাহা তার সঙ্গী সহচরদের দ্বারাই প্রমাণিত হয়। রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে কত সময় উহাকে দূরবীন হাতে ছাদে বারান্দায় ঘুরিতে দেখিতে পাইয়াছে। তার বাড়ীর নিকট দিয়া যাইবার সময় প্রমত্ত কণ্ঠের সঙ্গীত ও চীৎকার কতবার তাহাকে চমকাইয়া তুলিয়াছে। এসব দেখিয়া শুনিয়া ঘৃণাপূর্ণ বিরক্তিতে সে নিজের মনেই জ্বলিতেছিল। থিয়েটারের

স্টেজে দরিদ্র অভিনেতা 'রাজা' সাজিয়া দাঁড়াইলে সে যেমন সত্যকার রাজা হইতে পারে না, একজন ভেকধারী সন্ন্যাসী যেমন প্রকৃত সন্ন্যাসী নয়, নয়, তেমনি এই সাধু-সাজা লোকটির দরিদ্র-প্রেম যে খাঁটি জিনিস নয় এবং তার এই ভোল-ফিরানোর মধ্যে যে কিছু একটা উদ্দেশ্য নিহিত আছে এই চিন্তা তাহাকে পীড়িত করিতেছিল। নাট্যালয়ের অভিনেতার মত আগাগোড়া কৃত্রিমতা-ভরা ঝুটা লোকটা যে এমন করিয়া অণিমাকে ভুলাইয়া রাখিবে, ইহা তার ভাল লাগিতেছিল না বলিয়াই আজ আচম্‌কা সে তার সম্বন্ধে ঐ একটু আভাস দিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই এর জন্য তাহাকে মনে মনে অনুতাপ করিতে হইল। সে কাহারও ক্ষতি করিতে চাহে না। যার দ্বারা এ সংসার যতটুকু উপকৃত হইতে পারে,—হউক না।

অণিমা তাহাকে নীরব দেখিয়া কথাটা বদলাইবার জন্য অন্য কথা পাড়িল; কহিল, "আমায় শ'দুই টাকা বার করিয়ে দেবেন? রমেনবাবু শুন্‌লেই কিন্তু এখনি আমায় মার্‌তে উঠ্‌বেন।"

রমেন বাবু স্বকর্ণেই ইহা শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু মারিতে না আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে টাকা কি হবে?"

"আমার দরকার আছে",—বলিয়া অণিমা আঁচলের সুতা ছিঁড়িতে লাগিল। যামিনী তার মুখের দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "আমি বল্‌ব, কি হবে? বিশু ঘোষের ঘর ঝড়ে প'ড়ে গেছে, তৈরি হবে।"

মুখ তুলিয়া অণিমা প্রফুল্ল মুখে কহিল, "সত্যি ভাই! আহা বড্ড গরীব ওরা। রুগ্ন ছেলেগুলি, বউটি সেদিন মরতে মরতে বাঁচলো, শীত পড়ে গেছে, না দিলে হবে কেন?"

যামিনী রমেনের দিকে চাহিল, তার মুখভাবে স্পষ্ট সম্মতি না পাইয়া

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সম্মুখবর্তী সাগ্রহ দুটি চোখের উপর চোখ পড়িতেই আর সে "না" বলিতে পারিল না। সেই সঙ্গে মনে পড়িল, মিঃ বসু এত লোক থাকিতে তাঁর কন্যার টাকাকড়ি তাহারি বা হাতে দিয়া গেলেন কেন? অন্যে তার মহদুদ্দেশ্য বুঝিবে না, হয়ত তার মহৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে,—তাই না? কহিল—"দেবেন।"

রমেন্দ্রনাথ অপ্রসন্নতাপূর্ণ বিদ্রূপের সহিত ঈষৎ হাসিয়া মুখের চুরোটে বড় করিয়া একটা টান দিল। হাসিটার অর্থ এই যে, এ দুটোই এক জাতের পাগল। যে জিনিসটাকে ঘরে আনিবার জন্য এই জগৎজোড়া বৃহৎ আয়োজন চলিতেছে, তারই মুষ্টিকতক কি না এরা বিনা দ্বিধায় ছড়াইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা এক মিনিটের মধ্যে করিয়া ফেলিল। ইহা স্নায়বিক বিকারেরই এক প্রকার পরিণাম!

এর পর হইতে কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণের যাতায়াত ও তাঁর খাতির দিনে দিনে বাড়িয়াই উঠিল। কাছারীর সময় যামিনী ও রমেন গৃহে অনুপস্থিত থাকে বলিয়া সেই সময়টায় তিনি আসিলে অণিমা দেখা করিত না। সকালে বিকালে চায়ের টেবিলে তাঁর অনুপস্থিতি শুন্যতির মধ্যেই পড়িত। দেখিয়া শুনিয়া যামিনী মনে মনে একটু দুঃখিত হইল।

আতুরাশ্রমটা গৌরীপুরে হইবে কি কাঁচড়াপাড়ায় হইবে কিংবা এ-পারেরই কোন স্থানে হইবে, ইহা লইয়া মতভেদ চলিতেছিল, শেষকালে ইহা নৈহাটিতে হইবে বলিয়াই স্থির হইল, যেহেতু ঐ অঞ্চলের সমুদয় কল-কারখানার মধ্যকেন্দ্র নৈহাটি। একদিকে তার গৌরীপুর, কাঁচড়াপাড়া, অন্যদিকে কাঁকিনাড়া ইত্যাদি। অল্প দিনের মধ্যে জমি কেনা হইয়া বাড়ির প্ল্যান তৈরি আরম্ভ হইল।

এই সঙ্গে ঠিকাদারদের টেণ্ডার লওয়াও হইতেছিল। অণিমা ও

যামিনী জাঁকালো বাড়ীর পক্ষপাতী নহে, বাড়িতেই যদি বেশি টাকা খরচ হইয়া যায়, তবে কাজ চলিবে কিসে? কিন্তু মিসেস্ বিংহামের ইচ্ছা বাড়ীটা বেশ জমজমাট হয় আর এর নামটা তাঁদের নামের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, তাঁদের স্মৃতি-স্বরূপে।—অবশ্য এ ইচ্ছাটা তাঁর মনেই ছিল। বরেন্দ্রকৃষ্ণ একদিন অণিমাকে বলিল, "বাড়ীখানা একটু ভাল করেই হোক, না হয় আরও কিছু খরচই পড়বে।"

অণিমার এতে আপত্তি ছিল না, তথাপি একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "তার কি দরকার? ক্রমে ক্রমেই বাড়ানো যাবে।"

এই 'ক্রমে ক্রমে বাড়ানো যাবে' কথাটি যেন বরেন্দ্রকৃষ্ণের সর্ব্ব শরীরের রক্তের মধ্যে রিম্ ঝিম্ করিয়া মধুর নিক্কণে বাজিয়া উঠিল। হঠাৎ-আসা বর্ষার প্লাবনের মত সমস্ত শরীরের আনন্দ-হিল্লোলিত রক্তস্রোত চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়া মুখখানাকে উত্তপ্ত ও আরক্ত করিয়া তুলিল। অণিমা তবে তাকে দু'দিন পরেই বিদায় না দিয়া তার কর্ম্মসঙ্গী করিয়া লইবার ইচ্ছা করিয়াছেন? তবে 'ক্রমে ক্রমে' সেও হয়ত তার অধিকারের সীমা বাড়াইয়া লইতে পারিলেও পারে? প্রকাশ্যে সে দ্রুত অস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"আপনি আমায় যে রকম আদেশ করবেন, আমি তাই করতে প্রস্তুত আছি। তবে এটাও করা যায় যদি আপনার সম্মতি থাকে।"

আবেগে তার গলা কাঁপিতেছিল। যেন একটা ভয়ঙ্কর মনোবেগ সবলে চাপিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতে হইতেছে, এমনি যেন বোধ হইল। অণিমা,—যে সংসারের এই সকল সূক্ষ্ম জটিল ভাবসমূহের ধার ধারে না, সে-ই যখন তাহার এই অস্বাভাবিক মানসিকতার অভিব্যক্তিতে বিস্ময়ের সহিত তার মুখের উপর চাহিয়া দেখিল, তখন যামিনীর মনে যে এ ভাবটা সন্দিগ্ধ-বোধ জাগাইবে সে কি বিচিত্র নয়! তাহাদের মধ্যে অল্পদিন মাত্র সমাগত, এই প্রায় অপরিচিত ছেলেটির চোখের দিকে চাহিতেই তার

মধ্যে একটা তীব্র উজ্জ্বলতার শিখা জ্বলিয়া উঠিতে দেখিল। এ শিখা তার পক্ষে চিনিতে বাধিল না।

কে যেন সেই মুহূর্ত্তে তার পিঠে কশাঘাত করিয়া বলিয়া দিল,—এ খেলার প্রশ্রয় দিয়া তুমি ভাল করিতেছ না,—এর জন্য তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে।

অণিমার মনেও প্রথমটায় যেন কি একটা সন্দেহের ভাব জন্মিয়াছিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে নিজের প্রতি ধিক্কার দিয়া সে এই সন্দেহের বিরুদ্ধে নিজেই ধমক দিয়া বলিল, "একি অন্যায় সন্দেহ! এ লোকটি নিতান্ত সরল, আজকালকার লোকের মত পেটে মুখে বৈধ রাখিয়া বলিতে জানে না, সেই জন্যেই এমনটা ঘটে।"

অনুকম্পার সঙ্গেই চিত্ত হইতে অপ্রীতিকর চিন্তা সরাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "ওটা বরং আমরা কাল সেখানে গিয়েই ঠিক করবো। মিসেস্ বিংহামের একদিন যাবার কথাও তো আছে, তাঁর সঙ্গেই বরং যাওয়া যাবে।"

বরেন্দ্র সুগভীর কৃতজ্ঞতার আনন্দে দৃষ্টি পূর্ণ করিয়া নীরবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। যাহা সুদূর আকাশের গায়ে ছিল, তাহাই যেন মাটিতে নামিতে উদ্যত হইয়াছে! সে জানে যামিনীপ্রকাশ ভিন্ন আর কেহ একদিন এ সম্মানের অধিকারী হয় নাই। মনের ভাব মুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া হয়ত এখনি আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিবে সেই ভয়ে মাথা নীচু করিয়া নিজের স্বর্ণমণ্ডিত ছড়ির অগ্রভাগ দিয়া কক্ষতলে বিস্তৃত কার্পেটের ফুলপাতাগুলাকে বিব্রত করিয়া তুলিতে লাগিল।

এদিকে যামিনী তার কথা শেষ হইতেই কখন কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া জানালার ধারে গিয়া বাহিরের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অনেকক্ষণ পরে রমেন্দ্র যখন ঘরে ঢুকিয়া দু'জনকে নিবিষ্ট চিত্তে দেশের দারিদ্র্য এবং

তার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দেখিয়া ঈষৎ ভয় পাইয়া গিয়াছে, তখন সেই গৃহের আর একজন নির্লিপ্ত অধিবাসীর প্রতি তার দৃষ্টি পড়িয়া তাহাকে অধিকতর বিস্মিত করিল। ইতিপূর্ব্বে সেই ব্যক্তিই তো সকল উৎকট আলোচনার সুযোগ্য বক্তা ও সহিষ্ণু শ্রোতা ছিল, আজ কি তার স্থানটা বদল হইয়া গিয়াছে ? তাহার চোখে এই দৃশ্য কবিত্ব-মণ্ডিত হইয়া না উঠিয়া একটা সন্দেহ-মিশ্রিত আশঙ্কার সঞ্চার করিল।

নিকটে গিয়া কাঁধের উপর হাত রাখিতেই যামিনী চমকিয়া উঠিল, তারপর মৃদু হাসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। জানালার মধ্য দিয়া সূর্য্যাস্তের ছায়াময় ম্লান আলো আসিয়া তার মুখখানাকে অত্যন্ত পাণ্ডুর দেখাইতেছে। সান্ধ্য-প্রকৃতির আসন্ন ম্লানিমার অংশ তার বহিঃপ্রকৃতিকেই নয়,—অন্তঃপ্রকৃতিকেও যে অমনি ম্লান করিয়া তুলিয়াছে, সে তার সেই অর্থহীন একটুখানি বিষণ্ণ হাস্য হইতেই সুব্যক্ত হইল। রমেন্দ্রনাথ উৎকণ্ঠিতচিত্তে পিছনে ফিরিয়া দেখিল কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণ কি একটা মহৎ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহাকেই পল্লবিত করিতেছে। শ্রোত্রী স্তব্ধভাবে নিজের আসনে বসিয়া সেই কথা একান্ত মন দিয়া শ্রবণ করিতেছিল। তাহার মুখে চোখে একটা নিগূঢ় আশার আনন্দ মৃদু হিল্লোলিত জলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা রবিরশ্মির মত কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে।

যামিনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস একান্ত সাবধানতার সহিত পরিত্যাগ করিল।

বত্রিশ

পরদিন মিসেস্ বিংহামকে সঙ্গে লইয়া অণিমা ও বরেন্দ্রকৃষ্ণ জমি দেখিতে যাইবার জন্য মিলিত হইলে, মিসেস্ বিংহাম চারিদিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই মিঃ রায় যাবেন না?"

তখন অকস্মাৎ অণিমার চিত্তে তাহার প্রতি নিজের ব্যবহার স্মরণে আসিয়া গভীর অনুশোচনাপূর্ণ লজ্জার উদয় হইল। যে যামিনী নইলে তার কোন একটা সামান্য কাজ চলে না, আর আজ এত বড় একটা পরামর্শের ভিতর সে তাঁকে বাদ দিয়াছে! কাল যখন কুমার তার কাছে এই আতুরালয় সম্বন্ধে আরও অনেক অনেক আশার কথা বলিয়া যাইতে-ছিল, এবং সেই বশীকরণ প্রভাবে তাহাকে সম্মোহিত করিয়া ফেলিয়াছিল, তখন ইহার প্রভাব মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে, এমন শক্তি তার মধ্যে ছিল না। সে সময় কি ঘটিতে কি ঘটিয়াছে সে কথা সে জানিতেও পারে নাই। এইটুকুই মনে পড়িল যামিনী সর্বক্ষণই নীরব ছিল, তাদের আলোচনায় যোগ দেয় নাই এবং বরেন্দ্রকৃষ্ণ বিদায় লইবার পূর্বেই সে তাকে না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছে। অণিমা চিন্তিত ভাবে নিজের মনেই প্রশ্ন করিল,—"তিনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?" কিন্তু কেন? কিছুই বুঝিতে পারিল না। মনে কিন্তু অনুতপ্ত সন্দেহ জাগিয়া উঠিয়া বারে বারে বলিতে লাগিল, যেন তিনি রাগই করেছেন এবং তার কারণ যেন এই নব-পরিচিত বরেন্দ্রকৃষ্ণ।

সংশয়াকুলচিত্তে উত্তর করিল, "তবে কি রবিবারেই যাওয়া যাবে?" বলিয়াই হঠাৎ একটু জোর দিয়া আবার বলিয়া ফেলিল, "সেই ভাল, তিনি না থাকলে বিষয়টা তো পাকা হবে না। আমি তাঁকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।"

মিসেস্ বিংহামকে কথা বলিবার অবসর না দিয়া বরেন্দ্রকৃষ্ণ অধীর হইয়া উঠিল, বলিল "না, না, যেটা ঠিক হয়ে গেছে, সেটা আর ভাঙ্গবেন না। তাঁকে এতে কি দরকার!" শেষ কথা কয়টায় তার গলার পর্দায় কতকটা হতাশার সুর ধ্বনিত হইল। মেম সাহেব অণিমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি বল তাই হবে?" অণিমার মুখে মিসেস্ বিংহাম একটা আপত্তির ভাব দেখিতে পাইয়া কথা বদলাইলেন, "এসো বরং আমরা দু'জনে তোমার স্কুলটি দেখে আসি। ফিরে এসে একটু চা খেয়ে যাবে কি বল? কুমার বাহাদুর সেদিন কিছু বই চাইছিলেন, ওই বইগুলি বেছে রেখেছি",—এই সুস্পষ্ট বিদায়দানে বরেন্দ্রকৃষ্ণ নিজেকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিল। তাঁকে ডাকিয়া আনিয়া অপমান করা অণিমার কোনমতেই উচিত হয় নাই! অপমানের সহিত ঈর্ষার একটা তীব্র জ্বালাও তার রক্তবাহিকা শিরার মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। যামিনী!—যামিনীই এদের সবই! কেন? কি এমন আশ্চর্য্য পদার্থ তার মধ্যে আছে— আর তার ভিতরেই বা কি নাই? একটা সামান্য জেলা কোর্টের উকিল, তায় সন্তানের বাপ, বিপত্নীক! রূপই বা তার এমন কি-ই?

কাল সে যামিনীকে পরাজিত ও নিজেকে জয়ী বোধে আনন্দে অধীর হইবার উপক্রম করিয়াছিল, সে তবে কিছুই নয়? সে যে আরও দশ-হাজার টাকা ঐ আতুরালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য দান করিতে প্রতিশ্রুত হইল, সেই আপ্যায়ন তা হইলে সেই প্রস্তাবটার? তার জন্য কিছুই নাই? টান ষোলো আনা সেই যামিনীরই দিকে? অবমানিত কোপে সর্ব্ব-শরীর জ্বালা করিতে লাগিল। মিসেস্ বিংহাম তাহাকে শুষ্ক শিষ্টাচার জানাইয়া সচঞ্চল বিদ্যুতের মত ত্বরিতপদে গাড়িতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। স্কুল চলিতে থাকার কালে কোন পুরুষের তার মধ্যে যাওয়ার অধিকার নাই, সম্পূর্ণ জেনানা স্কুল। যাত্রাকালে অণিমা তাকে বিনম্র নমস্কার

করিয়া গেল, কিন্তু তার মনে হইল যে যেন তার প্রথম পরিচয়। [illegible]
তার কাছে তার মানসিক দুর্বলতা ধরা পড়িয়া গিয়াছে, তাই সে [illegible]
সন্দেহে তাড়াতাড়ি করিয়া তাহার নিকট হইতে সরিয়া গেল। সে যে তাহাকে তার পতনোন্মুখ জীবনের লক্ষ্যকেন্দ্র করিয়া নিজের পথভ্রষ্ট-প্রায় জীবনের গতি নির্ণয় করিয়া তুলিতে শত প্রলোভন ঠেলিয়া প্রাণপণে যুঝিতেছিল, মনে মনে কত সুখ-স্বপ্ন রচনা করিয়া রাখিতেছিল, হয়তো সে সমুদয়ই আকাশ-কুসুমের মতই অলীক ও অবাস্তব হইয়া যাইবে। এই দুরন্ত গ্রহরূপী যামিনীকে তার জীবন হইতে সরাইতে না পারিলে কিছুই হইবে না।—দানেও নয়,—ধ্যানেও নয়। কিন্তু কেমন করিয়া তা হয়? তার শিকড় এখানকার জমিতে যে রকম গাড়িয়া গিয়াছে, তাতে সহসা যে উৎপাটিত করিতে পারা যাইবে, এমন তো আশা হয় না।

এই মানস-বিপ্লবের একান্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়া বাড়ি ফিরিয়াই ক্রোধ-গম্ভীর-কণ্ঠে বরেন্দ্র ডাকিয়া উঠিল,—"ভূষণ!"

সে আসিলে কহিল, "আমার এই দাঁড়িয়ে অপমানগুলো হতে থাকলো, তোমার দিয়ে কোন কাজ হবে এমন তো আশাও হয় না, তবে অনর্থক আমায় জড়িয়ে ধরে বসে আছ কি জন্যে?"

ভূষণ উত্তর দিল,—"এও কি একটা কথা! আপনার আজ্ঞায় আমি গন্ধমাদন শুদ্ধ উপড়ে আন্‌তে পারি, একটা হুকুম পেলেই তো হয়। বলে, মহারাজের আজ্ঞে যদি পাই, লঙ্কাপুরী মাথায় করে কিষ্কিন্ধ্যাতে যাই।"

চতুর ভূষণের ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতে সময় লাগে নাই। গতকাল-কার সব খবরই সে শুনিয়াছিল। আজ ইহাকে এত শীঘ্র এমন উত্তেজিত হইয়া ফিরিতে দেখিয়া বাকি অংশটা ঠিকই অনুমান করিয়া লইয়াছে।

বরেন্দ্রকৃষ্ণ দাঁতে দাঁত চাপিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "ওটাকে

নিকেশ করে দিতে না পারলে কিছুই হবে না।" রাগে তার স্পষ্ট করিয়া স্বর বাহির হইতেছিল না।

ভূষণ জিজ্ঞাসা করিল, "তবে যে কালই বললেন, এইবার তার মন ফিরেছে। এইবারে দিন কিনে নেব। আবার কি হল? ঐ যে বলে, 'ক্ষেণে রুষ্টু, ক্ষেণে তুষ্টু, রুষ্টু তুষ্টু ক্ষেণে ক্ষেণে, অপ্রকৃতিস্থ মতি চ'—কুষ্ঠোটি দেখি যে ঠিক তাই!"

বরেন্দ্র আবার দাঁতে দাঁত ঘষিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "ও থাকতে কিছু হবে না, এই বলে দিলুম।"

যেমন করিয়া সম্মোহন-বিত্তাবিদ্‌গণ মানুষকে চোখের দৃষ্টিতে সম্মোহিত করিয়া ফেলে, তেমনি করিয়া তার চোখের উপর তীব্র দৃষ্টি স্থির করিয়া ভূষণ অত্যন্ত শান্ত স্বরে প্রশ্ন করিয়া বসিল, "সরিয়ে ফেলবো নাকি বলচেন?"

"হ্যাঁ তাই বলচি।—ওঃ, না না না—ও কি বলছ ভূষণ! আমি ঠিক তা বলি নি—" বলিতে বলিতে একটা অজানিত ভয়ে থমকিয়া থাকিয়া অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে বলিয়া উঠিল, "ওতে যেও না, আমি চাইচি, ধরো, হাত পা ভেঙ্গে পড়ে থাকে, ইনভ্যালিড হয়ে যায় এমন কিছু কি করা যায় না? টাকা দিয়ে যা পার কর। মাথা খাটাও।"

ভূষণ তখন কাজের কথা পাড়িল—"বেশ! ভেবে চিন্তে দেখি, ধরুন যামিনীপ্রকাশের সঙ্গে ওঁর ছাড়াছাড়ি যদি ক'রে দিতে পারি, তা' হ'লে আমায় কি বকশিস দেবেন তাই আগে বলুন তো শুনি? এতে অনেক মেহনৎ করতে হবে, বুঝতেই তো পারচেন?"

বরেন্দ্র আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "পাঁচ হাজার টাকা নগদ আর পাঁচ বিঘে লাখরাজ জমি, কি বল?" লোভের তীব্রতায় ভূষণের চক্ষু দুইটা ক্ষুধিত বাঘের মত দপদপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সে ঈষৎ হাসিয়া কহিল,

"ওটা বরং পুরোপুরি দশহাজারই থাক, কি ? আপত্তি হবে না তো ? কথায় বলে, কাজের সময় কাজী কাজ ফুরলেই পাজী। তাই করবেন না তো ?"

বরেন্দ্র একান্ত ক্লান্ত বোধ করিতেছিল, একটা প্রান্তশ্বাস সহকারে জবাব দিল, "না।"

তেত্রিশ

যামিনী সেদিন যখন বাড়ী ফিরিল সে যেন এতখানি পথ কলে চালিত হইয়া আসিল, প্রাণহীন পুতুলের মত, একটা অস্পষ্ট বিস্ময়ে মনটাকে তার যেন কেমন এক রকম অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সারা দেহ মন ঘেরিয়া একটা ঘোর অন্ধকার যেন চারিদিক হইতে জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে, এমনই তার মনে হইতে লাগিল। প্রথম জীবন হইতেই সে হতাশায় অভ্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু তখনকার সেই আশাহততার মধ্যে এতখানি তীব্রতা জন্মিতে পারে নাই। তার কারণ মানবচরিত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন, স্বভাবসিদ্ধ সংযত মনোবল এবং কাজের আদর্শের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা তাকে পিতৃ-নির্দ্দেশে ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেয় নাই। চরিত্রের সবলতা যামিনীর নিতান্ত অল্প না থাকিলে আজ সে যে রকম অন্তর্বিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে তাহাতে সেই লাঞ্ছিত ব্যথা সহ্য করা দুরূহ হইয়া উঠিত। আজই সে এই আঘাত সহিয়া বুঝিতে পারিল, সংসারে থাকিয়া তাহাকে লইয়া তারা যে রকম সহজভাবে চালাইতে চাহিয়াছে সে ঠিক তাদের মনোমত করিয়া নিজেকে তাদের হাতে কাদার তালের মত নিঃসহায় ভাবে তুলিয়া দিতে রাজী হয় না। তার নিজেরও একটা আইন, একটা নিয়ম আছে। মানুষ যেখা

তাদের নিজেদের হাতে গড়া আইন দিয়া তাহাকে বাঁধিতে চায়, তার চেষ্টাও তাদের তার নিজস্ব নিয়ম-নিগড়ে তেমনি করিয়া বদ্ধ করা। হয় ইহাকে ছাড়াইয়া যাও, না হয় ইহার শাসন-পাশ কণ্ঠে তুলিয়া লইয়া ইহার অধীনতা স্বীকার কর, এর মধ্যে আপোষ করার জন্য তৃতীয় আর পথ নাই।

একখানা আইনের মোটা বই খুলিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় বা দুর্ব্বুদ্ধিতায় চালিত হইয়া সে যে এখন এক দুর্গম স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আজ হঠাৎ চোখ খুলিয়া যাইতেই তাহারই অতলস্পর্শ অন্ধকার তার দুই চোখের দৃষ্টিকে ঝাপসা করিয়া দিল। একটা সন্দেহ, একটা নিদারুণ সংশয় অল্প কয়দিন হইতে তার মাথার ভিতরে ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া, ভিজা কাঠের আগুনের মত অল্প অল্প করিয়া ধরিয়া উঠিতেছিল, আজ সেটা অত্যন্ত সহসা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সেই আগুনের অসহ্য জ্বালায় জ্বলিয়া ভাবিল,—মানুষ নেহাৎ স্বার্থপর। সে বুঝি নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে পারে না, করিতে জানে না। সেও এতদিন ধরিয়া যা-কিছু করিয়াছে, যা-কিছু করিতেছে, সে সবই সেই একজনের জন্য,—তাহারই পরিতৃপ্তির জন্য,—তার মানসিক শান্তির জন্য ভাবিয়া আসিয়াছে, শুধু তাই নয়,—ইহার মধ্যে নিজেরও অনেকখানি তৃপ্তি অনেকখানি শান্তি নিহিত আছে। সে যদি তাহার স্থানে আজ অন্য কাহাকেও ডাকিয়া আনে, তবে সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তার আশা উদ্যম সমুদয় এক সঙ্গে বিধ্বস্ত হইয়া কালবৈশাখীর ভৈরব ঝটিকাহত মহীরুহের মতই বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে!—তবে এই সঙ্গে একথাও সে মনে করিল, একি তার অন্যায় আবদার নয়? অণিমা এতদিন বিবাহ করে নাই, সে তার নিজের ইচ্ছায়, নতুবা অনায়াসেই তো করিতে পারিত। এখন যদি সে একজনকে পছন্দ করিয়া থাকে, যদি তাহাকে বিবাহ করিয়া সে সুখী

হইতে পারে, তার ইহাতে ঈর্ষা করিবার কি অধিকার আছে? সে নিজে যখন অন্ত নারীকে বিবাহ করিয়াছিল, তখনই ত অণিমা তাহার নিকট হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে,—এখন আবার তার উপরে এ অসঙ্গত দাবী করা কেন? কিন্তু বিদ্রোহক্ষিপ্ত মানুষের মন সব সময় তো বিচার-বুদ্ধির সূক্ষ্ম যুক্তি মানিতে চাহে না, সে অসহনীয় দুঃখ-ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তীব্র আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতে চায়,—নিরানন্দ হাহাকারে হাহা করিয়া কাঁদিয়া বলে, তখন যা হইতে পারিত তাহাতে কোনই হাত ছিল না,—কিন্তু তা যখন হয় নাই, তখন এখন কেন এমন হইবে?

অনন্ত রহস্যপূর্ণ জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী অনিমেষ জাগ্রত নেত্রে সকৌতুক সহাস্তে ক্ষুদ্র মানবাত্মার গভীর হৃদয়-রহস্ত বিশ্লেষণ করিতেই বুঝিবা নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল,—কিন্তু সেই অগণ্য আলোক-লহরী হইতে এতটুকু সান্ত্বনার সুধাও তো তার উদ্দেশ্যে ক্ষরিত হইল না! সুধা? সুধা কোথায়? তীব্র তপ্ত অনল-পিণ্ড শুধুই দাহ দিতে পারে। সুধা কোথা হইতে দিবে? গভীর রাত্রে বিনিদ্র শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া যামিনী জানালার কাছে কৌচখানায় বসিয়াছিল। তখন পুঞ্জ পুঞ্জ জোনাকীর মত নক্ষত্রগুলা পাতলা কুয়াসার সূক্ষ্ম জালের মধ্য হইতে জ্বলিতে জ্বলিতে নিভিয়া যাইতেছে। পিছন দিকের বাঁশবাগানের ভিতর উচ্চরবে তৃতীয় প্রাহরীক শৃগাল-বাহিনী ঘোর রবে ডাকিয়া উঠিয়াছিল। অদূরপথে চৌকিদারটা—হৈ-ই—করিয়া হাঁকিয়া গেল। ঘুমাইতে ঘুমাইতে কি একটা স্বপ্ন দেখিয়া নলিনী আচমকা একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল,—"মা!" যামিনী চমকিয়া তাড়াতাড়ি মশারির ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইল।

সেদিন স্কুল হইতে ফিরিয়া অণিমা রমেন্দ্রকে কহিল, "আপনাকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হচ্চে।" রমেন্দ্র প্রমাদ গণিয়া মাথা চুলকাইতে

জাগিল। চুলগুলায় যেন তার ভয়ানক একটা কণ্ডুয়ন কীটের বাসা বাঁধিয়া গিয়াছে! ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় যেতে হবে?" অণিমা ঈষৎ চাঞ্চল্য রোধ করিয়া হাসিয়া বলিল,—"কোন দুর্গম গিরি কান্তারে নয়, মাত্র প্রকাশ বাবুর বাড়ী।" "কোথায়?—প্রকাশের বাড়ী?" এই কথা এমনই বিস্ময়ের সহিত উচ্চারণ করিয়া রমেন দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া তাহাকে দেখিল,—যেন যামিনীর বাড়ী যাওয়াটা অণিমার পক্ষে ইতিমধ্যেই একটা আশ্চর্য্য কাণ্ডের সামিল হইয়া পড়িয়াছে! রমেনের মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া অণিমা সশব্দে হাসিয়া ফেলিল। এইরূপ সন্দেহের যে কোন কারণ তার পশ্চাৎ হইতে নিঃশব্দে গড়িয়া উঠিতেছে এ সংবাদ সে জানিত না, কাজেই সন্দেহও ছিল না। তার সরল চিত্তে এই আশ্চর্য্যের স্বর সেই হেতু সন্দেহের আবছায়াও ফেলিল না। সকৌতুকে কহিল, "যেতে নেই, না কি? মিলির জরো-ভাব হয়েছে তাই তাকে নিয়ে যাবো না।" এইবার রমেন্দ্রনাথ বুঝিল, তাদেরই বুঝিবার ভুল!—বাস্তবিকই নবপরিচিতের নারীবিমোহন মূর্ত্তি যামিনীর পৌরুষের স্থল অধিকার করিতে পারে নাই! মনটা একেবারে হাল্কা হইয়া গেল,—হাসিতে হাসিতে কহিল, "তুমি যামিনীর বাড়ীর পথ চেন না নাকি? তুমি না চেন তো কোচম্যানটা তো চেনে। বল্লেই সে নিয়ে যাবেখন। আমার একটি মক্কেলের এখনি আসবার কথা কথা আছে। কি করি বল, মক্কেলের জন্য ভাল করে সেজেগুজে বসে থেকে অভ্যর্থনা না করলে তিনি হয়ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে প্রস্থিত হবেন, এ জন্মেও আর মুখদর্শন দান করবেন না। বুঝতেই তো পারচো? ঠাকুরকে বরং অবহেলা করতে পারি—তবু মক্কেলকে নয়।"

অণিমা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া আবারও একটু অনুরোধের সুরে বলিল,—"মিলিটা যেতে পারবে না তাই বলছিলাম,—একলাটি যাবো।"

"তা গেলেই বা, আমরা যখন যাই, তোমাদের কি সঙ্গে করে পথ দেখাবার জন্তে নিয়ে যাই ?" অণিমা হাসিয়া বলিল,—"আহা কি চমৎকার যুক্তি,—আপনারা না পুরুষমানুষ !" রমেন্দ্রনাথ খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া বলিল,—"তুমি স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার পাওয়া উচিত মনে কর না ? এই না তুমি 'সাফ্রেজিস্ট' !" অণিমা কুটিল কটাক্ষে কোপ প্রকাশ করিয়া কহিল,—"আপনি আমায় ভুল বুঝেছেন, স্ত্রী-পুরুষের সর্ব্ববিষয়ে সমান অধিকার পাওয়া উচিত, আমি এমন কথা বলি নি, কতকগুলি বিষয়ে অবশ্য তাদের সমানাধিকার পাওয়া নিশ্চয়ই উচিত।"

"ওগো এ্যানি বেসান্ত ! ওগো গার্গী ! ওগো মদালসা ! দোহাই তোমার ! তোমার বক্তৃতার চেয়ে প্রতিপক্ষের ব্যারিস্টারের বক্তৃতা আমার কাছে সহজবোধ্য। এসব ভাল ভাল কথা যে বুঝবে তুমি তারই কাছে দ্রুত গমন করো। 'বেনাবনে মুক্তা'র অপব্যয় করতে নেই, হে দেবি ! ঐ শোন আমার আগতপ্রায় মক্কেলের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্চে অদূরে।"

"যাচ্চি" বলিয়া ভয়ত্রস্ত প্রতিবাদীকে পরিত্যাগ করিয়া সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। রমেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়াই তাহার সঙ্গে গেল না। মিলি যাইবে না, সে না গেলে অণিমাকে একা পাইয়া হয় তো বা মূঢ় যামিনীটা তার কাছে নিজের মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিবে। কালিকার ব্যাপারে তারা দু'জনেই যে মনে মনে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছে, তাহা মুখোমুখি আলোচ্য না হইতে পাইলেও মনে মনে দু'জনকার কাছেই সুবিদিত হইয়াছিল। এরূপ স্থলে অণিমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিতে যামিনীর আর বিলম্ব করা উচিত নয় ইহা সহজেই বুঝা যায়। কোন বুদ্ধিমান্ লোকেই তা করে না। সে সেই জন্য কৌশলে দু'জনকে একা হইবার অবসর দান করিল। আঃ বাঁচা যায় ! আইবুড়ো বয়স্কা কন্যার অভিভাবকত্ব করা ঝকমারির কাজ। ব্যারিস্টারিতে কিছু না হয়, বরং চেষ্টাচরিত্র

করিয়া মুচ্ছেদী চাকরীতে ঢুকিয়া পড়াও ভাল, তবু আইবুড়ো শ্যালীর অভিভাবক হইয়া বসিয়া থাওয়া সুবিধাজনক নয়।

সেদিনও অপরাহ্নে বাড়ীর বাহির না হইয়া, যামিনী ছাদে একটা বেতের মোড়া পাতিয়া বসিয়া আকাশের রং দেখিতেছিল। সন্ধ্যা হইতে খুব বেশী বিলম্ব নাই। যে মেঘগুলা এতক্ষণ শাদা ছিল, এখন তা সন্ধ্যার ছায়ায় পাংশুল বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাদের শ্লথগতির সংক্রমণেও কেমন যেন একটা অবসাদ জড়াইয়া গিয়াছিল। সেদিনকার হেমন্ত-সায়াহ্নের প্রকৃতিটাও তেমন তাজা ছিল না, আকাশে বাতাসে একটা হৈম বিষন্নতা প্রলিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহার অন্তরও যেন উহারই ছায়াপাতে উহার মতই প্রফুল্লতাহীন অবসাদে ভরিয়া উঠিয়াছিল। যামিনীর মনে হইতে লাগিল, তার সম্মুখে একটা ঘোরতর দুর্দ্দিন সংগ্রামের সাজে যেন সাজিয়া আসিতেছে, ইহার সহিত যুঝিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম যে শক্তির বিশেষ প্রয়োজন, নিজের মধ্যে অন্বেষণ করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে—সে শক্তি তার একেবারেই নাই! এতদিন সে ফাঁকিতেই কাজ চালাইতেছিল, এখন সেই ফাঁকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে মাত্র, তবে কি এইবার সে তার সম্মুখে ঐ যে প্রলয়কল্লোল শুনা যাইতেছে, উহারই বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবে? না, কাপুরুষের মত দৈবের উপর নির্ভর করিয়া এখনও স্থাণুর মত বসিয়া বসিয়া তার নিষ্ঠুর খেলা দেখিতেই থাকিবে? তার মৃত্যু বিষাণের নির্ম্মম বাদ্যে কর্ণ বধির করিয়া শোণিত-ঝরা হাসিয়া তাহার নিষ্ঠুর উপহাসকে বরণ করিয়া কি সে তার এই দুর্ল্লভ মানবজীবনের আশা-তৃষ্ণার সমাধি দান করিবে, এই কি তার ললাটলিপি? ভাগ্যলিপিও দৈব? দৈবকে নিহত করিয়া ঋষিগণ পৌরুষের জয়গান করিয়া যান নাই কি? আজ নিতান্ত কাপুরুষের মত সে সেই দৈবকেই সবল করিয়া বসিল?—কিন্তু দৈব ভিন্ন আর কে এমন করিয়া তার ভাগ্য লইয়া লটারীর

খেলা খেলিবে? তাই কি একবার? এ নিষ্ঠুর খেলার যে তার সঙ্গে শেষ নাই। প্রথম জীবনমুকুলেই তো ঘুণ ধরিয়া গিয়াছিল। সবই তো শেষ হইয়া যা হইবার হইয়া গিয়াছে। তবে আবার ক্রূরা নিয়তি কেন তাকে তার জীবনের মাঝখানে এমন অসহায় ভাবে টানিয়া আনিল, সুলতাকে কেন এমন করিয়া তার জীবন হইতে ছিঁড়িয়া লইল। সেকি স্বপ্নেও কখন এমন বিসদৃশ চিন্তা করিয়াছে, না করাই সম্ভব ভাবিয়াছে। এ কি অভাবনীয় অঘটন কাণ্ড!—

কিন্তু দৈব না-ই বলা যাক্ অদৃষ্ট নাই-ই বা বলা গেল, ইহাকে প্রাক্তন কিংবা প্রারব্ধ একটা কিছু বেদান্তের উঁচু দরের ভাষা না দিলেও তো চলে না। কতকগুলি ব্যাপার আছে, তারা ঘটনা-পরম্পরা দ্বারা এমন ভাবে একটার পর একটা জীবন্ত ছবির মত একে একে পরস্পরের সহিত সংস্রব রাখিয়া হাত-ধরাধরি করিয়া দাঁড়ায়, যে মানবীয় শক্তি, চেষ্টা, তাহাকে না পারে সাহায্য করিতে, না পারে ঠেলিয়া ফেলিতে। কোন অজ্ঞাত রহস্য-ময় শক্তির প্রেরণায় মানুষ নিজের মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এই স্রোতের ঠেলায় অসহায় তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া যায়। উঠিবার, সরিয়া দাঁড়াইয়া ইহার তীব্র তরঙ্গবেগ রোধ করিয়া আত্মরক্ষা করিবার সাধ্যমাত্র থাকে না। ইহাকে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত গুণত্রয়ের বিকারই বল, ঈশ্বরের ইচ্ছাই বল, আর দৈব, অদৃষ্ট—প্রারব্ধরূপী কর্ম্মফলই বল, বিভিন্ন প্রকৃতি-অনুসারে বিভিন্ন আখ্যামাত্র দেওয়া যাইতে পারে,—কিন্তু উপাধি-ভেদে যেমন ঘটাকাশ, মঠাকাশ মহাকাশ হইতে বিভিন্ন হইতে পারে না, তেমনই আসল বস্তুটি সেই যে এক অদৃশ্য শক্তির অলঙ্ঘ্য পরিচালনায় মানুষের শত আরম্ভকে ভাঙ্গিয়া, শত ভগ্নকে গড়িয়া মৃদু-মন্দ-গতি ষ্টীম-রোলারের মত নিশ্চিন্তে চলিয়া যায়, তাহাকে বাধা দিবার ক্ষমতা কোন জাগতিক শক্তিরই নাই। তবে তার তলায় মাথা নত না করিয়া দিয়া

সে করিবে কি? এই অলঙ্ঘ্য-শাসনের অজ্ঞাত শাসকের চরণে নতশিরে দুই কর যুক্ত করিয়া বিক্ষোভহীনচিত্তে নিজের সহস্র ক্ষুদ্র বাসনা কামনাকে অন্তরের যজ্ঞকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ সুবর্ণের মত পবিত্র ও উজ্জ্বল জীবন লাভ করিতে চেষ্টা করাই না শ্রেয়ঃ! কিন্তু তবু সেই ক্ষুব্ধ অপমানিত বক্ষ-নীড়-বদ্ধ মানবের চিত্ত কোন যুক্তি তর্কের নিষেধ না শুনিয়া ভ্রষ্টনীড়, তীরবিদ্ধ কপোতের মত লুটাইয়া লুটাইয়া কেবলই হা-হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চাহে, যুক্তি মানে না তর্ক করে না।

আকাশের একখানা সোনালী-জলকরা ধূসর মেঘ, একটা প্রকাণ্ড সোনালী জরি-লাগানো হাওদা-ওলা মত্ত হস্তীর মত তার মেঘ-নির্ম্মিত শুণ্ড দোলাইয়া মন্থরগতিতে উত্তর দিকে চলিয়াছিল। আকাশের গাঢ় নীল রংটা খানিকটা চিকচিকে রেশমী কাপড়ের মত চক্‌চকে দেখাইতেছিল। এদিকে ওদিকে কোথাও খণ্ডমেঘের মধ্য দিয়া সমুদ্র-জলের মত নীল রং গাঢ় হইয়া আসিতেছে। ক্ষীণরশ্মি মুমূর্ষু সূর্য্যের শেষ দৃষ্টি তার মুখের উপর মেঘমুক্ত চোখ মেলিয়া কি যেন দেখিতেছিল, উহা দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল। এমন সময় পিছন হইতে একটি সুললিত স্বর উচ্চারিত হইল,—"প্রকাশবাবু! আপনি এখানে?"

প্রকৃতির সমুদয় অসামঞ্জস্য সমস্ত বিরোধ বিপ্লব একটি মুহূর্ত্তে আলোকের সম্মুখে অন্ধকারের মতই নিঃশেষে বিদূরিত হইয়া গেল। সৃষ্টির প্রথমে নব-জাগ্রত বিপর্য্যস্ত বিরাট শক্তিশালী অযুত কোটি গ্রহ-তারকাকে যে বিশ্ব-বিধায়িনী বরদা নিজের স্থিতি শক্তির মধ্যে সংহত করিয়া লইয়া বিশ্বের জীবনগতি বিশ্ব-নিয়মের অচ্ছেদ্য নিয়ম-সূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য নিজের পদ্মহস্তে বিশ্ব-বীণায় শান্তির সুর চড়াইয়া তাদের রুদ্র তাণ্ডব সেই সুরের মধ্যে বাঁধিয়া সংহত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই অখণ্ড রাগিণীই তারও বিদ্রোহ-বিপর্য্যস্ত প্রাণের তন্ত্রীতে আশাবরী রাগিণী বাঁধিয়া দিল।

অণিমা যে তার একটি দিনের অনুপস্থিতিকে এমন করিয়া অনুভব করিয়াছে, ইহাতে কাল হইতে যতখানি দুঃসহ দুঃখ সে ভোগ করিয়াছে, আজ মাপিয়া ঠিক ততখানিই আনন্দ সে ফিরিয়া পাইল। এবার পরিষ্কার রূপেই সে বুঝিয়াছে, তার জীবনের লক্ষ্যকেন্দ্র আজও সেই অণিমা। কেন্দ্র-চ্যুত গ্রহের যেমন নিম্নাভিমুখী হওয়াই পরিণাম, এ লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইলে তাহারও সেই দশাই হইবে। বৃথা মনকে চোখের ইসারায় থামাইয়া রাখিতে চাহিলে কি হইবে? ইহারই জন্ম সে সুসঙ্গতার প্রতি তার যথোচিত কর্ত্তব্য করিতে পারে নাই। না, না,—সে অণিমাকে অন্যের আশা-কেন্দ্ররূপে দেখা সহ্য করিতে পারিবে না।

চৌত্রিশ

যেদিন সন্ধ্যাবেলা অণিমা যামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল, উহার পরদিন সকালবেলা রমেন্দ্রনাথ যামিনীর বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

তখন বড় জোর বেলা সাড়ে ছয়টা, না হয় সাতটার বেশী হইবে না। অন্যদিন এমন সময় রমেন্দ্রনাথ বিছানা ছাড়িয়া উঠেও না, বাড়ির বাহির হওয়া তো বহু দূরের কথা। কাজেই তার নিয়ম-তান্ত্রিকের এত বড় নিয়ম-ভঙ্গ দেখিয়া যামিনী একটু বিস্মিত হইল। বাহিরের ঘরে তক্তপোষের উপর মোটা সুতায় গাঁথা চওড়া চওড়া কাগজে মহাজনী ছাঁদের টানা লেখায় আপ্রান্তখচিত কতকগুলি কাগজপত্র মেলিয়া একটি মোটা চেহারার মহাজন মক্কেল বসিয়া আছে, তা দেখিয়া রমেন বারান্দায় বসিয়া নলিনীর সহিত গল্প জুড়িয়া দিল।

মক্কেল উঠিয়া গেলে যামিনী আসিয়া রমেনের পিছনে দাঁড়াইয়া হাসিয়া

বলিল,—"কি হচ্ছে দু'জনে!" রমেন ঘাড় ফিরাইয়া তার মুখে অনুসন্ধিৎসু প্রখর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"এই সব কত গল্প-টল্প হচ্ছিল আমাদের। তুমি ও ভুঁড়িওয়ালাটিকে কোথায় বাগালে হে? দিব্যি মালটি বোধ হ'ল!"

"চুপ্"—বলিয়া যামিনী সতর্কতার সহিত দ্বারের দিকে চাহিয়া নিম্ন-কণ্ঠে কহিল, "শুনতে পাবেন। মেয়ের ছেলে নাতির জন্যে উনি তার বৈমাত্র কাকার সঙ্গে লড়্‌চেন।—তুমি আজ এত সকালে যে?"

শেষ কথাটায় একটু কৌতূহল মিশ্রিত ছিল। রমেন্দ্র এ কথার কোন উত্তর না দিয়া নলিনীকে বলিল,—"তোমার দিদিকে বল দেখি, আমার বড্ড কিধে পেয়েছে, আমি চা খেয়েও আসিনি,—চা চাই, খাবার চাই।"

নলিনী চলিয়া গেলে সে কোন রকম ভূমিকা না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তারপর তোমাদের সব ঠিক হয়ে গেল তো?"

"কিসের?"

"কিসের আবার? তোমাদের বিয়ের।"

"বিয়ের?—বলো কি?—এর মানে?"

"অতি সোজা,—বিয়ের মানে, বিবাহ, উদ্বাহ, ইংরাজীতে যাকে 'ম্যারেজ' বলে। আদিকাল হতে চলে আসছে, আর প্রলয়ের দিনটি পর্য্যন্ত যে কার্য্য নির্ব্বিচারে চলবে বলেই একান্ত আশা করি। যদিও তার রকম-ফের যুগে যুগে হয়ে এসেছে। এখনও—এবং তখনও হতে থাকবে।"

যামিনীর হৃদয়-রক্তের অনেকখানি সজোরে মুখের উপর উচ্ছলিত হইয়া পড়িল, তথাপি সে হাসিয়া বলিল,—"ও মশাই থামুন। অত সোজা কথাটার মানে তোমার কাছে আমি জানতে চাইনি। ওটা কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হলো?"

"স্বরূপার্থেই।"

যামিনী একটু অধৈর্য্য হইয়া কহিয়া উঠিল—"কথাটা খুলেই বল না ছাই। অত ঘোর-প্যাঁচে আর কাজ কি?"

রমেন্দ্র গম্ভীর হইয়া উঠিল, কহিল, "আমারও আজ তাই করবারই ইচ্ছে। তোমাদের ও সব কাব্য-কবিতার রসাস্বাদনে অসমর্থ ও শক্ত মানুষ আমিও ক্লান্তি বোধ করচি। কাল তা হলে অনিমাকে তুমি বিয়ের কথাটা বলেছ? বলার দরকার যে খুবই হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা আমি অনেক দিন থেকেই তো বুঝতে পারচি, তবে সাহস করে তোমায় কিছু বলতে পারছিলাম না।"

যামিনীর ললাট শীতের সকালেও ঈষৎ ঘামিয়া উঠিল। সে মুখ নত করিয়া বলিল,—"আমি কিছু বলিনি।"

সেদিনকার সেই ঘটনার পরও সে যে এমন সুযোগ প্রত্যাখ্যান করিতে পারে, এ কথা রমেন্দ্রের বিশ্বাস হইল না। সে সন্দিগ্ধ ভাবে তার মুখের দিকে চাহিয়া সন্দেহযুক্ত স্বরেই প্রশ্ন করিল, "কেন বললে না?"

যামিনী মুখ না তুলিয়াই উত্তর করিল,—"আমার সাহস হয় না।" তার গলা কাঁপিতেছিল। রমেন যথেষ্ট বিস্ময়ের সহিত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, —"সে আবার কি? সাহসের এতে কি আছে? সোজা কথা সোজা জিজ্ঞেস করবে, তার অত ভয়-ডর কিসের?"

"যদি আমি আমার এই দুরাকাঙ্ক্ষার দ্বারা তাঁকে বিরক্ত করে ফেলি? না রমেন! কাজ কি, যেটুকু পেয়েছি তাও যদি হারিয়ে যায়!"

যামিনীর স্বর ঘোর সংশয়পূর্ণ। রমেন্দ্র তাহার এই ভীরুতায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া কহিয়া উঠিল, "তাহ'লে তুমি কি তাকে বিয়ে করতে চাও না, তাই না হয় স্পষ্ট করেই বলো।"

যামিনী কাল অনেক রাত্রি,—প্রায় সারারাত্রি ধরিয়াই এই কথাটা ভাবিয়াছে,—কিন্তু কোন সদুত্তর নিজের মনের কাছে না পাইয়া কোনই

লিভাতে পৌঁছতে পারে নাই। অণিমাই তো থাকিতে দেলে তার বাপ দণ্ডা স্ত্রী। তাহাকে চিত্তে রাখিয়াই তো সে অপরকে বাহ্য সংসারে পত্নীপদ দান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তারপর, অণিমা যে তাহারই জন্য এ যাবৎ বিবাহ করে নাই, এ কথা কে-ই বা না জানে?—অণিমার পিতাও তো তাঁর মৃত্যুশয্যায় এই কথাটাই তাকে নিজ মুখে বার বার বলিয়া নিজের দুর্ব্বুদ্ধির জন্য যথেষ্ট অনুতাপ করিয়া গিয়াছেন। তবে? আপত্তি কাহার? নলিনী? এই বিমাতা যখন তাহার পক্ষে মার চেয়েও মঙ্গলদায়িনী,—তখন তাহাকে বিমাতা দান করায় তার কোনই অপরাধ হইবে না। নিজের পক্ষে এই পর্য্যন্ত ভাবিয়া যখন সে অণিমার কথায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন একবারের জন্য আবার সংশয় ও দুর্ভাবনা চকিতের মত মনের মধ্যে বিদ্যুৎ হানিয়া গিয়াছে। সে যদি অন্যের-স্বামী বলিয়া তাহাকে তাচ্ছিল্য ভরে প্রত্যাখ্যান করে? যদি মনে মনে তার লোলুপতায় ঘৃণা বোধ করে?—যদি অদ্যাবধি তার চিত্ত তাহার প্রতি অনুকূল না-ই থাকে? ইহা যদি তাঁর মনঃকল্পিত দুরাশামাত্রই হয়? এমন সময় রমেন্দ্র-নাথ এই প্রস্তাব লইয়া আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল। এ কি দৈব-প্রেরিত? যামিনী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আমি কিছু বুঝতে পারছিনে রমেন!" তার কথায় দারুণ দুশ্চিন্তার আশঙ্কা প্রকটিত হইল।

ব্যঙ্গের সহিত ঈষৎ হাসিয়া রমেন কহিল, "ও সব তো হ'ল কাব্য কথা। এখন আসল কথায় এসো দেখি। অণিমা তোমায় ভালবাসে। তোমার চাইতে তার প্রেম সমধিক নৈষ্ঠিক, তা তুমি অস্বীকার করতে পার না। তোমার জন্যে অমন বাঘের মত বাপের আদেশ পর্য্যন্ত রাখেনি। তোমার স্ত্রীও তো তা এই দেড় বৎসর হলো মারা গেছেন, তবে আর মিথ্যে-মিথ্যি দেরি করবার দরকারটা কি? কেন অমূলক ভাবনা ভেবে মাথা খারাপ

করছো ?—তার মন যে তোমার প্রতিকূল নয়, তা'তে কি তোমার আজও সন্দেহ আছে ? স্ত্রীলোক কি নিজে উপযাচিকা হয়ে বলবে,—'ওগো তুমি দয়া করে আমায় বিয়ে কর !' ”

এই কথায় যামিনীর মনের ভিতর হইতে সমুদয় দ্বিধা যেন একটি মুহূর্ত্তে উবিয়া গেল। সে উজ্জ্বল চক্ষে বন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিল,—“তা হলে তুমি নিশ্চিত জান যে—?”

“হ্যাঁ হে হ্যাঁ !—নিশ্চিত জানি যে, সে তোমার স্ত্রী হতে অসম্মত হবে না। বলো কি তুমি ? অ্যাঁ! কি সন্দিগ্ধ মন আপনার মশাই ?—এতেও আবার খুঁৎ খুঁৎ করছো ?”

অন্তরের বিপুল হর্ষোচ্ছ্বাস দমন করিবার চেষ্টা করিয়া যামিনী অস্ফুট স্বরে কহিল,—“তা হলে রমেন, এতে আমার কোন দোষ হবে না তো, দেখ ভাই !” রমেন তাহার মনের এই বিচলিত ভাব ঘুচিতেছে না দেখিয়া একটু করুণার সহিত তাহার বাহুর উপর হাত রাখিয়া সহানুভূতির সহিত কহিল,—“না, না, দোষ হবে না। একি ছেলেমানুষী ভাবনা যে করছো, যে তোমার জন্যে আজও সংসারী হ'ল না, তার উপরও কি তোমার একটা কর্ত্তব্য নেই ?”

এইবার রমেন্দ্রনাথ যে শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা অব্যর্থ হইয়া বুকে বাজিল।

সৌদামিনীর আহ্বান পাইয়া রমেন্দ্র বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলে যামিনী তাহার সঙ্গে গেল না। সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত চঞ্চল ভাবে অস্থির পদে পায়চারি করিতে লাগিল। নচিকেতার মত ধর্ম্ম-রাজ আজ তাহারও সম্মুখে শ্রেয় এবং প্রেয় এই উভয় পথ বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু কোনটা যে কোন্ পথ তাহা চিনাইয়া দিতেছেন না।

রমেন্দ্র যামিনীকে দিয়া মিহিরকে একখানা পত্র লিখাইয়া লইয়া সেখানা

তৎক্ষণাৎ তাকে পাঠাইয়া দিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে বাড়ি ফিরিল।

সেদিন বৈকালে রাস্তায় বাহির হইয়া যামিনী অণিমাদের বাড়ির দিকে ফিরিতে পারিল না। যদিও রমেনের সহিত কথা পাকা হইয়া গিয়াছে যে, মিহিরের পত্রোত্তর আসিলে অণিমাকে সেই পত্র দেখাইয়া দিনস্থির ইত্যাদি করা হইবে, ইহার মধ্যে তাহাকে কিছু জানাইবার প্রয়োজন নাই—কিন্তু নিজের মনেই তার যে পরিবর্ত্তনটা ঘটিয়াছিল, তাহারই দ্বারা আজ সে কিছুতেই দ্বিধার জড়িমা আর ত্যাগ করিতে পারিতেছিল না। অণিমা তার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেও হয়ত কোন ক্ষতি নাই।—আজ নিজের কাছে তার প্রতি এই হৃদয়পূর্ণ ভালবাসা লইয়া সে অপরাধীও হয়ত নয়, কিন্তু তবু সে কিছুতেই একটা 'কিন্তু'কে ভুলিতে পারিতেছিল না,—সে তাদের মধ্যে এক মধ্যবর্ত্তিনীর অকরুণ স্মৃতি!

নবীনবাবুর গৃহে আজ সন্ধ্যায় একটা নিমন্ত্রণ ছিল। যামিনী যাইবে না স্থির করিয়াও, মনে হইল—সেখানে না যাওয়া ভাল দেখাইবে না। যাওয়া প্রয়োজন। এমন সময় ধূলি উড়াইয়া সদর্পে একখানা বড় জুড়ি রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল। সেখানা কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণের গাড়ী, গাড়ীখানা তার আরোহীকে কোন্‌খানে লইয়া গেল, সেকথা মনে করিতেই যামিনীর মন হইতে সমস্ত দ্বিধা ও সঙ্কোচ এক মুহূর্ত্তেই চলিয়া গেল।

বরেন্দ্রকৃষ্ণ সেদিন খুব কড়া করিয়া দু'কথা শুনাইয়া দিবে মনে করিয়া গম্ভীর ভাবেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু অণিমা যখনই তার দিকে ফিরিয়া কলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"কাল আপনার সঙ্গে সর্ত্ত ভঙ্গ করে তার খুব ফল পেয়েছি!—ফুলটার দশা দেখে এমন কষ্ট হল। কি যে সব বেচাল হয়ে যাচ্ছে!"

তখনই তার চিত্ত হইতে বিদ্রোহের তাপদাহ মুহূর্ত্তে দূর হইয়া চলিয়া গেল, সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কেন? কেন? কি হ'ল?"

স্কুলের অবস্থা বর্ণনা করিয়া অণিমা কহিল,—"একটা প্রাইজের বন্দোবস্ত না করলে দেখছি চলবে না। আমি আজ সকালে ইন্দ্রনাথবাবুর বাড়ি গেছ্‌লাম, অমলাদিও এই কথাই বললেন। বেশীর ভাগ মেয়েই প্রাইজের লোভে পড়ে কিনা। পড়ার জন্য তো স্কুলে আসে না।"

যামিনী আসিয়া সোজা একেবারেই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, কাহারও দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়া তাহাকে আসিতে হইল না। সে আসিয়া বিনা অভ্যর্থনায় একেবারেই একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া ঘরের লোকের মত ঘনিষ্ঠ ভাবে কথার মধ্যখানেই যোগদান করিল। অণিমাকে সে নমস্কার পর্য্যন্ত একটা করিল না, অণিমাও তাহাকে নমস্কার করে নাই, এই সব অন্তরঙ্গতার প্রকট চিত্র দেখিয়া বরেন্দ্রকৃষ্ণের মনের ভিতরটা রুদ্ধ-রোষে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

প্রাইজের কথা উঠিতেই সে সাগ্রহে কহিয়া উঠিল,—"বেশ তো! প্রাইজ ভাল করেই দিন না,—তাতে যা কিছু খরচ পড়বে আমিই সব দিয়ে দোব।"

বাধা দিল যামিনী, সে কহিল,—"আপনি সবই দেবেন কেন? সব্বাই মিলে কিছু কিছু দেবেন, এতে সব্বাইকারই একটা ভাল কাজের উৎসাহ হবে, এসব বিষয়ে দায়িত্বজ্ঞানও একটা জন্মাবে, কারও গায়ে লাগবে না।"

বরেন্দ্রকৃষ্ণের স্বর ও কথায় সুপ্রচুর বিরক্তিপূর্ণ গর্ব্ব প্রকাশ পাইল। সে ব্যঙ্গভরে হাসিয়া একটুখানি বাঁকা সুরে বলিয়া উঠিল,—"ও সামান্য টাকা ক'টা দিতে আমার 'গায়ে-লাগা' ছেড়ে আঙুলেও লাগবে না।"

অবমানিত যামিনীর মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে তখনই আত্মদমন করিয়া স্থির স্বরে কহিল,—"তবে তাই দেবেন।" এই বলিয়া টেবিলের উপর হইতে একখানি বই তুলিয়া লইয়া তার উপরকার সোনালী অক্ষরগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল।

অণিমা সহসাই যামিনীর দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিল,—"না শুনুন, টাকা আমরা সব্বাই মিলে দোব। একজন দিলে সব্বারই যে এর উপর একটা দায়িত্ব আছে, সে জ্ঞানটা কোনদিন হতে পারবে না। জিনিসপত্র কেনার ভার কিন্তু প্রকাশবাবু আপনাকেই নিতে হবে।"

এবারও যামিনীর পূর্ব্বে বরেন্দ্রকৃষ্ণ সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "কি দরকার ওঁকে আবার অত কষ্ট দিয়ে? ওঁকে তো খেটে খেতে হয়,—অত সময়ই বা ওঁর কোথা? আমার বন্ধু ভূষণ সমস্ত ঠিক করে দেবে। 'লেড্‌ল'র দোকানে একটি দিন চলে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

এই কথায় বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত অণিমা তাঁহার দিকে ফিরিয়া স্বভাব-বিরুদ্ধ উত্তেজিত স্বরে বলিল,—"বলেন কি! আমাদের প্রাইজে বিদেশী জিনিস দেওয়া হবে? না, না, সে হবে না। সবই দেশী জিনিস দিতে হবে এতে।"*

বরেন্দ্র তার উত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া থমকিয়া গেল, কিন্তু দমিয়া গেল না। মনের ভাবটা গোপন করিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধভাবে কহিল,—"তবে-যে বলছেন ভাল করে প্রাইজ দিতে হবে?—দেশী জিনিসের প্রাইজ দিলে ভারি বিশ্রী দেখতে হবে যে,—আর পাবেনই বা কি?"

"কেন পাব না?—কাশীর, কৃষ্ণনগরের ও মির্জ্জাপুরের জিনিস-পত্র কত সুন্দর সুন্দর আছে। বোলপুরের গালার জিনিস-পত্র, কলিকাতা [illegible]টারির পুতুলগুলিও অতি সুন্দর তৈরি হয়েছে। তা ছাড়া গরীবের মেয়েদের বই শ্লেট, সেলায়ের জিনিস-পত্রই দেওয়া ভাল। আমাদের স্কুলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও গরীবের মেয়েই তো বেশী, বড় লোকের মেয়ের সংখ্যা তো নেই বললেই হয়, এখানের যাঁরা ধনী, সবই প্রায় সুবর্ণ-বণিক, তাঁরা তো স্কুলে মেয়েদের দেনই নি।"

* স্বদেশী যুগের ও প্রথম আমলের কাহিনী এটি—এক্ষেত্রে স্মরণীয়।

বরেন্দ্রকৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিল, প্রাইজ যাই হোক্ না কেন, তার তাহাতে কিছুই আসে যায় না। তাকে যে কর্ম্ম-কর্ত্তা পদে বরণ করা হইল না, ইহাতেই তার সর্ব্ব শরীরে বিষ ছড়াইতেছিল।

পরদিন যামিনী সকালবেলায় আসিল, কিন্তু কুমার আসিল না। অগত্যা প্রাইজের বিষয় সংক্ষেপে এক তরফা সারিয়া লইয়া কথায় কথায় তর্ক তুলিয়া তাদের 'ভয়সনের ফিলোজফি' খুলিয়া বসিতে দেখিয়াই মিলি জলিয়া উঠিয়া বলিল, "মাগো! আমি যেন বানের জলে ভেসে এসেছি! বিকেলে ওঁদের রাজা-উজির সব আসবেন,—সকালে এলেন তো বই খুলে বসলেন! আমি যেন ওঁদের কেউ নই! ও'টি হচ্ছে না। নাও, শিগ্‌গির পাততাড়ি তুলে ফেলো।"

যামিনী হাসিয়া কহিল,—"আপনিও আমাদের দলে চলে আসুন না,—তা হলেই তো সব দিকেই সহজ মীমাংসা হয়ে যায়।"

"সব্বাই ধার্ম্মিক হ'লে সংসার যে অরণ্য হয়ে উঠ্‌বে মশাই।" বলিয়া মিলি পাছে সে ঘরের বাতাস লাগিয়া সেও ধার্ম্মিক হইয়া পড়ে, সেই ভয়েই বোধ করি—ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। ধর্ম্মকে সে পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ রাখা নিরাপদ বলিয়া অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে। সাপগুলাকে যেমন সাপুড়েরা হাঁড়ির মধ্যে পুরিয়া রাখে তেমনই আর কি, ধর্ম্মের সঙ্গে খেলা করা আর বিষাক্ত সাপ নাবানো—ও একই।

জার্ম্মাণ পণ্ডিত বলিয়াছেন, জ্ঞানী অদ্বৈতবাদী জীবন্মুক্তগণকে শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু প্রভৃতি গুণশালী ও সমাধিপরায়ণ দেখিয়া সাধারণ সাধু ব্যক্তিগণ তাঁদের মধ্যে ঐ গুণসকলকে আয়ত্ত করিয়া জীবন্মুক্তির অবস্থা প্রাপ্ত হইবার আশায় দুইটি প্রধান মার্গ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। একটি সন্ন্যাস ও একটি যোগমার্গ। উক্ত মার্গাবলম্বীরা সন্ন্যাসে ত্যাগ ও যোগে ইন্দ্রিয়জয় ও সমাধি দ্বারা পরমার্থ সিদ্ধি প্রাপ্ত করিয়া থাকেন। সনাতন

হিন্দুধর্ম্মই যে জগতের প্রধানতম ও শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম এবং অন্য ধর্ম্ম সকল যে তাহারই শাখা প্রশাখা ইহা স্বীকার করিতে সেই বিদেশী পণ্ডিত কোনখানেই কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই, মুক্তকণ্ঠ হইয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রপ্রবর্ত্তিত আশ্রম চতুষ্টয় অপেক্ষা যে মানুষের পক্ষে সুনিয়ন্ত্রিত, ব্যবস্থা অন্য কিছু দ্বারাই হইতে পারে না, ইহাতেও তিনি নিঃসন্দিগ্ধ। ব্রহ্মচর্য্য ও নিষ্কাম কর্ম্মের মহিমা উপলব্ধি করিয়া তিনি একান্তরূপেই বিমুগ্ধ!

বইখানার একটা অংশ পড়া হইয়া গেলে অণিমা কহিল,—"যতক্ষণ বইটা পড়ি, মনে হয় আমি যেন ওঁর মনোভাব অনেকটাই বুঝতেও পারছি, কিন্তু মনের ভিতর দৃঢ় বিশ্বাস কিছুতেই আনতে পারিনে।"

যামিনী আশা করিতেছিল, অণিমাকে সে এবার নিশ্চয়ই ঈশ্বরবিশ্বাসী করিয়া তুলিবে, তাই তার এই মন্তব্যে সে ঈষৎ হতাশার হাসি হাসিয়া কহিল,—"লামার্কের 'হেরিডিটি' ও 'অ্যাডাপ্‌টেশনই' যে ডারুইন, হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের উপরে, আপনি সেইটেই চৌপটে প্রমাণ ক'রে দিলেন!"

পৈতৃক নাস্তিকতা তাহাতে প্রবল ভাবেই সংক্রমণ করিয়া আছে, যামিনীর পরিহাসে ইহাই অপ্রচ্ছন্ন রহিয়া ছিল। অণিমা চিন্তিত ভাবে চুপ করিয়া রহিল। জানি না এ' কি রহস্য! যে মস্তিষ্ক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জটিল বিষয় সকলের মীমাংসা করিতে সক্ষম, সে একজন সাধারণ লোকের মত ইচ্ছাসত্ত্বেও নিজের মনে ভক্তি বিশ্বাস আনিতে সক্ষম হয় না কেন? এও কি প্রকৃতির নির্ব্বাচন? প্রকৃতি যাহাকে শরীর মনের সমুদয় পূর্ণতা প্রদান করিলেন, তাহাকে, একজন অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য নর বা নারীর মধ্যে যে বিশ্বাসের অভাব নাই—তাহা হইতেই বা বঞ্চিত করিলেন কেন? 'ক্রমোন্নতিবাদ' ইহাতে তো খণ্ডিতই হয়। হয় নাকি? পূর্ণ মানবই তো এই মতে প্রাকৃতিক সৃষ্টির শেষ পরিণাম! তবে এই সুস্থ, সবল, সুন্দর

স্নেহ, জ্ঞানবুদ্ধি, মায়া মমতা প্রভৃতি সমুদয় অন্তর্বর্তিনী শক্তির পূর্ণ বিকাশ-স্বরূপিণী এই নারীর মধ্যে এত বড় একটা অপূর্ণতা কেন রহিয়া গেল ? এমন মধ্যাহ্ন ভাস্কর জ্যোতিঃহারা হইল কেন ?

বেশ খানিকক্ষণ পরে অণিমা বলিল,—"প্রকাশবাবু ! আপনি আমার উপর বিরক্ত হবেন না। আমারও খুব ইচ্ছে করে—আপনাদের মতন আমিও—কেউ একজন আছেন বলে মনে করি,—কিন্তু কিছুতে তা' পারি না। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বুঝিয়েছেন, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তি বশতঃ ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব্বপ্রকার জাগতিক পরিণামই নির্দ্দিষ্ট তালে তালে নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। আকর্ষণ শক্তির যখন প্রাদুর্ভাব ও বিপ্রকর্ষণ শক্তির যখন অভাব ঘটে, তখনই জগৎ ব্যক্তাবস্থায় আগমন করে এবং বিপ্রকর্ষণ শক্তির যখন প্রাদুর্ভাব ও আকর্ষণ শক্তির অভিভব হয়, ইহা ক্রমশঃ ব্যক্তাবস্থা হতে অব্যক্তাবস্থায় প্রবিষ্ট হয়। সৃষ্টি ও লয় এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে চিরদিনই আবর্ত্তিত হচ্ছে। জড় জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ ও জীব জগৎ এই সকলের বিকাশ যে এইরূপ নিয়মেই হয়ে থাকে, তিনি তা' তাঁর ফার্ষ্ট প্রিন্সিপলে সুস্পষ্ট ভাবে দেখিয়েছেন। এর জন্যে সর্ব্বদা পরিণামিনী একমাত্র প্রকৃতি ভিন্ন অন্য কোন চৈতন্য পুরুষের অধিষ্ঠানের প্রমাণ কই ? আর তার দরকারই বা কোথায় ? প্রাকৃতিক নিয়মে যারা দুর্ব্বল শরীর বা ক্ষীণ মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মেছে, এই সংসারের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে তাদের স্থান হচ্ছে না, তাদের প্রকৃতিই আবার প্রবলের পথ তৈরি ক'রে দেবার জন্যে সরিয়ে দিয়ে যোগ্যতমকে পরিত্রাণ কর্‌চেন। এর ভিতর ঈশ্বরকে কিসেরই দরকার ? আর তিনি করচেনই বা কি ? আমি অনেক ভেবে ভেবেও এর কোন সদুত্তর পাইনি।"

যামিনী একটু বেগের সহিত কহিল,—"হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, ডারুইন, লামার্ক এঁরা যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ দেখিয়েছেন বটে এবং এই ব্যক্তা-

সংরক্ষণের চেষ্টাই ক্রমোন্নতিবাদের মূলতত্ত্ব—একথাও অর্দ্ধ সত্য, আমি এর খণ্ডন করবার মত শাস্ত্রজ্ঞানী নই, কিন্তু তবু আমার মনে এই প্রশ্নই জেগে ওঠে, যে প্রকৃতি একজনকে নীরোগ, সবল, বুদ্ধিসম্পন্ন, ধনবান্ করচেন, সেই প্রকৃতিই আবার অন্য একজনকে রোগার্ত্ত, দুর্ব্বল, জড়বুদ্ধি এবং নির্ধন করচেন, এর কারণ কি? প্রকৃতি কি স্বেচ্ছাচারিণী? প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কি কোন একটা বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই? প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন যদি আকস্মিক, অহেতুক, অস্থির বা অনিয়তই হয় তবে বিজ্ঞানের আর কর্ত্তব্য কি থাক্‌বে? আবার সংসারে এও দেখা গিয়ে থাকে, যে বিদ্বানের ছেলে মূর্খ হয়, কুৎসিতের সন্তান সুন্দরও হয়, দুই ভাইয়ের মধ্যে কেউ নীরোগ, সুশ্রী, কেউ কুরূপ, রুগ্ন, মূর্খ ও বিদ্বান, এ রকম তো সদাসর্ব্বদাই হ'য়ে থাকে, এ থেকে কেবলমাত্র উত্তরাধিকারিত্বও তো মানা যায় না? বিশেষতঃ এই ক্রমোন্নতিবাদে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বড্ড বেশী গোলমাল ঠেকে না কি? 'নৈহারিকী' অবস্থাকে বিশ্বজগতের আদ্যাবস্থা বলে তাঁরা গ্রহণ করেচেন, কিন্তু ভাবুন দেখি, নৈহারিকী অবস্থা থেকে বিশ্বের ক্রমবিকাশ হ'তে হ'তে জগতে যখন প্রথম জীবের আবির্ভাব হ'ল, তখন নির্জীব পদার্থ থেকে তা অভিব্যক্ত হয়েছিল, না সজীব পদার্থ হ'তে? ভূত ও শক্তি দ্বারা বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্য্যন্ত কোন সজীব পদার্থ তৈরী করতে পারেন নি। পার্করী প্রভৃতি এ বিষয়ে সন্দেহ দেখালেও অনেক বৈজ্ঞানিক সেইজন্য সজীব পদার্থ জড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এ কথা মানতে পারেন না। ওয়ালেস্ বলেছেন, 'মনুষ্যজাতির অভিব্যক্তিতে কোন বাহ্য ইচ্ছা বা লক্ষ্যশক্তির মধ্যস্থতা নিতান্তই প্রয়োজন।' তবেই দেখুন আপনি যে জগতের ধর্ম্মমতকে একটার সঙ্গে একটার সামঞ্জস্য নেই দেখে তাদের সত্যতার উপর সন্দিহান হয়েছেন, বৈজ্ঞানিকদের মতামতও তো ঠিক সেই দোষের হাত এড়াতে পারচে না! আমার মনে হয় মানুষের প্রকৃতির

বিচিত্রতা যতদিন থাকবে, ততদিন এই সব বিচিত্র বিচিত্র এবং বিবিধ বিবিধ মতবাদও বর্ত্তমান না থেকে কিছুতেই পার পেতে পারবে না। আর বোধ করি চিরদিনই সেটা থেকে যাবে। কেন? তা আমি অবশ্য বলতে পারিনে। বৈচিত্র্যময় জগতে একটির মতন যেমন দ্বিতীয় বস্তুটি ঠিক একই রকম তৈরি হয় না, মানুষের মনেও মোটামুটি একই রকম বৃত্তি থাকলেও সম্পূর্ণ ঠিকটি কখনও হবে না। কেউ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দ্বারা জীবের ক্রমোন্নতি দেখবেন, কেউ তাতে ঈশ্বরের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা দেখতে পাবেন, কেউ ঈশ্বর ও কর্ম্মফল দুইকেই একত্র করে মিলিয়ে নেবেন। জগৎ কারও মতে স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ চির বর্ত্তমান; কেউ বলবেন, নৈহারিকী অবস্থা থেকে ক্রমাভিব্যক্ত! কেউ বলবেন এ জগৎ ঈশ্বরেচ্ছায় উৎপন্ন, কেউ বলবেন, বীজভূত প্রকৃতির লীলা-বস্থা থেকে চৈতন্য-পুরুষের সান্নিধ্য প্রাপ্তে যথাপূর্ব্বাভিব্যক্ত!—এই সব চিরদিনের তর্ক, চিরকালই চলুক না, তাতে আমাদের প্রয়োজনও তো এমন কিছু দেখি নে! আমাদের এইটুকুই দরকার হবে, আমাদের এক-জন পরিচালক আছেন, পাতা আছেন, বিধাতা আছেন, তাঁর উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের মন প্রাণ ও চিত্তকে সদা-সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখবো,—আর জীবনের অন্তে তাঁকেই যেন পাই, একমাত্র কামনা করে যাবো। যেন,—পণ্ডিতপ্রবর স্পেন্সারের মত হতাশার আক্ষেপে না ব'লে যেতে হয়,—"শেষ রহস্য যেমন তেমনি প্রচ্ছন্নই রয়ে গেল। আকাশব্যাপ্ত ভৌতিক পদার্থ কোথা হতে এলো? 'নিবুলা'র মত এর প্রকৃত কারণ দেখাতে অক্ষম! একটি গ্রহের উৎপত্তি যেরকম রহস্যপূর্ণ, একটি পরমাণুর উৎপত্তি সেইরূপই রহস্যময়! সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্ঘাটিত হ'ল না। বরং তা আরও রহস্যজালে জটিল করেই ফেললাম!"

পাঁচত্রিশ

স্কুলের পরীক্ষার পরেই প্রাইজ দেওয়া হইয়া গেল। প্রাইজের দিন মেয়েদের সংখ্যা নির্দ্দিষ্টের চেয়ে অনেক বেশীই হইয়াছিল, কিন্তু বান ডাকিয়া জলটা প্রথম খানিক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার পরেই যেমন হঠাৎ অনেকখানি নামিয়া যায়, তেমনই পুরস্কার-প্রাপ্ত মেয়েগুলি বৎসর খানেকের মধ্যে আর পুরস্কার পাইবে না, নিশ্চিত করিয়া লইয়া মায়েদের দ্বারা গৃহ সীমানাতেই অধিষ্ঠিত রহিল। অত কম মেয়ে লইয়া চলে না। অমলা ও অণিমা শিক্ষয়িত্রীটিকে সঙ্গে লইয়া মেয়েদের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া আসিল। কোন মা বলিলেন,—"ঐতো বেশ একটুখানি পড়্‌তে নিক্‌তে শিখেচে। মেয়েমানুষ ওর বেশী শিখে কি আর করবে? বেশী নেকাপড়া শিখলে মনে গর্ব্ব হয়, ধরাকে সরা দেখে।" কেহ বলিলেন,—"ইস্কুলে পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে মিশে' খারাপ হয়ে যাচ্ছে, না বাপু! মেয়ে আমি আর ইস্কুলে দিতে পারবো না।" অণিমা দেখিল, মেয়েটি তখন পাড়ার ক'টি ছেলেমেয়ে জড় করিয়া মহামহোৎসাহে কাঁচা কুল পাড়িয়া দিব্য সুখে খাইতেছে।—সে আর কিছুই বলিল না। প্রত্যেক স্থানেই প্রায় একই ফলপ্রাপ্ত হইতে হইতে তিনজনেই শূন্যমনে ফিরিয়া আসিল। ইন্দ্রনাথবাবু অণিমার শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"কি করবে মা, তুমি তো খুবই যত্ন নিয়েছিলে, এ দুর্ভাগ্য দেশ নিজের অভাব বুঝতে এখনও শিখলে না, এই বড় কষ্ট! সমাজের অর্দ্ধঅংশ নারী, জননী তাঁরা, তাঁদের জীবনকে ধর্ম্মে, কর্ম্মে, জ্ঞানে উন্নত করে গড়ে না তুলতে পারলে, তাঁদের গর্ভের সন্তানদের কিছুই যে হবে না, এ তত্ত্ব বোঝে না কেউ। বাগান করতে হলে মাটি ভাল তৈরি করা প্রয়োজন, এ কথাটা কেউই ভেবে দেখে না।

শুধু 'দেশ উদ্ধার' বলে চেঁচালেই দেশ আপনা হতে উদ্ধার হয়ে যাবে মনে করে। কি আর হবে, ঈশ্বরের যা ইচ্ছা তাই হোক্।"

এই ঘটনা প্রথমটা অণিমাকে বড়ই বিঁধিয়াছিল, কিন্তু সমুদয় শোকের মতই সে এই আসন্নপ্রায় বিয়োগ-ব্যথাটাকে অল্পদিনের ভিতরেই মনের মধ্যে চাপিয়া ফেলিয়া স্কুলটির জন্য আবার ভাল করিয়াই লাগিল। কত যত্নে, কত চেষ্টায় একটু একটু করিয়া গড়িয়া তোলা জিনিস সত্যই কি ব্যর্থ হইবে? কেন মানুষ নিজের মঙ্গল বুঝিতে পারে না? কেন সংসারের মধ্যে এত বিচিত্রতা? এমন কেন হয়? কেন জড়-প্রকৃতি এই বিচিত্র পরিণাম সাধন করছেন? একি তাঁর হিংস্র স্বভাব-জাত? কোথাও তিনি প্রবৃত্তি-স্বভাবা, কোথাও নিবৃত্তি-স্বভাবা হ'ন কেন? কেন যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই লয় করছেন? যিনি মানুষকে স্বভাবতঃই সুখাকাঙ্ক্ষী ও উন্নতি-শীল ক'রে তৈরি করেছেন, তাকে উন্নতির যথার্থ পথ কেন তিনিই দেখাতে সমর্থ হ'ন না? কেন তাদের জ্ঞান দিতে এরূপ যথেচ্ছ উচ্ছৃঙ্খলতা তিনি করে থাকেন? এ কি তাঁর খেয়াল? একি ভৌতিক-বস্তুর পূরণ অপূরণ-জনিত মস্তিষ্ক সুতের অভাবজাত বুদ্ধির বিকার? কিন্তু কেন একজন যে প্রাকৃতিক দান প্রাপ্ত হয়—অন্যে তা হয় না কেন? কেন এত বড় পক্ষপাতিত্ব?

স্কুলটি উঠিয়া যাইতে পারে এই আশঙ্কায় অণিমা স্কুলের উপর অধিক-তর আগ্রহ সহকারে কায়মন ঢালিয়া দিল। নিজেই গানের ক্লাস খুলিল, মিলিকে ধরিয়া দিল সেলাই-এর ভার। সেদিন শেষ ঘণ্টায় সে মেয়েদের গান শিখাইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ দ্বার খুলিয়া বরেন্দ্রকৃষ্ণ স্কুল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ইদানীং মিসেস বিংহামের মনে এই মহৎ ও অসাধারণ দাতা যুবকটি অত্যধিক করুণা ও স্নেহ আনয়ন করিয়া নিজের অনেকখানি সুযোগ সুবিধা

করিয়া লইয়াছিল। স্কুলের সে একজন ট্রাষ্টি, সেইজন্ত কোন একটা উপলক্ষ্য লইয়া সকল সময়েই স্কুলে যাইতে আসিতে পারে, তবে তেমন উৎকট সাহসিকতা সে দেখায় নাই। একদিন মাত্র সকল ট্রাষ্টির সঙ্গে স্কুলে আসিয়াছিল, আর আজ আসিল।

আসল কথা বরেন্দ্রকৃষ্ণ ইতঃপূর্ব্বে তাহার প্রতি অণিমার সৌজন্তের ভাব দেখিয়া যেটুকু আশান্বিত হইয়াছিল, ইদানীং তদপেক্ষা অনেকখানিই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরেও একটা অস্পষ্ট গুজব ক্রমেই যেন স্পষ্টতর হইতেছে বলিয়া জানা যায়। সে যে কি করিবে, কি করিয়া যামিনীকে বাধা দিবে, কিছুতেই ইহা বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া, ঝড় উঠিলে নৌকার আরোহী যেমন প্রতি মুহূর্ত্তে নিরুপায়ে ব্যাকুল হইতে থাকে, তেমনি ঈর্ষ্যার জ্বালায় জ্বলিয়া নিজের অক্ষমতার বিরক্তিতে নিজেকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে-ছিল। তার উত্তেজিত মনোভাব ক্রমেই যেন সকলের কাছে সুগোচর হইয়া উঠিতেছে। কেবল অণিমার মনেই কোনরূপ সংশয় ছিল না। সেদিন অসময়ে অকস্মাৎ বরেন্দ্রকৃষ্ণকে স্কুলের মধ্যে আসিতে দেখিয়া সে একটু বিরক্ত হইল, কিন্তু কর্ত্তব্য ত্যাগ করিল না। নিজে কেবল বাজনায় সুর দিয়া মেয়েদের গাহিয়া যাইতে আদেশ করিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ছাত্রীদের বিদায় দিয়া অণিমা যখন কুমারের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল, তখন তার মুখের ভাবে বরেন্দ্রকৃষ্ণের বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। তার এখানে অতর্কিত আসাটা যে অণিমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই, এই সংবাদই সেই সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত রহিয়াছিল। সহসা তাহার চিত্তেও বিদ্রোহের বিপ্লব জাগিয়া উঠিল।—যামিনীপ্রকাশ আসিলে মুখের ভাবটা বোধ করি অন্ত রকম হইত!

অণিমা সত্যসত্যই তার ব্যবহারে একটু খানি অপ্রসন্ন হইয়াছিল। প্রথমে. সে তার আগমনমাত্র মেয়েদের গান শেখান বন্ধ করিয়া দিবে

ভাবিয়াছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। মেয়েরা চলিয়া গেলে ঈষৎ কুণ্ঠিত ভাবে বরেন্দ্রকৃষ্ণ তার জামার পকেটের ভিতর হইতে একটি মখমলমণ্ডিত ক্ষুদ্র বাক্স বাহির করিয়া তাহা অণিমার দিকে ধরিয়া রুদ্ধপ্রায় স্বরে কহিয়া উঠিল, "এই সামান্য উপহারটি আপনার জন্য এনেছি, গ্রহণ করে আমায় ধন্য করুন। আজ বিকেলে কালেক্‌টারের বাড়ী সভা আছে, সুবিধা হবেনা, তাই এখানে চলে এলুম।

গভীর কৌতূহলে অণিমার গম্ভীর মুখ সহাস্য হইয়া উঠিল। সে উপহার বস্তুটি গ্রহণ করিয়া বাক্‌সটি খুলিতে খুলিতে ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "হঠাৎ আমার জন্য উপহার এনেছেন? আজ তো আমার জন্মদিন নয়! একি! এ যে হীরার ব্রেস্‌লেট্! এ আমার জন্যে কেন? না না!" তার দুই চোখ মুহূর্ত্তে সেই অনতিবৃহৎ অত্যুজ্জ্বল হীরাগুলির মতই দীপ্ত হইয়া উঠিল। বাক্সটা টেবিলের উপর রাখিয়া সে উপহারদাতার বিবর্ণ মুখের উপর দুই চোখ স্থির করিয়া গম্ভীরকণ্ঠে কহিল,—"যা' এনেছেন ফিরিয়ে নিয়ে যান, আর কখনও এরকম জিনিস আন্‌বেন না। আমি কিছুতেই এ সমস্ত নিতে পার্ব্বো না—জেনে রাখুন।"

বরেন্দ্রকৃষ্ণ এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যানে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। অণিমা হীরা চেনে, সে যে জিনিসটা না চিনিয়াই প্রত্যাখান করিল এমন নয়। তবে তার আর আশা কোথায়? কি দিয়া সে ইহাকে সেই সামান্য উকিলটার মোহ-কুহক হইতে মুক্ত করিবে? অণিমা একথা চাপা দিবার জন্য হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল,—"মিসেস্ বিংহাম কাল আপনার ওখানে গিয়েছিলেন?"

বরেন্দ্রকৃষ্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দুঃখিত স্বরে কহিল,—"হ্যাঁ গিয়েছিলেন। আপনি তো আর গেলেন না।...আপনাকে কি ক'রে আমি খুশী করতে পারি বলুনতো?" এই যে শব্দটা অসাবধানেই হোক্, আর ইচ্ছাকৃতই হোক্—তার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, বাস্তবিক

ইহাই এ লোকটীর আন্তরিক চিন্তার একমাত্র [illegible] কি করিলে সে তাহাকে খুশী করিতে পারিবে? ভাবিয়া দেখিতে [illegible] সে তাহার জন্ত যাহা করিয়াছে, সংসারে কোন নর কোন নারীর জন্ত সেরূপ করিতে পারে না। নতুন পাখা গজানো পাখীর মত স্বাধীন বড় লোকের অভিভাবকহীন পুত্র সে। সদ্য অগাধ সম্পত্তির মালিকানার সূত্রে একদল [illegible] হইয়া [illegible] কোন সংকার্য্যের সহায়তা করিতে তেমন আশা ছিল না; আর সেই লোক তার সকল প্রলোভন ত্যাগ করিয়া তার জন্ত কি না করিতেছে! [illegible] ভিন্ন বাকি সমুদয় উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুর দল দেশে ফেরত হইয়া গিয়াছে, সাজ পোশাক পর্য্যন্ত দিনে দিনে বদলাইয়া যাইতেছে। সেদিনকার সেই ভর্ৎসনার পর হইতে বিদেশী জিনিস ব্যবহার করাও বন্ধ করিয়াছে। বাড়ীতে সে যতক্ষণ থাকে, ডারুইন স্পেনসারের বই পড়িবার চেষ্টাতেই কাটায়। এ সব বিষয়ে ইংরাজীতে প্রবন্ধ লিখিবার চেষ্টাও মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকে। এমনই করিতে করিতে তার নিজেরও অজ্ঞাতে অভ্যাস স্বভাবও যে আবার কলিকাতা-পূর্ব্বাবস্থায় স্থিতিশীলভাবে বদলাইয়া আসিতেছিল, তাহা নিজেই বুঝিতে পারিয়া বিস্ময়ানুভবও করিত। জীবনের নবজাত পঙ্কিলতা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া, সে যেন আগেকার সেই [illegible] পরিণত হইতে চলিয়াছে, আর সে সব কাহার জন্ত? কে তার [illegible] কল্যাণ হস্ত দিয়া তার পঙ্কনিমজ্জিত জীবনকে এই পঙ্কজের মত বিকশিত করিয়া তুলিতেছে? কোন্ পবিত্র সূর্য্যালোকের পানে চাহিয়া এই মুদিত-হৃদয়-পদ্ম এমন সৌরভের ভরে প্রস্ফুটিত হইতেছে? শুধু একান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও মাষ্টার মশাইকে সে ডাকিতে বা তাঁর কাছে যাইতে পারে নাই, সেটা সঙ্কোচে নয়—সংশয়ে, যদি বিলাত-ফেরৎ বাড়ী, তার উপর একবয়সী অনিমার সঙ্গে বিবাহে বাধা দিয়া বসেন।

তার সেই বিষাদিত কণ্ঠস্বরে অণিমা হৃদয়ে একটু ব্যথা বোধ করিল। সে ঈষৎ কুণ্ঠার সহিত কহিল,—"আপনি দুঃখিত হবেন না। আমি ইচ্ছা ক'রে আপনার মনে কষ্ট দিইনি।—কিন্তু যা'তে আমার অনিচ্ছাসত্বেও আমাকে আপনার মনকষ্টের কারণ হ'তে হয়, আপনিও সে রকম কাজে আমাকে বাধ্য করবেন না। আপনিই বলুন, কেন আমি আপনার কাছে এত দামের জিনিস উপহার ব'লে নেব ?"

এই প্রশ্নের উত্তরের উপরেই বরেন্দ্রের সমস্ত পার্থিব সুখের আশা ভরসা একান্ত রূপেই নির্ভর করিতেছে। ইহার সে [illegible] উত্তর, "যামিনীবাবুর কাছ থেকে বোধ করি কোন রকম দামের কোন উপহারই নিতে আপনার আপত্তি হয়না ?" ইহা সে অতি কষ্টে সংবরণ করিয়া লইল। এই তার সুযোগ, এমন সুযোগ হয়ত এর পর আর কখনও ঘটিবে না। পাহারাওয়ালা দুই জনের একজনও এখন এখানে উপস্থিত নাই। সে নিজ বক্ষের ও কণ্ঠের কম্পন যথাসাধ্য রোধ করিতে চেষ্টা করিয়া কহিল,—"আমার এই সামান্য উপহারটুকু নিলে যদি আমি কৃতার্থ হই, সেটুকু দয়াও কি আপনি আমায় করতে পারেন না ?"

অণিমার নেত্রে বিরক্তির ছায়া স্ফুটতর হইয়া উঠিল। সে স্পষ্টই বিরক্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—"কৃতার্থ ই বা হবেন কেন ?"

হৃৎপিণ্ডটা দ্রুত-তাণ্ডব আরম্ভ করিয়াছে, গলা যেন তাহারই আবর্জ্জন বেগে বুজিয়া আসিতেছে, কোন মতে বরেন্দ্র অস্ফুট স্বরে উত্তর করিল,—"কেন হবো ?—আপনি এ কথা জিজ্ঞেস করবেন না।—কেন হবো না তাই বলুন। আমি তো কতকগুলো পিশাচের হাতে পড়ে ডুবতে বসেছিলুম,—আমায় কে মানুষ করে তুললে ? কে আমার জীবনের গতি ফিরিয়ে দিলে ? কে আমায়—কে আমার—" সহসা গভীর আবেগে

তার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু অণিমা যখন শান্ত স্বরেই কথা কহিল, তার অপরিবর্তিত প্রশান্ত স্বর ও সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠ তাহাকে প্রায় বিহ্বল করিয়া তুলিল। সে তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইল তার আবেদনের তীব্রতাপ ইহার বরফ-মণ্ডিত হৃদয়কে গলাইতে পারে নাই। অণিমা সহজকণ্ঠে কহিল,— "আপনি যে রকম বলছেন, যদি তার কণামাত্র আমার দ্বারা ঘটেই থাকে, তা'তে আমিই কৃতার্থ হয়েছি। প্রার্থনা করি, যেটুকু হতে বাকি আছে, তা'ও যেন সুসম্পন্ন হতে পায়। আপনি দেশের সুসন্তান, গরীবের বন্ধু,— দেশের এই দুঃসময়ে এ রকম বৃথা পয়সা নষ্ট করে কতকগুলো কাঁচ-পাথর কিনে আর গরীব দেশের ব্যয়ভার বাড়াবেন না। যদি কিছুতে কারুকে খুশী করতে চান, তাহ'লে গরীবদের ডেকে এনে অন্ন দান করুন, তাদের পরবার মোটা দু'খানা করে কাপড় বিলোন। কি আনন্দই সেই সব অভাব-গ্রস্তদের মুখে মুখে দেখতে পাবেন, তখন সত্য সত্যই মনে হবে 'কৃতার্থ'—হয়েছেন! আমি কে, আমার জন্যে—"

"আপনি—আপনি কে? ঐ অনাথ-আতুরগুলোই বরং আমার কে? অযাচিত হয়ে তাদের জন্যে আমি যা কিছু করেছি,—এখনও আমার সর্ব দিয়ে আমি তাদের জন্যে যা বলবেন, করতে প্রস্তুত আছি,—সে কা জন্যে? তাদের? তারা আমার কে? কেউ না। শুধু আপনাকে প্রসন্ন করবার জন্যেই আমি এ যাবৎ যা কিছু করেছি—করে গেছি। আর যা কিছু বলবেন, সবই করতে প্রস্তুত আছি,—শুধু আপনি আমাকে পরিত্যাগ করবেন না! আমায় কৃপা করুন।"

পাশেই প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর অফিস ঘর, সে ঘর হইতে কথাবার্ত্তার সাড়া পাওয়া যাইতেছে, হয়ত তাঁরাও এই সকল অশোভন কথাবার্ত্তার এক একটা অংশ শুনিতে পাইতেছেন,—অণিমা একটু নিকটে আসিয়া একখানা কেদারার পিঠের উপর দুই হাত রাখিয়া উহার মুখের উপর স্থির

নেত্রে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল,—"তাহ'লে আমি আপনাকে কতবড় ভাল লোক বলে মনে করেছিলাম, তা আপনি নন? [illegible] দিয়ে আপনি সত্যকে লুকিয়ে, ধর্ম্মের আবরণে অধর্ম্ম কিনছিলেন? তবে যাদের সামনে আমি বার হ'তে অপমান বোধ করি, তাদের চেয়ে আপনি কিসে বড় হলেন? এবার থেকে তাহ'লে আমাদের মধ্যে আর দেখা-সাক্ষাৎ ঘটতে পারবে না, এই দেখাই আপনার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হোক। টাকা যদি ফেরৎ চান, পাই-পয়সা হিসাব করাই আছে আমার হিসাবের খাতায়, ফেরৎ দোব।"

বরেন্দ্রকৃষ্ণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে সবেগে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া একান্ত কাতর কণ্ঠে আর্ত্তনাদের মত কহিয়া উঠিল,—"আমায় এতটা অবিচার করবেন না, দয়া করুন—।"

অণিমা তেমনই দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"আপনারই কথা দিয়ে আপনাকে আমি বিচার করেছি মাত্র! আমি আপনাকে ভাল লোক মনে করে, দয়ালু দেশভক্ত ভেবে আপনার সঙ্গে অসঙ্কোচে কথা কই,—বিশ্বাস করি,—এখনও আমার যদি সে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যেত, তাহ'লে এতক্ষণ কোন্‌কালে আমি এখান থেকে চলেই যেতাম।—তা নয়,—আমার ভুল হয় নি।—বাস্তবিকই আপনিই নিজেকে ভুল বুঝেছেন। মহৎকার্যের উদ্দেশ্য কখনও এতখানি হীন হ'তে পারে না। আমরা ভাই বোনের মত পরস্পরকে চিরদিন সাহায্য করতে পারি যেন—এই প্রার্থনা করুন। যাক—আজ আমি আসি। এরকম অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্ত্তা আর যেন আমাদের মধ্যে কোন দিনই না ওঠে, কি বলেন? তাহ'লে আমি আপনাকে তো পরিত্যাগ কর্ব্বো না, আপনি নিজেই আমাকে পরিত্যাগ করাবেন। আচ্ছা, মাপ করবেন কুমার সাহেব! আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি রূঢ় কথা বলার জন্য।"

এই বলিয়া তাহাকে নমস্কার করিয়া সে দৃঢ় পদক্ষেপে গৃহান্তরে চলিয়া গেল। সেখানকার সঙ্গে একটি মাত্র দেওয়ালের ব্যবধান থাকিলেও বরেন্দ্রকৃষ্ণ বুঝিল, তাহা তাদের মধ্যে সুদৃঢ় দুর্গতোরণেরই ব্যবধান হইয়া গেল। অণিমার কণ্ঠে যে অখণ্ডনীয় দৃঢ়তা ও অলঙ্ঘনীয় আদেশ বিদ্যমান ছিল তাহা চিনিতে বাধে না। দুঃখে হতাশায় অভিমানে ও অপমানিত ক্রোধে তাহার শরীরের রক্ত রুদ্ধ পাত্রমধ্যস্থ উষ্ণ জলের মতই ফুটিতে লাগিল। কি গর্ব্ব ঐ একটা সামান্য ঘরের সামান্য মেয়ের! কি অখণ্ডনীয় তেজ! আর সেই গর্ব্ব, সেই তেজ যেন জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ বলিয়াই তাহা বুঝি এত বেশী আকর্ষক!

ছত্রিশ

সেদিন বাড়ি গিয়া অণিমা সোজা ছাদে চলিয়া গেল। তার মনটা আজিকার এই অভাবনীয় ব্যাপারে বড়ই উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এ রকম কাণ্ড যে ঘটিতে পারে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। মনে মনে বলিল, "শুভ সঙ্কল্প সাধনে সংসারে যে কত বাধা! হয়তো আজ একজন প্রধান সহায়কে হারিয়ে এলাম!"

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে ছাদ হইতে নামিতে না দেখিয়া মিলি ছাদে উঠিয়া আসিল। দেখিল, গঙ্গার দিকের আলিসা ধরিয়া সে গঙ্গার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, শীত-সন্ধ্যার ম্লান ছায়া গঙ্গার উপর গভীর বিষণ্ণতার মতই ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইতেছে। ওপারে গৌরীপুরের প্রকাণ্ড কলের চিমনি হইতে ধুম উত্থিত হইয়া গঙ্গার উপর দিয়া ওপারকে এপারের সঙ্গে যুক্ত করিয়া

দিয়াছে। হুগলী পুলের উপর দিয়া একখানা মালগাড়ী এপার হইতে ওপারে যাইতেছিল, জনকোলাহল শান্ত হইয়া আসাতে তার সেই গুমগুম শব্দ ও কল কয়টার ঝন্‌ঝনানি স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। অণিমা ভাবিতেছিল,—সে যাহা করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা করা ভিন্ন তাহার অন্য কোন উপায় ছিল না। যদি ইহাতে তার দেশ তাঁহার প্রাপ্য কণাটুকু হারায়, দেশ জননী তাহাকে এর জন্য ক্ষমা করিবেন তো?

মিলি আসিয়া পাশে দাঁড়াইল। একটুখানি ইতঃস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ভাব্‌ছিস?" অণিমা তাহার দিকে ফিরিল, তাহার মুখে জিজ্ঞাসু ভাব দেখিয়া সে একটুক্ষণ চুপ করিয়া তাহাকেই প্রশ্ন করিতে সময় দিল, তারপর উহাকে প্রশ্ন-বিমুখ দেখিয়া বলিল,—"আচ্ছা মিলি! বলতো,—একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের মনের এতখানি তফাৎ কেন? শুধু মানুষেরই নয়, সমস্ত জিনিসেই এই যে বিচিত্রতা দেখতে পাওয়া যায়, সত্যি, এ কোথা থেকে এলো? কেন এলো? কেন একই গাছের দুখানা পাতা ঠিক এক রকম হয় না? দু'টো ফুল রং-এ গড়নে পাপড়িতে ঠিক একটির সঙ্গে অন্যটি সম্পূর্ণ অভিন্ন হয় না? কেন এমন হয় বল্‌ দেখি? সত্যি, আমার প্রাণটা যেন এর মীমাংসা খুঁজে কেমন হাঁপিয়ে উঠছে! বিশেষতঃ মানুষের মনে মনে এত প্রভেদ কি করে হ'ল বল দেখি? এমন কেন হয়?"

অণিমার চিন্তিত প্রশ্নের উত্তরে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া সে এক ঝলক নিশ্চিন্ত হাসির সহিত যেন হাঁফ ছাড়িয়াই তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল,—"ঈশ্বরের মরজী। তাঁর ইচ্ছায় কি না হয়!"

"তাঁর? যদি তিনি থাকেন,—যদি ঈশ্বর থাকেন,—তাহ'লে তিনি কি এত খামখেয়ালী? এই সব তাঁর লীলাখেলা? এ কি সাংঘাতিক লীলা তাঁর? পিতা কি তাঁর সন্তানদের নিয়ে এমন ভয়ানক প্রাণঘাতী খেলা

কখনও খেলতে পারেন? বোধ করি,—বোধ করি,—হয়ত বা এ সব কর্ম্মেরই লেখা! কর্ম্মকে কি তবে মানতেই হবে? মানুষের কৃতকর্ম্মই কি ঈশ্বর? জড় প্রকৃতি কর্ম্ম-নিরপেক্ষ হয়ে কখনও এমন বিচিত্রতা সাধন করতে পারেন না, একথা যে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বহু দার্শনিকই বলছেন,—কর্ম্ম-বৈচিত্র্যই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের হেতু,—ঈশ্বর নেই, কিন্তু কৃত কর্ম্মের অলঙ্ঘ্য ফল তাকে ঘিরে আছে। তার হাত এড়াতে কেউ পারে নি—এই কি সত্যি?"

মৃণালিনী আজ 'বাজে' কথা কহিতে আসে নাই। সে ঈষৎ বিরক্ত হইয়া উত্তরে কহিল,—"তা' হোকগে ভাই! এ বৈচিত্র্য, বৈষম্য থাকতে দিয়ে দে। না হলে জগৎটা একেবারেই যে একঘেয়ে হয়ে উঠে আমাদের মতন গোলা মানুষদের অতিষ্ঠ করে তুলবে! সব্বাই যদি তোমাদের মতন ল্যাটিন ভাষায় কথা কইতে আরম্ভ করে, আর থেকে থেকে মুখ ভার করে আকাশের দিকে চোখ তুলে ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ভাবতে থাকে ঈশ্বর আছে কি, নেই—তাহ'লে এ পৃথিবীর চেয়ে বাইবেলের নরকও কম ভয়ঙ্কর হবে। তার কাজের তবু একটা ফরমুলা আছে।"

মিলির কথায় অণিমা সহসাই হাসিয়া ফেলিল, হাসিয়া কহিল,—"সেখানে যে অনন্তকাল ধরে নরক যন্ত্রণা ভুগতে হবে, তা কিছু ভেবে দেখেছিস? মাগো! মনে করলেও প্রাণটা থর থর করে কেঁপে ওঠে। মানুষ তার একটা জীবনে এত কি মহা মহা পাপ করতে পেরে ওঠে—যার জন্যে তার আত্মাকে অনন্তকাল ধরে ফল ভুগতে হবে! তা'হলে তো দেখছি ওঁদের ঈশ্বরের চাইতে আমাদের মানুষ বিচারকরাও অনেক ভাল! তাঁদের দণ্ডের যা হোক চৌদ্দ বৎসর, বিশ বৎসর একটা নির্দ্দিষ্ট সময় বাঁধাধরা আছে।"

মিলি বলিল,—"তাই নাকি? আর যাবজ্জীবন নেই।"

"আছে। তাও না হয় এ জীবনের দিন কটারই জন্য। তারপর মৃত্যু এসে তো মুক্তি দেবে? অ—ন—ন্ত! সে যে এক বীভৎস ও ভয়ানক কাণ্ড!"

মিলি এই তুচ্ছ আলোচনাটা এইখানেই শেষ করিয়া ফেলিয়া একটু কৃপার হাসি হাসিয়া কহিল,—"ছাই পাঁশ ভেবে ভেবে তো শরীর মন সমস্ত মাটি করছো, এইবার একটুখানি নিজের জন্যে ভাবতে শেখো দেখি! ইনি তো মুক্তেফির জন্য দরখাস্ত করছেন। তা আমরা তোর একটা গতি করে যেতে পারলেই তো নিশ্চিন্ত হয়ে যাই। দাদা তো এখনও এলেন না, কবে যে আসবেন তারও তো কিছুই ঠিকানা নেই।"

অণিমা ওপারের একটা নূতন তৈরি বাঁধা ঘাটের দিকে চাহিয়াছিল, দেখিতেছিল কি শুধুই চাহিয়াছিল সে-ই জানে, তেমনই থাকিয়া মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমরা আমার জন্যে কি রকম গতির ব্যবস্থা স্থির করেছ শুনি? আমায় চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেবে? না কি—"একটু হাসিয়া কহিল,—"আর এক ধাপ উপরে,—শ্বশুরবাড়ী?"

মিলি যেন একটা পথের মত পথ দেখিতে পাইল, আগ্রহান্বিত মুখে বলিয়া উঠিল, "সত্যিই—শ্বশুরবাড়ীই তোকে পাঠিয়ে দিতে চাই। সন্ন্যাস ত্যাগ করে তুমি গৃহী হও, আমরা দেখে চক্ষু সার্থক করে বিদায় নিই।"

মৃণালিনীর কথায় বড় বোনের ব্যাকুল আন্তরিকতা এবং গভীর স্নেহ অভিব্যক্ত হইল। অণিমাও তার এই স্নেহ-করুণ শুভেচ্ছার বিরুদ্ধে সহসা কোন প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হইল না। মৃণালিনী তার মুখের দিকে আগ্রহ সংযুক্ত একপ্রকার সুকোমল প্রীতির সহিত চাহিয়াছিল, সে তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া আবারও বলিল,—"ঈশ্বর যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যকেই মিলিয়ে থাকেন, তাঁর বিধানকে মানুষ জোর করে ভাঙতে চাইলেও মানুষের দুর্ব্বল হাতে তা কখনও ভাঙা যায় না। মামা যদি সে সময়

মোকদ্দমার দিন পিছাইবার জন্ত অনুরোধ জানাইল, কিন্তু কোর্ট তার অনুরোধ এবার রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন না। অপর পক্ষে বিপুল আয়োজন, চারিদিক হইতে সাক্ষীদের আনা হইয়াছে, কলিকাতা হইতেও সেই বিখ্যাত ব্যারিষ্টারটী আসিয়াছেন, তাঁদের দিক হইতে তীব্র প্রতিবাদ উঠিল।

বাদী রাধাশ্যাম মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, কিন্তু যামিনী খুব বেশী দমিল না, সে মনে সাহস সংগ্রহ করিয়া নিজের নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিল। তাদের মক্কেল সভয়ে প্রস্তাব করিলেন,—"আর একজন বড় উকিল কি ব্যারিষ্টারকে আপনার সঙ্গে নিয়ে নি'ন না, একলা কি আপনি সামাল দিতে পেরে উঠবেন?

সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"এখন এ অসময়ে কাকেই বা নেব? তিনি নিশ্চয়ই এসে পড়বেন।" এই একমাত্র প্রার্থনাই সে অন্তরের সহিত সর্ব্বক্ষণ ধরিয়া করিতেছিল।

মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। যামিনীর প্রতিদ্বন্দীপক্ষ হইতে বড় বড় বক্তারা তীব্র ওজস্বিনী ভাষায় তাঁদের বক্তব্য বলিয়া গেলে, মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া যামিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। একবারের জন্ত তার গলাটা শুখাইয়া কাঠ হইয়া আসিয়াছিল, মনের মধ্যে একটা একান্ত দুর্ব্বল সঙ্কোচ ঠেলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু এক মুহূর্ত্ত পরেই তার একান্ত কম্পিত স্বর উচ্চগ্রামে চড়িয়া উঠিল এবং মন হইতে সমস্ত দ্বিধা সরিয়া গেল। সে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া, সেই জাল উইলের সম্বন্ধে নবীনবাবুর অনুপস্থিতিতে তাহার উপর ভার ন্যস্ত হওয়ার এক মাসের পর্য্যবেক্ষণের ফলে যে সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহাই এখন ওজস্বিনী ভাষায় বিচারকের সম্মুখে চিত্রবৎ চিত্রিত করিতে লাগিল। সে স্বাভাবিকই সুবক্তা—এ মোকদ্দমাটি সে একান্ত যত্নের সহিত পর্য্যবেক্ষণ,

করিয়াছে। নবীনবাবুর অন্তরালে ঢাকা থাকিলে তার যে শক্তি সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইবার অবসর পাইত না, তিনি না থাকাতে তাহা মেঘমুক্ত সূর্য্যের মত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিপক্ষের ব্যারিষ্টার প্রথমটা এ তরুণ যুবককে একাকী তাঁদের পক্ষের বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে দেখিয়া মৃদু মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হাসিতেছিলেন, কিন্তু মিনিট কুড়ি পরে তাঁর সে অবজ্ঞাপূর্ণ বিদ্রূপ হাস্য সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া বিস্ময়ের আকার ধারণ করিল। বিচারক মনোযোগের ভাবে সম্মুখে ঈষৎ ঝুঁকিয়া বসিলেন।

উইল যে জাল তাহার অকাট্য প্রমাণ সকল দর্শাইয়া শেষকালে সে সেই উইল চাহিয়া লইয়া তাহা অতিসূক্ষ্ম লেন্সের দ্বারায় ইহা যে প্রথমে পেন্সিল দিয়া অতি সাবধানে অস্পষ্টভাবে মৃত ব্যক্তির লেখা কপি করিয়া তাহার উপরে কালি দিয়া লেখা হইয়াছে, ইহা যখন বিচারককে দেখাইয়া দিল, তখন সহসা বিচার-কক্ষ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। বিপক্ষের উকিল ব্যারিষ্টারগণ, বিশেষ করিয়া কলিকাতার ব্যারিষ্টার তীব্র রোষে অধর দংশন করিয়া অগ্নিময় দৃষ্টিতে মক্কেলের দিকে চাহিলেন। সে তখন স্তব্ধ হইয়া মাটির দিকে চাহিয়া ছিল। বিচারক চোখ তুলিয়া সম্মুখবর্ত্তী বাদীর উকিলের উৎসাহদীপ্ত মুখের পানে চাহিলেন, তাঁর অধরপ্রান্তে প্রশংসাপূর্ণ বিস্ময়ের হাসি খেলিয়া গেল। ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "যামিনীবাবু! আপনি আজ আমাদের আশ্চর্য্য ক'রে দিয়েছেন। আপনার এ আবিষ্কার ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের মতই কৌতূহলপূর্ণ।

হরিদয়ালকে উইল জালের জন্য অভিযুক্ত করিয়া বিচারক কোর্ট বন্ধ করিলেন।

সেদিন আদালত ও আদালতের বাহিরে চারিদিক হইতেই যামিনী-প্রকাশের আইনজ্ঞান ও সূক্ষ্মবোধ-শক্তি সম্বন্ধে তুমুল আলোচনা চলিতে-ছিল। তাহার সহকর্ম্মিগণ সকলেই তাহাকে আনন্দপ্রকাশ পূর্ব্বক

অভিনন্দন জানাইল। রাধাশ্যামবাবু আসিয়া তাঁর বিপুল বক্ষের আনন্দ আলোড়নের মধ্যে গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে কতকগুলা কৃতজ্ঞতার কথা বলিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি তাঁর এই একমাত্র জীবিত দৌহিত্রটির জন্য নিজের যথা-সর্ব্বস্ব পণ করিয়া যুঝিতে দাঁড়াইয়াছিলেন।

গৃহে ফিরিবার পথে গাড়ীতে বসিয়া যামিনী আজিকার এই উপন্যাসবৎ ঘটনার বিষয় ভাবিতেছিল। নিজের সফলতার কথা মনে করিয়া তার হৃদয় যে গর্ব্বোৎফুল্ল না হইয়াছিল, এমন কখনই হইতে পারে না। এই ঘটনাটাই বিশেষ করিয়া তার কর্ম্মজীবনের মঙ্গল সূচনা করিতেছে— তাহাতেও অন্যের মত তাহারও চিত্তে কিছুমাত্র সন্দেহের লেশ রাখে নাই। আজ তার মনে পড়িল সুসঙ্গতাকে। বাড়ী পৌঁছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, নলিনী তার জন্য বহির্দ্বারের সম্মুখেই প্রতীক্ষা করিতেছে। সে ছুটিয়া আসিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া স্নেহ-বিগলিত-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—"কত দেরী করে এলে বাবা। তোমার টাকা আনতে এত কেন দেরী হয়?" তার পর টাকা নাই দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল,—"তোমায় সমস্ত দিন ধরে কাজ করিয়ে নিলে, কিছুই দিলে না, বাপি? আর তুমি ওরকম দুষ্টু মক্কেলের কাছে কাজ করতে যেও না।"

তার গৌরবের অংশভাগী হইয়া তাহাকে উৎসাহিত করিবার মত এ বাড়ীতে তার জন্যও কেহই নাই। সে এই ক্ষুদ্র সঙ্গিনীটির নিকটেই আজিকার এবং ভবিষ্যৎ সফলতার সংবাদ দিতে দিতে তাহার বড় বড় চোখ দু'টির সরলতাপূর্ণ বিস্ময়বিস্ফারণ প্রতিদান স্বরূপ পাইয়াই নিজেকে যথেষ্ট পুরস্কৃত বোধ করিল। আহারকালে সেদিন পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মিহিরের চিঠি এলো রে?" যামিনীর মনেও এই রকম একটা ঔৎসুক্য বোধ করি জাগিতেছিল, সে হাসিয়া ফেলিল,—"তোমার

যে আর দেরী সইছে না! পরশু আসবে বলে মনে হয়।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে সত্য-সত্যই বিলাতি ডাকের মাধ্যমে মিহিরের পত্র আসিল। মিহির আনন্দোৎফুল্ল চিত্তেই যে পত্রোত্তর দিয়াছে, তাহা তার পত্রের প্রতি বর্ণে বর্ণেই সুপরিব্যক্ত হইতেছে। সে লিখিয়াছিল, "অণিমার আবার এমন ভাগ্য হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। তোমার জন্তেই সৃষ্ট সে, সে তো তোমারই। এ বিষয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। যে তোমার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াছে, তোমারই জন্য চির-কৌমার্য্যের প্রতিজ্ঞা লইয়া নিভৃতে বসিয়া তপস্যা করিতেছে, তাহার সে তপস্যার ফল তাহাকে দিবে কি না আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছ? আমার জন্য অপেক্ষা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আমি এখান হইতেই দিব্য চক্ষে আমার স্নেহ প্রতিমার সহাস্য সানন্দ মুখখানি চোখের সম্মুখে সুস্পষ্ট রূপেই দেখিতে পাইতেছি। সে আজ সুখী হইয়াছে, আমিও পরম পরিতৃপ্ত হইলাম। তোমার একটি মেয়ে আছে,—তাহাতে ক্ষতি কি? সে তো অনেক অনাথ অনাথারই মা হইয়াছে, তবে একটিমাত্র মেয়ে আছে বলিয়া তোমার এত কুণ্ঠা কেন?"

অননুভূত পুলকে যামিনীর বক্ষ স্পন্দন মধ্যে মধ্যে দ্রুত হইয়া উঠিয়া আবার থামিয়া আসিতে লাগিল। 'যে তাহার জন্য নিভৃতে বসিয়া তপস্যা করিতেছে!' 'তাহার তপস্যার ফল!' চিঠিখানা সে বারবার পড়িল।

নলিনী কোন সময় আসিয়া পিঠের উপরে পড়িয়াছিল, দু হাত দিয়া তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল,—"চু"। যামিনী তাহাকে দুই হাতে কোলের উপর টানিয়া আনিয়া বুকের মধ্যে সজোরে চাপিয়া ধরিল। সুগভীর আনন্দের উচ্ছ্বাসটা সে যেন শুধু নিজের মনের ভিতর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। চিঠিখানা খস্‌খস্‌ করিয়া

উঠিতেই নলিনী সেখানা টানিয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"ওটা কিসের কাগজ বাপি ?"

তাহাকে নীরব দেখিয়া পুনশ্চ সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, "তুমি বুঝি ভূতকে ভয় কর ?

"ভূত !"

"হ্যাঁ ভূতই তো ! ঝিয়ো বলে, গলায় ঠাকুরদের নাম লিখে রাখলে ভূতের হাতে কোন ভয় থাকে না।"

যামিনী দুঃখিত হইল। সে ভাবিল, তার সময়াভাবে নলিনীর শিক্ষা-দীক্ষা ভালরূপ হইতেছে না। পিসিমার সময় কম, দাসীর হস্তে ছেলে-মেয়েদের এর চেয়ে বেশী কি সৎশিক্ষা হইতে পারে ? অথচ এই শিশু-কালের অসম্পূর্ণ শিক্ষায় তাদের অপূর্ণ মনোবৃত্তি গঠিত হইয়া উঠিলে সেই মন চিরদিনের মত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিকৃত হইয়া উঠিবে। সে মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই সদ্যপ্রাপ্ত পত্রখানার উপর দৃষ্টি পড়িতেই তার সমুদয় দুশ্চিন্তা এক মুহূর্তে দূর হইয়া গেল। মাতৃহীনাকে অণিমার মাতৃহস্তের স্নেহচ্ছায়ায় তুলিয়া দিতে পারিলেই তার জন্য প্রকৃত মঙ্গলের পথ প্রসারিত করিয়া দেওয়া হইবে। সে তাহার কর্মাবসরে কতটুকুই বা উহাকে দেখিতে পারে। এ বিবাহে নলিনীর প্রতি তার এতটুকু অবিচার করা হইতেছে না,—বরং এরূপ না করাই অবিচার হইতেছে ! যে কল্যাণময়ীকে সে তার তরুণ জীবনের প্রথম উষায় আশালোক-দীপ্ত জীবন-কাননে আবাহন করিয়া,—যার [illegible] প্রভায় নিজের সুদূর ভবিষ্যৎকে আলোকে-পুলকে কল্যাণপূর্ণ করিয়া দেখিয়াছিল এবং যাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেন্দ্র-বিচ্যুত গ্রহের মতই সে জীবন পথে লক্ষ্যচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই তার লক্ষ্যকেন্দ্রের সহিত সে তাহার জীবনের গতিকে নিবদ্ধ করিবে কি না, ইহাই যদি প্রশ্ন হয়, তবে বলিতে

হয়, পৃথিবী কি বলিবে, "সূর্য্য তুমি আমার কেহ নও, তোমার আমি চাহি না!" একথা পৃথিবী যদি কোনদিন বলে, তবে সে যে কতখানি দুঃখেই বলিবে, তাহা বলিবার কথা নয়। যামিনীও যে অণিমাকে বিবাহ করিবার কথায় ইতস্ততঃ করিয়াছিল, তাহাও সেই অবস্থায় পড়িয়া। সে জানিত, তার সমস্ত মনপ্রাণ, আশা, আনন্দ, অণিমার দিকেই চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্র জলের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে চাহিতেছে। সেই জন্যই সে নিজেকে সেই তীব্র প্রলোভন হইতে কর্ত্তব্যবোধে টানিয়া রাখিতেছিল।

না, না, সে আর কুণ্ঠিত হইবে না। পরিপূর্ণ চিত্ত লইয়া সে তার কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া গেল।

পাড়ারই কতগুলি একান্ত গরীব ঘরের কচি ছেলেদের অণিমা দুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল। চন্দর সিং-এর উপর সেই কাজটির ভার ছিল। এ লইয়া সে ছিল ঘোর অসন্তুষ্ট। এই শ্রেণীর লোকেরা তার চেয়ে নিম্ন বা সমশ্রেণীর লোকেদের প্রতি অন্যের অধিকতর করুণা সহ্য করিতে পারে না। বিশেষতঃ এই সব হতভাগা ছেলেগুলার জন্য তাহাকে একটু খাটিতেও তো হয়। সেজন্য এদের দেখিলে তার গা জ্বালা করে। বড়লোকের বাড়ি চাকরী করিয়া সে শৌখীন হইয়া উঠিয়াছে, এ রকম অপরিচ্ছন্নতাও বরদাস্ত করিতে পারে না। নাক তুলিয়া বলে, "দিদিমণি দিন দিন যেন কি হচ্ছে!"

ঝি চলিয়া গেলে, মিলি শিশুদের ক্ষুধিত চীৎকারে বিব্রত অণিমার নিকট আসিয়া বলিল,—"সত্যি! তুই এত ছেলে ভালবাসিস্, আর এদিকে বলিস, বিয়ে করবি নে। তাই তো বলি, এখনও তুই নিজের মনই বুঝিস নি। তোর যখন ছেলে হবে, সে ছেলে কি সুন্দরই হবে!"

অণিমা হাসিয়া জবাব করিল,—"তুই কি মনে করিস, আমার এই চিলের মতন চীৎকার শুনতে বড্ড মিষ্টি লাগে? তবে কি করবো? এরা যে বড্ড অসহায়, দু'বেলা তবু ঐ দুধটুকু পেলে খানিকটা বল পাবে তো!

এটুকু না করলে কি পারা যায়। তাই বা আমার সাধ্যে কতটুকু আমি পেরেছি!"

মিলি উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিল। "তা বেশ করছো, আমি কি তোমাকে বারণ করেছি!—কিন্তু যখন তোমার পৃথিবীর সব্বারই ওপর এতটা মায়া দয়া,—তখন একটি মাত্র লোকের উপরেই বা তুমি এতটা নির্দয় কেন? তুমি তো আন সুসঙ্গতাকে বিয়ে করে বেচারী শুধু শুধু কি কষ্টটাই না ভোগ করেছে। তখন তোমার সঙ্গে বিয়ে হলে সে আজ কত বছর হয়ে যেত। তা এখনও তো সময় আছে, যার জন্য সন্ন্যাসিনী হয়েছিলে তাকেই যখন ফিরিয়ে পাচ্ছো, তখন আর তোমার কিসের অমত বাপু? এতো কিছুতেই আমরা বুঝতে পারি নে।"

অণিমা চঞ্চল হইয়া উঠিল, মৃদুস্বরে কহিল,—" 'যার জন্যে সন্ন্যাসিনী হয়েছিলুম!'—এ আবার কি কথা?" মিলির মুখে চোখে ঘোর বিদ্রূপ অবিশ্বাসের ছায়া ফুটিয়া উঠিল, সে কহিল, "এই কথাটাই মস্ত বড় সত্যি কথা! তোমার কল্পনা তোমায় আজও ফাঁকি দিচ্ছে, তুমি তা বুঝতে পারছো না! যখন যামিনীবাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হয়, তখন তো তুমি কোন আপত্তিই করনি। আর তাঁর সঙ্গে বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পরই যখন জলপাইগুড়ির সেই ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে বিয়ের কথা হয় অমনি তোমার বিয়েয় যত আপত্তি দেখা দিয়েছিল। কেন, মামাও তো এঁকে বলেছিলেন, 'যামিনীর জন্যেই অণি আইবড় হয়ে রইলো। আমারই ভুলে এই হ'ল।' একথা কি তুমি অস্বীকার করতে পারো অণি?"

"তখন আমি ছেলেমানুষ ছিলাম, ভাল মন্দর কি বুঝতাম বলতো?"

মৃণালিনী অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। সে প্রথমটা ইহা ইহার লজ্জাজনিত আপত্তি মনে করিয়া কথা কাটাকাটি করিতেছিল, কিন্তু ক্রমেই সে বুঝিতে পারিতেছে, সে যাহা বুঝিয়াছিল তাহা একান্তই ভুল। এ তার বহুর্তব

পণ। অন্যের যুক্তি, তর্ক, অনুরোধ বা আবেগে মন তার টলিবে না। তথাপি সে যুঝিতে লাগিল। উল্‌টা দিক দিয়া আক্রমণ করিল,—"আচ্ছা, যামিনীবাবুকে না হলে যখন তোমার কোন কাজই চলে না, তখন অন্ততঃ তাঁর চিরদিনের সাহায্য পাবার জন্যেও তোমার তাঁকে বিয়ে করা দরকার। তুমি এমন স্থযোগ যদি হারাও অণি, তাহ'লে নেহাৎ নির্ব্বোধের কাজ করবে। তিনি কি বিনা সম্বন্ধে চিরদিনই এই ভাবে তোমার কাজে প্রাণপাত করতে থাকবেন,—এই কি তুমি আশা করো? আর সেটা কখনও হয়!"

অণিমার গণ্ডে গাঢ় রক্তিমা ফুটিয়া উঠিল। সে যেন জোর করিয়াই হাসিয়া কহিল,—"থামোগো ব্যারিষ্টার মশাই! থামো! দেখ্ মিলি! তুইতো আমাকে ঢের উপদেশ দিলি, আমিও তোকে দু'একটা দিই শোন,—বিবাহিত স্ত্রী পুরুষ ক'জনকে তুই এক সঙ্গে মিলে দেশের কাজ করতে দেখলি,—তাই আমায় বল্ দেখি?…দেখেছিস কখনও?"

মিলি বলিল,—"এই তোমার আপত্তির কারণ? তা তুই ঠিকই বলেছিস। মানুষ নিজের সুখ দুঃখ আর ঘর সংসার নিয়ে এমনই জড়িয়ে পড়ে যে অন্য কারও কথা ভাবতেই সময় পায় না, কিন্তু তোমাদের সে ভয় নেই, প্রকাশবাবু নিজে যে রকম মহৎ লোক, তিনি বিয়ে হলেও তোমায় শুধু ঘরকন্নার ভিতরে আবদ্ধ করবেন না, আর করলেও তুমি যে মেয়ে, তুমিই কি তাই মেনে নেবে নাকি?"

অণিমার মুখ এতক্ষণ অবনত রহিয়াছিল, এবার সে মুখ তুলিল। মিলি দেখিয়া বিস্মিত হইল, তার মুখখানা একান্ত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। দৃঢ় ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"কেন এত জিদ করছিস্ মিলি! পথের ধারে একটা ঘাসের ফুল ফুটেছে, সেটাকে না ছিঁড়ে নিলেই কি নয় তোদের? বাগান-ভরা কত ফুল তো ফুটে রয়েছে চারিদিকে, বেছে বেছে একটা

তাঁকে ভাল বেসে ভুলে যে না। এতই যদি মরম হয়ে থাকে। আমার চেয়ে কীত ভালো তারা।"

মিলি নিম্নস্বরে কহিল,—"কিন্তু যদি সেই ঘাসের ফুলটার সুগন্ধে বাগানের ফুলের গন্ধ ঢেকে যায়?"—অণিমা এবার আর জবাব দিল না। রাগ করিয়া উঠিয়া গেল।

অণিমা মিহিরের নিকট হইতে যে পত্র পাইল তাহাতেও মিহির তাদের বিবাহ সংবাদের অনুকূলে উচ্ছ্বসিত চিত্তে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। এই বিবাহ যে তাদের পক্ষে একান্ত ঈপ্সিত ও অত্যন্ত গৌরবজনক।—তার মতে ইহাতে কোন সংশয় নাই। সে বিবাহ অনুষ্ঠানে বৃথা বিলম্ব করিতে নিষেধ করিয়াছে। অবশেষে লিখিয়াছে,—"অণি! বোনটি আমার! আমরা যে 'চির-কৌমার্য্যের' প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা কোন কাজেরই প্রতিজ্ঞা নয়। তখন কম বয়স—অত শত বুঝি নাই,—সংসারী জীবের পক্ষে বিবাহ-বন্ধনই একমাত্র পবিত্র বন্ধন। ইহাতে নর-নারী নিজের ক্ষুদ্র 'স্ব'কে বিকাশ করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া বৃহত্তর হয়, বিবাহ-বন্ধন শক্তিকে একত্র সম্মিলিত করিয়া অবিচ্ছিন্ন একান্ত ও পরিপূর্ণ করে। বিবাহ ব্যতীত কখনই সমাজের যথার্থ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। মানুষ মনুষ্যত্বে পরিণতি লাভ করিতে পারে না। বিবাহ মানব সমাজের পক্ষে একান্ত কল্যাণকর। বিশেষতঃ এইরূপ যোগ্য নর-নারীর সম্মিলন ঘটিলে তো কথাই নাই।"

এ পত্র পাঠ করিয়া অণিমার সমস্ত মুখখানা ঊষাকাশের মত সুলোহিত ও অরুণাচলের মত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। পত্রখানা লইয়া সে রমেন্দ্রনাথের কক্ষদ্বারে ক্রতপদে আসিয়া দাঁড়াইল, অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বরে ডাকিল, "মিলি"! ভিতর হইতে মৃণালিনী বলিল, "এসো"।

ঘরের ভিতর স্বামী-স্ত্রীতে মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়াছিল। রমেন্দ্রনাথের হাতেও একখানা সেই একই হাতের লেখা বিলাতি ডাকের পত্র। অণিমা গৃহে প্রবেশ করিয়া হস্তস্থিত পত্রখানা মিলির গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল, "পড়ে দেখো"।

হঠাৎ এইভাবে আমন্ত্রিত হইয়া মিলি একটু অপ্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। সে ব্যাপারটা সম্যক্ ধারণা করিয়া পত্র উঠাইতে না উঠাইতে রমেন্দ্রনাথ সেখানা তুলিয়া লইল।

পত্র পাঠান্তে রমেন্দ্রনাথ শান্তস্বরে কহিল, "এতে কি হয়েছে?"

"এর মানে কি,—আমি জানতে চাই।"

রমেন্দ্রনাথ কহিল,—"মানে তো কিছুই গূঢ় নয়, কোন্ কথাটার মানে তুমি বুঝতে পারনি বল,—বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

রমেন্দ্রের অস্বাভাবিক শান্তভাবে সে সমধিক অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, অধীর কণ্ঠে কহিল, "সবটাই আমি বুঝতে চাই। দাদা হঠাৎ এরকম চিঠি লিখলেন কেন?"

রমেন্দ্র ঔদাস্যের সহিত উত্তর করিল, "তাঁর এই রকমই লেখা উচিত বলে মনে হয়েছিল হয়ত। এই দেখ না, আমাকেও তো তাই লিখেছেন।" —এই বলিয়া সে মিহিরের লেখা তার নামের পত্রখানা অণিমাকে পড়িতে দিল।

সে চিঠিতেও সেই একই ধরণের কথা ছিল। চিঠি পড়া হইয়া গেলে অণিমা অনেকক্ষণ মুখ তুলিল না, কিন্তু তার ঈষৎ অবনত মুখের যে অংশটুকু দেখা যাইতেছিল, তাহা দেখিয়া তার অভিভাবক দম্পতির মনে বড় একটা সুফল লাভের প্রত্যাশা জাগিল না। কিছু পরে মুখ তুলিলে দেখা গেল, তার মুখে ক্রুদ্ধ বিরক্তির ঘনছায়া বর্ষার মেঘের মত জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। সে কহিল, "দাদাকে এ সব কথা কে লিখলে অনি?" রমেন্দ্র-

নাথ এ কথার পুরাপুরি উত্তর না দিয়া একটুখানি ঘুরাইয়া বলিল, "আমরাই লিখেছি।"

"কেন লিখলেন?"

"কি ছেলেমানুষী করছো। লেখা দরকার, আর উচিত ভেবেই লেখা গেছলো,—তাতে ক্ষতিটা কি এমন হয়েছে? যামিনীর সঙ্গে তোমার বিয়ে যখন সবারই এত ঈপ্সিত, তখন তুমি কার জন্যে এত আপত্তি তুলছো? তুমি কি তাকে অপছন্দ কর? তোমার অযোগ্য মনে কর?"

অণিমার চোখের পাতা আপনা হইতে নামিয়া আসিল। তার উত্তেজিত মুখ অস্বাভাবিক বিবর্ণ হইয়া আসিল, সে মৃদু স্বরে কহিল, "না।"

"তবে? তবে তুমি এ কি কাণ্ড করছো? এত বোঝ আর নিজের প্রকৃত মঙ্গল কিসে সেটাই শুধু বোঝ না। তাও যদি না ধর, তা হ'লেও সে মানুষটার প্রতিও তো'একটা কর্ত্তব্য আছে, দয়া আছে, সে যে নিঃশব্দে তোমার সুখের জন্যে নিজের লাভ লোকসান সমস্ত উপেক্ষা করে তোমার প্রতি ইচ্ছাটি প্রতিপালন করতে এই দীর্ঘকাল ধরে প্রাণপাত করছে, তার সমস্ত মন প্রাণ তোমারই কাজে উৎসর্গিত হয়ে গেছে বলে সে সাংসারিক যশ মান যা পেতে পারত তার অর্দ্ধেকও পেলে না। তোমার কি উচিত নয় যে তুমি তার জীবনকে শান্তিপূর্ণ করে তার সেই ঋণ শোধ করো? শুধু নিজের জিদ ধরে তর্ক কর না, ভেবে দেখ, বুঝে দেখ, তারপর কথা বল। আজ না বললে নাই বললে, না হয় দু'দিন পরেই বলো—কেন তুমি তাকে বিয়ে করবে না।"

রমেন্দ্রনাথ যতক্ষণ কথা কহিতেছিল, অণিমা স্থির হইয়া শুনিতেছিল। তার-বক্তব্য শেষ হইয়া গেলে সে শান্তস্বরে বলিল, "আপনি যা' যা' বলেন সবই ঠিক, কিন্তু তবু আমি কিছুতেই আপনাদের মত গ্রহণ করতে পারলাম না। সময় নেবার দরকার নেই, আমি অনেক ভেবেই এই

উত্তর দিচ্ছি। আপনি দাদাকে একথা না লিখে প্রথমে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই ভাল করতেন। এখন অনর্থক একটা কেলেঙ্কারী করে তুললেন।”

সে একটু অস্বাভাবিক দ্রুতপদেই ফিরিয়া গেল। রমেন্দ্রনাথ ও মিলি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এমন কাণ্ড যে ঘটিতে পারে ইহা তাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। অনেকক্ষণ পরে রমেন্দ্রনাথ কহিল, “মিলি, এর ভেতর তো আর কোন ব্যাপার নেই?……কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণ?”

মিলি চমকিয়া সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিল, “অ্যাঁ—সেকি? না-না, কি বলো।” রমেন্দ্রনাথ কাছারী যাইবার জন্য তৈরি ছিল, দাঁড়াইয়া উঠিয়া গম্ভীর-মুখে কহিল, “ ‘না’ নয়, বোধ করি ডবল ‘হ্যাঁ’। তা ছাড়া আর কি হ’তে পারে, আমি তো তা’ ভেবে পাইনে’। বরেন্দ্র অত্যন্ত সুশ্রী, অতিশয় ভক্ত প্রেমিক, এবং অগাধ ধনবান।”

আটত্রিশ

বলা বাহুল্য নবীনবাবু যামিনীর সফলতায় খুব বেশী সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। যামিনীকে গুপ্ত অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া তিনি নিজেই যেস্থলে তার প্রকৃত প্রাপ্য যশ ক্রয় করিতে পারিতেন, সেখানে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টা হইয়া যাওয়াতে কে খুশী হইতে পারে? এই ঘটনায় কিন্তু মক্কেল-শ্রেণীর লোকেদের চক্ষু খুলিয়া গিয়াছিল। যারা ইতঃপূর্ব্বে নবীনবাবুর গর্ব্বিত অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার ও অপর্য্যাপ্ত পারিশ্রমিক দিতে বিরক্ত এবং বিপন্ন হইয়াও তাঁর নামের জোরে মকদ্দমা জিতিবার লোভে ঘর বাড়ী বেচিয়াও তাঁর পূজা প্রণামী যোগাইতে বাধ্য হইত, তাহারা যখন তাঁর সহকারী মাত্র থাকিয়াও তাঁর সাহায্য ব্যতীত যামিনীকে একলাই এত বড় একটা কঠিন

মোকদ্দমা জিতিতে দেখিল, তখনই তাদের চোখের পর্দা সরিয়া গেল। শুধু বড় জুড়ি, মোটা চেনই যে সফলতার একমাত্র কারণ নয়, ইহা বুঝিয়া অনেকেই সেই মিষ্টভাষী বন্ধলোভী যুবকের নিকট আসিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যামিনী নবীনবাবুর বাঁধা মক্কেলদের ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "তিনি হয়ত মনে করতে পারেন আমিই তোমাদের ফুসলে নিয়েছি। সে কাজ আমার দ্বারা হবে না।'

হরিদয়াল ভীষণ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা যামিনীর উপরেই চটিয়াছিলেন। সে না থাকিলে হয়ত তাঁর এ পরাজয় ঘটিত না। এই 'হয়ত'র উপরেই তাঁর ক্রোধের মাত্রা এত অধিক হইয়াছিল যে, লাঠিয়াল পাঠাইয়া তাহাকে খুন করিবার কথাও দু'একবার মনে উঠিয়াছিল। এমন সময় ভূষণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে যামিনীর বিরুদ্ধে বিশেষ করিয়া উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিল। মোকদ্দমার প্রথমেই সে তাঁর নিকট যাওয়া আসা আরম্ভ করিয়াছিল, এদিকে রাধাশ্যামের কাছেও সে অনেকখানি বিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে। সে স্থির করিয়াছিল যদি এই মোকদ্দমায় রাধাশ্যামের হার হয়, তাহা হইলে তার কার্য্যসিদ্ধির প্রশস্ত পথ আপনা হইতে তৈরি হইয়া উঠিবে। যামিনীপ্রকাশ যে হরিদয়ালের কাছে ঘুষ খাইয়া ঐরূপ করিয়াছে এই কথা,—এই মোকদ্দমার ফলের উপর অন্ধভাবে আগ্রহান্বিত রাধাশ্যামকে বুঝাইয়া তাহারই দ্বারা একথাটা রটনা করা কিছুই কঠিন হইবে না। এই উপলক্ষ্যে যামিনী যে কাগজপত্র জালও করিয়াছেন, ইহার পর্য্যন্ত গুজব উঠাইয়া দিয়া সে তাঁহাকে জনসমাজে অপদস্থ করিতে পারিলে বরেন্দ্রকৃষ্ণের পুরস্কারটা দাবী করিবে। সে স্বার্থের জন্ত সব করিতে পারে, এই অঙ্গীকৃত পুরস্কার তো সে যেমন করিয়াই হোক্ লইবেই লইবে, তা' ছাড়া সে মনে মনে ইহাও স্থির করিয়াছিল,—অণিমার সহিত বরেন্দ্রকৃষ্ণকে সে কিছুতেই সম্মিলিত হইতে দিবে

না। যাহাকে চোখে দেখিয়াই অমন লোকটা একেবারে বিগড়াইয়া যাইতে বসিয়াছে, তাহাকে হাতে পাইলে আর কি রক্ষা আছে! ও মেয়ে ঘরে আসিলে হয়ত 'যত অনিষ্টের মূল' বলিয়া তাকেই গাঁয়ের বা'র করিয়া দেওয়া হইবে! ভূষণ তেমন কাঁচা ছেলে নয়, যেমন দেখিবে একটুখানি পাকাপাকি হইয়া আসিয়াছে, অমনই সে তার পূর্ব্ব-জীবনের সমস্ত কাহিনী রং চড়াইয়া অণিমার কর্ণগোচর করিতে কালবিলম্ব করিবে না। আপাততঃ যামিনীর ঘাড় হেঁট করিয়া দিতে পারিলে, প্রথম পুরস্কারটা তো লইতে পারে। পরে তখন ষ্টেপ বাই ষ্টেপ উপর দিকেই চড়িতে থাকিবে।

টাকাটা হাতে লইয়া বাবুকে উদ্ধার করিয়া সে নিশ্চিন্ত মনে দেশে ফিরিবে, আর কখনও তাঁহাকে গাঁয়ের বাহির হইতে দিবে না। ভবিষ্যৎটা বেশ মনের মত গড়িয়া পিটিয়া বসিয়া আছে, এমন সময় তার মতলব ফাঁসিয়া গেল। মোকদ্দমায় হরিদয়াল না জিতিয়া, জিতিল রাধাশ্যাম। প্রথমকার 'শক'টা থামিলে ভাবিতে বসিয়া দেখিল, তার তাতেও বড় আসিয়া যায় না। হরিদয়ালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার এই আকস্মিক বিপৎপাতে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে কহিতে লাগিল, "এখন কলিকাল কিনা, দেবতাও নেই, ঠাকুরও নেই। এই দেখেই তো লোকে আর মা কালীকে পাঁঠা টাঁঠা খেতে দেয় না। কতবারে মাকে মানলুম, বল্লুম যে, মা ভদ্দর লোকের গলা থেকে কাঁটাটি উলিয়ে দাও, ভিক্ষে সিক্ষে ক'রেও, আমি তোমায় জোড়া পাঁঠা দোব। তা' ও বেটির গেরাহ্যিই হ'ল না। তা অত কম মাল তোর পছন্দ না হয়, না হয় আরও বেশী করেই খেতিস্, খপন টপন দিয়ে—বলি নিজের খাবার পথটাইতো আগে খুলে রাখ। তা' নাগ মশাই! এখন এর বিহিতটা কি ঠিক করেছেন? হাইকোর্ট কচ্ছেনতো!"

নাগ মহাশয়ও মানুষের চেয়ে দেবতার প্রতি অধিক মাত্রায় চটিয়া—

মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাকে একখানা সুদীর্ঘ পত্রও লিখিবে না? হাঁ লিখিবে বৈকি, তা না হইলে মরিয়াই বা লাভ কি হইল? তবে কি রকম করিয়া সেই পত্রখানা আরম্ভ করিবে? সম্বোধনে কি লিখিবে? লিখিবে কি,—"অণিমা! পাষাণি!" কিংবা শুধুই "পাষাণি!" অথবা এ সব কিছুই না লিখিয়া একটু কাব্যমিশ্রিত ভাষায় এইরূপে আরম্ভ করিবে,—"হে আমার মানস-মন্দিরের পাষাণ-দেবতা! তুমি আমার প্রাণঢালা সাধনার পরিবর্ত্তে যখন তোমার বজ্রানল-জ্বালা মাত্র আমার জন্য বর রূপে প্রদান করিলে, তখন তাহাকেই আমি আমার এই ভগ্ন দেউলে আবাহন করিয়া লইলাম! তোমার তৃপ্তির জন্য এই যে ভক্ত হৃদয়ের সুলোহিত শোনিত-ধারা আজ উৎসারিত হইল, সেই অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া তুমি প্রসন্না হইলে তো?"

কিন্তু ইহাতেই বা কি লাভ? তার এই শোচনীয় পরিণামই কি উহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইবে? মানুষের মনের ভিতরেও দুইটা বিভিন্ন শক্তি সমুদয় জাগতিক ব্যাপারের মত দুইদিক হইতে একসঙ্গেই কাজ করিতেছে। একটা যখন প্রবল হইয়া উঠে, তার বিপরীত শক্তিটাকে সে তখন অভিভব করিবার চেষ্টা করিতে থাকে বটে, কিন্তু অন্য শক্তিটাও তেমনই প্রাণপণ বলে নিজেকে মাথা তুলিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিবার জন্য যুঝিতে ছাড়ে না। প্রবল "তম" যখন বরেন্দ্রকৃষ্ণকে অভিভূত করিয়া তাহাকে মৃত্যুর জন্য প্রলোভিত করিতেছিল, সেই সময় মোহকে পরাভব করিয়া রজঃশক্তি তীব্র ঈর্ষারূপে তার বিহ্বল মস্তিষ্ককে ধীরে ধীরে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে লাগিল। সে আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিল, "কেন আমি মরবার কথা মনে করছি? না, না, মরবো না। আমায় আরও বেশী করে চেষ্টা করতে হবে। অণিমাকে আমায় পেতেই হবে। কিন্তু হতভাগা বাঘিনীকে কেমন করে যে তার মন হতে সরাবো? সেই

শয়তানটাই যে তাকে গ্রাস করে রাহু হয়ে রয়েছে তাতে তো সংশয় নেই। সে না থাকলে, তার বউটা মা মরলে—" তার সমস্ত হতাশা, ক্রোধ ও ঈর্ষা নিরপরাধ যামিনীর উপরেই মেঘমধ্যস্থ অলক্ত অশনির মতই বর্ষিত হইতে লাগিল।

অণিমাকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে বলিল, "যদি তুমি আমায় দয়া না করে একটু ভালবাসতে, আমিও ওই স্পর্শমণির স্পর্শ পেয়ে পেতল থেকে সোনা হতে পারতাম। যদি এখনও দয়া হয়,—যদি কখনও দয়া হয়, তাহ'লে এখনও অনেক সময় আছে,—আমি মানুষ হব, তোমার জন্যে আমি দেশের সেবা, গরীবের সাহায্য—সবই করব। শুধু তুমি ধ্রুবতারার মত আমার দু'দিনের পথভ্রষ্ট জীবনের গতি তোমার পুণ্যজ্যোতিঃ দিয়ে ফিরিয়ে রেখে আমার মাষ্টার মশাই-এর শিক্ষা ও আদর্শকে সার্থক হ'তে দিও। আমায় আবার এই জম্বুক দলের হাতে ঠেলে দিও না। ওঃ ভালিম! না, না, সে সব কথা ভাবতেও আজ লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়।"

চল্লিশ

সেদিন কাছারী যাইতেই সর্ব্বপ্রথম নবীনবাবুর সহিত যামিনীর সাক্ষাৎ ঘটিল। নবীনবাবু তার আনন্দোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া কহিলেন, "কিহে মনে বড় স্ফূর্ত্তি যে! ব্যাপারটা কি ?"

সত্য সত্যই মনের অবস্থাটা সেদিন বড় বেশী ভাল ছিল। পকেটের ভিতর মিহিরের পত্রখানা আসন গ্রহণ করিবার সময় খড় মড় করিয়া যেন আশার বাণী শরীরীরূপে তার কালো চোগাটার তলায় আত্মগোপন

করিয়া তাহাকে মধ্যে মধ্যে নিজের স্থিতি-সংবাদে পুলক-চকিত করিতে চাহিতেছিল। নবীনবাবুর আবিষ্কারে সে একটুখানি লজ্জিত হইল, প্রফুল্ল নেত্র-তারকা জুতা দুইটার উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "ব্যাপার! কই এমন কিছু তো নয়!" নবীনবাবু সকৌতুকে তার লজ্জা-জড়িত মুখের দিকে সহাস্যনেত্রে চাহিয়া কহিলেন, "অত আর লুকোচুরি কেন? রমেন কাল আমায় সব বলেছে। বেশ, বেশ, বড় সুখী হলাম। তোমার এ সৌভাগ্যের জন্যে তোমায় কন্‌গ্র্যাচুলেট করছি। সত্যি মেয়েটি ভাল।"

সহসা এইরূপে অভ্যর্থিত হইয়া যামিনী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত যেন আপনাকে সামলাইয়া লইতে সক্ষম হইতে পারিতেছিল না। নবীনবাবু রমেন্দ্রনাথের নিকট সংবাদ পাইয়াছেন কাল? তবে কি রমেন মিহিরের পত্র পাইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে বলিয়াছে এবং তাহার আবেদন ব্যর্থও হয় নাই, একি সত্য? ঈশ্বর যা কিছু করেন সবই যে মানুষের মঙ্গলের জন্যই, তার সে বিশ্বাস আজ আরও দৃঢ় হইল। যামিনী ভাবিতে লাগিল, তখন তাহার সহিত যদি অণিমার বিবাহ হইয়া যাইত, তাহা হইলে বোধ করি তাহাদের জীবন এতখানি পূর্ণভাবে গঠিত হইতে পারিত না। প্রথম জীবনের তরুণ আলোকে এই দুইটি হৃদয়ের সম্মিলন আরও নিবিড় এবং ক্লান্তি-লেশহীন হইতে পারিত বটে, কিন্তু তাহা এমন উন্নত, এমন নিঃস্বার্থ হইত না। সেদিন সে তার পার্শ্বে তার গৃহে লজ্জানম্রা কল্যাণময়ী গৃহলক্ষ্মীকেই বরণ করিত, আজ সে তার ঘরের জন্যেই শুধু নয়, সমস্ত দেশের জন্য দেশলক্ষ্মীকে পার্শ্বে লইয়া দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে। তাদের সম্মুখে বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে। ভোগকে পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষকে লাভ করিবার জন্য প্রকৃতিকে মহা-প্রকৃতিরূপে পুরুষের পার্শ্ববর্ত্তিনীরূপে কল্পনা করিয়া সে এই আসন্নপ্রায় মিলনকে তার জীবনের পরম সাফল্যরূপে অনুভব করিল। ইহ কেবল সাধারণ দুইটি নর-নারীর পার্থিব মিলন মাত্র নয়।

হায়! শুধু যদি কৃতজ্ঞতা তার ওই অপ্রিয় স্মৃতি দিয়া তার মনকে জ্বালাইয়া না রাখিত!—এ যে ভুলিতে চাহিলেও ভোলা যায় না। কিন্তু সে তো স্বপ্নেও কোনদিন তার অকল্যাণ কামনা করে নাই! তার অপরাধ কি?

রমেন্দ্র সেদিন কাছারীতে বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিল, দেখা হয় নাই। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যামিনী নীচের ঘরেই সাম্‌নে একটা কেতাব খুলিয়া বসিয়া রহিল। দু'একজন মক্কেল আসিয়াছিল, কালসকালে আসিতে বলিয়া তাদের বিদায় করিয়া দিল। মানুষের মন যখন কোন বিষয়ে—হয় দুঃখে নয় সুখে অভিভূত থাকে, তখন সেই বিষয়েরই আলোচনা ও আন্দোলন ভিন্ন সে অন্য আর কিছুই সহ্য করিতে পারে না। যামিনীও তার পরিপূর্ণ চিত্ত লইয়া ক্ষুদ্র মামলা মোকদ্দমার চিন্তা মনে স্থান দিতে পারিতেছিল না।

অপরাহ্ণ সন্ধ্যায় এবং ক্রমে সন্ধ্যা রাত্রিতে পরিবর্তিত হইয়া গেল,—রমেন্দ্রনাথ আসিল না। আকাশে অল্প মেঘ করিয়াছিল, ক্রমে সেই খণ্ড মেঘ চন্দ্র-তারকা-মণ্ডিত আকাশকে নিবিড়ভাবে ব্যাপ্ত করিয়া সঘন বিদ্যুতের স্ফুরণে আসন্নবর্ষী হইয়া উঠিল এবং অতি শীঘ্রই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বাতাসের দম্‌কায় কাচের চিমনির ভিতরে দীপশিখা বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং অর্দ্ধমুক্ত জানালাটা সবেগে খুলিয়া গিয়া জলের ঝাট ও প্রচুর বাতাস গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিল। পরমুহূর্ত্তে আলোটা বারকতক কাঁপিয়া উঠিয়া সহসাই নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়া গভীর অন্ধকারে গৃহ পরিপূর্ণ করিয়া দিল। প্রতীক্ষার সমস্ত আশাটুকু নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়া অবশেষে সে হতাশচিত্তে উঠিয়া গেল। আনন্দের প্রথম মুহূর্ত্তটায় অকস্মাৎ এই প্রকার একটা প্রচণ্ড আশাহত হওয়ার ধাক্কা খাইয়া মনের ভিতরটা যেন কতকটা সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। কেন সে আসিল না? তবে কি মিহিরের পত্র সে এ ডাকে পায় নাই? না, মিহির তো

লিখিয়াছে, "অণিকে ও রমেনকেও আমি এই সঙ্গে স্বতন্ত্র পত্র দিলাম।"—তবে? রমেন কি জানে না, তার আজ কি উৎকণ্ঠায়—কি প্রতীক্ষায় মুহূর্ত্ত কাটিতেছে? কিন্তু রমেনেরই বা ইহাতে দোষ কি? সেও হয়ত মনে করিতে পারে যামিনী নিজেই তার কাছে সংবাদ লইতে আসিবে! হয়ত প্রতিদিনের মত সন্ধ্যা বেলায় সে যাইবে মনে করিয়া সেও এই রকমই প্রতীক্ষা করিতেছে! আজ চির পরিচিত গৃহ নূতন ভাবের দ্বারা আবার এতদিন পরে তাহার অবাধ গতিকে যে রুদ্ধ করিয়াছে, সে কথা হয়ত সে বুঝিতেও পারে নাই।

একচল্লিশ

রমেন সকালেও যখন কোন সংবাদ লইয়া আসিল না, তখন একবারের জন্য একটা অজ্ঞাত দুর্ভাবনায় তাহার সমস্ত শরীরের স্নায়ুজাল রক্তের দ্রুত সঞ্চালনে ঝিন্‌ঝিন্ করিয়া উঠিল। কি ঘটনা ঘটিয়াছে? তবে কি সেখানে কোন অশুভ ঘটিল? না, তাই বা কেন? হয়ত রমেন তাহার সহিত কৌতুক করিতেছে।—ঠিক্ তাই। কিন্তু কতবড় অন্যায়! সে কি জানে না কি তীব্র উত্তেজনা ও ঔৎসুক্যের মুহূর্ত্তই তার কাটিতেছে? মক্কেলের কাজের মধ্যে লক্ষবার চকিত হইয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে ও রমেনের না আসার যত রকম কারণ থাকা সম্ভব অসম্ভব—মনে মনে তাহারই তোলাপাড়া করিতে করিতে ঘড়িতে দশটা বাজিয়া গেল। দশটার মধ্যেই ইন্দ্রনাথ বাবুর বাড়ী যাইবার কথা। সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ রহিয়াছে।—আর বিলম্ব করা চলে না। অগত্যা ক্ষুব্ধচিত্তে স্নান করিতে গেল। ইন্দ্রনাথবাবুর সঙ্গে প্রার্থনার সময়টুকু বাকিছু

তার লাগিল। মানসিক চাঞ্চল্য ও আভ্যন্তরীণ তীব্র দুঃখের সমুজ্জ্বল স্মৃতি সহসা পরাভূত করিয়া হৃদয়কে যেন নির্মল করিয়া সেখানে একটি মাত্র আনন্দ জাগ্রত হইয়া উঠিল। সে নত্রশিরে যেন সেই অদৃশ্য আনন্দ-দাতার চরণ স্পর্শ অনুভব করিতে করিতে আপনার মনের ভিতরে আপনি বলিল, "প্রভু! তোমার দেওয়া এ পুরস্কারের আমি যেন উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারি। যেন নিজেদের স্বার্থ ও তুচ্ছ সুখে তোমার কাজ ভুলে গিয়ে উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতিতে নেমে না পড়ি।"

প্রার্থনা-শেষে যামিনী কন্যার উদ্দেশ্যে চারিদিকে চাহিতেই প্রথমে এবাটীর গৃহিণীর পার্শ্বেই নলিনীর প্রতি তার দৃষ্টি পড়িল। নলিনীরও আজ এ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল, নলিনীর অপরপার্শ্বে বসিয়া একটি মেয়ে তাহাকে মৃদুস্বরে কিছু যেন বুঝাইয়া দিতেছিল, তাহাকে সে চেনা-বলিয়া-ঠেকিলেও ভাল করিয়া চিনিতে পারিল না। কিন্তু দৃশ্যটি বড় ভাল লাগিল বলিয়া হঠাৎ চোখ ফিরাইয়াও লইতে পারিল না। মেয়েটি একটি হাতে নলিনীকে তার খুব কাছে টানিয়া রাখিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে তাহার কানের কাছে নত হইয়া গালের উপর গাল রাখিয়া খুব স্নেহের সহিত মৃদুমৃদু স্বরে বোধ হয় প্রার্থনার কথাগুলিই তাহাকে বুঝাইয়া দিতেছে। মেয়েটি অসাধারণ সুন্দরী না হইলেও তাহার মুখের দিকে চোখ পড়িবা মাত্রই দর্শকের মনে হইবে এমন মুখ সহজে চোখে পড়ে না। বাস্তবিকই সে অত্যন্ত সুন্দর। বড় বড় নেত্র-পল্লবগুলি কোমল গণ্ড দু'টির উপর ছায়া ফেলিয়া রহিয়াছে, পাতলা দু'খানি রাঙা ঠোঁট সকালের বাতাসে পুষ্প-পল্লবের মত ঈষৎ নড়িতেছে ও তাহার মধ্যে হইতে দু' একটি শ্রদ্ধামিশ্রিত শব্দ অস্ফুটভাবে উচ্চারিত হইতে শুনা যাইতেছে। শ্রদ্ধা ও প্রীতির একটি শরীরী মূর্ত্তির মত মেয়েটিকে উপাসনা-গৃহে, বিশেষতঃ শিশুটির পাশে বড়ই তার ভাল লাগিল।

একে একে সকলেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে, যখন যামিনীও চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, তখন অমলা বলিল, "দাঁড়ান যামিনীবাবু! একটা কথা আছে। কিরে জ্যোতি, কই যামিনীবাবুকে তোদের 'কিশলয়ে' লেখ্‌বার জন্যে যে বল্লি না?" এই বলিয়া সে যেখানে জ্যোৎস্না নলিনীর হাত ধরিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া যামিনীর বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া হাসিল। যামিনীও এই কথা শুনিয়া চলিয়া না গিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়াই মুখ ফিরাইয়া অমলার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া তাহার দিকে দেখিল। এইবার সে তাহাকে ইন্দ্রনাথ বাবুর দ্বিতীয় কন্যা বলিয়া বুঝিতে পারিল। ইতিপূর্ব্বে সে তার চোখেও পড়িয়া থাকিবে, সেকথা বড় মনে নাই, পরের বাড়ীর অনাত্মীয়া মেয়েদের সে হয়ত পায়ের কথা বলিতে পারে—মুখ তুলিয়া মুখ দেখেনা, সেখানে সে লক্ষণ-ধর্মী। জ্যোৎস্না অমলার পরিহাসে চমকাইয়া উঠিয়া সক্রোধ-লজ্জায় লাল হইয়া তীব্র দৃষ্টিতে দিদির পানে চাহিয়াছিল। হঠাৎ যামিনীর সকৌতুক দৃষ্টি তাহাকে অসহায়রূপে আরক্ত করিয়া তুলিল। ছি ছি ছি! দিদির কি একটুও কাণ্ডজ্ঞান নাই! তাহার মাথার ভিতরটা সঙ্কোচে ও লজ্জায় যেন ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল। "কিশলয়" তাদের হাতে লেখা মাসিকপত্র, সে তার জন্য লেখক খুঁজিয়া ফিরিতেছেও বটে, তাই বলিয়া কি ইহাকে একথা বলিতে হয়? যামিনী তাহার রঞ্জিত মুখ হইতে ত্বরিৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া অমলার কৌতুকপূর্ণ সহাস্য মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিশলয় কি? আপনারা কোন কাগজ বা'র করচেন নাকি?"

জ্যোৎস্না নিরুপায় ক্রোধে দাঁড়াইয়া মাটি হইতে লাগিল। তাহার নীরব তর্জ্জন উপেক্ষা করিয়াই দিদি কহিলেন, "আমরা নয়, জ্যোতির একটা মাসিক পত্রিকা হাতে লিখে বের হচ্চে, তার নাম দিয়েছে 'কিশলয়'। বেচারির লেখক নেই—আপনি অনুগ্রহ ক'রে এক আধটা লেখা দেবেন

তো। মিস্ দত্তকেও বলতে হবে, কি বলেন? আহা বেচারি একটা কাজ আরম্ভ করেছে—" এবার আর জ্যোৎস্না আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। সে নলিনীর হাত ছাড়িয়া দিয়া দ্রুতপদে একটা কক্ষদ্বার খুলিয়া অন্তঃঘরে পলাইয়া গেল। তাহার অবস্থা দেখিয়া অমলা আরও হাসিতে লাগিল। যামিনী ব্যাপার বুঝিয়া ঈষৎ স্নেহের সহিত মৃদু হাসিয়া অমলাকে কহিল, "উনি আমার লেখা কি ওঁর কাগজে দে'বার যোগ্য মনে কর্বেন, আমি যা লিখব তা পড়বে কে?"

অমলা স্নেহভরে হাসিল, "না না, আমি ওকে ক্ষ্যাপাচ্ছিলুম। লেখা লেখা করে মাথা খারাপ করছে তাই বলেছিলুম, লেখক আমি তোকে জুটিয়ে দোব।"

আহারে বসিলে যোগমায়া পাখা হাতে লইয়া কল্পিত মক্ষিকার কাল্পনিক উপদ্রব নিবারণ করিয়া রন্ধনের পরিচয় দিয়া কহিলেন, "আজ জ্যোৎস্নাই বেশীর ভাগ রেঁধেছে। জ্যোৎস্না, বাঁধাকপির চপ দুখানা যামিনীকে দিয়ে যাও তো, মা! এগুলি ও রেঁধেচে—কেমন হয়েছে প্রকাশ?" "চমৎকার!" বলিয়া মুখ তুলিতে না তুলিতে একসঙ্গে গোটা পাঁচ ছয় গরম চপ তার পাতে পড়িল। যে হাতখানা রেকাব ধরিয়া পরিবেষণ করিতেছিল, যামিনী তাহা জ্যোৎস্নার হাত বলিয়া চিনিতে পারিল, সামান্য মাত্র পূর্ব্বেই সেই ক্ষুদ্র শিশুহস্তের মত কোমল ছোট্ট হাতখানি সে নলিনীর পৃষ্ঠে বেষ্টিত দেখিয়াছিল। হাতে সেই সরু একগাছিমাত্র সাদা বালা; হস্তে ধৃত রেকাবখানা কাঁপিতেছিল, একটু দৃঢ় করিয়া তাহা ধরিয়া সে দ্রুতপদে ফিরিয়া গেল। যামিনী একবারমাত্র তাহার দিকে কৌতুকের সহিত চাহিয়া আবার মুখ নত করিয়া আহারে মনোনিবেশ করিল। অমলার নিকট অপদস্থ হওয়ার রাগ ও লজ্জা সে যে এখনও ভুলিয়া যায় নাই, তাহার মুখে ও চলনে তাহাই ব্যক্ত হইতেছিল, তাই দেখিয়া সে একটু স্নেহের হাসি

ছিল। কিশলয়ের কমনীয়তা কিশলয়ের মতই কোমল ও তেমনই বাহুল্য-বর্জিত।

ফিরিবার সময় কেবলই মনে হইতে লাগিল,—বোধ হয় এতক্ষণ রমেন্দ্রনাথ তার বাহিরের ঘরের চৌকির উপর অধিষ্ঠিত হইয়া তাহার ফেরার বিলম্বে উৎকণ্ঠিত হইতেছে। গাড়ি সমস্ত-পথই ছুটিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু তার মনে হইয়াছিল, ঘোড়ার পায়ে এমন মৃদুগতি সে ইহার পূর্বে আর কখনও দেখে নাই। ঘোড়াটা কি এর মধ্যে বুড়া হইয়া গিয়াছে না কি!

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, কেহ আসিয়া ফিরিয়া যায় নাই। ইহার অর্থ কি? এই কি বন্ধুর উপযুক্ত কাজ? না, আর তো এ উৎকণ্ঠা সহ্য করা যায় না!

*

কাছারীতে প্রথম ঘণ্টাতেই একটা আপীলের শুনানী ছিল।

রমেন্দ্রনাথের সহিত যখন সাক্ষাত ঘটিল তখন বেলা প্রায় চারিটা বাজে। বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল রমেন বারলাইব্রেরীর বাহিরে একটা সিগারেট মুখে করিয়া চিন্তিতভাবে পাইচারি করিতেছে, যামিনীকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। যামিনী দেখিয়া বিস্মিত হইল যে সে তার মুখের দিকে চাহিয়া পর্য্যন্ত দেখিল না। পাওনাদারকে দেখিলে খাতকের মুখের যেরূপ সঙ্গীন ভাব হয়, তার মুখেও যেন ঠিক সেই রকমই একটা সচকিত শোচনীয় ভাব ফুটিয়া উঠিল। সংবাদ যে শুভ নয়, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন রহিল না!

কোনরূপ ভূমিকা পর্য্যন্ত না করিয়া রুদ্ধপ্রায়-কণ্ঠে রমেন্দ্র কহিল, "ভাই প্রকাশ, আমাকে তুমি ক্ষমা কর ভাই"—কণ্ঠস্বর তার অপরাধের গুরুত্বে যেন গভীর ভারাক্রান্ত।

উদ্বেগে যামিনী ক্রমেই অধীর হইয়া উঠিতেছিল। আপনার অজ্ঞাতে

সে তার দিকে আরও দু এক পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া যন্ত্র-চালিতের মত নিজের একখানা হাত তার কাঁধের উপর রাখিয়া তীব্র স্বরে কহিয়া উঠিল, "মিহিরের কোন চিঠি পেয়েছ তুমি?" রমেন তাহার হাতের উপরকার হাতখানার দ্রুত কম্পন স্পষ্টই অনুভব করিতেছিল। সেখানা এত দ্রুত কাঁপিতেছিল যে স্পর্শ মাত্রেই বুঝিতে পারা যায়, তাহার অধিকারীর শরীরের মধ্যে প্রবলবেগে যেন ভূমিকম্প হইতেছে। সে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিষাদপূর্ণ-কণ্ঠে কহিল,—"চিঠি তার পেয়েছি বই কি,—দেখিয়েও ছিলুম,—কিন্তু—"

বুঝিতে কিছু বাকিও ছিল না, তথাপি জন্মস্থিত সযত্নরক্ষিত কল্পনা সত্যকে স্বীকার করিতে চাহিতেছিল না। সমস্ত শরীরের স্নায়ু-পেশীগুলা হাল ছাড়িয়া দিয়া প্রত্যেক অণু পরমাণু তাদের সংযোগ শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করিয়া যেন একটা প্রলয়ের সূচনা করিতেছিল।—সে আর্তভাবে শ্বাস টানিয়া কোনমতে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু—"

"আমিই তোমাকে এই আঘাত দেওয়ার জন্যে না বুঝে না শুনে এই কাণ্ডটা করালুম প্রকাশ! তাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম, সে তোমায় ভালবাসে না।"

কথাটার প্রকৃত অর্থ মনের মধ্যে যেন অনুভব করিতে না পারিয়া অথচ শব্দটার অব্যর্থতায় অস্তবিদ্ধের মত ছটফট করিয়া উঠিয়া অস্ফুট কাতরোক্তির মত যামিনী বলিয়া উঠিল,—"কি?—কি বল্লো রমেন?" তার হাতখানা অজ্ঞাতসারেই তার বন্ধুর বাহুর উপর হইতে স্খলিত হইয়া নামিয়া পড়িল।

রমেন্দ্রনাথ আবার গভীর সহানুভূতিপূর্ণ অনুতাপের সহিত বলিল,—

—"মিলি ও আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি, কিছুই ফল হয় নি।"

যামিনী অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই রকমই স্থিরনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া

রহিল। অকস্মাৎ গুরুতর আঘাত লাগিলে যেমন এক মুহূর্তের মধ্যে জীবন্ত দেহকে যেমন তেমনই রাখিয়া দেহ ছাড়িয়া প্রাণবায়ু নিমেষের মধ্যে বাহির হইয়া যায়, অথচ বাহিরে কিছুই বুঝা যায় না, তার নিশ্চল শরীর হইতে সেই ক্ষণ স্থিরিতে সমস্ত সংজ্ঞা যেন চলিয়া গিয়াছিল। তারপর কিছুক্ষণ পরে একটুখানি অর্থহীন, আনন্দহীন, শুষ্ক হাসি হাসিয়া সে প্রাণহীন অথচ ভূত-গ্রস্ত বা যন্ত্রচালিতবৎ বারান্দা ছাড়িয়া নামিয়া নীরবে চলিয়া গেল।

বিয়াল্লিশ

আপনার মনে গঙ্গাতীরের রাস্তা ধরিয়া চলিতে চলিতে সহর ছাড়াইয়া যখন অনেকখানি বাহিরে আসিয়া পড়িল, মানুষের সাড়া-শব্দ বিরল হইয়া অবশেষে প্রায় একেবারেই থামিয়া গেল, তখন হঠাৎ যামিনী চলা বন্ধ করিয়া অত্যন্ত ক্লান্তভাবে একটা পুরাতন গঙ্গাঘাটের পৈঠার উপরে বসিয়া পড়িল।

স্থানটি অত্যন্ত নির্জন। যখন চিরপ্রার্থিত আশা বা দুরাশা সফলতার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আকাঙ্ক্ষিত আলিঙ্গন দানার্থ আসিয়া সহসাই মরীচিকার মত মিলাইয়া যায়, তখন জন এবং প্রাণীর অস্তিত্বহীন এই রকমই একটা আশ্রয় বরং মানুষ সহ্য করিতে পারে, কিন্তু সহস্র সহানুভূতিপূর্ণ মানুষজনের সঙ্গ সে একেবারেই সহিতে পারে না। পথে একটা ভাড়াটে গাড়ি যামিনীর ঘর্ম্মাক্ত ললাট ও বিপর্য্যস্ত গতি দেখিয়া তাহাকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলে সে মাথা নাড়িয়া অনিচ্ছা জানাইয়া তেমনই লক্ষ্যশূন্য ভাবেই পথ চলিতে লাগিল।

বহু পুরাতন কালের বাঁধানো ঘাট মেরামতের অভাবে এখন ভাঙ্গিয়া

পড়িয়া গিয়াছে। ঘাটের উপরেই প্রকাণ্ড একটা বট গাছ অনেকখানি স্থান জুড়িয়া শাখা-প্রশাখাগুলাকে চারিদিকে মেলিয়া দিয়া অনেক দিনের মেলা-মেশায় চারিদিককার ছোট বড় অনেক সঙ্গী সহচর লইয়া ঘরকন্না পাতাইয়া বসিয়াছে। প্রকাণ্ড গুঁড়ি বয়সের ক্লান্তিতে ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়াছিল, তাহার গায়ে একস্থানে খানিকটা সিন্দূর লেপন করিয়া নিকটস্থ মহিলারা নিকটবর্ত্তী কোন বিশেষ তিথিতে দু'চারটা গাঁদ, ও বিল্বপত্র দিয়া মা ষষ্ঠীর পূজা করিয়া গিয়াছেন। একদিককার মোটা দুইটা ডালে দুই দিকে দড়ি বাঁধা তক্তা ঝুলাইয়া গ্রাম্য শিশুদল দোলনা তৈয়ার করিয়াছে এবং গাছ তলাতেই কিছুদিন পূর্ব্বে কোন প্রবাসী পথিক ভাত র্‌াঁধিয়া খাইয়াছিল, তারই একটা ভাঙ্গা ইটের চুল্লি ও ভস্ম-চিহ্ন এখনও তাহা প্রমাণ করিতেছে। সেই গাছটাই যামিনীর মাথার উপরে পড়ন্ত রৌদ্রের দীপ্ত রশ্মি হইতে ছায়া করিয়া রহিল, ডাল হইতে কতকগুলা আলোক লতা নামিয়া গিয়াছে, তাহারই সাদা ডাঁটায় লাল সবুজে মিশানো এক রকম ফুল থলোয় থলোয় ফুটিয়া রহিয়াছিল। এখানে বসিতে পারিতেই যামিনীর বক্ষ হইতে এতক্ষণকার অনিশ্বসিত তপ্তশ্বাসটা প্রকৃতি যেন সস্নেহে আহরণ করিয়া লইলেন। সুদীর্ঘ দিনের আশা?—তাই কি! আশা তো ছাড়িয়াই দিয়াছিল! তবে কথা এই যে, কতবার ভাঙ্গাগড়া হইতে হইতে যে কাণ্ডটা অবশেষে গড়িয়া উঠে, তা আর সহজে ভাঙ্গিতে চাহে না, লোহার মতই তাহা কঠিন, পাথরের মতই তাহা শক্ত হইয়া উঠে। যামিনীর সমস্ত চিত্ত তাই হয়ত আজ তার এই হতাশার নবতর পর্য্যায়ের বিরুদ্ধে প্রবলবেগে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সুসঙ্কতার মৃত্যু সে নিমেষের জন্য স্বপ্নেও কামনা করে নাই এবং তার মৃত্যুর পরেও এ সম্ভাবনা তাহার চিত্তে অকস্মাৎ কিছু সমুদিতও হয় নাই কিন্তু স্বাভাবিক মানব ধর্ম্মেই আজ তাহার যে বহু ঈপ্সিত অপূর্ণ আশাকে পাঁচজনে মিলিয়া সেই মৃতকল্প-প্রায় বিস্মৃত আশা-তরু-মূলে

জল ঢালিয়া ঢালিয়া সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা এখন পলে, দণ্ডে, দিনে, মাসে এমন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, যে আজ তাহাকে তার জীবনের ভিতর হইতে উৎপাটিত করিতে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেবারকার ত্যাগে পিতৃ-আজ্ঞা ছিল, এ পক্ষেও একটা অবিচারের অভিমান ছিল, নিজের মনও অপরীক্ষিত ছিল,—কিন্তু এবারে!

সে বহুক্ষণ পরে লক্ষ্যহীন দৃষ্টি জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া পরপারের ছায়াচ্ছন্ন নদী-সৈকতের উপর বিন্যস্ত করিল। সন্ধ্যা আসন্ন। ভাটপাড়ার ঘাটের একদিকে জলের অনতিদূরে একটা চিতা জ্বলিতেছিল, তাহারই অগ্নিশিখায় অর্দ্ধেকটা গঙ্গার জল যেন অগ্নিবর্ণ হইয়া জ্বলিতেছে। যামিনী তাহারই দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিল। আহা! কার আজ সকল আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব সমাপ্ত হইয়া গেল! এমনি করিয়া তারও যদি যাইত, এইখানেই তো সকল সমস্যার এক সমাধান! সহসা সেই নির্জ্জন পৃষ্ঠে একটা স্পর্শানুভব করিয়া সে চাহিয়া উঠিল। "আমি—প্রকাশ!" বলিয়া রমেন তাহার পিঠে আবারও হাত দিয়া সহানুভূতি বা গম্ভীর স্বরে বলিল, "বাড়ি চলো ভাই!"—

যামিনী বুঝিতে পারিল, যখন সে আকস্মিক আশাভঙ্গের অতর্কিত দুঃ-সংবাদে জ্ঞানশূন্য হইয়া কাছারী ছাড়িয়া চলিয়া আসে, তখন রমেন্দ্রনাথও নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিয়াছিল এবং এতক্ষণ সে তাহাকে কোনরকম বাধা না দিয়া এইরকম গভীর সহানুভূতির সহিত বিষণ্ণমুখে তাহার দুঃখের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য নীরবে তার পশ্চাতে বসিয়া আছে। এই মানসিক বিপর্য্যয়ের মুখে বন্ধুর এই স্নেহটুকু তাহার বিক্ষিপ্ত চিত্তকে অত্যন্ত কোমলভাবেই স্পর্শ করিল। রমেনের হাতে হাত রাখিয়া কহিল,—"সেই অবধি বসে আছ রমেন! বাড়ি যাওনি? মিসেস রায় কত ভাবছেন এতক্ষণ ধরে!"

তার কণ্ঠস্বরে রমেন অত্যন্ত আঘাত পাইল। রোগক্লিষ্ট রোগীর কণ্ঠেই বুঝি এই রকম দুর্বল ক্লান্ত স্বর শুনা যায়! সে বন্ধুর হাতটা নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়া একান্ত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল,—"তোমায় এমন করে রেখে যেতে তো পারিনে ভাই! বাড়ি চলো, পিসীমাও তো কম ভাবছেন না এতক্ষণ ধরে।"

যামিনী এই আগ্রহপূর্ণ অনুরোধে বিশেষ লজ্জানুভব করিল। সে তাকে কি ভাবিতেছে! কত দুর্বল, কত আত্মবিস্মৃত তাহাকে মনে করিয়াই সে তাকে এমন করিয়া ঘরে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে! ছিঃ ছিঃ, এ কি করিয়া বসিল সে আজ? জীবনের আশা-ভরা প্রভাতে যে মানসিক সংযমতাকে ভাসিয়া যাইতে দেয় নাই, আজ এই অসময়ে জীবনের এতখানি অবেলায় সেই ধৈর্য্য তার কোথা গেল! আপনার আকস্মিক দুর্ব্বলতায় সে একান্তরূপে লজ্জিত না হইয়া পারিল না। যথাসাধ্য সহজ ভাব দেখাইবার চেষ্টা করিয়া কহিল,—"এই যে যাই,—হ্যাঁ, বাড়ি তো যেতেই হবে, বড্ড ভুল করেছি না? ওরা ভাববে,—নলিনী হয়ত—"

রমেন তার হাতের উপর মৃদু মৃদু হাত বুলাইতেছিল, সে এই কথায় মুখ তুলিয়া একটু আগ্রহের সহিত কহিয়া উঠিল,—"সেখানে তোমার নলিনী আছে যে, সে হয়ত তোমার দেরী দেখে এতক্ষণ কাঁদতেই বা বসে গেছে। যা বাপ-পাগলা মেয়ে।"

গভীর মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিবিড় অন্ধকার যেমন বিদ্যুতের একটুমাত্র চকিত স্ফুরণে মুহূর্ত্তে মিলাইয়া যায়, তেমনই এই কথা কয়টাও যেন তাহার অন্ধকারাচ্ছন্ন ছন্নছাড়া মনটাকে মুহূর্ত্তে আলোর তলায় টানিয়া লইল। সে রুদ্ধপ্রায় স্বরকে স্পষ্টতর করিয়া কহিয়া উঠিল,—"ঠিক বলেছ, আমার নলিনী হয়ত আমার জন্য কাঁদছে! চলো, চলো, বাড়ী যাই।"

পরদিন সকালে মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে অণিমা জিজ্ঞাসা

করিল,—"রমেনবাবুর কাল ফিরতে অত রাত হ'ল কেন রে ?"

যিনি তিনদিন যাবৎ তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতেছিল না, সে এক প্রকার উদাসভাবেই তার প্রশ্নের জবাব দিল—"প্রকাশবাবুর কাছে ছিলেন বলে।"

অণিমা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার তাকে অনিচ্ছুক জানিয়াও জিজ্ঞাসা করিল—এর জন্ত তাহাকে বোধ করি একটুখানি দ্বিধা কাটাইতে হইয়া থাকিবে—"তাঁর শরীর বুঝি অসুস্থ হয়েছে ? না কি, কাজ ছিল ?"—

মৃণালিনীর মনে হইল ইহা নিছক পরিহাস ! তৎক্ষণাৎ তীব্র ভাবে তাহাকে প্রত্যাঘাত করিবার অদম্য ইচ্ছার সামান্তমাত্র সুযোগ লইয়া কঠিন কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "তোমার সে খোঁজে দরকার কিসের, তাঁর শুভাশুভতে তোমার তো কোন ক্ষতিবৃদ্ধিই হয় না, তোমার যখনই নিজকার্য্য সাধনের প্রয়োজন দেখা দেবে, ঐ বেহায়া লোকটা কিছুতেই না বলতে পারবে না, ঠিক এসে জুটবে !"—

সে অবজ্ঞার তীক্ষ্ণ হাসি মৃদুভাবে হাসিয়া চলিয়া গেল।

তেতাল্লিশ

কর্ম্মরথের ঘর্ঘর মন্দ্রে যখন সংসারের যাত্রাপথ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, বিশ্বপুরের সিংহদ্বার খুলিয়া যাত্রারথকে প্রবেশ করিতে দিবার পাশপত্র লিখিবার জন্ত যখন দ্বাররক্ষী অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনী-মধ্যে লেখনী তুলিয়া ধরিয়াছেন, এমন সময় এ কি আকস্মিক বিঘ্নবে সেই রথচক্র সহসা মৃত্তিকা-প্রোথিত হইয়া গেল ?

হায়, অভিশপ্ত নারীজন্ম! নিজের অন্তরের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের ভার বহন করিয়া রুদ্ধ দুয়ারে অন্যের একটুকু সহায়তার প্রতীক্ষা করিবার জন্যই কি তাহারা পৃথিবীতে জন্ম লইয়াছে! কেন তবে তাদের এই ব্যর্থ সাধনা? পূজার অধিকার না লইয়া পূজার আয়োজন সাজাইতে বসা তবে কেন? কেন? কেন?

স্কুলের মধ্যে সেই সেদিনের সেইরূপ অভাবনীয় দেখা-সাক্ষাতের পর বরেন্দ্রকৃষ্ণ আর এখানে আসে নাই। সেও সপ্তাহ কাল অতীত হইয়া গেল। যামিনীও প্রায় সম-সাময়িক কাল হইতে অনুপস্থিত। ইহা কি তাদের সঙ্গে তার চিরবিচ্ছেদেরই সূচনা? কি যেন একটা অবসাদপূর্ণ নিরানন্দে অণিমার সমুদয় প্রাণটাকে কে যেন কালি মাখাইয়া দিল। এত দিনের এত চেষ্টায় যাহা লাভ করিয়াছিল একই ক্ষণে তার সমস্তই একটুখানি হাওয়ার ফুৎকারে খসিয়া পড়িল। কর্ম্মবিমুখ ব্যথাজড় চিত্ত লইয়া সে আবার অনেকদিনের পর আপনাকে আপনার গৃহ-প্রাচীর সীমায় নিবদ্ধ করিল। কিন্তু তার তো আর তখন অতীত দিবসের মত কর্ম্মহীনতার আলস্যপূর্ণ ভাবে কাটাইলে চলে না। স্কুলের দায়িত্বপূর্ণ পদ সে এখন গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। সঙ্গীত-শিক্ষার ক্লাস লইতে তো সপ্তাহে তিনদিন যাইতেই হয়। তা ছাড়া সেক্রেটারীর দায়িত্বও আছে।

মৃণালিনী কয়দিন তাহার সহিত অভিমানে কথা কহে নাই। সুরেন্দ্রের তো কথাই ছিল না। দাসী চন্দর পর্যন্ত নন্দ কাহারের কুৎসিত শিশুটার প্রতি তার অনাবশ্যক ও অতিরিক্ত করুণায় মুখ ভার করিয়া রহিয়াছে। মিহিরের সেই পত্রখানার উত্তর অণিমা তাহার উপর রাগ করিয়াই দেয় নাই। কিন্তু আবার আর এক সপ্তাহের প্রথমেই যখন তাহার দ্বিতীয় পত্র আসিল তখন সে সেই পত্রখানা পাঠ করিয়া বরাবরের মতই দোয়াত কলম লইয়া চিঠি লিখিতে না বসিয়া আর থাকিতে পারিল না। তথাপি পূর্ব্বের সঙ্গে

একটা ব্যবধান রাখিল। পত্রে বেশী কিছুই লিখিল না, শুধু জিজ্ঞাসা করিল, সে কতদিনে ফিরিবে? সে ইচ্ছা করিয়াই এমন নির্লিপ্ত নিষ্ঠুর পত্র উহাকে লিখিল।

এমনই করিয়া দিন কাটানো অণিমার পক্ষে যেমনই হোক, মিলির পক্ষে যেন অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। সে মনের মধ্যে বিশেষ রূপেই একটা আশা পোষণ করিয়াই অভিমানে মৌনী হইয়া ছিল। অণিমা নিজের মনের ভাব ভাল করিয়া বুঝিয়া শীঘ্রই যে তাহারই দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইবে, এই সহজ বিশ্বাসটুকু লইয়াই সে নিজেকে তাহার সঙ্গ-বিমুক্ত করিয়া রাখিতে পারিয়াছিল। কিন্তু যখন দেখিল দিনের পর দিন কাটিয়াই যাইতে লাগিল, কোন অনুতপ্ত বাহু তার অভিমান ভাঙিতে অগ্রসর হইল না, তখন সে তার আশৈশব প্রিয়তরা সখীর উপর বাস্তবিকই অত্যন্ত রুষ্ট হইল। দয়া বুঝি কেবল বাহিরেই ছড়াইতে হয়? আপন জনের প্রতি একটা কর্তব্য বলিয়া কি কিছুই নাই? তথাপি মন মানিল না, মান খোয়াইয়া প্রথমে নিজেই মৌন ব্রত ভঙ্গ করিয়া কথা কহিতে গেল।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, অপরাহ্নের ঝিরঝিরে বাতাস শীতের জড়তা কাটাইয়া স্বাস্থ্যসম্পন্ন শিশুটির মত স্বচ্ছন্দ লঘু পদে আকাশে,—পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছিল। সমস্ত প্রকৃতি যেন রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া দিনে দিনে একটু একটু করিয়া নবীন স্বাস্থ্যের আভায় ও শক্তিতে তাজা হইয়া উঠিতেছে। এখনও সূর্য্যাস্তের পরপারে রাত্রির গোপন ভবনে তাহার অঙ্গের ক্লান্তি ও অবসাদ ঈষৎ কুহেলিকায় যদিও জড়িত হইয়া রহিয়াছিল, তথাপি তাহার সে আলিঙ্গন বন্ধুত্বপূর্ণই। মিলি খুঁজিতে আসিয়া দেখিল, সেই গঙ্গাধারের বসিবার ঘরে অণিমা জানলার গরাদ ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেও নীরবে আসিয়া তার পাশে দাঁড়াইল।

বেশভূষায় যত না হোক, গম্ভীর মুখের ভাবে অণিমাকে অনেকখানি

পরিবর্ত্তিত দেখাইতেছিল। তথাপি আজ যেন তার মধ্যে আর একটা নূতন শ্রী ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহা মিলির স্থূল দৃষ্টিকেও প্রতারণা করিতে পারিল না। সে দেখিল, যদিও তার উজ্জল চোখের দীপ্তি ম্লান দেখাইতেছে, তথাপি তাহার চোখে-মুখে এমন কিছু মাখানো ছিল, যাহা পূর্ব্বে আর কখনও সেখানে ছিল না। কিন্তু সেটা কি! সে কি হারানো মনকে খুঁজিয়া পাওয়া? তারই অভিনন্দন? অনেকক্ষণ চুপ করিয়া মৌনা-সঙ্গিনীর সম্ভাষণ প্রতীক্ষা করিয়া নিষ্ফল হইবার পর আত্মাভিমানকে সম্পূর্ণরূপেই বিদায় দান করিয়া অবশেষে সহজ হইতে চাহিয়া স্বাভাবিক স্বরেই বলিল,—"অণিমা! রাগ করেছিস?"

এক ফোঁটা বিষাদের হাসিতে বিষণ্ণ মুখে ম্লানিমা অধিকতর প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল তবুও অণিমা হাসিটাকে ঠোঁটে রাখিয়াই উত্তর দিল,—"তোমরাই তো সব্বাই মিলে জোট বেঁধে রাগ করেছ। আমি আর রাগ করলুম কখন কার উপর!"

"মনে করতুম তুই আমায় একটু ভালবাসিস্!"— মৃণালিনী নিশ্বাসটা জোর করিয়াই ফেলিল।

"বিশ্বাসটা ফুরিয়ে গেছে এক ফুঁয়ে? তাই না?"

মিলির রুদ্ধ অভিমান উথলিয়া উঠিল,—"উঃ, তোমার মনে একটুকুন্ মায়া দয়া নেই!"

অণিমা এ ভীষণ অভিযোগ নিঃশব্দে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিল। সে বুঝিয়াছিল মিলি আজ তাহার সহিত বোঝাপড়া করিতে ভালরূপেই সাজিয়া আসিয়াছে! আবার মিলিও বুঝিয়াছিল অণিমার মনে পাথর গলে নাই!

লঘুগতি শ্বেতপক্ষীর মত একখানা সাদা-পাল-তোলা নৌকা নৈহাটির পারঘাট হইতে ছাড়িয়া গঙ্গার জলে রেখা কাটিয়া সাঁ সাঁ করিয়া এপারের

দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল। অস্তসূর্য্যের শেষ রশ্মি তার রক্তাভ তুলির ধূসর-পাটকবর্ণে শুভ্র মেঘের পুঞ্জগুলিকে রং করিতে বসিল। দ্বারের নিকট হইতে চন্দর ডাকিয়া বলিল, "বড় দিদিমণি, জামাইবাবু আপনাকে একবার কি জন্যে যেন ডাকছেন।" স্বামী কাছারী হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া মিলি ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল, অণিমার সহিত মিটমাট করা আর ঘটিল না।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে মিলি যখন আবার সেই ঘরে প্রবেশ করিল, তখন তাহার চাহনিতে বা চলনে-বলনে পূর্ব্বের অভিমানপূর্ণ দৃপ্ত ভঙ্গীর স্থলে গভীর একটা সংশয়সঙ্কুল জড়তা মাখানো ছিল। গতিভঙ্গীতে ও চোখের চাহনিতে কেমন যেন একটা হতাশাচ্ছাদিত দুর্ভাবনা ক্রম-বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল। সে আসিয়া দেখিল, যে অবস্থায় দেখিয়া গিয়াছিল—অণিমা তখনও সেইখানে সেইরকমই সলিল-বক্ষে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কে জানে এর ভাবপ্রবণ চিত্ত জলের চিরচাঞ্চল্যময় ধাবন-নর্ত্তনকে শুধুই জড়ের অন্ধ ক্রীড়ামাত্ররূপেই দেখিতেছিল, না মনের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সুপরিতৃপ্ত স্নেহ-বিলাসরূপে কল্পনা করিতেছিল! প্রকৃতি জড়, তার একজন কর্ম্মসঙ্গী ভিন্ন, চৈতন্যের সাহচর্য্য ব্যতীত তাহার নিজের কোঁন কর্ম্ম-ক্ষমতা নাই? সত্য, এই কি সত্য? তাই কি এই বিশ্বজগতে, কি জড়ে, কি সচেতনে, বিশ্বমানবে—না শুধু তা-ই নয় জীবমাত্রের মধ্যেও এই সাহচর্য্য-ধর্ম্ম সংক্রমণ করিয়াছে? বিরুদ্ধবাদী দার্শনিকদের এ কল্পনা কি কথাই? কর্ম্মে সঙ্গী চাই! কিন্তু জ্ঞান।—নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিরোধী—আঃ! এই জ্ঞানের পথ কি উদার, কি স্বাধীন!—কিন্তু, কিন্তু সে তো জ্ঞান-মার্গী হইতে চাহে নাই, চাহিয়াছে কর্ম্ম! ঈশ্বর-চিন্তায় কালক্ষেপ করার মত বিলাসিতা তার নাই।—দেশের এই দুর্দ্দশার দিনে তাকে ভুলিয়া নিজের মনকে ফাঁকি দিয়া অবান্তর স্বার্থচিন্তা করিয়া দিন কাটাইবে? তারই নাম

আনর্বার্ণ ? অত্যাচারিত দেশবাসীর হৃদয়ে দুঃখ অভাবের যে ক্রন্দন রোল উত্থিত হইতেছে, তাহার অংশ গ্রহণ করিতে তাদের পাশে না দাঁড়াইয়া সে কোথায় কোন্ নির্জ্জন কোণের নিঃসঙ্গ মন্দিরে আপনার সমাধির আনন্দ খুঁজিতে যাইবে ? এই মানবসমাজের কর্মক্ষেত্রই তো তার মুক্তিক্ষেত্র। কর্মই মানুষের একমাত্র আশা ও আনন্দ! কিন্তু এ পথের যা পাথেয় সে বুঝি আজ সে সমুদয়ই হারাইয়া রিক্ত হইয়া বসিয়াছে। মূল্য না বাহির করিলে মহাজনেরা আর ধারে যে কারবার করিবে না। তাহারা নোটিশ পাঠাইয়াছে। সে কি তবে দেউলে হইতেই চলিল ?

মিলি আসিয়া পাশে দাঁড়াইল, ক্ষণকাল ইতঃস্তত করিয়া কোনমতে সঙ্কুচিতভাবে বলিয়া ফেলিল,—"ইনি বল্‌ছিলেন, তোমার একবার অন্ততঃ প্রকাশবাবুর সঙ্গে দেখাটা করা উচিত। না হলে নেহাৎ অভদ্রতা করা হয়।"

আঘাতের জায়গাতেই ঠিক সেই পুনরাঘাতটি ডাক্তারের নির্ম্মম ছুরির মতই কর্‌ কর্‌ করিয়া কাটিয়া বসিল। তার এই ভীরুতাকে মনের মধ্য হইতে না তাড়াইতে পারিয়া এই সপ্তাহাতীত কাল ধরিয়া সে অন্তর্বাণের রুদ্ধ শক্তিতে জীর্ণপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। ঐ বিষয়ে চিত্ত স্থির থাকিলেও সেটা পরকে কি করিয়া বুঝাইবে ভাবিয়া স্থির করিতে সে অপারগ হইয়াছে। ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"তিনি কেমন আছেন ? অসুখ করেছিল—সেদিন যেন শুনছিলাম না ?"

"তবু ভাল, তাঁর খোঁজ করলে!" মিলি কষ্ট বিদ্রূপে তাহার প্রতি আহত চিত্তের জ্বালা ঢালিয়া দিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে গেল। একটা কথা-কাটাকাটি, খানিকটা বাদ-প্রতিবাদ করিয়া ব্যাপারটাকে গুরুত্বে তুলিয়া ধরিয়া প্রকৃতরূপে তাহার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিয়া সে তাহাকে দেখাইতে চায়, কিন্তু কি অচল পাথরের কঠোর স্তূপই যে তার সম্মুখে

উহাকে হাজার নাড়া দিলেও সে নড়ে না! তার গায়ের উপর আগুন জ্বালিলেও সে গলে না। না, ও পথে কাজ হইবে না। এবার মিলি যথা-সম্ভব শান্তস্বরেই কহিল,—"তিনি যে এসেছেন।"

গলার উপর হইতে ফুটবল-বিজয়ী একদল ছেলে আসন্ন সন্ধ্যার শান্ত আকাশ সহসা হতচকিত করিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—"হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে! হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে! হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে!"

অণিমা চমকিয়া সেই দিকে চাহিল। মিলি ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। উত্তরের অপেক্ষা করিবার দুঃসাহস তাহার মনে ছিল না।

যামিনী অনিচ্ছুক শ্লথ গতিতে গৃহে প্রবেশ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। মিলি পিছনেই দাঁড়াইয়াছিল, সে দেখিল তার পা দুইটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

অণিমা সেইরূপ নিথর হইয়া জানালার নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, দ্বারের নিকট জুতার শব্দ শুনিতে পাওয়ার পরই সে দ্বারাভিমুখী হইয়াছে। এবার ঘরের মাঝখানে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে হাত তুলিয়া স্বাগত অভিবাদন জানাইল এবং লিখিবার টেবিলের সম্মুখ হইতে গৃহের একমাত্র চেয়ারখানি টানিয়া সে যামিনীর অভিমুখে আগাইয়া দিল, তারপর নিজে টেবিলটা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"বসুন।"

যামিনী মুখ না তুলিয়া,—একটিবারও তার দিকে না চাহিয়া ধীরে ধীরে অণিমা-প্রদত্ত আসনের নিকট অগ্রসর হইয়া গেল। তখনও তার গতি স্থির হয় নাই। পা দুইটা রীতিমত কাঁপিতেছিল এবং অগ্রসর হইতে গিয়া পায়ের সহিত মনও যেন মুহুর্মুহুঃ পিছাইয়া পড়িতে চাহিতেছিল। সে যে আজ এখানে আসিয়াছে সে কেবল রমেন্দ্রনাথের জবরদস্তিতে এবং মিলির অনুরোধে,—তা নহিলে যে তাহাকে অকম্পিত ধীর হস্তে চেয়ার

টানিয়া বলিতে বলিল, তাহার সমূহীন হইতে পারে মনের এমন অবস্থা আজও সে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় নাই।

মৃণালিনী দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া দু'জনকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। যামিনীর বুদ্ধির বিকাশে উজ্জ্বল ও উদারতায় দীপ্ত দুই চোখের জ্যোতিঃ শঙ্কিত লজ্জায় আজ ম্রিয়মান হইয়া উঠিয়া যেন ঘরের মেঝের লুক্কায়িত কোন গুপ্ততত্ত্ব আবিষ্ক্রিয়ায় নিযুক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদের মত সেই দিকেই নির্নিমেষ হইয়া আছে। ঠোঁটের ঈষৎ কম্পনে সচেষ্ট আত্মদমনের বিফল প্রয়াস সুব্যক্ত হইতেছিল। মিনি ব্যথিত ভর্ৎসনার সহিত অণিমার দিকে চাহিল; তার মনে হইল মোমের একটা বড় পুতুলকে ইহা অপেক্ষা প্রাণহীন মনে করিতে পারা যায় না! তাহাদের বাক্য-বিমুখ দেখিয়া সে-ই যামিনীকে সুযোগ দিবার জন্য কথা আরম্ভ করিল। সোফাটার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল,—"কাল নবীনবাবুর মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে তাঁর স্ত্রী আমাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন। কি বড়মানুষীর জাঁক বাবু তাঁর। বড্ড বিসদৃশ ঠেকে। তাঁর মেয়েগুলিকেও প্রায় তেমনই তৈরি করছেন, যাদের ঘরে যাচ্ছেন সব, সে বেচারারা হাড়ে হাড়ে বুঝবে! ছোটবেলার শিক্ষা চিরদিনের সম্বল, এটা কেউ বোঝে না, এই বড় দুঃখ,—ছেলেমানুষ ব'লে উড়িয়ে দেয়।"

যামিনী মিনির এ মধ্যস্থতায় বাঁচিয়া গেল। কৃতজ্ঞভাবে তাহার দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া ম্লান ভাবে ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"এই জন্যই সন্তান ভাল করতে হলে নিজেকে আগে ভাল হতে হয়।"

কথায় কথায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, কিন্তু কথা ফুরাইল না। মিনি যামিনীকে আজিকার প্রধান কথাটা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিলেও বলিবার সুযোগ পাইতেছিল না। সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তর্ক উঠিয়া তাদের মাঝখানে যে কোন কিছু একটা বিশেষ ঘটনা

[illegible] গিয়াছে, তার একটুও [illegible] এখন যেন তাদের আলোচনায় ব্যক্ত হইতেছিল না, সেই চির পরিচয়ের মৈত্রীর ভাব ; সেই অতল যুক্তির অবতারণা, ভবিষ্যতের আশা, অতীতের গৌরবের কথা !

অবশেষে থাকিতে না পারিয়া একথা সেকথার মাঝখানে খপ্ করিয়া এক সময় মিলি আসল কথাটার সূচনা করিয়া দিল। সে বলিয়া ফেলিল, "এবারকার মেলে আপনি দাদার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছেন প্রকাশ বাবু ? এঁকে তো দাদা আবার একখানা চিঠি লিখেছেন। তা'তে লিখেছেন, আপনাদের বিয়ের দিন স্থির হ'লেই তাঁকে একটা টেলিগ্রাম দিতে, যা'হোক্ একটা ঠিক ক'রে ফেলুন আপনারা, নৈলে তাঁকে কি লেখা যায় ?" বলিতে বলিতেই, "ঐ যাঃ ভাঁড়ারের চাবিটা কোথায় ফেল্লাম !" —বলিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ভাব দেখাইয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

তাহার পদশব্দ মিলাইয়া যাইবার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘরখানা দারুণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। সেখানে যে কোন জীবিত প্রাণী বাস করিতেছে, এমন কোন একটা চিহ্ন পর্য্যন্ত যেন রহিল না, কেবল সন্ধ্যার হিমায়মান মৃদু অন্ধকারে ছায়া-কম্পিত দেওয়ালের গায়ে বড় একটা ঘড়ি তার কাষ্ঠময় আধারে বসিয়া অবিশ্রান্ত গতিতে দুলিতে দুলিতে শব্দ করিয়া চলিয়াছিল, টিক্ টিক্ টিক্।

গঙ্গায় নৌকা বাহিতে বাহিতে সহসা একদল যুবক বেহালার সুরের সঙ্গে গাহিয়া উঠিল—"তোর আপন জনে ছাড়্‌বে তোরে, তা ব'লে ভাবনা করা চল্‌বে না।"

ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বহুক্ষণ পরে যামিনীর অস্ফুট কণ্ঠস্বর অণিমাকে সহসা সচকিত করিয়া তুলিল। সে এতক্ষণ যামিনীর মতনই নিজের আসনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল।

যামিনী বলিল—"মিহির আমাকেও চিঠি লিখেছে"—এইটুকু বলিতেই

তার যেন বাধাটা কাটা পড়িল। ছি ছি, এ কি বাতুলোচিত আচরণ সে করিতে আসিয়াছে? এই আহত হৃদয় কি আজও তার অন্যায়কারীকে বাক্যজালবদ্ধ করিবার মত ক্ষমতাসম্পন্ন আছে? সুহাসিনীর এই আকস্মিক অশ্রুপাতের পরই তাহাকে ছাড়িয়া যাওয়া উচিত হয় নাই। অণিমা একথার পর একটুখানি নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিল। যামিনী তার দিকে চাহিয়া দেখে নাই, সেও চাহিল না। মাটির দিকে চোখ রাখিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"তিনি আমাকেও লিখেছিলেন।"

তাহার কণ্ঠে ঈষৎ যেন কুণ্ঠা প্রকাশ পাইল। অত্যন্ত সহজ স্বরেই সে কথা কহিতে চাহিতেছিল। আবার যামিনী অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। সে কি বলিবে? চিরনির্ব্বাসনের আদেশ তো তার বিরুদ্ধে হইয়াই গিয়াছে, সে সংবাদ সে তো রমেনের মুখে পাইয়াই ছিল, নিজের কানে সেটা না শুনিলেই কি চলিত না? তথাপি সেটা যে তার অবশ্যপ্রাপ্য, নীরব থাকা আর তো চলে না। "তাঁকে কি উত্তর দিব?" এই উদ্বেগ চঞ্চল কণ্ঠস্বর অণিমার বক্ষের আঘাতের উপর গিয়া সজোরে আঘাত না করিয়া পারিল না। এতক্ষণ সে একবারও তার সম্মুখবর্ত্তী মুখখানার দিকে চোখ তুলিতেই সাহস করে নাই। সে মুখের যে ক্লিষ্ট বিবর্ণতা গৃহে প্রবেশ মাত্রেই তার চোখে পড়িয়া লজ্জায় ও মর্ম্মব্যথায় তাহার নারীচিত্তকে অন্তরে অন্তরে সহস্র ধিক্কার দিয়া উঠিয়াছিল, তাহারই আঘাত সে যে তার মনের মধ্যে হইতে থামাইতে পারে নাই। তারও আহত বক্ষে বক্ষরক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল। যামিনী বহুক্ষণ প্রশ্নোত্তর না পাইয়া অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। সংশয়পূর্ণস্বরে সে পুনশ্চ কহিল—"আপনার পিতার বিশ্বাসের বলেই আমি এতটা সাহসী হয়েছি,—কিন্তু এখন বুঝতে পারছি তাতে আপনাকে বিরক্ত ক'রেই ফেলেছি, কিন্তু—" প্রশ্নটা নিরুত্তর অণিমার নত মুখখানা জোর করিয়া যেন উঠাইয়া দিল। সে তার গভীর সহানুভূতিপূর্ণ দুই চোখের

দৃষ্টি যামিনীর মুখের উপর স্থাপন পূর্ব্বক তাহার কথায় বাধা দিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, "না"।

একটি ছোট্ট শব্দ ওই—'না'। কিন্তু ইহাতেই প্রবল একটা বিপ্লব মুহূর্ত্তে যামিনীর শরীরের সমস্ত স্নায়ুজালের মধ্যে দিয়া ঘটিয়া গেল। চোখে মুখে প্রচণ্ড রক্তোচ্ছ্বাস লইয়া সে তার কম্পিত দৃষ্টি মুহূর্ত্ত মাত্র তাহার মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া আবার তখনই তাহা নত করিয়া লইল। হৃদয়ের মধ্যে ঈষৎ বল সংগ্রহ করিয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "তা'হ'লে কি রমেনের কথাই ঠিক ?"

অণিমা উঠিয়া দাঁড়াইল। তার সেই নবোদিত আশার ব্যাকুল কণ্ঠ তাহাকে বর্ষার প্লাবনে ঊষর ভূমির মতই প্লাবিত করিতে চাহিতেছিল, কিন্তু তাই বলিয়া প্লাবনে সে নিজেকে ভাসিতে দিল না। মৃদুস্বরে শুধু কহিল, "আমায় ক্ষমা করুন !"

ঘরের ছাদ ফুঁড়িয়া বিনামেঘের বজ্র আসিয়া যেন যামিনীর উপর পতিত হইল। মুখের উপর এমন নিষ্ঠুর উত্তর সে যে দিতে পারিবে, ইহা যেন কল্পনারও অতীত ছিল। ইহার পরও আরও কিছু শুনিবার সাধ কাহারও থাকে ? গভীর একটা আর্ত্ত নিশ্বাস সজোরে চাপিয়া ফেলিয়া একটু পরে যামিনী বলিল, "রাত হয়ে যাচ্ছে, আজ আসি।" এই বলিয়াই সে চলিয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। তার কণ্ঠে নিদারুণ হতাশার স্বর স্বর-সপ্তকের শেষে উঠিয়া বিলাপের মূর্চ্ছনার মত কক্ষময় ঘুরিয়া ফিরিতেছিল, তাহা শুধু কাঁদেই না,—অন্তের কঠিন নেত্র হইতেও হয়ত একবিন্দু অশ্রু আহরণ করিবার জন্য যুঝিতে থাকে। অণিমাও অবলম্বন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া তার দিকে দু'এক পদ অগ্রসর হইয়া আসিল, এবার সাগ্রহে কহিল, —"আমারও কিছু বল্‌বার আছে।" তাহারও কণ্ঠে এবার উদ্বেলিত হৃদয়ের সংবাদ ব্যক্ত হইল।

তার কণ্ঠস্বরে যামিনী বিস্মিত হইয়াছিল, কিন্তু আশ্বাসিত হয় নাই। সে ফিরিয়া আসিয়া আর আসন গ্রহণ করিল না, ধীরে ধীরে খোলা সেই জানালাটার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। স্বর্ণময় চন্দ্রালোকে নদীতীর ভরিয়া উঠিয়াছে, জলে যেন হীরা মাণিক ঝিকিমিকি করিয়া জলিতেছিল। ইতস্ততঃ না করিয়া এবার অণিমাই কথা কহিল। বলিল, "পাঁচ বৎসর আগেকার কথা ভেবে দেখুন"—বলিতে গিয়া হয়ত তার গলা বুজিয়া আসিতেছিল, ললাট ও গণ্ডের রক্ত গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু যামিনী তাহা দেখিতে পায় নাই, জানিতেও পারিল না। বরং এতক্ষণে সে যেন অতলের মধ্যে একটুখানি তলের সন্ধান পাইল। আশান্বিতভাবে চোখ তুলিয়া সম্মুখবর্ত্তিনীর স্থির মুখের দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া ঈষৎ একটুখানি বেদনা-পূর্ণ ভর্ৎসনার ভাবে কহিল—"বাবার কথা ?"

"না ঠিক তা নয়"—অণিমার কণ্ঠে আর্ত্তবিলাপের মত হঠাৎ এই শব্দটা ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সে যামিনীর পরিত্যক্ত চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"তখন বাধা ওঠে যে, আপনি ব্রাহ্ম, আমি, আমরা—"

"এই বাধা ?" অণিমা মুখ নত করিয়া রহিল। যামিনী কহিল,—"আমার আশা আছে, শীঘ্রই আপনি ঈশ্বরের অধিষ্ঠানকে স্বীকার করবেন। আপনি, না, আপনি নাস্তিক ন'ন, আমি নিঃসন্দিগ্ধরূপেই জানি, আপনি নাস্তিক ন'ন।" তাহার কণ্ঠ নূতন আশার পুলকে পবন-চঞ্চল-নদী-তরঙ্গের মতই কম্পিত হইতেছিল। আবারও সে কথার উপর জোর দিয়া বলিতে লাগিল। "ভুল, ভুল, নাস্তিক ? না, আপনি নাস্তিক ন'ন।"

অণিমা চেয়ারের হাতটা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া তারপর উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বলিল,—"আমায় আপনি ক্ষমা করুন, আপনি আমার জন্ত অনেক কষ্ট করেছেন, কিন্তু এমনই আমি অকৃতজ্ঞ যে—এতটুকু প্রতিদান দেবার সাধ্য আমার নেই,—আমি হয়ত এমন কিছুই যুক্তি দেখাতে পারব না

যাতে করে ঠিক মত আমার কথা আপনাকে বোঝাতে পারি। আমায় ক্ষমা করুন।" হঠাৎ আবেগতাড়িত কণ্ঠে এই কথা কয়টা বলিয়াই সে রুদ্ধবাক্ হইয়া গিয়া সহসা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া একেবারে ঘর ছাড়িয়াই চলিয়া গেল। নির্ব্বাক নিস্পন্দ যামিনী বজ্রাহতের মতই স্তব্ধ জীবনহীন ভাবে সেখানেই কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

ছত্রিশ

বরেন্দ্রকৃষ্ণ একদিন যামিনীর সহিত কি একটা স্কুলের কাজে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া একটা নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। এই লোক এত ভদ্র, এত মহৎ, আর সে ইহারই বিরুদ্ধে কি কুৎসিত, কি ঘৃণ্য ঈর্ষা পোষণ করিয়া ইহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছিল। ভূষণের সহিত সাক্ষাৎ হইল না, সে এখানে নাই, একটা জরুরী সাংসারিক কার্য্যে বাড়ী গিয়াছে। মনে মনে স্থির করিল—সে আসিলে, যামিনীর প্রতিকূলতা সে ত্যাগ করিয়াছে—ইহা তাহাকে জানাইবে। আর তাঁর শত্রু নহে, বরং যদি সম্ভব হয়, তবে সে তাঁর বন্ধুত্ব লাভ করিবারই চেষ্টা করিবে।

সেদিন যামিনী যখন সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিল, ঠিক আলোটার সম্মুখে মিলির সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। সে উৎসুক হইয়া তাঁর মুখের দিকে চাহিতেই ব্যাপারটা তার নিজস্ব রূপেই তার কাছে ধরা পড়িয়া গেল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, অমিয়াকে সে আর এ সম্বন্ধে কোন কথাই এ জীবনে কোনদিনও বলিবে না। তাহারাই বুঝিবার ভুলে ইহার এই মনঃকষ্ট ও অপমান ঘটাইয়াছে, এজন্ত নিজেদেরও সে ক্ষমা করিবে না।

ইহার পরদিন সকাল বেলা অণিমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে এ সম্বন্ধে এতটুকু আভাসেও এ বিষয়ের কিছু উল্লেখ করিল না। অণিমা মিলিকে ভর্ৎসনার যথেষ্ট অবসর দিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে নীরব দেখিয়া সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে খানিকটা চাহিয়া রহিল, ভাবটা দেখিয়া বুঝিল, ইহা ঘোর অভিমানাহত হৃদয়ের পূর্ণ হতাশামাত্র, উদারতা ইহাতে কিছুমাত্রও নিহিত নাই। সে নীরবে নতমুখে সেখান হইতে সরিয়া চলিয়া গেল। পৃথিবীতে কোথাও আজ আর তাহার জন্ত এতটুকুমাত্র সহানুভূতি নাই, সবারই চক্ষে সে অমার্জনীয় অপরাধে মস্ত বড় অপরাধিনী।

রাত্রে যামিনী চলিয়া গেলে, সে এ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া উঁহারই পরিত্যক্ত আসনে বসিয়া যখন লক্ষ্যহীন নেত্র-তারকা শূন্য পথে স্থির করিয়াছিল, তখন তো কেহ একটীবার তাহার পানে চাহিয়া দেখে নাই! ঘরের বাহির তখন জ্যোৎস্নার প্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছিল, আকাশের নীলিমা, তীর-তরুদলের শ্যামলতা সমস্ত ঘুচিয়া গিয়া কেবলমাত্র শুভ্রতায় চারিদিক্ ভরিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু চাঁদ ছাদের মাথার উপর উঠিয়া পড়ায় দীপালোকহীন কক্ষ ঈষৎ ছায়ান্ধকার। তখন রাত্রি অধিক হইয়া গিয়াছে। প্রতিবাসীদের গৃহে গৃহে কর্ম্ম-শ্রান্তি দিবাচর প্রাণীর সহিত নিজেদের ক্লান্ত শরীর মন বিশ্রাম শয্যায় এলাইয়া দিয়াছে। পাশের দিকের ফুলবাগানে বসন্তের নিকুঞ্জে উৎসবের সহস্র বাতি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বেলফুলের গন্ধে চারিদিক ভরিয়া আছে। গঙ্গাতীরে আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের মত বালি ও ভাঙ্গা কাচের টুকরা জ্যোৎস্না-লোকে জল জল করিতেছে। আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে উৎসবের গীতধ্বনি অব্যক্ত স্বরে বাজিয়া উঠিয়াছিল। বিশ্বযন্ত্রের কোনও অদৃশ্য যন্ত্রী তাঁহার অজ্ঞাত দেউলে বসিয়া সপ্তস্বরার সুরসপ্তকের উপর অঙ্গুলীচালনা করিয়া সেই আনন্দরাগিণীর গানে সুর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন

কিনা তা' কে' জানে! একান্ত নিভৃতে নীরবে লোকচক্ষুর নিতান্ত অগোচরে কোথায় বা সেই অদৃষ্ট মহামন্দির? আর কোথায়ই বা তার মধ্যের সেই চির-অপরিচিত দেবতা,—প্রতিদিন যাঁর আরতির বাদ্য দ্যুলোক ভূলোক ব্যাপিয়া চির রাত্রি-দিন ধ্বনিত হইতেছে, অর্ঘ্যডালি সন্ধ্যায় প্রভাতে সজ্জিত হইতেছে? যদি আজ তাঁহাকেও সে আপন বলিয়া একান্তভাবে নিজের কাছে, অত্যন্ত কাছে পাইত! সে স্পন্দিত বক্ষে সবলে দুই করতল চাপিয়া ধরিল, আশাহীন আর্ত্তভাবে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তার এ অবস্থা যে কাহাকেও বুঝাইবার নয়,—কি অপ্রতিবিধেয়, অভিশপ্ত এ জীবন!

একদিন পরে কোন রকম ভূমিকা না করিয়া সৌদামিনী বলিলেন,—"বাবা তবে আর মিথ্যে দেরি হচ্চে কেন? বিয়ের দিন একটা ঠিক ক'রে ফেলা যাক্ না।"

যামিনী অকস্মাৎ চমকিয়া একান্ত বিবর্ণ হইয়া গিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"না, না, না, ওকথা বলো না।"

সৌদামিনী আকাশ হইতে পড়িলেন,—"ওমা সে কি রে! তোর কথা শুনে অবাক্ হতে হয়! এ আবার কি নতুন কথা বল্‌ছিস?"

যামিনী হঠাৎ কি ভাবিয়া লইয়া দাঁড়াইল, বলিল—"তোমাকে সবকথা বুঝিয়ে বলাই ভাল। এ হতে পারবে না, পিসিমা! তুমি আর এ সম্বন্ধে কোন কথাই যেন ব'ল না। এ বিয়ে হবে না ভাল করে জেনে রেখো।"

সৌদামিনীর বিস্ময় ক্রমেই সীমা অতিক্রম করিতেছিল, উৎকণ্ঠাসহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন হবে না, কি হয়েছে কি?"

যামিনী নতনেত্রে কহিল,—"আমরা যে ব্রাহ্ম।

সৌদামিনী এবার চটিয়া উঠিয়া মুখ সিঁটকাইয়া বলিলেন,—"আমরা ব্রাহ্ম আর উনিই কোন্ ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্যির মেয়ে শুনি, ওর দাদা যখন

মত দিয়েছে, তখন ও-সব কথা তুল্‌বো কেন? বিয়ে হবে না বল্লেই অমনি হবে না।"

যামিনীর মুখে দুঃখের কৌতুকের সহিত হাসি ফুটিয়া উঠিল, —"কি কর্‌বে!"

"তা' সত্য! করবার উপায় কি আছে!" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"তবে না হয় ওঁদের মতেই বিয়েটা হয়ে যাক্ না, বাবা!"

বৈদ্যুতিক যন্ত্রের কোন খানে হাত পড়িলে যেমন হয়, ঠিক সেই রকমই সর্ব্বাঙ্গ চমকিয়া উঠিয়া তাঁহার তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর লোভ-চঞ্চল দৃষ্টির উপর নিজের ভর্ৎসনাপূর্ণ গম্ভীর সংকল্পসুন্দর দৃষ্টি স্থির করিয়া দৃঢ়স্বরে উত্তর কহিল,—"না।" তাহার কণ্ঠে অবিচলিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বজ্র নিশ্চল রহিয়াছিল।

যে গাঁথনিটা গোড়া হইতেই ঝড় ঝাপ্‌টা সহিয়া সহিয়া দৃঢ় রূপে গাঁথা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ভূমিকম্পের কম্পনও সহিতে সক্ষম। জীবনের প্রথম হইতেই জীবন-যাত্রার সহজ পথের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে বাধ্য হওয়ার জন্য এই পথের সঙ্গে সে এমনই সহজ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, এই পথের চেয়েও অন্য কোন সঙ্কটপূর্ণ যাত্রায় আদিষ্ট হইলেও তার মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া থাকিবার প্রয়োজন হয় না। বরং এই দুঃসাধ্য সাধনেরও যে একটা আনন্দ আছে, ইহার মধ্য হইতে সে সেইটাকেই গ্রহণ করে, আদায় করিয়া লইতে চায়। নিজের স্বত্ব বজায় রাখিবার জন্য লোকে যেখানে ঢাল তুলিয়া ধরে, সে সেখানে বুক পাতিয়া দিয়া বর্শার আঘাত গ্রহণ করাকেই পৌরুষ মনে না করিয়া পারে না। নিজের বুকের শোণিতাক্ত ক্ষত জ্বালার কথা ভাবিয়াও দেখে না।

অণিমার ব্যবহার অন্তরের মধ্যে অনির্ব্বাণ অগ্নিজ্বালার মত জ্বলিতে ও কাঁটার মত বিঁধিতে থাকিলেও তাহার ভিতরকার তপস্বী মনুষ্যত্ব, তাহার

ত্যাগের দিকটাকে—নিবৃত্তি সুখটাকেই সজাগ করিয়া তুলিল। সে তাহার মধ্যেও একটা যন্ত্রণার পুলক অনুভব করিতেছিল। তপস্তার কঠোরতার জন্যই নিজের চারিদিকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করাতে যোগীর যে সুখ, নিয়মচারিণী, ব্রহ্মচর্য্যশীলা হিন্দু বিধবা তাঁহার পরলোকগত প্রিয়তমের স্মৃতির সম্মানে নিদাঘের অগ্নিতপ্ত রজনীতে একাদশীর দুরন্ত তৃষ্ণাকে যেমন পরমসুখের মত অনায়াসে সহ্য করিয়া যান, সেও সেই রকমই একটা দুর্জ্জয় আধিদৈবিক শক্তি দিয়া নিজের আশাহত চিত্তের তীব্র যন্ত্রণার ক্রন্দনকে বলিদানের বাদ্য বাজাইয়া ঢাকা দিতে চাহিতেছিল। সে আপনাকে আপনি কহিল,—কেন দুঃখ করিব? মঙ্গলময়ী জননী আমার সহিত তাহার জীবনের বন্ধনকে চিরশিথিল রাখিয়াছেন, সেই বিশ্ববিধাত্রীর বিচারের দণ্ডে আপীল করিবার জায়গা নাই। তাহা আইনের ধারা নহে, যোগ্যতার পুরস্কার। আমি যে জিনিষের যোগ্য নই, লোভ করিয়াই কি তাহা লাভ করিতে পাইব?

পঁয়তাল্লিশ

বিলাত হইতে ভ্রাতার টেলিগ্রাম পাইয়া অণিমা জানিল, মিস্ ক্লারটনের সহিত মিঃ দত্তর শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। 'অক্টেভকে পাইয়া সে নিজে যে পরিমাণে সুখী হইয়াছে তাহার প্রাণাধিকা ভগিনীরও সেই পরিমাণে সুখের ইচ্ছায় এ তাহার উৎফুল্ল চিত্তোৎসারিত একান্তই আশীর্ব্বাদ।' মিঃ রায়কেও সংবাদটা দিবার অনুরোধ ছিল।

এই আকস্মিক ঘটনটা অণিমার উপরে বাজ পড়ার মত খসিয়া পড়িয়া তাহাকে একেবারেই যেন দগ্ধ করিয়া দিল। মিহির,—তার

দাদা, এ জগতের একক সহায়, একমাত্র প্রাণাধিক ভাই তার,—সে তার সঙ্গে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করিল! জীবনের প্রত্যেক পদে বিপদে যে একমাত্র তাহার সহিত সকল সম্বন্ধে সংবদ্ধ, প্রত্যেক সুখ দুঃখ আশা নিরাশার অংশে অংশী, সে-ই তার পৃথিবীর একমাত্র সুহৃদ, একটি মাত্র আপনার লোক, সেও এমন করিয়াই ঘোরতর নিষ্ঠুরতার সহিত তাহার নিকট হইতে চিরবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল! এত বড় অবিশ্বাসী সে, এত বড় কঠিন চিত্ত তার, এ তো স্বপ্নেও সে কল্পনা করিতে পারে নাই!

নির্বেদে ও ধিক্কারে সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া সে মিহিরের টেলিগ্রামখানার খণ্ডিত অংশ জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল। তারপর শ্রান্ত বোধ করিয়া আর্ত্তভাবে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া একখানা আসনের উপরে লুটাইয়া পড়িল।

এতদূরে চলিয়া গেল? একবার বলিয়াও গেল না? কি নিষ্ঠুর—সে কি নিষ্ঠুর! তারপর,—শুধুই কি তাহার নিকট হইতে গেল? সত্যের নিকটে, নিজের অন্তরের নিকটে, সমাজের নিকটে কি অক্ষমণীয় অপরাধেই সে আজ অপরাধী। চিরকৌমার্য্যের শপথ—কি সে কঠিন শপথ—সে সমুদয়ই কি একখানা বিদেশী মেয়ের সাদা মুখের নিকটে তৃণের মত ভাসিয়া গেল! হায় ধিক্! তার বিবাহ-প্রস্তাবে উঁহার এতখানি আগ্রহ-প্রকাশের অর্থ আজ তাহার নিকট জলের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এইটুকুর জন্যই যেন সে এতদিন প্রত্যাশা করিয়া বসিয়াছিল। অণিমার শপথভঙ্গ কল্পনায় তাই অবিলম্বে ঈপ্সিত কার্য্য সমাধা করিতে দ্বিধা মাত্র করিল না।

যামিনী একদিন রমেন্দ্রের নিমন্ত্রণে আসিয়া অণিমাকে দেখিয়া বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। মনে হইল দুশ্চিকিৎস্য কঠিন ব্যাধি যেমন আকস্মিক জরার সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তেমনই একটা দুরারোগ্য ক্ষতের চিহ্নে তাহার সমস্ত

শরীর চিহ্নিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে সে যথাসম্ভব প্রফুল্লভাবেই সম্বর্দ্ধনা করিতে গেল, কিন্তু যে মুখের গাম্ভীর্য্যও চিরমধুর ছিল, সেখানে যেন আর সচেষ্ট আনন্দ-প্রকাশের আভাসও মানাইতেছিল না। কষ্টকল্পিত হাসিটুকু মুহূর্ত্তে পুঞ্জীভূত গোপন অশ্রুজলের ভারে বাষ্পের মত উবিয়া যাইতে চাহিতেছিল। সুগভীর সহানুভূতিতে যামিনীর সমস্ত হৃদয় মন দ্রবীভূত হইয়া উঠিতেছিল। অন্তরের অন্তর হইতে যেন সান্ত্বনা ও ক্ষমা ক্ষরিত হইতে চাহিতেছিল, কিন্তু কোন অধিকারই যে তার নাই। সে কে? সে তার জন্য কি করিতে পারে?

তথাপি বিদায়-বেলায় করুণা-ব্যাকুল-কণ্ঠে সে অণিমাকে কহিল, —"শুনলুম আপনি নিজের শরীরের উপর একটুও যত্ন নিচ্ছেন না। এত অধীর কেন হলেন! মনকে স্থির করুন।"

অণিমাকে নীরব দেখিয়া যামিনী এ সম্বন্ধে আর কিছু না বলিয়া কথা ফিরাইয়া লইয়া বলিল,—"যা' হয়ে গেছে তাকেই তাঁর দান ব'লে মনে করতে পারলে, এ থেকেই আনন্দ লাভ করা যায়। তিনি যা কিছু করেন সবই মঙ্গলের জন্য করেন। নিজের প্রতি অবহেলা করবেন না। এখনও আপনার অনেক কাজ বাকি রয়েছে। জীবনকে নিজের কেন্দ্রে স্থির রেখে গন্তব্য-পথে যেমন চলছিলেন সোজা চলুন। মিহির না আসে, আপনার সাহায্য সে না করে,—আমরা তো আছি,—আমরা যেটুকু পারব, আপনার আরব্ধ কাজে সাহায্য করতে তো কখনই কুণ্ঠিত হব না। এত কাতর কেন হচ্ছেন?"

যামিনীর সহানুভূতিপূর্ণ-হৃদয়-ভারাক্রান্ত গম্ভীর স্বর তার দুই কর্ণে অভয় শঙ্খের মত ফিরিয়া ফিরিয়া বাজিয়া উঠিল। অশরণের শরণের মত সকল দুঃখের দিনে সে আছে—সে যে তার পাশে পাশেই আছে। তার চারিপাশকে সকল দুর্দ্দিনেই রক্ষা-প্রহরণ দিয়া ঘেরিয়া রাখিতে কখনই

সে তো কুণ্ঠিত হয় নাই, আজও না—এমন উচ্চ হৃদয় চরম নিষ্ঠুরতার বাণে বিঁধিবার পর কতটুকু সময় ইহার প্রতিফল পাইতে বিলম্ব ঘটিতে পারে? এ কি কর্মফল? কে বলে কর্মফল নাই। প্রকৃতির বিধিবদ্ধ বিধান অন্ততঃ একটা আছে তো। এই তো তার জীবনেই তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া গেল!

দুই চোখের তারা ভূমিলগ্ন করিয়া সে মৃদুকণ্ঠে কহিল,—"আমারও আর কেউ নেই, এই কথা মনে রাখবেন, আর আমার কিছুই বলবার নেই।"

আহতচিত্তে যামিনী ফিরিয়া গেল। সান্ত্বনা, শান্তি সবই তো তাকে যথাসাধ্য সে দিতে পারিত। সে নিজেই তো তা তার কাছ হইতে লইল না। এখনও না,—বুঝি তার সন্দেহই সত্য!

যামিনী চলিয়া গেলে অণিমা উপরে উঠিয়া নিজের শয়ন-গৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। 'আমরা তো আছি।'—'যেটুকু পারব সাহায্য করতে তো কখনই কুণ্ঠিত হব না।' যামিনীর এই কথা কয়টা তার সমস্ত শরীরের রক্তের তালে তালে বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল, সেই বাণী যেন কোন অদৃশ্যলোকের অজ্ঞাত দেবতার করুণার বাণী,—যাহাকে সে কোনদিনও স্মরণ করা দূরে থাকুক,—বিশ্বাসও করে নাই!

যামিনী চলিয়া যাইবার প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকা পরে কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণের প্রকাণ্ড জুড়ী আসিয়া দত্ত সাহেবের গাড়ি-বারান্দার ভিতর প্রবেশ করিল। রমেন্দ্র ও মৃণালিনী বাড়ি নাই, কাজেই কুমারের আগমন-সংবাদ পাইয়া অণিমাকেই সেই গভীরভারাক্রান্ত মন লইয়া নামিয়া আসিতে হইল।

বরেন্দ্র বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে নমস্কার করিতে গিয়াই ভূতাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। যেন কোন ডাকিনী তার উচাটন মন্ত্র দিয়া মানুষটাকে জীবন্ত চুষিয়া খাইয়াছে! অণিমা তাঁহার বিস্ময় বুঝিয়া এমন করিয়া আসন গ্রহণ করিল, যাহাতে পর্দ্দার ছায়া তার মুখখানাকে কতকটা অন্ধকার করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়।

কথা সাব্যস্তই হইল। আতুরালয়টি এবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সুদৃঢ় সম্ভাবনায় পৌঁছিয়াছে।

আগামী মাসে ছোট লাট আসিলে তাঁহার সম্মুখে কাজটি আরম্ভ করা হইবে। অণিমা তাঁর বদান্যতার প্রশংসা করিয়া বলিল,—"আপনাকে বন্ধু পেয়ে আমরা কৃতার্থ হয়েছি।" সম্প্রতি কুমার আতুরালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

বরেন্দ্রের মুখের রংটা মুহূর্তে ঘোর রক্তবর্ণ দেখাইল। চোখ মুখ উত্তপ্ত করিয়া সে কোন প্রকারে বলিয়া ফেলিল,—"অমন কথা বলবেন না, আপনার সাক্ষাৎ আমি যে কি শুভক্ষণে পেয়েছিলেম, তা আমিই শুধু জানি আর আমার ঈশ্বরই জানেন। আমার এই খসে-পড়া-উল্কার মত পাপ-পঙ্কিল জীবনের গতি কি মহান বারিধির সন্দর্শনে কত বড় মঙ্গলের পথে ফিরে গেছে, তার যদি কিছুও আপনি বুঝতেন!"

অণিমা বুঝিল, ব্যাধি এখনও তার মধ্য হইতে ঘুচিয়া যায় নাই। বরেন্দ্রকৃষ্ণও আজ স্থিরসংকল্প হইয়া আসিয়াছিল,—হয় হার, নয় জিৎ,—এ কটা পুরা সিদ্ধান্ত না করিয়া সে আজ আর কিছুতেই পিছু ফিরিবে না। বলিল,—"মিঃ দত্ত তো ইংলণ্ডেই আপাততঃ থাকবেন শুনলুম। মিঃ বসুরাও এখানে আর বেশীদিন থাকছেন না, আপনি কি তারপর একাই থাকবেন? কিছু মনে করবেন না,—'বন্ধু' বলে উল্লেখ করলেন তাই একথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস করছি।" অণিমার সহিত কথা কহিতে গেলেই তাহার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতে চায়, বুকের ভিতর একটা অস্বাভাবিক তোলপাড় চলে, এ ব্যাধি তার সত্যই সারে নাই। কিন্তু আজ সে দৃঢ়সংকল্প,—তাই সমস্ত বিদ্রোহীর বিরুদ্ধেই ঘোরতর শক্তি সংগ্রহ করিয়া প্রচণ্ড বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল।

অণিমা মৃদু কণ্ঠে কহিল,—"তাই থাকবো।" এই বলিয়া সে

টেবিলের কাপড়টা করতল দিয়া সমান করিতে লাগিল। বরেন্দ্র কহিল,—"আমার একটি ভিক্ষা আছে।"—"কি?" "বলুন আজকের মত আমার একটুখানি সহ্য করবেন? আমি এ সম্বন্ধে আপনার অভিভাবকেরও অনুমতি নিয়ে এসেছি।"—এই কথাটা শুনিয়াই অণিমা ঈষৎ চমকিয়া সবেগে মুখ তুলিয়া, বিস্ময়মথিত স্বরে বলিল,—"কার অনুমতি নিয়ে এসেছেন বল্লেন?" বরেন্দ্রও সবিস্ময়ে বলিল,—"যামিনীবাবুর।—তিনি মহৎ,—তিনি সজ্জন, তাঁকে পূর্ব্বে আমি চিনিনি, এখন আমি তাঁর নিতান্ত অনুগত শিষ্য, বিশ্বাসী ছোট ভাই।—তিনি আমার জন্য অনেক করবেন বলেছেন। আর সব চেয়ে আমার জীবনের যা একমাত্র ঈপ্সিত ও একমাত্র তপস্যা,—তাতে তিনি আমায় দয়া করেছেন, বলেছেন,—আপনার অসম্মতি না থাকলে তাঁরও কিছুমাত্র আপত্তি নাই।"

কৌতূহলহীন ধীরস্বরে অণিমা জিজ্ঞাসা করিল,—"কি,—সে?" বরেন্দ্রকৃষ্ণ একটুখানি ইতস্ততঃ করিল, তারপর সকরুণ দৃষ্টি তাহার স্থির নেত্রের উপরে দীনভাবে স্থাপন করিয়া কুণ্ঠিত স্বরে কহিল,—"আপনার দয়া ভিক্ষা করবার অধিকার! এখন আপনার করুণার উপরেই আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আমায় আপনি দয়া করুন, আমায় বিদায় করে দেবেন না।"

শেষের কথাটা কানে না তুলিয়াই অণিমা বেগের সহিত কহিয়া উঠিল, "সে 'অধিকার' দেবার অধিকার তাঁর আছে নাকি?" তার গলার স্বাভাবিক শান্তস্বরের পরিবর্ত্তে দম্ভকারী বজ্রস্বর ধ্বনিত হইল।

সেই অস্বাভাবিক রূঢ় স্বরের প্রশ্ন শুনিয়া বরেন্দ্রকৃষ্ণের মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। কিন্তু তথাপি সে এটুকুতেই হাল ছাড়িল না, যথাসম্ভব আত্মদমন পূর্ব্বক উত্তর দিল,—"তিনি আপনার অভিভাবক। আপনার পিতা তাঁর উপর আপনার সমস্ত ভারই তো দিয়ে গেছেন।"

"তিনি নিজে বলেছেন, তিনি আমার অভিভাবক? তাঁর আমার সম্বন্ধে সকল বিষয়েরই ব্যবস্থা দেবার আইনত অধিকার আছে?"

এই কূটপ্রশ্নে এবার কুমারের হাত-পা হিম হইয়া আসিল, অস্ফুটকণ্ঠে সে কহিল—"না, তা' তিনি অবশ্য বলেন নি বরং তাঁর এসম্বন্ধে কোন অধিকারই নেই—এই কথাই তিনি বলেছিলেন। তবে তিনি এখন আমাকে আর অযোগ্য মনে করেন না এবং তাঁর এ বিষয়ে নিজের কোন আপত্তি নেই, এইটুকু ব'লেই তিনি আমাকে যথেষ্ট দয়া দেখিয়েছেন। এখন আপনার কৃপার উপরেই সমস্ত নির্ভর করছে।"

নতমুখে অণিমা হাতে হাতে নিবদ্ধ করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। ইহা দেখিয়া কুমার বরেন্দ্র আশান্বিতভাবে কহিতে লাগিল—"আমার অন্তর বাহির সবটা আমি নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলেছি, আপনার একটা সামান্ত ইঙ্গিত মাত্রে এ জীবনের গতি আপনার প্রদর্শিত পথ ধ'রে ছুটে চল্‌বে। আপনি যদি আদেশ করেন, দেশের কাজে আমার যথাসর্ব্বস্ব এই মুহূর্ত্তেই আমি দান ক'রে দিয়ে নিঃস্ব ভিখারীর বেশে আপনার কাছে এসে দাঁড়াব। গরীব তো আপনার দয়াই, ঐশ্বর্য্য আমি চাই না, সুখ সম্পদ কিছুই না, দারিদ্র্যে যদি স্বর্গ পাই, তবে এই ব্যর্থ ঐশ্বর্য্যে আমার লাভ কি? আমি শুধু মনের শান্তি চাই। বলুন, আমার জীবনের নিয়ন্ত্রীর পদ আপনি দয়া করে গ্রহণ করবেন?"

অণিমা মুখ না তুলিয়াই অত্যন্ত মৃদুস্বরে উত্তর করিল,—"করবো।"

আকস্মিক অপ্রত্যাশিত একটা ভয়ানক বিপৎপাতে মানুষকে যেমন স্তম্ভিত করিয়া ফেলে, তেমনই এই আশাতীত আনন্দের উচ্ছ্বাসটাও কুমার বাহাদুরকে কিছুক্ষণের জন্ত নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ করিয়া ফেলিয়াছিল। মুহূর্ত্ত কয়েক পরে সেই অতর্কিত আনন্দের নিশ্চলতা দূর হইয়া গিয়া পূর্ণ সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে তড়িৎস্পৃষ্টের মত চৌকি হইতে উঠিয়া দুই পদ অগ্রসর

হইয়া আনন্দ-নিরুদ্ধ কণ্ঠে সে কহিয়া উঠিল—"একি সত্য! না আমার শুন্‌তে ভুল হয়েছে? তবে এসো অণিমা! জীবনের চিরারাধ্যা দেবী আমার! এ জীবনকে সফলতা দাও, সার্থক কর।"

এই কথা বলা হইয়া যাইতেই অণিমাও আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন তার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যপূর্ণ আরক্ত কপোলে রক্তের একটি বিন্দুও বোধহয় অবশিষ্ট ছিল না, কিন্তু সমস্ত মুখ ভরিয়া এমন একটি দিব্য দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছিল, যাহাতে তাহাকে সত্য সত্যই দেবীর মতই শ্রীমণ্ডিতা করিয়া তুলিয়াছিল। বিবর্ণ অধরপ্রান্তে মৃদু করুণার স্নিগ্ধ হাসির সহিত স্নেহপূর্ণকণ্ঠে সে কহিল,—"এসো ভাই, ভ্রাতৃহীনার ভাই হয়ে তার শূন্য জীবন পূর্ণ করবে এস। আজ থেকে তুমি আমার সহোদরতুল্য ভাই হলে, আমার দাদার জায়গায় তুমি এসে দাঁড়াও। আমাদের দুজনেরই আর আপন জন বলে কেউ নেই, দেশই আমাদের মা, তাঁকেই আমরা ভালবাস্‌ব, সেবা করব, তাঁর লুপ্ত সৌভাগ্য ফিরিয়ে আনবার পথের কাঁকরটুকুও যদি সরিয়ে দিতে পারি, সেই চেষ্টাই প্রাণ দিয়ে করবো। এই আমাদের স্বার্থ, এইটুকুই আমাদের সুখ, আর কিছুই আমাদের জন্যে না। ক্ষুদ্র-স্বার্থ, তুচ্ছ-মোহ—এ সব সামান্য বিষয়কে ধুয়ে মুছে এসো নির্মলপ্রাণে পবিত্রচিত্তে মার নামে শপথ ক'রে আমরা এই সম্বন্ধ স্বীকার করে নিই, জগতে এতবড় পবিত্র—এত খানি উচ্চ আর যে কোন সম্বন্ধই নেই ভাই! মার গর্ভের ভাই বোন—এ যে অচ্ছেদ্য অতুলনীয় স্নেহ-সম্বন্ধ।"

এক মুহূর্ত্ত, পরক্ষণে কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণের পক্ষাঘাতে অসাড় আড়ষ্টবৎ চিত্ত এবং সেই সঙ্গে দৈহিক বৃত্তিসমূহ স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার শক্তি লাভ করিলে কুমার মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিয়া উঠিল,—"তাই হোক্, তুমি আজ থেকে আমার বোন, আমি তোমার ভাই, মার নামেই এই শপথ কর্‌ছি।"

অণিমার অধরপ্রান্ত সহসা জয়ের আনন্দে সুখের হাসিতে বিকশিত হইয়া উঠিল। একটা সুগভীর শ্বাস টানিয়া লইয়া কুমার একটুখানি পিছু হটিয়া নিজের আসন পুনর্গ্রহণ করিয়া পুনশ্চ কহিল,—"আমি মা জানি না,—অন্য কোন দেবতাকেও জানি না,—একমাত্র তোমাকেই জেনেছি। তুমিই আমার জীবনের ধ্রুবতারা, আমাকে যে পথে চল্‌তে বল্‌বে, তাই আমি চল্‌ব,—তাই আমি কর্‌ব। আমাকে যে দূরে ঠেলে না ফেলে, কাছে—এত কাছে, আপন করে তুমি ডেকে নিলে, এতেই আমার জীবন ধন্য হয়ে গেছে, তোমার অনেক দয়া।"

অণিমা উত্তর দিল না। এত বড় ভক্তেও যদি ভগবানকে না পায়, তবে যে সাধনার কোন মূল্যই থাকে না!

চিত্ত এখনও সম্পূর্ণ বিকল রহিয়াছে। সমস্ত ঘটনাটা যেন থাকিয়া থাকিয়া স্বপ্নের মত, ছায়াবাজির মত শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছিল! কুমার উঠিয়া বিদায় চাহিল, তার উদ্বেলিত হৃদয়ের গভীর সংশয়িত বার্ত্তা কণ্ঠস্বরে সুস্পষ্টরূপেই ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছিল।

বরেন্দ্রকৃষ্ণ চলিয়া গেল। যে পথ দিয়া ঘণ্টাখানেক মাত্র পূর্ব্বেই যামিনী বিদায় লইয়া গিয়াছিল, সেই পথ ধরিয়া গেল—হয়ত তাহারই পদ-চিহ্নের উপর তাহারও গমন-চিহ্ন মুদ্রিত হইয়া রহিল। সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া অণিমা সহসা মুখ ফিরাইয়া লইল। তার চোখ হইতে সহসা ঝর্ ঝর্ করিয়া অজস্র জল, বৃষ্টিজলের মত সহসা উৎসারিত ঝরণার মত ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এতবড় সবল চিত্ত একেবারে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ না হইলে তাহা হইতে অতখানি জলের স্ফূর্ত্তি পারে না।

ছেচল্লিশ

হরিদয়ালের মোকদ্দমা সেসন পার হইয়া নূতন করিয়া হাইকোর্টেও চলিল। উকিল ব্যারিষ্টারের অর্থ্যদানের কিছুমাত্র ত্রুটি না হওয়া সত্ত্বেও সেই পূর্ব 'রায়ের' একটি অক্ষরও বদল হইল না। অন্নন ব্রাদার্স, বার্ড এবং মাদ্রাজের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া চুনা পুঁটি, বারের একটি প্রাণীর নিকট হইতেও প্রায় পাওনার বিল আসিতে বাকি থাকে নাই। বড় বড় মহাল বাঁধা পড়িল, তবুও অর্দ্ধেকের বেশী পাওনা শোধ হইল না। পুত্র কৃষ্ণদয়াল নাগ বাপের মত দুঃসাহস ও দুর্দ্দম-প্রকৃতি লইয়া জন্মাইতে পারে নাই বলিয়া চিরদিনই বাপের অপ্রিয় ছিল। মেজ সর্বদয়াল ঠিক পিতৃ-প্রকৃতি লাভ করিয়াছিল, বরং ক্রমোন্নতির ক্রমানুসারে তার উপর একটুখানি উন্নতিও করিতে পারিয়াছিল। ব্যথিত পিতাকে প্রণাম করিয়া সে তাঁর পদধূলি লইলে, শীর্ণ হস্তে পিতা তার মস্তক স্পর্শ করিয়া অশ্রুরুদ্ধস্বরে আশীর্বাদ করিতে গেলে সে বাধা দিয়া বলিল, "ও সব কি বল্‌ছেন আপনি? বলুন, শিগ্‌গির যেন আপনার শত্রু নিপাত কর্‌তে পারি।"

হরিদয়াল চমকিয়া উঠিলেন, বহুক্ষণ কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু পুত্রের মুখের উপর স্থাপন করিয়া রাখিয়া অবশেষে কহিলেন,—"পার্‌বে ঠিক?"

"পার্‌ব না? না পারি যদি তা' হ'লে নিজের হাতে নিজের গলা কেটে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব।"

পিতা শিহরিয়া পুত্রের হাত ধরিয়া বলিলেন,—"না বাবা না, কাজ নেই—থাক্!" সর্বদয়ালের চোখ দিয়া আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল, দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল,—"কোন রকমেই না। সে

মরবে। স্বয়ং মা কালী এলেও তাকে রক্ষা করতে পারবেন না। তার মরণ পালক উঠেচে যে!" হরিদয়াল পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া মস্তক চুম্বন করিলেন। সাশ্রুনেত্রে কহিলেন,—"তুমিই আমার সুপুত্র! ওরা সব কুলাঙ্গার। যদি ফিরে আসি, এর পুরস্কার তুমি নিশ্চয়ই পাবে,—আর যদি না ফিরি, তবে তোমার পিতৃঋণ শোধ হ'ল। কিন্তু দেখো নিজে কোন বিপদে প'ড় না যেন। নিজেকে বাঁচিয়ে কাজ ক'র,—কিছু টাকা দিয়ে সেই ভূষণচন্দ্রকেই বরং এ কাজে লাগিয়ে দিও। সে খুব টাকা ভালবাসে, টাকা পেলে হেন কর্ম নেই যা সে করতে পারে না। আর একটা কথা,—যার জন্যে এবং যার দ্বারা আমার এই দুর্দ্দশা ঘটল, তারা সবাই-ই যেন একটু একটু জান্‌তে পারে। এই আমার তোমার কাছে অনুরোধ। হয়ত বা শেষ অনুরোধই এ।"

"এ অনুরোধ আপনার অবশ্যই প্রতিপালিত হবে।"

এই মোকদ্দমাটা জিতিবার পর হইতেই মফঃস্বল হইতেও যামিনীর সর্ব্বদা ডাক পড়িতে লাগিল। হাইকোর্টের সঙ্গে তার সম্বন্ধটাও ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতে লাগিল। বন্ধুবান্ধবেরা তাহাকে হাইকোর্টে প্রবেশ করিবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। যামিনী স্থির করিল, ডি-এল পরীক্ষার জন্য একবার বিশেষ করিয়া লাগিবে। এই সঙ্কল্প লইয়া সে আর একবার পুঁথি খুলিয়া বসিল কিন্তু কাজের ভিড় এত বাড়িয়াছে যে, নিশ্চিন্ত হইয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া এখন যেন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। "উকিল বাবু বাড়ী আছেন?" এই শব্দটা ভোর হইতে কাছারির বেলা অবধি এবং কাছারীর ছুটি হইতে না হইতে শয়ন কাল পর্য্যন্ত অবিশ্রামে চলিতে থাকে। বক্তৃতাশ্রান্ত ও কর্ম্মজয়ী হইয়া সে যখন পকেট-ভরা টাকাগুলা আনিয়া নলিনীর কাছে ফেলিয়া দেয় এবং তার কচি মুখখানি আনন্দের আভায় চকচক্ করিয়া উঠিতে দেখে, তখন তার মুগ্ধতার

কথাই মনে পড়িয়া যায়। আজ তার এই সফলতার দিনে যদি সে বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে সেই অসন্তোষময় চিত্ত কি গভীর আনন্দেই না ভরিয়া উঠিত! এত অর্থ, এত নাম অথচ তাহার কাছে এ সবই যেন ব্যর্থ, সবই যেন বৃথা! কিছুতেই তো তার এতটুকু কই স্পৃহা নাই?

সেদিন কাজের তেমন ভিড় ছিল না, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ডাকিল,—"নলিনি!"

নলিনী উত্তর দিল না, রান্নাঘরের ভিতর হইতে সৌদামিনী কহিলেন, —"সে তো এখনও ফিরে আসেনি রে।"

"ফিরিয়া আসে নাই! কোথা হইতে ফিরিবে?"—যামিনী বিস্মিত হইয়া কর্ম্মরতা পিসিমার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল। সৌদামিনীও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"কেন, তুই জানিস নে,—সে তো রোজই ইন্দ্রনাথবাবুর ওখানে সন্ধ্যে অবধি থাকে। তার মেয়েরা ওকে বেশ যত্ন ক'রে পড়ান টড়ান, তাই আমিও বারণ করিনে যেতে। বড় ভাল মেয়ে ওরা।"

শুনিয়া যামিনী একটুও অসন্তুষ্ট হইল না। বরং কৃতজ্ঞতার সহিতই একটু আশ্চর্য্যানুভবও করিল। সে যখন আপন কর্ত্তব্যে উদাসীন হইয়া রহিয়াছিল, কে সেই অদৃশ্য পরমাত্মীয় তার যিনি তাঁর মঙ্গল হস্ত দিয়া তখনও তার সেই ভ্রষ্ট-কর্ত্তব্যের ভার অন্য একজনের দ্বারায় সুসম্পন্ন করাইয়া তুলিতেছিলেন! একটু পরেই একরাশ চন্দ্রমল্লিকা ফুল একখানি ডালায় ভরিয়া লইয়া একরাশি ফুটন্ত ফুলেরই মত তার সেই ছোট্ট মেয়েটি হাসিমুখে বাড়ী ঢুকিল। যামিনী উঠিয়া গিয়া তাহাকে কোলে লইয়া স্নেহ চুম্বনে ভরাইয়া দিল। মেয়ে সদ্যপ্রাপ্ত সুন্দর ফুলগুলি লইয়া একটু বিব্রত ছিল, জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, আজ তোমার মক্কেল নেই বুঝি?" "না, রে, না।—রোজই কি মক্কেল থাকবে? আয় আজ তোর সঙ্গে গল্প করি।"

টেবিলের উপর মুখ রাখিয়া উপরে একটা আসনে বসিলে যামিনী তাহার দিকে কৌতুকভরে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"সমস্ত দিন ধরে ওখানে কি করিস? কার সঙ্গে খেলা করিস?" ঘোর অবজ্ঞার সহিত নলিনী হাসিয়া উঠিল,—হাসিতে হাসিতে বলিল, "ঈস্!—খেলা করি বই কি! আমি সেখানে জ্যোৎস্না-মাসিমার কাছে পড়ছি না!" কথাটার গুরুত্বে যামিনী যেন ভয় পাইয়া গেল,—এমন কৃত্রিম মুখভাব করিল, "তাই নাকি? তা' তো আমি জানতুম না। কি পড়ছিস বল দেখি? কি পড়া হলো?"

নলিনীর মুখখানা খুব গম্ভীর হইয়া উঠিল,—"পড়ছি, এই টুকটুকে বই, সেই যাতে আছে, 'মহাকায় মহিষ ধায় মানা নাহি মানে,—নাকে তার কালি বেঁধে দুইজনে টানে'।" যামিনী হাসিয়া ফেলিল,—"অ্যাঁ দু'জনের টানেও সে কালি ছেঁড়ে না? কি শক্ত কালি রে!" "নাঃ ছেঁড়ে না-ই তো! আচ্ছা আবার আরও সব কি শিখেছি চুপ করে শোন না আগে।—কাল থেকে 'এ' 'বি' 'সি' 'ডি'ও শিখতে আরম্ভ করেচি।—শুন্‌বে, এরই মধ্যে ওয়াই জেড্‌ পর্য্যন্ত সব অক্ষরগুলো মুখস্ত বলতে পারি। আচ্ছা, আবার একটা পদ্যও শিখেছি,—শুন্‌বে? আচ্ছা শোন,—'ফুটিয়াছে সরোবরে কমলনিকর, ধরিয়াছে কি আশ্চর্য্য শোভা মনোহর।' কমল মানে কি জান? বল দেখিন্‌? বলতে পারলে না তো? কমল মানে—পদ্মফুল। সেই যে ফুলের ভেতর মুড়ি থাকে, সেই পদ্মফুলকে ভাল কথায় কমল বলে।" যামিনী সকৌতুকে হাসিল। তারপর ক্রমে ক্রমে নলিনীর আরও অনেকখানি বিদ্যার পরিচয় হইয়া গেল। সে একশত [illegible] পর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছে। প্রশ্ন করিয়া জানিল, তাহার শিক্ষয়িত্রী জ্যোৎস্নাই। সে-ই তাহাকে চুল আঁচড়াইয়া দিয়া গা হাত পরিষ্কার করিয়া দেয়, আহার করায়, প্রার্থনার গান শেখায়। গল্পচ্ছলে অনেক নীতি উপদেশ, ইতিহাস ও ভূ-বৃত্তান্তও শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছে। জ্যোৎস্নার সম্বন্ধে কি একটা

কথা মনে করিতে যাইতেই একখানা [illegible] মুখের ছবি ও [illegible] হাতের উপরে একটা কম্পিত জোৎস্নায় এইটুকুই তার মনে রহিল। এত সামান্য পরিচয়ে পরিচিত কোন একজন লোক তার এতখানি হিত কার্য্য সাধন করিতেছে, ইহা মনে করিতেও যেন কেমন একটা বিস্ময়পূর্ণ কৌতূহল স্বতঃই মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল এবং একটা কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে সেই অপরিচিতা নিষ্কাম উপকারিণীর প্রতি স্বভাবতঃই প্রধাবিত হইয়া উঠিতে হইল। সেই রাত্রের কথোপকথন হইতে যামিনীর মনে জ্যোৎস্না সম্বন্ধে একটা নূতন কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছে, তাহা ক্ষুদ্র নলিনীও বুঝিতে পারিয়াছিল। পরদিনও সে সুযোগ খুঁজিয়া এক সময় পিতাকে ধরিয়া তাহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলিল,—"আজ আমি একটা সমস্কৃত শ্লোক শিখেচি, বল্‌চি শোন, ভাল করে মন দিয়ে শোন—'পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতা হি পরমন্তপঃ, পিতরি পিতিমাপন্নে পিয়ন্তে সব্বদেবতা।' এটা তোমার পূজো, জানো বাবা! তোমার স্তব এটা হচ্চে।"

যামিনী স্নেহের আবেগে তার ক্ষুদ্র ললাটে প্রগাঢ় চুম্বন করিয়া বলিল, "কে শেখালে এ স্তব তোকে? কে ব'লে দিলে এ আমার পূজো?"

শিশু উত্তর করিল,—"কেন জ্যোৎস্না-মাসিমাই তো বল্লেন, কি বল্লেন জানো বাবা! বল্লেন—রোজ বিছানা থেকে উঠে এইটি ব'লে তোমাকে নমস্কার করতে—আর বল্লেন, অনেক তপস্যা ক'রে আমি তোমাকে বাবা পেয়েছি, আমার খুব ভাল হওয়া উচিত। 'উচিত' কাকে বলে বাবা? তপস্যা কি রকম ক'রে করে? তপস্যা তো আমি কক্ষনো করিনি।"

যামিনীর বিস্ময় আরও একটু বর্দ্ধিত হইল, তার উপরে তাহার হঠাৎ এতটা ভক্তি হইবার কোন কারণ তো দেখা যায় না। প্রকাশ্যে 'উচিত' ও 'তপস্যা'র সম্বন্ধে মেয়েকে যথাসাধ্য মোটামুটি বুঝাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার সেই মাসিমা তোমায় বড্ড যত্ন করেন, না?"

"খুব খুব,—তোমাকেও তিনি খুব যত্ন করেন তো।"

যামিনী হাসিয়া বলিল,—"আমাকে? আমি তো কখনো তা' দেখিনি।"

নলিনী সবেগে ঘাড় নাড়িয়া ত্বরিতস্বরে কহিয়া উঠিল,—"উঁহু সে তুমি দেখতে পাবে কি রকম ক'রে? তিনি যে আমাকে তোমার কথা সব জিজ্ঞেস্ করেন। আমি একদিন তোমার সেই ছেঁড়া ছবিখানা নিয়ে গেছলুম, জ্যোৎস্না-মাসিমা সেখানা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে বাক্সে তুলে রাখলেন। খুব তলায় কাপড়ের সব নীচে রেখে দিলেন। আবার আর একদিন সেখানা বা'র ক'রে বসে বসে দেখছিলেন, আমি যেই গিয়ে প'ড়ে বলেছি,—'হ্যাঁ জ্যোৎস্না-মাসিমা! তুমি আমার বাবার ছবিটা আমায় ফিরিয়ে দিলে না তো।' অমনই শুধু শুধু তিনি এমন ভয় পেয়ে আমার মুখ চেপে ধ'রে ব'লে উঠলেন,—'চুপ কর লক্ষ্মী মেয়ে, তোমায় একটা মজার জিনিস দিচ্ছি, তুমি চুপ কর আর কাউকে কিছু ব'ল না।' খুব মজা হ'য়ে গেছলো কিন্তু না বাবা?" এই বলিয়া সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার পিতা হাসিল না বরং যামিনীর মুখে এতক্ষণ যেটুকু হাস্যভাব ছিল, তাহা তার এই বর্ণনাটার সঙ্গেই মিলাইয়া গেল। এ কি? শিশুর অনভিজ্ঞ চিত্ত তো নূতন সৃষ্টি করিতে শেখে নাই। যামিনীর মুখের ভাব ক্রমেই কঠিনতর হইয়া আসিতে লাগিল। একটা সম্ভাবনা, না না, সে পাগল নাকি? মেয়েটি তাকে বোধ করি কি রকম একটুখানি শ্রদ্ধা করিয়া ফেলিয়াছে, এছাড়া আর কি হইতে পারে?—না সে সব কিছু নয়, মেয়েটি বরাবরই বড্ড বেশী লাজুক। তাই অমন করিয়াছে বুঝি?...যা হোক আকর্ষণ প্রত্যাকর্ষণ না করিয়া ছাড়ে না। যামিনী স্থির করিল সে নিজে গিয়া একদিন তার মেয়ের প্রতি যত্ন লওয়ার জন্য উহার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আসিবে, নহিলে ভাল দেখায় না।

কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণ হঠাৎ দেশ ছাড়িয়া কোথায় যে চলিয়া গিয়াছিল, সে কথা কেহই জানিত না। যাইবার কারণও একজন ভিন্ন অন্যের নিকট সুগোচর ছিল না। কেবল যামিনীর মনে একটা অনুমানের সংশয় মধ্যে মধ্যে জাগিয়া উঠিত।

শেষ বর্ষার একটা ধূলিধৌত নির্ম্মল প্রভাতে পাপিয়ার কণ্ঠস্বর যখন সপ্তম ছাড়াইয়াও অষ্টমে চড়িয়া উঠিয়াছে, এমন সময় বৃন্তচ্যুত শুভ্র শেফালিকাগুলিকে পদদলিত করিয়া যামিনীর ক্ষুদ্র উদ্যান-পথে কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণ সহসা দেখা দিল। যামিনী তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিল না। বরেন্দ্রকৃষ্ণ বলিল,—সে তার আশৈশব হইতে প্রতিপালক গার্জেন টিউটারের সঙ্গে দেখা করিতে এবং তাঁকে তার বিষয়-কর্ম্মাদির ভার গ্রহণ করাইতে দেশে গিয়াছিল। শরীরটাও একটু সারাইবার দরকার ছিল। যামিনী সংশয়পূর্ণ নেত্রে তার শরীরের দিকে চাহিয়া দেখিল, শরীর সারিবার প্রয়োজন তখনকার অপেক্ষা এখন হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধিই পাইয়াছে বলিলেও বলা যায়। মনে হইল, সেই হৃষ্টপুষ্ট নধরকান্তি অনেকখানি ঝরিয়া ঝাড়িয়া কতকটা কর্ম্মঠ লোকের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কোন মন্তব্যই প্রকাশ করিল না।

কুমার আশপাশ কথায় অনেকখানি সময় কাটাইয়া তার পর এক সময় বলিয়া ফেলিল—"আমাকে নিয়ে এইবার আপনাকে একটুখানি খাটতে হচ্চে দাদা! আমাকে মানুষ ক'রে গ'ড়ে তোলবার ভার আপনারই উপর দিলাম।"

যামিনী তৃপ্তমনে কহিল,—"সর্ব্বান্তঃকরণে! কিন্তু আমার চাইতেও যোগ্যজনের হাতও আপনি তো পেতে পারেন!"

কুমার ঈষৎ হাসিল,—"হ্যাঁ, সেও আমি ইতিপূর্ব্বেই পেয়েছি। আর তা' পেয়েছি ব'লেই তো আপনার আশ্রয় নিচ্চি। আপনিই আমাকে

শুধু তার বিশ্বাসের উপরকে করে গড়ে দিতে পারবেন, আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না।"

যামিনীর বক্ষস্থলে হৃৎপিণ্ডটা বারংবার সজোরে আঘাত করিয়া যাইতে লাগিল। ভারাক্রান্তচিত্তে সে অনেকক্ষণ বাক্-রহিত হইয়া নত নেত্রে বসিয়া রহিল। তবে সত্যই সে তাহাকে পাইয়াছে? তাহার তপস্যাই সফল হইয়াছে? তাই হোক। তাহাতেই বা সে দুঃখ করিবে কেন? দুঃখ করিবার বা ইহার সৌভাগ্যে ঈর্ষা করিবার কোন অধিকার তো তার নাই।

কুমার তাহার স্তম্ভিত মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল, তারপর একটু-খানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল,—"প্রথম আমার এ সৌভাগ্যকে সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য ভাববো কিছুতেই এই সমস্যা হ'তে মুক্ত হ'তে পারিনি,—তাই নিজের চিত্তবল পরীক্ষা করবার জন্যে কিছুদিন নিজের কাছে সময় চেয়ে নিয়েছিলুম। এখন আমার চিত্ত স্থির হয়ে গেছে।—আমার মত লোকের পক্ষে এই কি কম পুরস্কার? তিনি আমাকে ভাই ব'লে ডেকেচেন, তার কর্ম্মের সঙ্গী করতে চেয়েছেন, আমার পক্ষে সেই ত ঢের! জীবনটাকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করে তিনিই তো এটা কিনে নিয়েছিলেন, তা ত াঁর যে কোন কাজেই এটা লাগুক না কেন, আমার তাতে আর ক্ষতি কি?—কি বলেন? মিহির যা বুদ্ধির দোষে হারিয়েছে, আমি যদি নিজের চেষ্টায় সেইটেই লাভ করতে পারি, তাই কি সামান্য হ'ল?"

এক মুহূর্ত্তে যামিনীর চিত্ত হইতে সমস্ত সংশয়, সমুদয় ঈর্ষা নিঃশেষে মুছিয়া গেল। সে দুই হাতে বরেন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিল!

অল্প দিনের মধ্যেই অণিমা, যামিনী, রমেন্দ্র সকলেই বরেন্দ্রকুমারের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্যানুভব করিল। সেই বিলাস-লালসা-

অপরিত-অঙ্গ অমিয়ার্যপুরে এমনই সহজ স্বচ্ছন্দতার সহিত নিজের বেচ্ছা-ব্রতের প্রত্যেক খুঁটিনাটিটি পর্য্যন্ত পালন করিয়া যাইতে লাগিল, নিজেকে সামান্য স্বচ্ছন্দতাটুকু হইতেও বিনির্মুক্ত করিয়া, পূর্ব্বের শিক্ষা যে তার কতখানি ছিল তাহা দেখাইয়া দিল। বিদেশী গন্ধ বর্জ্জিত নিরাড়ম্বর সাজে সাজিয়া পায়ে হাঁটিয়া প্রথম যেদিন অনাথাশ্রমের ব্যবস্থা-পত্র লইয়া অণিমাকে দেখাইতে আসিয়াছিল,—সেই মুহূর্ত্তেই নিজের আসন ছাড়িয়া সে উঠিয়া আসিয়া তার হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—"এসো দাদা, আমি যে তোমারই প্রতীক্ষা করছিলুম!"

কাজকর্ম্মের ভিড়ে যামিনীর আর ইন্দ্রনাথবাবুর বাড়ী যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। যেদিন একটু অবসর পায় অনাথাশ্রমের জন্ম সেদিন কতকটা না খাটিলেও চলে না,—কাজেই সেই পূর্ব্বকল্পিত মতলবটা আর কার্য্যে পরিণত হইবার অবসর পাইল না, ক্রমে ক্রমে বরং সেটা মন হইতে মিলাইয়াই গেল।

হেমন্তের একটা অপরাহ্নে কর্ম্ম-বিরামের মধুর অবসরে দিবাবসানের পরম মাধুর্য্যের মধ্যে যামিনী সেদিন অণিমার তত্ত্ব লইতে আসিল। আজ কাল এ অবসরও বড় একটা ঘটে না,—ঘটিলেও যথেষ্ট মানসিক সঙ্কোচেই দু'জনে যেন কতকটা দূরে দূরে থাকিতেই চায়।

অণিমার হাতে যে বইখানা ছিল, সে সেখানা মুড়িয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিল, অদূরে দাঁড়াইয়া বলিল,—"আপনি সাংখ্যদর্শন নিশ্চয়ই পড়েছেন?"

"আমি হাঁ সাংখ্যদর্শন মোটামুটি পড়েছি বই কি। আপনি পড়েছেন নাকি? কি বই এটা?"

"সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী। এতে দেখছি—প্রকৃতি-পুরুষের সুন্দর বিশ্লেষণ আছে। প্রকৃতির সম্বন্ধে যেন একটা আলো পাওয়া যায়। 'লোহিত,

কৃষ্ণ, শুক্লা' এবং 'বহ্বিঃ প্রজাঃ সৃজমানা'—তাঁর এই ভেরিফিকেশনটা যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি!—কিন্তু সাংখ্যের এই প্রকৃতির সঙ্গে আর 'নেচারের' সঙ্গে অনেক প্রভেদ।"

যামিনী কহিল,—"সাংখ্যকারের মতে এই কৃষ্ণ, লোহিতকে যখন পরাস্ত ক'রে, শুক্ল আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হবে, তখনই আমরা আনন্দলোকের মধ্যে প্রবেশ লাভ করতে পারব। সেই স্থানে—যেখানে আর জড়ের সম্বন্ধ মানতে হয় না, অণুপরমাণুর নর্তন যেখানে স্থির, স্তব্ধ, সেই বিকার বিশোচনের বাইরে অক্ষয়কে লাভ করবার জন্যই প্রথম আমাদের প্রকৃতির সেবা করা প্রয়োজন।"

অণিমা তাহার অন্তরের একাগ্রতা দিয়া যামিনীর বাক্য কয়টাকে প্রণিধান করিবার চেষ্টা করিল। উড়াইয়া দিবার জন্য যুদ্ধ করিল না, তর্ক তুলিল না। তার মনের ভিতরটার কি কিছু ওলোট-পালট ঘটিয়া গিয়াছিল, বা ঘটিতে আরম্ভ করিয়া ছিল নাকি?

সাংখ্যদর্শন লইয়া কিছুক্ষণ আলোচনার পর অণিমা হঠাৎ সমস্ত সঙ্কোচকে প্রাণপণে জয় করিয়া লইয়া বলিয়া ফেলিল, "আপনার অনেক কাজ সময় ত পাবেন না, নাহ'লে প্রাচ্যদর্শনগুলি পড়ে দেখতুম। বিনা সাহায্যে হয় না।"

হায়, তাহার কাছে যামিনীর সময়াভাব! অখণ্ড দণ্ডায়মান কালের ভিতর হইতে গোটাকতক দণ্ড পলও যদি সে গ্রহণ করে, তাহাও কি তাহার পক্ষে অনধিকৃতের জুলুম করা হইবে? এতটুকু জোর করিবার অধিকারও সে তার উপর রাখিতে চাহে না! সে নীরবেই রহিল।

এর পর কথা জমিল না। সামান্য পরেই যামিনী বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। দু'জনেই বুঝিতেছিল, তাদের মধ্যেকার পূর্ব্ব সম্বন্ধ সাম্প্রতিক সেই ঘটনার সঙ্গেই যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, বাহিরে সব মিটিয়া গেলেও সেই অন্ত-

স্থানটি ঠিক যেন আর তেমন হইয়া জোড়া লাগিতে পারে নাই। কাটের দাগ স্পষ্ট রেখায় থাকিয়া গিয়াছে। শিশুর ভাঙা হাড় যেমন জোড়া লাগে, বৃদ্ধের তেমন করিয়া লাগে না।

যামিনী চলিয়া গেলে অণিমা গঙ্গাতীরের একটা জানালা খুলিয়া মুখ ফিরাইয়া হেমন্ত-সায়াহ্নের ধূসরছায়াচ্ছন্ন ম্লান আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। গৌরীপুরের কলবাড়ীতে ওভারটাইমের কাজ বন্ধ। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ছুটি হইয়া গিয়াছে। তাহার বিশালকায় চিমনি হইতে ধূম দেখা যাইতেছিল না, অথবা বৈদ্যুতিক আলোকের দীপ্তি গঙ্গাবক্ষে কাঁপিতেছিল না। ওপারের ছায়ামাখা ঘাট-পথ লইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সমস্ত দৃশ্যটা আসন্ন সন্ধ্যার ম্লানিমার মধ্যে তন্দ্রামগ্ন শিশুর মতই নিঝুম। গঙ্গার জল সেই নিঃশব্দ নির্জ্জন তটভূমে আপনার অব্যক্ত মনের বেদনা অজ্ঞের অবোধ্য মূর্চ্ছনার অর্দ্ধস্ফুট কলতানে করুণ সুরে ব্যক্ত করিতেছিল। আর সেই মূক শ্রোতা ভিন্ন সেখানে একজন মাত্র শ্রোতা ছিলেন, যাঁহার নিকটে তাহার সেই ভাষাহীন অন্তঃস্তলের গোপন সমাচার কোনদিনই অজ্ঞাত ছিল না, তা হোক তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকৃত আর হোক তা' অস্বীকৃত।

সাতচল্লিশ

সেদিন জনবিরল রাজপথ দিয়া যামিনী যখন ভারাক্রান্তচিত্তে বাড়ি ফিরিয়া আসিল, তখন পাড়া-প্রতিবেশীর গৃহে রুদ্ধদ্বার জানালার ফটকের মধ্য দিয়া সন্ধ্যাপ্রদীপের প্রথম রশ্মি গৃহচ্ছায়ান্ধকার সঙ্কীর্ণ পথের 'পরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কোন গৃহের গৃহদেবতাকে কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া আরতি করা হইতেছে, সেই সঙ্গে গৃহান্তর হইতে নববধূর সুকোমল সলজ্জ কণ্ঠপূত

শঙ্খধ্বনিও থাকিয়া থাকিয়া মিলিত হইতেছিল।

বাড়ি ফিরিতেই নলিনী আসিয়া দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"কোথা গেছলে বল দেখি বাবা! সব জায়গায় যাও, আর জ্যোৎস্না-মাসিমাদের বাড়ি একদিনও যেতে হবে না বুঝি?"

পিতা কন্যার পুষ্পপুটতুল্য কচি অধরে চুম্বন করিয়া তাহার ক্ষুদ্র দু'খানি দুর্বল হাতের আলিঙ্গনে নিজেকে ছাড়িয়া দিল, ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—"তা না হয় নাই বা গেলুম। তুই তো রোজই যাচ্চিস আমার হয়ে।"

নলিনী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া উঠিল,—"তা বই কি। সে হবে না, তোমায় যেতেই হবে। জ্যোৎস্না-মাসী রোজ রোজই জিজ্ঞেস করেন,—হ্যাঁ তুমি যাবে না বই কি!"

যামিনী তাহাকে টানিয়া লইয়া ঘরের ভিতর অগ্রসর হইতে হইতে সকৌতুকে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি জিজ্ঞেস করেন?"

"আবার কি? এই বলেন, 'কই নেল্। তোমার বাবা তো কই এলেন না? আস্‌বেন না বুঝি?' আমি রোজই বলি 'আসবেন গো আসবেন,—দেখো ঠিক আসবেন।' তিনি কি বলেন জানো? বলেন, 'রোজই তো বল, আসবেন—এলেন কই?'—আবার কি বলেন জানো?"

"কি?"

"এই বলেন, 'তুমি আমার কথা যেন তাঁকে কিছু ব'ল না। দেখো ভুলে যেও না যেন।' আমি বললুম, 'তোমার কি কথা?' তা তিনি বললেন, 'এই কোন কথাই না। আমি তোমায় তাঁর কথা যা জিজ্ঞেস করি-টরি, কিচ্ছু যেন বল না,—লক্ষ্মীটি।' তা আমি বললুম, 'তিনি যদি আমায় জিজ্ঞেস করেন? তখন কি বলবো বলে দাও।'—তখন তিনি বললেন, 'কি ক'রে জানবেন? না, জিজ্ঞেস করবেন না, আমার কথা কেনই বা জিজ্ঞেস করতে যাবেন?' তুমি যাও-ও না, কিছুই

না,—তবু কিন্তু মাসিমা তোমায় খুব ভালবাসেন। তোমার কথা রোজই জিজ্ঞেস করেন।"

যামিনীর মুখ ক্রমেই গম্ভীর হইয়া আসিতেছিল। সে সহসা কন্যার হাত ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখস্থ টেবিলটার উপর হইতে একটা শ্বেতপাথরের কাগজ-চাপা তুলিয়া লইয়া তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত হইল। শিশুর মুখের সরল ভাষাতেও সংবাদটার গুরুত্বপূর্ণ জটিলত্ব বেশ যেন একটু সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল না কি? এ আবার কি কুটিল হঠাৎ!

নন্দিনী তাহারই মেয়ে, সে খুবই বুদ্ধিমতী, যাকে সোজা কথায় বলে চালাক। সে কিছুতেই নিজের কায ভোলে না। আদরে আবদারে পিতাকে স্বীকার করাইয়া লইল যে, এবার যেদিন সময় থাকিবে সেইদিনই তিনি মাসিমার বাড়ি না গিয়া জ্যোৎস্না-মাসিমার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন। তাহার জিদে যামিনী ইহা স্বীকার করিল বটে, কিন্তু নিজের মনের ভিতর একটা যে অস্ফুট সংশয়পূর্ণ বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেটুকু সে একেবারেই উড়াইয়া দিতে পারিল না। তাহা এই যে,—যদি শ্রদ্ধাই হয় ভক্তিই হয়, তবেএত লুকোচুরির চেষ্টা কেন? বারে বারে শিশুর নিকট এত নিষেধেরই বা কি প্রয়োজন? স্পষ্টই সে তার কুশল প্রশ্ন বা সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিত না কি? আর সে যে তেমন বেহায়া ব্যাপক মেয়ে তা'ও কোনদিন তাকে দেখিয়া যামিনীর মনে হয় নাই! হঠাৎ তার মনে পড়িয়া গেল, সুনন্দার সহিত বিবাহের পূর্ব্বে কিশোরী জ্যোৎস্নার সহিত তার বিবাহের কথাবার্ত্তা একবার উঠিয়াছিল। কিন্তু সে তো তখন নেহাৎই ছেলেমানুষ, বড় জোর দশের কি বোল বৎসরের।

নিজের চিত্তভারের উপর এই নূতন চিন্তাটা আরও একটু ভার হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সহসাই সে নিজের মনকে ধমক দিয়া বুঝাইল, তার এ

ভাবনা একান্ত ভিত্তিহীন। সে নিজে যেমন তাকে দু'একটি দিন মাত্র দেখিয়াছে, সেই বালিকাও তাহাকে তাহার চাইতে বেশি কিছু জানে না, চেনে না। তার এই আগ্রহ, ইহা শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি ভিন্ন আর কিছু হওয়া সম্ভবই নয়। সেই স্বল্প পরিচয়ে মেয়েটি নাকি—কি যে তার হইয়াছে, বুদ্ধিতে ঘুণ ধরিয়াছে অথবা সে ক্ষেপিয়া গিয়াছে ?

প্রভাত-অরুণের উদয়াচলে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার কর্ম্মো-দ্দীপক শক্তি করুণা-রশ্মিরূপে সমস্ত জগতের উপর হইতে যে মুহূর্ত্তে মোহান্ধকার ও অসত্য জড়তার আবরণ তুলিয়া লইল, সেই মুহূর্ত্তেই কর্ম্মো-দ্দীপনা আসিয়া তাহারও গত রাত্রের চিন্তা-বেদনা ও দুষ্ট সংশয় হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে কর্ম্মস্রোতের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল। পরদিন সে আবার অণিমার উদ্দেশে গেল। সেদিন্ হাতে কাজের অভাব ছিল না, তথাপি না গিয়া সে পারিল না। আদি-বিদ্বান্ মহর্ষি কপিল, তাঁর পুরুষ-প্রকৃতির বিশ্লেষণ দ্বারা তার আর কতটুকু পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া উঠিতে সক্ষম হইলেন, তাহা জানিবার কৌতূহল অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। উন্নতি হইবে না অবনতি ? কাপিল-শাস্ত্র ধরিতে গেলে নাস্তিক্যবাদেরই ক্রম পর্য্যায়ে পড়ে না কি ? ঈশ্বরসিদ্ধে প্রমাণাভাব—এর জটিলার্থ বোধগম্য কতনকার ? ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যায় না—এ তো বেদান্তেরই কথা।

কিন্তু সেখানে গিয়া কৌতূহল-নিবৃত্তির পরিবর্ত্তে সেটা আরও কিছু বর্দ্ধিত করিয়া অল্পক্ষণ পরেই তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। অণিমা বাড়ী ছিল না। রমেন্দ্রেরাও কেহ নাই। চন্দর দাসী আসিয়া বলিল,—"তানারা সব দাদামশায়ের কাছে গেছেন গো, আপনি তা' জানেন্ নি ?"

যামিনী বিস্মিত হইল। দাদামহাশয় ! কে' আবার তিনি ? অণিমার পিতামহ তো নয়ই, মাতামহ ? তাও না। তবে আর কে হইবেন ? দত্ত সাহেব যে আত্মীয় স্বজন-পরিত্যক্ত তাহা সে জানিত।

দাসী কহিল,—"আপুনি তাঁকে চেনোনি বুঝি ? তা কেমন ক'রেই বা চিনবে, দিদিমণি নিজেই কখনও ওঁাকে দেখেনি। সায়েবের সঙ্গে তো কারুই বনিবনা ছিল না। এঁর সঙ্গেও না। ইনি মস্ত ধাম্মিক লোক, এ সব মেলেচ্ছ কাণ্ডর মধ্যে কি তিনি আসেন ? মা লুকিয়ে এঁর কাছে মন্তর নিয়েছিলেন, ওনার বাপের গুরু। কাশীপুরে একটা বাগানে তিনি বরাবরই থাকতেন, মধ্যে বছর কতক ধরে নানান্ তীথি কর্‌তে যান, আবার এই এয়েচেন।"

যামিনী প্রশ্ন করিয়া করিয়া পুরাতন দাসীর নিকট হইতে যতটুকু জানিতে পারিল—তাহা এই, দাদামহাশয় লোকটি অণিমার মাতামহের গুরু, তাঁহার নাম সে বলিতে পারিল না, বাটির গৃহিণীর অর্থাৎ অণিমার মাতার মৃত্যুপূর্ব্বে একবার মাত্র তিনি মৃতকল্পার একান্ত আগ্রহে মিঃ দত্তের অবর্ত্তমানে এদের কলিকাতার বাসায় আসিয়াছিলেন। চন্দর তার বিশ বৎসর চাকরীর ভিতর ইঁহাকে দ্বিতীয়বার আর কখন দেখে নাই, তাঁর নামও শুনে নাই। অণিমার মার মনে তাঁর এই পিতৃকুলের মহাযোগী মহেশ্বরতুল্য ইষ্ট-গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। তিনি মৃত্যু আসন্ন জানিয়া স্বামীর অজ্ঞাতে ইঁহাকে সংবাদ দিয়া দিয়া অনেক চেষ্টায় আনাইয়াছিলেন এবং মরণ-মুহূর্ত্তে জীবনব্যাপী অনাচার ইত্যাদির জন্য অনুশোচনা করিয়া ইঁহারই নিকট হইতে মৃত্যুর পরবর্ত্তী লোকের জন্য পাথেয় ভিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন। শুনা যায়, স্বামী বাড়ী ফিরিয়া তাঁহার সেই শেষ অপরাধও ক্ষমা করিতে পারেন নাই।

হঠাৎ এতদিন পরে এই নিঃসম্পর্কীয় গুরুদেব, এই সংসারত্যাগী অণিমার দাদামহাশয়ের সংবাদ সে কোথা হইতে পাইল এবং তাঁহার কাছে সে হঠাৎ ছুটিলই বা কেন ? যামিনীর এই কৌতূহল চন্দর ভাল করিয়া মিটাইতে পারিল না। সে এই পর্য্যন্ত জানে যে, দাদামহাশয়

মিহিরের বিবি-বিবাহের সংবাদ খবরের কাগজে পড়িয়া বড়-সাহেবের কন্যার সংবাদ লইতে কাহাকে নাকি পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া অণিমার অকস্মাৎ এই আত্মীয়টিকে দেখিবার সাধ হইল।

এই নূতন সংবাদটা যামিনীকে একটুখানি বিস্মিত করিলেও কিছুটা খুশীও করিল। নিরাত্মীয়া অণিমার একজন এমন কেহ তবে এখনও বিত্তবান আছেন, যাঁহার কাছে সে প্রয়োজন হইলে—দু'দিন গিয়াও দাঁড়াইতে পারে! রমেন্দ্রনাথের মুক্তি লওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল এবং কাজটাও তার নাকি হইয়া গিয়াছে। তাহারা শীঘ্রই কর্মস্থানে চলিয়া যাইবে।

আটচল্লিশ

কাশীপুর সর্ব্বমঙ্গলাকালীর অদূরে একখানি ছোট্ট ও সুপরিচ্ছন্ন বাগান-বাড়ীতে যোগত্রয়ানন্দ "বলিয়া পরিচিত একজন পরম বিদ্বান ও যোগ-বিভূতি সম্পন্ন ব্যক্তি বহুদিন যাবৎ বাস করিবার পর যখন একদিন ফটকে তালা বন্ধ করাইয়া তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়া গেলেন এবং তারপর এই ছয় সাত বৎসর অতীত হইয়া গেল, তাঁহার কোন সংবাদও কেহ শুনিতে পাইল না, তখন তাঁর ভক্তমণ্ডলী ও অনুগত প্রতিবেশীবর্গ তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশাস হইয়া, অরক্ষিত উদ্যান-বাটিকাতে একজন মালী রাখিয়া ও তাহার জীর্ণসংস্কার করাইয়া ঐ বাড়ীটি ভাড়া দিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, আবার দু' একজন পরম উপকৃত ধনী ব্যক্তি তাঁর মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও তুলিলেন। এমন সময় একদিন শরতের নির্ম্মল সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অতীপ্সিত ব্যক্তির পুনরভ্যুদয় ঘটিয়া

গেল। সঙ্গে ছিল একটি ছাত্র—তাঁহারই পূর্বাশ্রমের পিতৃমাতৃহীন দৌহিত্র—হৃদ্‌কুমার। অণিমা যেদিন অকস্মাৎ এই ব্রহ্মাশ্রমের মতই প্রশান্ত নির্জন উদ্যানের পুষ্পবীথি উত্তীর্ণ হইয়া ইহার জনহীন গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, সেদিনটা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সূচনা লইয়া কৌতূহলী প্রকৃতির সস্মিত দৃষ্টিপাতে বড় উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছিল। রাশি রাশি শেফালির গন্ধে বাগানের সমুদয় ভ্রমরগুলা এক সঙ্গেই মাতাল হইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে, তার সঙ্গে মিশিয়াছে সদ্যবিকশিত চামেলীর গন্ধ। পাখীর কলতানে কান পাতা যেন ভার বোধ হইতেছিল, তারা না জানি কি বুঝিয়াছিল যে এত উৎসব-মুখর হইয়া পড়িয়াছে!

যোগব্রহ্মানন্দ মহাশয় তাঁর অনতিপ্রশস্ত ঘরখানিতে কম্বল পাতা শয্যাটির উপর পূজাদি শেষ করিয়া আসিয়া সবে মাত্র একখানি পুরাতন পুঁথি লইয়া চশমাটির মধ্য হইতে তাহার উপরে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, অমনই মুক্ত দ্বারের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া অনাহূতা অণিমা তাঁহার পায়ের গোড়ায় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। যোগীরাজ (এই নামেই তিনি পরিচিত) একবার মাত্র তাহার দিকে চাহিয়াই পুঁথিখানি নামাইয়া রাখিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়াই প্রশংসার সহিত কহিলেন,—"'ঋগ্বেদসূক্তা' কুমারী কি আজ প্রত্যক্ষরূপে আবির্ভূতা হলেন নাকি? কে মা তুমি?"

লজ্জায় সঙ্কোচে রাঙা হইয়া গিয়া নতমুখে সে উত্তর করিল,—"অচল-কৃষ্ণ দত্তের মেয়ে,—আমি অণিমা, আমার মা ছিলেন আপনার—"

"অচলের মেয়ে তুমি? নাত্‌নি আমার! এসো এসো দিদি এসো! উনি বুঝি আমার নাত্‌জামাই?—আর এটি কে?"

রমেন্দ্র ও মৃণালিনীকে লক্ষ্য করিয়া যোগীরাজ এই প্রশ্নটি করিয়াছিলেন। অণিমা সলজ্জমুখে কহিল,—"হাঁ, উনি আপনার নাতজামাইই হন,—

আমার একজন শিসিয়ার জামাই, আর এই তাঁর মেয়ে মৃণালিনী।"

"বেশ! বেশ! খুব আনন্দ হ'ল দেখে। তোমার স্বামী কই?"

অণিমা লজ্জায় মাথা নত করিয়া রহিল। কটকটে মেয়ে মিলি তার হইয়া ত্বরিতেই উত্তর দিয়া দিল,—"ওকে আপনি প্রথমেই যে 'কুমারী' বলে সম্বোধন করেছিলেন, সেটা আপনার একটুও ভুল হয়নি, দাদামশায়! ও কুমারীই সত্যিকারের!"

দাদামহাশয় সরিয়া আসিয়া অণিমার নত মুখ দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া সস্নেহনেত্রে তাহাকে দেখিতে দেখিতে স্বাভাবিক মধুর হাসিটুকু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া কহিলেন,—"সে যে ওর চেহারাতেই মাখানো রয়েছে। দেখছো না,—এ যে আদ্যাশক্তি, বীণাপাণির হুবহু চেহারা,—একে তো কোন মতেই স্থিতিকারিণী শক্তিরূপে দেখতে পারিনে! উহুঁ! মোটে তা ওকে মানায় না।"

অণিমা মুগ্ধচিত্তে আবারও তাঁর পদতলে প্রণত হইয়া দুই হস্তে তাঁহার পদধূলি লইয়া মাথায় ও কপালে সেই হাতটা ঘর্ষণ করিল। হাসিয়া কাঁদিয়া কহিল,—"এতদিন আমায় ডাকনি কেন দাদামশাই? তোমার এমন স্নেহদৃষ্টির বাইরে ফেলে রেখে কি বঞ্চিতই যে আমায় তুমি করেছ, সে যদি তুমি জানতে, কক্ষনো পারতে না।"

সেদিন গৃহে ফিরিয়া সে যেন আরও অতৃপ্তি বোধ করিতে লাগিল। ক্রমাগত সেই যেন একেবারেই চিরাত্মীয়, অথচ চির-অপরিচিত পূত দাদা-মহাশয়ের সৌম্যমূর্তি ও মধুর ব্যবহারের কথা মনের ভিতরে তার ক্রমাগতই তোলপাড় হইতে লাগিল। এমন স্নেহ, এমন সরলতা, এমন অনাড়ম্বর পাণ্ডিত্য সে যেন আর কোথাও কখনও দেখে নাই, দেখিতে কোনদিনও আশা করে নাই। এই কি ব্রহ্মবিদ, এই কি ব্রহ্মাত্মিক-বোধসম্পন্ন লোক, যাঁর উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

যামিনীকে সে সেই দিনই তার দাদামহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়া বলিল,—"তাঁকে না দেখলে আপনি তাঁকে বুঝতেই পারিবেন না! কি সরল শিশুর মত মন, আর তার সঙ্গে কি অপূর্ব্ব গভীর জ্ঞানের চাবি তাঁর সামনে খোলা। এমন আত্মীয় থেকেও আমরা চিরকাল ধরে বিযুক্ত ছিলাম, এ কি কম দুর্ভাগ্য! আপনি যে একদিন পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন না? তার অর্থ আমি একটি দিনের সামান্যক্ষণেই বুঝে এসেছি যামিনীবাবু।"

কাশীপুরে যামিনীর ভগ্নীপতির বাড়ী, যাওয়া কিছু কঠিনও নয়, মধ্যে মধ্যে সে নন্দিনীকে দেখিতে গিয়াই থাকে, এবার যেদিন কি একটা নিমন্ত্রণ উপলক্ষে তাদের সঙ্গে দেখা করিতে গেল, অমনই সে দাদা-মহাশয়ের সহিতও সাক্ষাৎ করিল। গরদের জোড় পরিয়া খড়ম পায়ে সেই মাত্র তিনি পূজাগৃহের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছিলেন। শুভ্র সুপ্রচুর গৌরবর্ণ হরিৎ বৃক্ষপত্রের ভিতর হইতে গৌরতর দেখাইতেছিল। মুখের স্বাভাবিক মিষ্ট হাসিটুকু দর্শনার্থী যুবকটিকে দেখিয়া মধুরতমরূপে ফুটিয়া উঠিল। যামিনী অল্পদূরে থাকিয়াই প্রণাম করিল। দাদামহাশয় কহিলেন,—"তুমি কে গো? মুখখানিতে যে বড্ড মহৎ ও কল্যাণীল শান্ত উদারতা মাখানো রয়েছে! আর উচ্চাদের বিদ্যাবুদ্ধিতেও তেমনই কি উজ্জ্বল। তুমি তো নেহাৎ এক জন সামান্য ছেলে হবে না দাদা!"

একটা অপূর্ব্ব বিস্ময়ে মুহূর্ত্তে তার শূন্য হৃদয় যেন ঠাণ্ডা জলের মৃদু ভারে ভরিয়া উঠিল। আকাশের পূর্ব্ব ললাট সেইমাত্র স্বর্ণচ্ছটায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই কিরণ-কেশ-পাশ এলাইয়া দিয়া হেমন্তের শিশিরার্দ্র প্রকৃতি বনে ও উপবনে তার বিচিত্রিত শ্যামাঞ্চলখানি বিছাইয়া দিয়া তাহা শুভ্র পুষ্পে খচিত করিয়া তুলিতেছিলেন। গাছের উপর হইতে বোঁটাখসা জুঁই ফুলগুলির সহিত পূর্ব্বরাত্রের বর্ষণের-ফলে সঞ্চিত বৃষ্টিবিন্দুগুলিও টুপ্‌টাপ্

করিয়া ঘাসের উপর ঝরিয়া পড়িতেছিল। এই তপোবন-তুল্য গৃহখানি উপলক্ষ্য করিয়া নির্মল নীল আকাশে ও বাতাসটিতেও প্রশান্ত রাগিনীর একটি অবিচ্ছিন্ন মহান সুর নীরব শব্দহীন ভাষায় যেন সর্বক্ষণই স্পন্দিত হইতেছিল। তাহা বোধ করি এই কিরণকুন্তলা, গন্ধনন্দিতা মহাপ্রকৃতির স্বর্ণ-বীণার বিচিত্র ছন্দেরই আবহ সুর!

যামিনী নতশির মৃত্তিকালগ্ন করিয়া বিনত বচনে কহিল,—"আমি আপনার একজন দর্শনার্থী, নাম আমার যামিনীপ্রকাশ রায়।"

ঊনপঞ্চাশ

বসিবার সেই ছিমছাম সুপরিষ্কৃত রজনীগন্ধা ও অগুরু-ধূপের গন্ধামোদিত কক্ষটিতে প্রবেশ করিয়া দাদামহাশয় কহিয়া উঠিলেন,—"বটে! তুমিই তবে আমাদের যামিনীপ্রকাশ! বেশ! বেশ! হ্যাঁ, আমি ভাবছিলাম যে তুমি একদিন এখানে আসবে।"

যামিনী মোহিত হইয়াছিল, অধিকতর সম্মোহিত হইয়াই গেল, বিস্ময়-পূর্ণ হাস্যের সহিত কহিয়া উঠিল,—"আপনি যে দেখছি অন্তর্যামী!"

দাদামহাশয় তাঁর মধুর হাসিটি হাসিয়া বলিলেন, "ওগো! না, না!—এসেই একেবারে অত ক'রে বাড়িয়ে ব'স না, শেষকালে কি আমাকেই হতাশা নিয়ে ফিরতে হবে! দ্যাখো, এটুকুর জন্তে কারুকে অন্তর্যামী হতে হয় না। সেদিন ওরা সবাই এসেছিল তুমি তাও জান তো?—কথায় কথায় তোমার কথাও উঠেছিল বই কি,—রমেন আমাকে সবই বলেছে। তা' সেই সমস্ত শুনে-টুনে কেমন যেন একটা কৌতূহল মনে হয়েছিল যে একদিন সে আসে তো তাকে চোখেই না হয় একটিবার দেখি, বুঝ্‌লে? চিন্তা-শক্তির

একটা আকর্ষণ তো আছে,—এটা তোমরা মান তো? তা' ছাড়া আর বড়বড় ব্যাপার কিছুই নয়।"

"একেই তো আমাদের শাস্ত্রে যোগবল বলে থাকে?"

"একেই যোগবল বলো বা না বলো, যোগবল এই শক্তিরই পূর্ণ প্রকাশ আর কি। দেখ যোগ ভিন্ন জগতের ছোটবড় কোন কাজই হতে পারে না। কুলিরা এই যোগের দ্বারাই ভারী ভারী মাল তোলে, বেদেরা মজাবাজি বাজি দেখায়। আবার মনে প্রাণে যোগ করেই সাধক তাঁর সাধ্যকে লাভ করেন। যোগ না করতে জানলে কি তোমার নিউটন, ফ্রাঙ্কলিন, রণ্টজেন, জগদীশ বোস—এঁরা সবাই প্রকৃতির গুপ্ত রহস্য সমূহ আবিষ্কার করতে পারতেন? সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা থেকে বর্ত্তমান তুমি আমি পর্য্যন্ত যে কেউ কিছু করি, যোগের দ্বারাই করি। যখন যোগকে ত্যাগ করি, তখনই যে কোন তুচ্ছ কাজেও ব্যর্থ হই, নাচের দড়ি থেকে পা ফসকে যায়।"

যামিনী চুপ করিয়া শুনিতে শুনিতে বিস্মিত হইতেছিল, কহিল,—"যোগ বলতে আমরা সাধারণতঃ এইটুকুই বুঝি প্রাণায়ামে শ্বাসরোধ করা—"

দাদামহাশয় হাসিয়া বাধা দিলেন,—"'বুঝি' বল্‌চো কেন? আসলেই তো তাই হ'ল গো! মনে কর, যখন তুমি গণিতের একটা কঠিন তত্ত্ব সমাধান কর্‌চো কিংবা আইনের একটা সূক্ষ্ম খুঁটিকে খুঁজে বা'র কর্‌চো, তখন তোমার স্বাভাবিক গতি কখন যে নিরুদ্ধ হয়ে গেছে, তুমি কি তা জানতে পার? সার্কাসে যখন পালোয়ান বুকের উপর হাতী তোলে, কি একটা পাকানো সুতোর উপর একটা ছোট বাচ্চাকে খেলে বেড়াতে দেয়, তখন যে এক সঙ্গে হাজার লোকের হাজার প্রাণায়াম হতে থাকে, আর যে সেই দড়িতে ঝুল্‌চে বা বাঘের পিঞ্জরে ঢুকেচে তারই বুঝি হয়

না? সে তখন কুম্ভকে না থাক্‌লে ওই দৈবী বল পায় কোথা? সবার মধ্যেই প্রকৃতি জয় করে নিজের সর্ব্বকম শক্তিকে প্রকাশ করার এই ক্ষমতা রয়েছে, তবে সাধারণ লোকে না বুঝে সেটাকে বৃথা নষ্ট করে ফেলে, আবার কেউ কেউ বা তাদের কষ্ট-অর্জ্জিত এই হঠযোগকেই চরম লক্ষ্য বোধে এটাকে নিয়ে একটা অর্থকরী ব্যবসা করেই বেচে খায়। কেউ বা এই দিয়ে প্রকৃতিকে জয় ক'রে তাঁরই ঐশ্বর্য্য ভোগ করাকেই চরম সিদ্ধি বোধ করে সেই দিকেই ঝুঁকে পড়ে। কাপালিক যোগীদের অষ্টসিদ্ধিলাভের কথা কিছু কিছু শুনে থাকবে? ওইটেকেই তারা সাধনার একমাত্র লক্ষ্য করেছিল ব'লেই অত কঠোর তপকেও স্বার্থের পায়ে অঞ্জলি দান ক'রে ব্যর্থ হয়েছে। নইলে তন্ত্রশাস্ত্রের যা সত্যকার উপদেশ সে কি তুচ্ছ বস্তু! এই জন্যেই তো শাস্ত্রে যোগৈশ্বর্য্যের পরীক্ষা করতে সাধকদের পুনঃ পুনঃ নিষেধ করা হয়েছে। নিজের ক্ষমতা জান্‌তে পার্‌লে মত্ত হস্তীও আর শেকল বাঁধা থাক্‌তে চায় না, সে তখন শেকল ছিঁড়ে লোক ধ্বংস ক'রে নিজেকেও নষ্ট ক'রে ফেলে। ওগো বাবু! অমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে তো চল্‌বে না। তোমার এখন যুবো বয়েস,—তা'ছাড়া তোমার জজের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বহস্‌ করা অভ্যাসও আছে, আমি বুড়োমানুষ, কাঠগড়ার আসামীর মতন তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কাঁহাতক্‌ থাকি বল তো? এসে ব'সে পড়া যাক্‌ গে।"

যামিনী ঈষৎ অপ্রতিভভাবে তাঁহার অনুসরণ করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল, গোটাকতক পৈঠা উঠিয়া এতক্ষণ সে একটা বারান্দায় ঠিক সেই অণিমার পরিচিত ঘরটার সামনেই দাঁড়াইয়া ছিল, এখন তাঁর কাছে আমন্ত্রিত হইয়া প্রবেশ করিল। ঘরের জানালা-দরজা সব খোলা। ভিতরে আসিতেই ধূপ ও গুগগুলের অস্পষ্ট গন্ধ, পূজাগৃহের সেই পুণ্য সুরভি তার ঘ্রাণের মধ্য দিয়া অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ হইয়া বহিয়া গেল। ঘরের

চারিদিকে কাঁচের আলমারি ভরা ভরা অনেক পুস্তক। যামিনী দেখিল তার মধ্যে নানা ভাষার অনেক বিষয়েরই সংগ্রহ রহিয়াছে, মেঝের গালিচার উপর কম্বলের বিছানা, দাদামহাশয় নিজে কম্বলটায় বসিয়া তাহাকেও গালিচাটায় বসিতে বলিলেন।

যামিনী একটু সঙ্কুচিত হইয়া কহিল,—"আমি কিন্তু ব্রাহ্ম, আপনার বিছানায় কি আমি বস্‌বো?"

দাদামহাশয় ছেলেমেয়েদের মতন শব্দ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসির সুর শুনিয়া যামিনী অধিকতর বিস্মিত হইয়া গেল, তাহা যেন শিশু-কণ্ঠের হাস্য-কাকলী, তেমনই তরল আর তেমনই সরল। তিনি কহিলেন,—"হ্যাগা দাদা তুমি যে নিজেকে 'ব্রাহ্ম' বল্‌ছো, তা' ব্রহ্মকে কি নিজের মধ্যে জান্‌তে পেরেছ? তা' যদি পেরে থাক তা হ'লে তুমি তো আমার পরম নমস্য, আমি তো তার ধারে-কাছেও যেতে পারিনি।"

এই কূট প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া আইনের কূটতার্কিক যামিনী লজ্জায় মাথা নত করিয়া রহিল। দাদামহাশয় কহিতে লাগিলেন,—"দেখ দাদা, ব্রাহ্ম হওয়া এমন কিছুই অপরাধের বিষয় নয়, শেষপর্য্যন্ত ব্রহ্মোপাসনা ভিন্ন মানুষের মুক্তির আর দ্বিতীয় পথ কই? সম্পদুপাসনা বা প্রতীক উপাসনা, যাই কিছু করা যায়, তা' সেই নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনার উদ্দেশেই তো করা হয়ে থাকে। ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ বা বিরাট্ পুরুষকে ধ্যান করবার অক্ষমতার জন্যেই আমরা শালগ্রাম শিলা বা দশভুজা মূর্ত্তি, না হয় তো ভক্তি-ভাজন মানুষ গুরু কিংবা নিজের নিজের অভীষ্ট মূর্ত্তিতে চিত্ত স্থাপন ক'রে থাকি। আমাদের উদ্দেশ্য তো আর এ নয়, হাতে গড়া পুত্তলিকাটার কিম্বা সেই নুড়ি পাথরটুকুর কৃষ্ণচিক্কণতাই চিরদিন ধরে ধ্যাননেত্রে দেখতে থাক্‌বো! আনন্দ বিভূতিরূপ শঙ্খ, অনন্ত কালচক্রস্বরূপ-চক্র, শ্রেয়ঃস্বরূপ গদা, ও প্রেমস্বরূপ পদ্ম, আর অবিদ্যাময়ী প্রকৃতিরূপশ্যাম বর্ণ, সেই যে চিন্ময়স্বরূপা

তাঁর বক্ষঃস্থলে উজ্জ্বল কৌস্তুভ-মণিরূপে বর্ত্তমান—সেই সচ্চিদানন্দ আত্মার জগৎসৃষ্টি-সময় ভগবানের বক্ষস্থলে শ্রীবৎস নামক রোমাবর্ত্তরূপে বিরাজিত। আর, আর সত্ত্বরজস্তমোময়ী ব্যক্তা প্রকৃতি ভগবানের কণ্ঠবিলম্বিত বনমালা-রূপে অবস্থিত। ছন্দসকল বিরাট বিশ্বের আশয়, অপ্রমেয় ভগবানের পীতবাস। অকার উকার মকারময় ত্রিমাত্র—প্রণব ভগবানের ত্রিসূত্রী ব্রহ্মসূত্র। সাংখ্য এবং যোগ ভগবানের মকর এবং কুণ্ডল নামক কর্ণাভরণ এবং ব্রহ্মপদই সর্ব্বলোকের অভয়প্রদ ভগবানের মৌলীরূপ শিরোভূষণ। অব্যাকৃতা প্রকৃতি ভগবানের অনন্তরূপ আসন। ভয়শূন্য আত্মার কৈবল্য-পদই ইহার ভয়হারী বৈকুণ্ঠধাম। ত্রৈগুণ্য বিষয় ঋক্, যজু ও সামরূপ বেদসকল ইহার বাহন গরুড়। ও এর পুরুষমূর্ত্তিই যজ্ঞ। ব্রহ্মের অক্ষয় অব্যয় ঐশ্বরিক শক্তিই ভগবানের অবিচ্ছিন্ন শক্তি লক্ষ্মী। এই যে সর্ব্বাত্ম সর্ব্বময়কে আমরা সম্পত্ত্যুপাসনার কালে ধ্যান করবার চেষ্টা ক'রে থাকি, তিনি কি ব্রহ্মের বাইরে? যখন ব্রহ্ম ভিন্ন জগতের আর দ্বিতীয় সত্তাই নেই, তখন যে রূপে যে নামে যেমন ক'রেই তুমি পূজো কর না, গঙ্গায় দাঁড়িয়ে জলাঞ্জলি ফেল্‌লে জলেই না তা মিশে যাবে? তা' ছাড়া সে আর যাবে কোথা? তবে আলাদা ক'রে 'ব্রাহ্ম' বল্‌তে গেলে কি বোঝায় বল ভাই? তুমি তা'হলে অবাঙ্‌মানসগোচর পরব্রহ্মকে বেশ করেই বুঝেছ? হাঁ হে 'সদেবাহমস্মি', 'সোহহমস্মি' এই রকম জ্ঞানটা পেয়েছ না কি? ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি, বেদ তাই বলছে না গা! উপনিষদ তো পড়ে থাকবে?"

লজ্জায় মরিয়া গিয়া যামিনী উত্তর করিল,—"আজ্ঞে তা' আর কই পেয়েছি। আমি এই বলছিলাম যে, আমি ব্রাহ্মসমাজের লোক, আপনার এ আসনটায় বসা যদি ঠিক না হয়।"—এই বলিয়াই সে তাঁর সহাস্য মুখের দিকে চাহিয়া তাঁর পদতলের দিকে আসন গ্রহণ করিল।

রাজামহাশয় কহিলেন—"সত্যি! ব্রহ্মকে নিয়ে তোমরা একটা আলাদা

সমাজ করেছ বটে। তা' ভাই আমার অতটা মনে ছিল না। বয়েস হচ্ছে তো! দেখ, নিজেদের মধ্যেও পরস্পরের সঙ্গে তফাৎ—একটা বড় রকম বেড়া বাঁধা যেমন মানুষের ভেদ বুদ্ধির খেলা, তাদের উপাস্যকেও তেমনই অন্যের উপাস্যের সঙ্গে অভেদভাবে না দেখা তাদের সেই বৈষম্য দ্বারা গঠিত লীলাময়ী প্রকৃতিরই একটা বিশেষ গুণ। তা' ব'লে তোমরা নিজেদের 'সগুণ-ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভোপাসক হিন্দু' এই নামটা প্রচার না করে নিজেদের হিন্দু-সমাজের বাইরের লোক ক'রে তুলে, এখনও এত বড় একটা নাম নিয়ে স'রে রয়েছ কেন? ব্রহ্মোপাসনাই হ'ল মানুষের চরম লক্ষ্য। জ্ঞানে অজ্ঞানে সবাই-ই বিশ্বস্রষ্টা সেই মোক্ষপুরুষকেই পেতে চায়। তাঁকেই প্রাণ ভরে ডাকে। ডাকের সাজ-পরা ঠাকুরপ্রতিমাকে কেউ মুখ্যভাবে চাইতে পারে না। তবে সবারই জ্ঞান সমান নয়, বুদ্ধি সমান নয়, তাইতেই যা' ডাক্‌বার বিষয়ে নানান ভেদ এসে পড়েছে। ভাস্করানন্দ কি সবাই? প্রতীকভাবে হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বরের উপাসনা না ক'রে কেউ কি নির্গুণ অক্ষর অব্যয়কে ধর্‌তে সক্ষম হয়? আকাশ বা বিষ্ণুমূর্ত্তি যাঁর আধিভৌতিক রূপ, আধিদৈবিকভাবে তিনিই তো পালনকর্ত্তা বিষ্ণু এবং আধ্যাত্মিকভাবে তিনিই পরমাত্মা। তুমিও বিষ্ণু উপাসক বৈষ্ণবের মত যদি ভাবসমাধিতে কদাচিৎ ব্রহ্মদর্শন লাভ ক'রে জন্ম সফল করতে পেরে থাক, তবেই তুমি ব্রাহ্ম। না হলে একজন মনুষ্যত্ব-সম্পন্ন মানুষই না হয় হলে, তুমি অশুচি কিসে দাদা?"

যামিনী কহিল, "আচ্ছা, প্রতীক বা সম্পদুপাসনার কথা যা' আপনি বল্‌ছেন, কিন্তু প্রতিমাদি সহায় ক'রে প্রতীক উপাসনার অভ্যাস করা কি ভাল? এর যা উদ্দেশ্য অর্থাৎ জগৎ থেকে মনকে সরিয়ে এনে একটা সীমার মাঝে নিবদ্ধ রাখা, তা কি সাধক মনে রাখ্‌তে পারে? তাঁর সেই ইষ্ট-মূর্ত্তিই কি শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মের স্থান জুড়ে বসে থাকে না? প্রতিমা-

পূজক যাত্রই তিনি থেকে গেলে তাঁর মূল উদ্দেশ্য কি ব্যর্থ হয় না? মূর্ত্তের পূজা করতে করতে দেশটা একেবারে সঙ্কীর্ণচেতা, হীন হয়ে যাচ্ছে নাকি?"

"ওহে ভায়া, তোমায় আমায় নাম ধ'রে না ডাকলে আমরা সাড়া দিইনে ব'লে কি তিনিও তাই করবেন? 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং'—এই না তাঁর নিজের কথা? খোদা, ডাকা চাই। এখন যে আর কেউ ডাকেই না। ডাকার ভান করে মাত্র! সঙ্কীর্ণতা জন্মে গেছে সেইখানে। আচ্ছা, তুমি নিজেই কেন বুঝে দেখ না,—এই যে এই ঘরে আমার সামনে কেবল মাত্র তুমি ব'সে রয়েছ, এখন আমি তোমায় যদি কখন 'যামিনী' ব'লে ডাকি, কখনও ভুল করে যদি 'অবনী' ব'লেই বা ডেকে ফেল্লুম কখনও বা বলি 'ওরে' কখনও বা বলি 'হ্যাগা শুনচো' তা' হ'লেও তুমি তো বুঝতে পারবে যে ডাকবার যখন একজন বই দু'জন কেউ বর্ত্তমানই নেই, তখন আমার বুদ্ধি-বৈলক্ষণ্যের জন্যে আমি যা-ই কেন বলি না, ডাকার উপলক্ষ্য সেই যে তুমি একমাত্র যামিনীই, তখন সাড়া দেবে কি দেবে না?"

"তা' হ'লে আপনি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষপাতী নন?"

"ঐ দেখ, ঐটে তুমি ভুল বললে। যে রকম আছে এ রকম একটা স্বতন্ত্র সমাজের আমি পক্ষপাতী নই। শাস্ত্রকাররা অনেক ভেবে বুঝেই ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঐশ্বরিক গুণ ও ভাবযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর উপাসনার নিয়ম ক'রে গেছেন, সেই নিয়মই সমুচিত ও মানব-প্রকৃতির অনুযায়ী অলঙ্ঘ্য নিয়ম। কিন্তু উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে শুধু উপায় নিয়ে থাকলে শাস্ত্রের সে শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যাবে। বিদ্যা সম্বন্ধেও যেমন, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তেমনই, আহার সম্বন্ধেও ঠিক তাই। যেটিট বুঝে খাত বুঝে ব্যবস্থা করতে হয় কি, হয় না? প্রকৃতির উপযোগী খোরাক দিতে না পারলে তা' থেকে সু ছেড়ে কু-ফলই পাওয়া যায়। তাই মনে করি—যেমন বৈষ্ণব,

শাক্ত প্রভৃতি বিপুল হিন্দু-সমাজে মিশে গিয়ে তার সঙ্গে এক হয়ে গেছে, —ব্রহ্মোপাসক সম্প্রদায়েরও এইবার তাঁদের দু'চারটে রীতিনীতি ছাঁট্‌-কাট্‌ ক'রে নিয়ে বিশাল সমাজ-অঙ্গে মিশে যাওয়াই উচিত। তার যা কাজ ছিল তা একরকম সুসম্পন্ন হয়ে গেছে। উপনিষদ প্রচার ক'রে অদ্বৈততত্ত্ব-জ্ঞাপন ও খ্রীশ্চানিটি থেকে সমাজের শিক্ষিতগণকে রক্ষা করবার জন্যই ভগবানের ইচ্ছাস্বরূপ ঐশীশক্তি-সম্পন্ন লোকেদের আবির্ভাব হয়েছিল। এখন বুদ্‌বুদ্‌ জলে না মিলিয়ে গিয়ে বৃথা জলাবর্ত্ত তৈরি ক'রে তোলায় লাভ কি? সে প্রয়োজনীয়তাও নেই, সে ব্রাহ্ম আর জন্মাচ্ছেও না।

যামিনী সর্ব্বান্তঃকরণে কহিল, "আমারও এই কথা মনে হয়, কিন্তু—তা কি আর মিশতে পারে? এখনও দু'পক্ষেই কত বদ্ধমূল সংস্কার ও ভেদবুদ্ধি বর্ত্তমান। পূর্ব্বের চেয়ে অনেক ক'মে গেলেও, এখনও এই দুই সমাজের মধ্যে এমন একটা বিরুদ্ধ ভাব বর্ত্তমানে রয়েছে যে, দু'জনকার চোখেই তাদের পরস্পরের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ঘোরতর হেয় এবং অবজ্ঞেয়। সুযোগ পেলে কেউ কাউকে আক্রমণ করতেও ছাড়ে না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা হিন্দু-সমাজটাকে একটু বেশী মাত্রায়ই ছোট করে দেখেন সেটা দেখতে পাই।"

দাদামহাশয় কহিলেন—"এক দিনে কিছুই হয় না। দু'দিক থেকে এই ইচ্ছা ও চেষ্টা হতে আরম্ভ হলে এবং দু'পক্ষই কিছু কিছু স্বার্থত্যাগে রাজী থাকলে আর কিছুই বাধা থাকবে না। শাক্ত-বৈষ্ণবেও কিছুদিন এমন ভেদবুদ্ধির খেলা চলেছিল। এখন তো সেদিনের মত আহার-আচারের গণ্ডি প্রায় কেটেই এসেছে। যারা এই সব জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্যলাভের জন্যে ব্রাহ্ম হতো তারা হিন্দু-সমাজে থেকেই তা যখন লাভ করছে তখন কি জন্যে বেড়া ঘিরে থাকতে যাবে? লোকসান ত তাদেরই।"

যামিনীর চিত্ত এই স্বল্প-পরিচিত লোকটির প্রতি ক্রমেই অধিকতররূপে

আকৃষ্ট হইতেছিল। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া তাঁহার কথাগুলি বেশ করিয়া প্রণিধান করিবার চেষ্টা করিল, তারপর সহসা জিজ্ঞাসা করিল,—"ক্লাভিডের সম্বন্ধে আপনার মত কি ?"

দাদামহাশয় তাকিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্দ্ধশায়িতভাবে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন—"হ্যাঃ, আমি আবার নাকি মত লোক কি না, তাই—গড় গড় করে পাতার পর পাতা লেখা থিসিস শোনাচ্ছ আর মত নিচ্ছ। আমি বাপু আদার ব্যাপারী। আমার ও সকল বড় বড় ম্যান-অফ-ওয়ারের খবর কেন ?"

যামিনী অন্তরের সহিতই কহিল,—"আপনি মস্তলোকই বটে !"

"বেশ জহুরীতেই জহর চেনে। এসেই একেবারে চিনে ফেলেছ ! জান না তো এ বুড়োটা একটা আস্ত পাগল, তাই তোমাদের মতন ছেলে-ছোক্‌রা পেলে মুখ ছোটাতে ছাড়ে না। খুব বক্‌তে পারে ব'লে এ নয় যে, সে খুবই একটা প্রতিভাবান বাগ্মী।"

যামিনী হাসিয়া বলিল,—"জহরী সত্যিই জহর চিনেচে। আপনি এখন আর ঢাক্‌তে তো পার্‌চেনই না, এখন নিত্য নিত্যই জহরীর আড়তে চোরেদের উপদ্রব ঘটবে এবং সে উপদ্রব সইতেই হবে। আচ্ছা, আমাদের এ কথাটা এর পরে কোনদিন আলোচনা করা যাবে। এখন তবে আমি উঠি, আজ বোনের বাড়ী নেমন্তন্ন কিনা, আমার বোনের ওখানে একবার যেতেই হচ্চে। আবার কখন এলে দর্শন পাব ?"

দাদামহাশয় হাসিমুখে প্রণত যামিনীর মাথায় কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সস্নেহে কহিলেন, "ঈশ্বর তোমার ভাল করুন ! বেশ ছেলে তুমি, বাঙ্গালীর ঘরের রত্ন তুমি ! বেঁচে থাক। দু'টোর পর যখনই যেদিন আস্‌বে দেখা হবে। এখন এস তবে, বোন্‌টি আবার পথ চেয়ে ব'সে আছে তো।"

যামিনী উঠিয়া বাহিরে আসিতেই কেহ তড়িৎগতিতে সরিয়া গেল এবং পরক্ষণেই দেখিয়া চিনিল, অণিমাই তাকে না চিনিয়া সরিয়া যাইতেছিল, তাহাকে চিনিতে পারিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। অণিমা সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিল,—"ওঃ কি আশ্চর্য্য আপনি? আমি আর কেউ ভেবেছিলাম। তা' আপনি এখানে কি ক'রে এলেন যামিনীবাবু? চেনা ছিল নাকি আগে থেকে? কই, কখনো ত বলেননি।"

"আমি নন্দিনীর ওখানে এসেছিলাম। চেনা ছিল না তো, আজই হ'লো।"

"ওঃ। তা আমার দাদামশাইকে কেমন দেখলেন বলুন।"

যামিনী সস্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিল, মুখে একটা হাল্কা রহস্যের কথা আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা সংবরণ করিয়া লইয়া বলিল,—"আপনি যেমন গুরু খুঁজছিলেন ঠিক তেমনই।"

"কেমন ঠিক তাই না?" বলিয়া অণিমা উৎফুল্লনেত্রে চাহিয়া বলিল, —"কিন্তু তবুও আমার স্বীকার করা দরকার,—আপনিই আমার গুরু চেনবার প্রয়োজনীয়তা বোঝবার এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হবার শক্তি দেবার আদ্যগুরু।"

অণিমার হাতে একখানি পদ্মকাটা রূপার রেকাবে সুগন্ধ ফুল ও বাটিতে সাদা চন্দন ছিল। দাসীর হাতে ছিল একটি নূতন চাঙারিতে অল্পাল্প সাজানো সুখাদ্য ও ফলমূল দ্রব্য-সম্ভার। সে ঘরে ঢুকিয়া থালাখানি নামাইয়া মাটিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, সসঙ্কোচে পায়ের ধূলা লইতে গিয়া একটু কি ভাবিয়া হাত সরাইয়া লইল। তাহার সঙ্কোচের কারণ দাদামহাশয়ের অবিদিত ছিল না। তিনি তার হাতখানা ধরিয়া তাহাকে নিজের অতি নিকটে টানিয়া লইয়া বসিলেন,—"অণিমা,—সুষিমা,—মহিমা —গরিমা! এস, এস সিদ্ধি আমার! যোগৈশ্বর্য্য দান করে কৃতার্থ করবে

এস। আজ আবার এমন সময় হঠাৎ যে এলি?"

অণিমা চোখ নামাইয়া কহিল,—"আজ আমার জীবনের একটা কঠিন দিন যে দাদামশাই। আজ মিহিরের জন্মদিন।" এই বলিয়া হঠাৎ সে একবারের জন্ম থামিয়া গেল, তারপর রুদ্ধকণ্ঠ সাফ্ করিয়া লইয়া পুনশ্চ কহিতে লাগিল—"এই দিন আমার কত সুখের দিনই ছিল। প্রতি বছরে এই দিনে আমি নিজের হাতে মালা গেঁথে, চন্দন ঘ'ষে, জামা-কাপড় সাজিয়ে জন্মাবধি তাকে পরিয়েছি,—এখনও সেই অত দূরেও নিজের হাতে পার্শেল সেলাই ক'রে কত আনন্দেই তাকে পাঠাতুম। কিন্তু এবার আর সে আমার ভাই নেই। আমার কাছে সে নেই তাই তার পাওনাটা তোমার পায়ে দিতে এসেছি, আজ তুমিই যে আমার সব হারানোর সমস্ত না পাওয়ার একটিমাত্র প্রাপ্ত। তাকে হারিয়ে তবে তো আমি তোমায় পেয়েছি। তুমি আমার প্রাণঢালা সমস্তর সঙ্গে আমাকেও গ্রহণ কর। তোমার মধ্যে যেন আমি স্থান পাই, এক কথায় নূতন জীবন লাভ করে শান্তি পাই। জীবন যেন আমার ব্যর্থতাকে ঢেকে এবার সফল হয়ে ওঠে। এইটুকু শুধু তুমি এই শান্তিহীনাকে ভিক্ষা দিও, দিও,—দিও।"

এই বলিয়া অণিমা তাঁর পায়ের উপরে নিজের মাথাই লুটাইয়া দিয়া বলিতে লাগিল, "আমি আপনার বিশ্বাসে বিশ্বাসী হ'ব, আপনার সেবা করব, আমায় এইখানে একটুখানি স্থান দিন, আর আমি সেখানে ফিরে যাব না। আমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে নেই, সংসার আমার শূন্য হয়ে গেছে। সমস্ত পুরাতন যেন মাটির তলায় চলে গেছে, তাদের আর আমি সইতেই পারছি না। আমায় আপনি বাঁচান।"

যামিনী ফিরিবার পূর্বে কথামত আর একবার অণিমার দাদামহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিল। তাঁহার সহিত এবারেও তার অনেক কথা হইল।

যামিনী কহিল,—"যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন তাঁরই ব্রাহ্মণ হওয়া উচিত কি না?"

দাদামহাশয় কহিলেন, "ওরে তোরা দু'টো বিদ্বান্ বিদুষীতে যদি আমার দুটো কান ধ'রে দুদিক থেকে এমন ক'রে পাক দিতে থাকিস্, তা' হ'লে আমার যা-ও বা একটু-আধটু বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল, তা-ও যে লোপ পেয়ে যাবে! দেখ দিদি প্রকৃতিমাতা নিজে যাকে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম দিয়েছেন, সে যত অধমই হোক্, তার সেই জন্মস্বত্ব বা উত্তরাধিকার কেউ কি কেড়ে নিতে পারে? তাকে 'জাতি ব্রাহ্মণ' তো বল্তে হবেই। ব্রাহ্মণ তো এক রকম নয়, তার তো প্রকার-ভেদ আছে। জ্ঞানী ব্যক্তি, যাঁকে মহাপুরুষ বা মহাজন ব'লে সারা জগৎ পূজো করছে, তাঁরও এমন একটা কোনও সূক্ষ্ম অভাব থেকে গেছে, যাতে তাঁকে অন্ত্যকুলে জন্ম নিইয়েছে। এই পর্য্যন্ত গেল প্রাকৃতিক অধিকার। তারপর সেই 'জাতিব্রাহ্মণ' তার কর্ম্মের দ্বারা হয়ত লোকের ভাতের হাঁড়ির ভার পেলে, আর ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ জাতিবৈশ্য জাতিকায়স্থকুলোদ্ভব অথবা আরও কেউ—তিনি নিলেন শত ব্রাহ্মণের জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি খোল্বার ভার কিন্তু তবু ঐ জন্মসূত্রে পাওয়া অধিকারে সে সেইটুকুই মাত্র দাবী না করবে কেন? সেটা তো তাকে আমরা দিই নি।" তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া যামিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"তোমার প্রশ্নের এই থেকে উত্তর

দেওয়া হয়ে গেছে বোধ করি? যদি তোমার ব্রহ্মজ্ঞ বাস্তবিকই তা-ই হয়ে থাকেন, তবে তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। তিনি লক্ষ জাতিব্রাহ্মণেরও নমস্ত এবং সে উচ্চ সম্মান তিনি পৈতা না প'রেও, ভিক্ষা না করেও পেয়ে থাকেন। যিনি ব্রহ্মকে লাভ করেছেন, তাঁর কাছে 'ব্রাহ্মণ্য' ক্ষুদ্রতর ও তার অধিকার তুচ্ছতম হয়ে গেছে। যে বিশ্বের সঙ্গে এক হয়ে গেল, আ-ব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যার একই সত্য মঙ্গলের বিকাশরূপে পরিব্যক্ত হয়ে গেল, তার কাছে আবার কিসের জন্তে জাতি, মান, গর্ব্ব স্থান পাবে? সেই জীবন্মুক্ত মহাত্মাদের দেশ কাল পাত্র কিছুই নেই, তাঁরা তাঁদের সেই প্রকৃতিদত্ত অধিকারকে ও ভোগায়তন দেহকে প্রারব্ধ-খণ্ডনের উপাধিরূপেই গ্রহণ ক'রে বিদেহমুক্তির প্রতীক্ষা ক'রে থাকেন মাত্র। বিধিবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না জাগিয়ে তুলেও তাঁরা প্রকৃত ব্রাহ্মণের অধিকার লাভ করে থাকেন। কোন্ ব্রাহ্মণ এই সকল মহাপুরুষদের ভক্তি ও সম্মানদান না করছেন? আর নিঃসন্দেহে জেনে রেখো যে নিজেকে ব্রহ্মজ্ঞ বোধে ব্রাহ্মণ পদবী দাবী করতে চায়, সে আমার তোমারই মত একজন দিকভ্রান্ত, তার সিদ্ধি মরু-মরীচিকার মতই অলীক। সে ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে নি, যেমন তেমনই অজ্ঞ আছে। কারণ ব্রহ্মকে জানতে হ'লে যে নিজেকেই জানতে হবে। নিজেকে সে তখন তো আর তা থেকে ভিন্ন দেখতে পারবে না। বাস্তবিক তো তার জগতের মানুষে মানুষে কোন ভেদই নেই, ভেদটা তো মানুষের হাতে গড়া। সমাজ-বন্ধনের জন্তেই শুধু একটা নিয়ম ক'রে রাখা হয়েছে মাত্র। যে যতখানি ভিতরে পৌঁছেচে, সে-ই প্রকৃত সাম্যকে ধরতে পেরেছে। ব্রাহ্মণ চণ্ডালে সমজ্ঞান করেছে। সে মানুষের দেওয়া ব্রাহ্মণ্যের জন্ত লালায়িত হ'তে পারে না, স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব যে নিজের হাতে তাদের গলায় যজ্ঞসূত্র পরিয়ে দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ হ'তে চাওয়া তো একটা প্রচণ্ড লোভ, না কি!"

যামিনী ও অনিমা পরস্পরের দিকে এক সঙ্গেই চাহিয়া দেখিল। অনিমা আগ্রহের সহিত কহিয়া উঠিল,—"জটিল বিষয়গুলো এক মুহূর্তে আপনার কাছে এমন সহজ হয়ে যায়! সত্যি আমার এখন মনে হচ্ছে ধরা যাক্ বিবেকানন্দ স্বামীকে যদি সমাজ থেকে 'ব্রাহ্মণ' বল্‌বার অধিকার দিত, তা' হ'লে এর চেয়ে কিছুই বেশী দিতে পারত না।"

দাদামহাশয় হাসিয়া নাতিনীর পিঠ চাপড়াইয়া কহিয়া উঠিলেন,—"ওরে আমাকে তোরা অত ক'রে 'নাই' দিস্‌নে। ঐ করে আমায় মাথায় তুল্‌বি দেখ্‌ছি।"

যামিনী হাসিয়া কহিল, "আপনি যে মাথায় রাখ্‌বার যোগ্যই দাদামশাই!" দাদামহাশয় হাসিয়া ধমক দিয়া কহিলেন, "থাম্ খোসামুদেরা থাম্। দেখ ভাই দিদি, সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, বাড়ী-টাড়ী কি আজ যাবিনে ঠিক করেছিস্ নাকি?"

যামিনী চকিত হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল। বাস্তবিকই সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। বাগানে পাখীর সাড়া-শব্দ প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে, এবং গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি-বর্ষণে সন্ধ্যাতেই চারিদিকের দৃশ্য ঝাপ্‌সা দেখাইতেছে। সে উঠিয়া আসিয়া দাদামহাশয়ের পদ-বন্দনা করিল। দাদামহাশয় কহিলেন,—"চল্লে নাকি?"

যামিনী কুণ্ঠিতস্বরে উত্তর দিল,—"আজকের মতন যাই। আবার সুবিধে পেলেই আস্‌বো।"

"হ্যাঁ এসো। বেশ ছেলে তুমি! তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। নাতনি! তুমি কি ওঁর সঙ্গেই যাচ্ছো?"

যামিনী জিজ্ঞাসুভাবে অনিমার মুখের দিকে চাহিল। সে চোখ নত করিয়া কহিল,—"না, আমি আজ এখানেই থাক্‌বো। আমি যাবো না।"

"থাক্‌বি? বলিস্ কি? এখানে কোথায় থাক্‌বি? ও বেলা তো

সেই হুঁকো আলোচালের ভাতে-ভাত খেয়ে আছিস্। না না, এখানে তোর ভারি কষ্ট হবে। যা', বাড়ী যা', আবার আসিস্।"

অণিমা দৃঢ়তার সহিত সংক্ষেপে কহিল,—"না।" যামিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, তাহার সঙ্গে যাইতে হইবে বলিয়াই হয়ত সে এমন সঙ্কোচ বোধ করিতেছে। তারা এর মধ্যে এত-খানি পর হইয়া গেল!—

কিন্তু অণিমার জীবনের এই পরিবর্ত্তন ও ইহার অভ্যন্তরের যে কি অনির্ব্বচনীয় শান্তি—তাহা সে অনুমান করিয়া উঠিতেও পারে নাই। সন্ধ্যার দীপ জ্বালিয়া দিলে দাদামহাশয় স্নান সারিয়া আহ্নিক করিতে অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। অণিমা একখানি আসন লইয়া পুবের বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। স্নিগ্ধ অন্ধকার সস্নেহে তাহার ললাটে অঙ্গুলি বুলাইয়া দিতে লাগিল,—উদার আকাশে অসীমের যে বন্দনা-গান বিবিধ তালে ও অপূর্ব্ব ছন্দে অনাদিকাল হইতে অনন্ত সুরে প্রতি দণ্ডে প্রতি পলে চিরদিন গীত হইয়া চলিয়াছে, তাহারই অচেনা ছন্দে তাহারই কোন ভাষাহীন ধ্বনির রেশ তার কানের মধ্যে ও তথা হইতে তাহার অন্তরাকাশে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

দাদামহাশয়ের গৃহে ফিরিতে অনেক রাত হইল। অন্ধকারে অদূরবর্ত্তী গঙ্গাজলের কল্লোল-স্বর, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর-রব এবং নিকট ও দূর হইতে বাতাসের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ থাকিয়া থাকিয়া ভাসিয়া আসিতেছে। ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ ছাইয়া কোটি কোটি তারকা তাদের অভেদ্য রহস্যপূর্ণ মৌন দৃষ্টি পরস্পর বিনিময় করিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণভাবে প্রাণপণে জ্বলিতেছে। অণিমা স্তব্ধ হইয়া নিজের আসনখানির উপর বসিয়া স্তম্ভিত বিশ্বের এই স্তব্ধতার নীরব বাণী শুনিতেছিল। দিবসের কোলাহলে যাহা শ্রবণ তথা অন্তরের নিকট হইতে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যায়, এমনই নিঃসঙ্গ অন্ধকারে

তাহা স্পষ্ট ও সুবোধ্যরূপে অন্তরের অন্তর্লোকে প্রবিষ্ট হইতে কোনই বাধা পায় না।

দাদামহাশয় কাছে আসিয়া ডাকিলেন,—"অণিমা!"

"আপনি এসেছেন" বলিয়াই অণিমা ত্রস্তে দাঁড়াইয়া উঠিল। "এস ঘরে গিয়ে বসি, ঠাণ্ডায় অসুখ করবে।" অণিমা তাঁহার অনুসরণ করিয়া বলিল,—"আমার অসুখ করে না। আচ্ছা দাদামশাই আপনি এতক্ষণ ধ'রে কি রোজই পূজো করেন? চার ঘণ্টা প্রায়!"

"চব্বিশ ঘণ্টা থেকে চার ঘণ্টা বাদ দিলে কত বাকি থাকে দিদি? শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই যে তাঁকে আমাদের ডাকা উচিত। অণুতে অণুতে যিনি আমার সঙ্গে মিলিয়ে আছেন, তাঁকে চারটে ঘণ্টা দিলে তো বড় বেশী দেওয়া হ'ল না রে। সবটাই যে তাঁর, দেবার কথা যে তাঁকেই।"

অণিমা কহিল,—"আচ্ছা দাদামশাই কতকগুলো ফুল-চন্দন নিয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাঁধা গোটাকতক মন্ত্র পাঠ ক'রে তাঁকে একটা জাঁকজমক দেখিয়ে না ডাক্‌লেই বা ক্ষতিটা কিসে? এটা শুধু বাহিক আড়ম্বর নয় কি?"

দাদামহাশাই গলার রুদ্রাক্ষের মালাটি নাড়িতে নাড়িতে মৃদু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কতকটা দেখানো তো বটে রে ভাই, ভান করতে করতেও যে কত কত পাপিষ্ঠ সাধু হয়ে গেছে সে সবই যে গল্প তাতো নয়। অনেকখানিই তার সত্য, নিয়ম জিনিষটির এমনই মজা যে হাজারও তোমার কাজ থাক্‌, দুঃখ থাক্‌, অসুখ থাক সেই সময়টিতে ঠিক কে যেন তোমাকে হাত ধরে টেনে তুলে দিয়ে মনে করিয়ে দেবে, 'ওরে এখন যে তোর পূজার সময় হয়েছে, যা'। আরও একটা কথা হচ্ছে, ঐ উপকরণগুলো সম্বন্ধে। দেখ, একটি শুদ্ধ কাপড় প'রে সুগন্ধি ধূপটি জ্বালিয়ে, মাজা তামার থালাখানিতে সুগন্ধ ফুল ক'টি সাজিয়ে, একটি কুশের আসন বিছিয়ে বসলে

জিনিষগুলির সংস্পর্শে তোমার মনের মধ্যেও তাদের মধ্যস্থ সত্ত্বগুণগুলি সংক্রমণ ক'রে, তোমার মনকে কতকটা পবিত্র ও সুস্থির করবেই। দ্রব্যগুণ তোমরা মান তো? একটি অণুপরিমাণ হোমিওপ্যাথি ওষুধ যদি একটা প্রচণ্ড রোগরূপী তমকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়, তা হ'লে সত্বপ্রধান শুভ্র বস্ত্র, তুলসী বা রুদ্রাক্ষ মাল্য, গন্ধ পুষ্প আর ধূপ অগুরুর গন্ধে রজটাকে তাড়িয়ে দিতে নাই বা পারবে কেন? ইষ্টমন্ত্রও ওই নিয়ম-পালনেরই চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নয়। একটি জিনিস—জিনিসটি খুবই ছোট্ট কিন্তু তার ভিতর তার অর্থের মধ্যে সৃষ্টি স্থিতি লয় এবং তারও পরের সংবাদ নিহিত হয়ে আছে। সেই ভাষা দিয়ে ক্রমে ক্রমে অর্থ এবং ভাবকে মনের মধ্যে আয়ত্ত করতে পারলেই আর কি,—সেই-ই তখন তার অভয় মন্ত্র হয়ে দাঁড়াবে। নিত্য নূতন কথার মালা গেঁথে দিলে তা' শুধু যে কতকগুলো কথাই থেকে যাবে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে না তো তা'তে কোন দিনও।"

দাদামহাশয় রাত্রে একটু দুধ ও ফল মাত্র গ্রহণ করিলেন। সুকুমার আসিয়া ডাকিল,—"মাসিমা খেতে আসুন।" আহারের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন, ইহা অণিমার এতক্ষণ মনেও ছিল না। অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ক'রে রান্না হ'ল সুকুমার?" সুকুমার হাসিয়া কহিল, —"যেমন ক'রে রোজ হয়। আমি লুচি ভেজেচি, আর গাছের বেগুন ভাজা করেচি, আর তো কিছুই বড় জানিনে'।"

অণিমা লজ্জায় মরিয়া গেল। ছি, ছি, সে কি আত্মবিস্মৃত! মাসী সম্পর্ক তার সঙ্গে, কোথায় সে বালককে একটুখানি স্নেহ যত্ন করিবে, তা' নয়, সে-ই রাঁধিয়া তাহাকে খাওয়াইতেছে। এই ব্যর্থ নারীত্ব লইয়া কোন্ অভিশপ্ত কর্মফলে সে এই রমণীদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল? ভগবানের এমন বোকার মত কাজ কখন হইতে পারে? দুষ্ট প্রকৃতিরই এই একান্ত উপহাস!

ভোরের বেলা কাক-কোকিল না ডাকিতে গঙ্গাস্নান সারিয়া পট্টবস্ত্র পরিয়া কতকগুলি যুঁই মল্লিকা ও গোলাপফুল একখানি পাত্রে লইয়া নিঃশব্দে পূজাগৃহে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরে ধূপ ও অগুরুর গন্ধে বাসি ফুলের গন্ধ মিশিয়া ভাসিতেছিল। দাদামহাশয় তখনও গঙ্গাতীর হইতে ফিরিয়া আসেন নাই। দেব-গৃহে কোন দেবতা ছিলেন না, কেবল একখানি পাথরের চৌকির উপরে অপর্য্যাপ্ত গন্ধপুষ্প সম্মুখে সাজানো এবং দেওয়ালের গায়ে বার্নিস করা চওড়া ফ্রেমে আঁটা যে মহাপুরুষের বৃহৎ তৈলচিত্র রহিয়াছিল, আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে এখনও তাঁহার অমৃতনিষ্যন্দিনী বাণী ভৈরবমন্ত্রে নির্ঘোষিত হইতে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। সে ধূলায় লুটাইয়া সেই শূন্য মন্দিরের অদৃশ্য দেবতাকে অন্তরের সহিত প্রণাম করিল।

ছায়ার মত অনুসরণ করার একটা উৎকট আনন্দ আছে, সেই আনন্দ সে তার এই হঠাৎ-পাওয়া দাদামহাশয়ের নিকট হইতে রীতিমত উশুল করিয়া লইতেছিল। দাদামশাই স্বপাকে খান। রান্নার দরকার অনিমা, সুকুমার ও মালীর জন্য। অনভ্যস্ত রন্ধনের ভার লইতে গিয়া যখন সে সঙ্কুচিত-পদে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দাদামহাশয় চোখে চশমা আঁটিয়া গীতাপাঠ করিতেছিলেন। চশমার কাচে ছায়া পড়িতেই মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিগো, রাঁধ্‌তে গিয়ে ফিরে এলি যে? যা না আজ একটু খিদে পেয়েছে যে। আর কি, বুড়ো হ'চ্ছি, এখন ভাল ক'রে রেঁধে বেড়ে খাওয়া-দাওয়া, কোন্ দিন টপ্‌ ক'রে ম'রে যাবো।"

সে যাহা জানিতে চাহিতেছিল, তাহা প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়াই মীমাংসিত হইয়া গেল। হৃষ্টচিত্তে সুকুমারের সাহায্য লইয়া সে রন্ধনে মন দিল। কান্তিবাবু ও যামিনীকে সে শুধু এক সময় কেতাবের সাহায্যে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছিল, আর আজ আবার এই আয়োজন।

কথায় কথায় সেদিনও কোথা দিয়া চলিয়া গেল জানিতেও পারা গেল না। এক সময় অণিমা কহিল,—"একটা আমার বড় খারাপ লাগে, শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের ও শূদ্রের অধিকার নাই কেন? এ পক্ষপাত অহেতুক।"

দাদামহাশয় স্নেহের সহিত নাতিনীকে দেখিতে দেখিতে মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"না অহেতুক নয়। ক'জন স্ত্রীলোক ঘরসংসার স্বামিপুত্রের সুখ ত্যাগ করে শাস্ত্রতত্ত্বালোচনা করতে যাচ্ছে, বল্ তো দিদি? নারী বলতে এখানে যার মধ্যে প্রকৃতির অংশ বেশী কাজ করছে, এইটেই বুঝতে হবে কি না। প্রকৃতিকে যে যতটা পরাভব করতে সমর্থ হয়েছে তার মধ্যে 'পুরুষের' প্রকাশ ততোখানি হয়েছে। সে সেই পরিমাণে প্রকৃতির হস্তচ্যুত। এই রকম নারীদেহধারিণীদের তো কোন শাস্ত্রেই অনধিকার নেই। গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী মদালসা এঁরা ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী। একালেরও কেউ কেউ সেরকম আছেন—যেমন মীরা, করমেতি, আরও কত কত জ্ঞাত, অজ্ঞাত সাধিকা ছিলেন—এখনও কেউ কেউ আছেন। শূদ্র সম্বন্ধেও সেই কথা, তখনকার অনার্য্যরা যারা শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হয়েছিল, এখনকার চেয়ে অনেক ভিন্ন প্রকৃতির ছিল তো, শাস্ত্রের সমুদয় সূক্ষ্ম তত্ত্ব ভাল করে না বুঝে উল্টো পথে যাবে ব'লেই তাদের জন্যে সহজ পথে অন্য ভাবের শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বেদে উপনিষদে যা আছে, অষ্টাদশ পুরাণে আর গীতায় তার চেয়ে কোন্ কথাটা খাটো ক'রে লেখা আছে ভাই? বিশেষ বেদমন্ত্রের উচ্চারণ বড়ই দুরূহ, স্ত্রীলোক এবং শূদ্র জাতির মুখে মুখে সে শ্লোকাবলী অত্যই বিকৃত হয়ে দাঁড়াতে পারে, সেই জন্যই প্রধানতঃ এইরকম কঠোর ভাবে নিষেধের কারণ। তখনকার শাস্ত্র তো ছাপার কেতাবে লেখা ছিল না। কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর সম্পত্তিরূপে তাই তাকে অধিকৃত রাখা হত। 'শ্রুতি'

এবং 'শক্তি' রূপ। তার মধ্যে বিকৃতি ঘটানো যে কত বড় বিপদের কথা তা' বোধ করি সহজেই বুঝতে পারবে? যোগ্যকে কেউ তার উপযুক্ত অধিকার থেকে কোনদিন বঞ্চিত করতে পারে না। স্নেহময়ী মা-ই তাকে নিজে ডেকে নিয়ে তার যথাপ্রাপ্য দিয়ে দেন। আচ্ছা দিদিমণি, তুমি তো আমাকে অনেক জেরা করলে, এখন আমি একটি কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দাও তো। আশা করি কিছু লুকবে না। উত্তরটা ঠিকই দেবে? কেমন না?"

অণিমা অত্যন্ত বিস্ময় অনুভব করিল, কি সে প্রশ্ন! প্রকাশ্যে সবিনয়ে উত্তর করিল,—"সাধ্য হলে নিশ্চয়ই বলবো বইকি দাদামশাই।"

"যামিনীপ্রকাশকে তুমি বিবাহ করতে অনিচ্ছুক কেন?"

অণিমার চারিদিকের আলো একমুহূর্তে যেন সায়াহ্ন ছায়ায় মিলাইয়া গেল।

দাদামহাশয় কহিতে লাগিলেন—"সে তোমার অযোগ্য তো নয়। তবে কি সেই পূর্ব্ব-প্রত্যাখ্যানের অভিমান আজও মনের মধ্যে পুষে রেখেছ?"

অণিমা মুখ নত করিয়া রহিল, বহুক্ষণ পরে সেইরূপ থাকিয়াই উত্তর করিল,—"না, দাদামশাই, এ দুইএর একটাও নয়।"

"কি তবে? তুমি তাকে ভালবাস না; যদি মনে ক'রে থাক, সে তোমার অত্যন্ত ভুল অণিমা! নিজেকে নিজের দ্বারা প্রতারিত ক'র না। এ কয়দিনে আমি বুঝেছি, তুমি তোমার সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়ে প্রাণ মন ঢেলে দিয়ে ওই প্রত্যাখ্যাতকেই অন্তরের সঙ্গেই ভালবাস। তবে কেন এ আত্মনিগ্রহ এবং তাকেও দুঃখ দেওয়া?"

অণিমা আর্ত্তস্বরে ডাকিল, "দাদামশাই!"

"দিদিমণি!"

"আমায় কিছু বলবেন না, আপনি শুধু অমন গম্ভীর মুখ ক'রে

বক্বেন না আমায়। আপনারা জানেন না, আমি যে কত সহ্য করেছি,—আজও করছি।"

"কিন্তু কেন? কেন করছো দিদি? দেশের কাজে যার সাহায্যের হাত তোমার সব চেয়ে প্রয়োজনীয়, সেই হাতকে কেন আঘাত ক'রে ঠেলে দিচ্ছ? প্রকৃতি যখন ক্রিয়মাণা তখন পুরুষ-চৈতন্ত ব্যতীত তাঁর ক্রিয়া তো সফল হ'তে পারবে না?"

"তোমার ব্রহ্মকে কোনদিনই চিনিনি, দাদামশাই—আমি চিনেছিলাম, সত্যকে। কিন্তু সে তো তোমারই সেই সৎস্বরূপ,—যাঁর আনন্দরূপ আমি তোমার কাছে এসেই শুধু একটুখানি উপলব্ধি করতে পেরেছি। যে অপরাধে মিহিরকে ক্ষমা করতে পারিনি, সেই একই অপরাধের দণ্ড থেকে কি নিজেকে মুক্তি দিতে পারি?—না, কখনও না। বাবার আদেশ আমার অলঙ্ঘ্য ঈশ্বরাদেশ। তাই যেদিন তাঁর ইচ্ছায় এ জীবনের সাংসারিক সুখসাধে জলাঞ্জলি দিয়েছিলাম, সেই দিনই যে কঠোর প্রতিজ্ঞা নিতে বাধ্য হয়েছিলাম,—অবশ্যই আত্মরক্ষার জন্যে নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই তাকে উপায় ব'লে ধরেছিলাম, কিন্তু আজ সে-ই আমার উদ্বন্ধন হয়ে বসেছে।—তাই ব'লে কি সত্য হ'তে বিযুক্ত হবো! দুঃখের ভয়ে যদি আজ সত্যকে ত্যাগ করি, তবে তাকে আর 'সত্য' আখ্যা দেবো কোন্ মুখে? যা' অবিচল, যা অপরিবর্ত্তনীয়, সৎস্বরূপ তা-ই যদি সত্য হয়, তবে সেই সত্য কি মানুষের কোন লাভ-লোকসানের মুখ চেয়ে পরিবর্ত্তিত করা চলে?—থাক্ দাদামশাই, মৃত্যুর পরোয়ানা পুনঃ পুনঃ নিজমুখে পাঠ ক'রে আর কি ফলই বা হবে?—তার চাইতে বরং আপনি দু'টো ভাল কথা বলুন; আমি শুনি, আর আপনাকে পাওয়ার সুখের মধ্যে সকল দুঃখ এবং সমুদয় ক্ষতিকে নিমগ্ন ক'রে দিই। এর বেশী এজন্মে আর কিছু আমার জন্যে পাওয়া নেই!"

সেদিন বাড়ী ফিরিয়া যামিনী ঈষৎ বিস্ময় অনুভব করিল। তার বসিবার ঘর, কাজ করিবার ও শয়নের গৃহ যেন সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। জিনিসপত্র সমুদয় সুবিন্যস্তভাবে সাজানো। টেবিলের কাপড়, চেয়ারের আস্তরণ, পর্দা—সমস্তই ধব্ধবে করিয়া কাচা। ছোট ছোট ফুলগাছের যে টবগুলা এতদিন খালি পড়িয়াছিল, তাহাতে বাগান হইতে বিলাতি পাম্ ও শীত ঋতুর বাহারে ফুলের গাছ বসাইয়া জানালার ধারে ধারে বারান্দার থাটালে থাটালে স্থাপন করা হইয়াছে। দোয়াতগুলির কালি উঠাইয়া মাজা এবং কলমগুলির নিব পর্য্যন্ত সযত্নে মুছিয়া রাখা। দাসদাসীদের হাতে এ ঘর কখনও এমন ছিমছামরূপে সাজানো গোছানো হইতেই পারে না,—এমন রুচিই যে তাদের নাই। যামিনী কৌতূহলের সহিত চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

একটি ছোট সাদা পাথরের টিপয়ের উপর বিচিত্র ফ্রেমে আঁটা যামিনীরই একখানা ফটোগ্রাফ বহুদিন হইতে পড়িয়াছিল। ধূলা লাগিয়া ফ্রেমটার পূর্ব্ব ঔজ্জল্যের কোনও চিহ্নও তার ছিল না। সেইখানাই আজ যেন সব চেয়ে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সযত্নে মার্জ্জিত করিয়া কেহ তাহার চারিদিকে একটি জুঁইফুলের মালা দিয়া ঘেরিয়া দিয়াছে।—এ কি গভীর প্রীতি-নিদর্শন! স-ভক্তি পূজারাধনা!—এ কি সবই অর্থহীন?—অথবা এর কোন নিহিতার্থ আছে?

আহারে বসিয়া যামিনী সৌদামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আজকের মাছটা যে ঠিক ইন্দ্রনাথবাবুর বাড়ীর ধরনের রান্না হয়েছে দেখছি, তাঁরা পাঠিয়েছেন নাকি?"

সৌদামিনী কহিয়া উঠিলেন,—“ঐ দেখ এমনি ভুলো মন হয়েছে, বলবো বলবো ক’রে ভুলেই গেছি একেবারে! আজ ওরা দু’টি বোনে যে বেড়াতে এসেছিল। বড় বোনটি হরিশের বউকে দেখতে গেল। এই সন্ধ্যের আগে কিছুক্ষণ হ’ল এসে ছোট বোনকে নিয়ে গেছে। কখনও তো ওকে দেখিনি,—আহা খাসা মেয়েটি।”

যামিনীর চোখের পর্দ্দা চট করিয়া এক মুহূর্ত্তে সরিয়া গেল। এ রন্ধন জ্যোৎস্নার হাতের, ওই গৃহ-মার্জ্জনের মধ্যেও সেই সেবাকুশল ছোট হাতদু’খানিরই চিহ্ন প্রকটিত! কিন্তু কেন?—এ সব কেন? পিসিমা আগ্রহের সঙ্গে কহিতে লাগিলেন,—“এমন মেয়ে কখনও দেখিনি বাবা! একদিনের দেখায় বাছা যেন আমায় মায়ার বন্ধনে বেঁধে রেখে গেছে গো! আমার ভাঁড়ার গুছানো, রান্নাঘর সাফ করা থেকে তোর বৈঠকখানা পর্য্যন্ত সারা বাড়ী এক দণ্ডের মধ্যে যেন ঝকঝকে ক’রে দিয়ে গেল—কতক্ষণই বা সময় লাগলো। বারণ করলেই হাসে, বলে ‘আপনি একলা মানুষ সব তো পেরে ওঠেন না,—একদিন এসেছি যদি তো একটু সাহায্য আপনাকে করলামই বা! বাড়ীতে কি করি না।’ যেমনই নম্র, তেমনই মিশুকে, আবার তেমনি কি গতরে। আহা হা,—চমৎকার মেয়ে!—জোছ্‌না তো যেন সগ্‌গের জোচ্ছনা! যার ঘরে যাবে, সে তপস্যা করচে। বউ হবে তো অমনি।” পিসিমা নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

এমন যত্ন এত সেবাকাঙ্ক্ষার অর্থই বা কি? বিস্ময়ে, সন্দেহে, চিন্তায় যামিনীর হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। এতদিন জ্যোৎস্নাকে মনে করিতে গেলে কেবল একটি লজ্জারক্তিম, নির্ব্বাক প্রস্তর-প্রতিমা ভিন্ন আশা-নিরাশায় ভরা, আকাঙ্ক্ষায় সুখ-দুঃখে আকুলিত, স্নেহ-প্রেমে গঠিত মানবের অন্তঃকরণ-বিশিষ্টা কোন তরুণীমূর্ত্তিকে তার কোনদিনও মনে পড়ে নাই। আজ তাহার নিভৃত হৃদয়ের এইটুকু পরিচয় পাইয়া

সে যেন আজ কল্পনার সহিত একটু আশ্চর্য্যানুভব না করিয়া পারিল না। ক্ষুদ্র একটি নির্ঝরের মধ্যে যেন অতলস্পর্শী সাগরপ্রবাহ দেখিতে পাইল।

বাহাত্তর

বরেন্দ্র মুন্সেফি লইয়া কর্মস্থানে চলিয়া গেল। বরেন্দ্রকৃষ্ণ নিজের জমিদারীর একটা পাকা রকম বন্দোবস্ত করিয়া কার্ত্তিকের প্রথমেই এখানে ফিরিয়া আসিল। এতদিনে আতুরাশ্রমের গৃহনির্মাণ শেষ হইয়া গিয়াছিল, তার নাম হইয়াছিল সেবাগৃহ। তার জন্য পরিদর্শকসমিতি গঠিত হইয়াছে। হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সিবিলসার্জ্জন্ এবং নবীনবাবু যামিনী বরেন্দ্র প্রভৃতি সাতজন দেশীয় ভদ্রলোক লইয়া সেই কার্য্য-করী কমিটি গঠিত হইয়াছিল। দেশের রাজা ইংরেজ। রাজার সাহায্য-হস্ত গ্রহণ না করিলে এখনও আমাদের কোন কার্য্য সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়া উঠে না, তাই ম্যাজিস্ট্রেটপ্রভৃতিকে ভিতরে লওয়া হইল, নহিলে বরেন্দ্রকৃষ্ণ এবং অংশতঃ যামিনীই তাদের নিজেদের উপর কার্য্য-নির্ব্বাহের সমুদয় ভারই গ্রহণ করিয়াছিল। বালিকা-বিদ্যালয়টিও এইরূপ একটি কমিটির লোকেদের হাতেই ছিল। সহরের স্কুলটি হঠাৎ উঠিবার সম্ভাবনা ছিল না, যেহেতু ইহাতে গর্ণমেণ্টের সহানুভূতি ও সাহায্য দুই-ই ছিল। এইটুকুর জন্যই স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে গেলে চেষ্টা সফল হওয়ায় ব্যাঘাত পড়ে। এদেশের লোকে এখনও স্বাধীন ভাবে কোন কাজ করিতে সাহসী হয় না। এর সুস্পষ্ট অর্থ এই যে দেশের লোককে তাহারা যথার্থ আপনবোধে এখনও বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিতে শিখে নাই, মক্ষিকার ন্যায় 'ব্রণে'র সন্ধানই করিতে ব্যাপৃত—মধুর অন্বেষণ করে না। দেশের লোকের

কোন সন্তানই তারা খুঁজিয়া পায় না এবং বোধ করি সেই কারণেই কেহ কাহাকেও নিজের উপরওয়ালা ভাবে সহ্য করিতেও অসমর্থ। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধাতা তাহাদের জন্ম যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদেরও কোন আপত্তি নাই। এ দেশের লোকের আর যতই দোষ থাক, এবিষয়ে বিশেষ একটা সহিষ্ণুতা আছে, একথা কে না স্বীকার করিবে? তাহারা বিধাতার দেওয়া সকল দণ্ডকেই তাঁহার দানস্বরূপে শান্ত ভাবেই যেমন গ্রহণ করিতে পারে, তেমন আর কোথাও কোন দেশেই আর কেহ পারে না।

অণিমা এখন অধিকাংশ কালই কাশীপুরে কাটায়। দাদামহাশয়ের অনুযোগে মধ্যে মধ্যে বাড়ী আসিলেও সেখানে আর সে বেশী দিন তিষ্ঠিতে পারে না।

দাদামহাশয় নাতিনীকে এড়াইতে না পারিয়া স্বয়ং একদিন আসিয়া তাহাদের আশ্রম-প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। তারপর অবশ্য আর একদিন রাজ-কর্মচারী ও বাহিরের লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাহ্য আড়ম্বর দেখাইতেও হইয়াছিল। কিন্তু অণিমা মনে মনে জানিত সেটা কোন কাজেরই নয়। দাদামহাশয়ের সেই সৌম্য মূর্তিখানিই তার পূর্ণ মঙ্গলাচরণ। তাঁহার স্মিত হাস্যমণ্ডিত মহিমময় মুখ অনন্তস্বরূপের আনন্দ-জ্যোতির রেখায় উজ্জ্বল বলিয়াই না অমন সুন্দর, অমন উদার!

একদিন কাছারী হইতে ফিরিয়া যামিনী শুনিল ইন্দ্রনাথবাবুর মেয়েরা আসিয়াছেন। যে কথাটা নানান গোলমালে চাপা পড়িয়া আসিয়াছিল সেইটে যেন হঠাৎ ইহাতে জাগিয়া উঠিল।

ইন্দ্রনাথবাবুর মেয়েরা—? জ্যোৎস্নাও হয়ত আসিয়াছে? এ কি ভাল হইতেছে? সে এই সব ভাবিয়া দূরসম্পর্কীয়া এক জ্ঞাতি ভগিনীকে

সম্প্রতি নলিনীর শিক্ষার ভার লইবার জন্য বাড়ীতে আনাইয়াছিল। ওই মেয়েটাকে চিরদুঃখী করিয়া ফেলিবার পথে সে একটুকুও সাহায্য করিতে পারে না। আবার মাঝে হইতে এই ঘনিষ্ঠতা পাতাইয়া তার ক্ষতি করিতে বাড়ীর লোকেদের এ আগ্রহ কেন? কিন্তু তারা হয় তো কিছুই জানে না।

অমলার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে আতুরাশ্রমটারই কথা পাড়িয়া কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণের অনেক সুখ্যাতি করিল। কিন্তু কথা যেই বেশ একটু জমিয়া আসিয়াছে, অমনই সে হঠাৎ আকস্মিক ভাবে এমনই একটা প্রশ্ন করিয়া বসিল, যে, তাহা অকস্মাৎ যামিনীকে গম্ভীর করিয়া তুলিল। সে মৃদুস্বরে উত্তর করিল,—"আপনাকে এ কথা কে বল্লে?"

"সত্য কথা কি কখনও চাপা থাকে? এখন বল তো কবে আমরা আমাদের চক্ষু সার্থক করবো?"

যামিনী আরও একটু গম্ভীর ও ভিতরে ভিতরে বেশ বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল যে তাহার উপর একটা পরীক্ষা চলিতেছে, স্থিরকণ্ঠে কহিল,—"কথাটা মোটেই সত্যি নয়।"

অমলা ঈষৎ থমকিয়া গেল, একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তারপর চোখ নত করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল,—"মিস্ দত্তর সঙ্গে তোমাকে মিলিত দেখবার জন্যে আমরা যে অনেক দিন থেকেই উৎসুক আছি।"

ইহা সে প্রশ্নের মত করিয়া না উচ্চারণ করিলেও কণ্ঠস্বরে একটা কৌতূহলপূর্ণ জিজ্ঞাসা প্রকটিত হইয়া পড়িল। যামিনী এ কথার কোন উত্তর না দিয়া টেবিলটার মাঝখানের জিনিসপত্রগুলার উপর চোখ ফিরাইয়া রাখিতে গেল। সেখানে সব চেয়ে আগেই চোখে পড়িল, সেই রূপালী কাজ করা ফ্রেমের ভিতরকার নিজের ছবিখানা! এইখানাকে সে সেদিনের পর হইতে একটুখানি ঈর্ষাপূর্ণ শ্রদ্ধা না করিয়া যেন কোন মতেই

পারিতেছিল না। সে তার রক্তমাংসের শরীরে সমুদয় অন্তর-বাহিরের দোষ, গুণ, আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা লইয়া যাহা পায় নাই, এই জড় অচেতন পদার্থটা তাহার সেই অভাব পূর্ণ করিয়া লইয়াছে! সে যে প্রভাত-শিশিরসিক্ত শুভ্র শেফালিকারই মত কুমারীচিত্তের অম্লান একনিষ্ঠ প্রেমপূত অঞ্জলি লাভ করিয়াছিল, এ পৃথিবীতে জন্মিয়া কয়জন ভাগ্যবানের ভাগ্যে সেই সুপবিত্র, দেবভোগ্য বস্তুলাভ ঘটিয়া থাকে? বাণীপদলাঞ্ছিত কনককমলতুল্য কোমল করপল্লবের সেই সপ্রেম উপহার সে কণ্ঠে বরণ করিতে না পারুক,—সেই চিত্তশতদলের যে সুরভি-আঘ্রাণ সে পাইয়াছিল তাহা তাহার বরণীয় না হইলেও গভীর শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয় হইয়া থাকিবে তাহাতে একটুও সন্দেহ নাই। ধীরে ধীরে সে দৃষ্টি সরাইয়া লইল।

অমলা কহিল,—"দেখ প্রকাশ, আমরা পরস্পরকে যে রকম চোখে দেখে আসছি, তাতে বাইরের লোকের মত মাপে মাপে না কথাবার্ত্তা ক'য়ে যদি আপনার জনের মত একটু কৌতূহল প্রকাশ ক'রেই ফেলি, সেটাকে বিরুদ্ধভাবে নেবে না তো?"

অমলার প্রশ্নের ভাবার্থ যামিনীর কানে ঠেকিয়াছিল, সে ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিল,—"আমি আপনাদের কাছ থেকে আপনার জনের মত ব্যবহারই তো প্রত্যাশা করি দিদি! আর আমার বিশ্বাস—তা' পেয়েও আসছি। আমিই শুধু নয়, আমরা সকলাইই।"

"তোমাদের বিয়ের যে গুজবটা শোনা যায়, সেটা তবে মিথ্যা? কারণ বোধ হয় পূর্ব্বের সঙ্গে একই?"

"প্রায় তাই।"—যামিনী সহজ ভাবেই জবাব দিল।

অমলা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"পিসিমার একান্ত ইচ্ছা, আমাদেরও খুব সাধ, তুমি নিজের সমাজের একটি মেয়েকে পছন্দ ক'রে বিয়ে কর। যদি মত দাও, আমরা মেয়ে খোঁজ করি।"

যামিনী অমলার সাগ্রহ-দৃষ্টির সহিত বিষণ্ণ-দৃষ্টি স্থির করিয়া কহিল,—"আমার কি আর বিয়ের বয়স আছে, না আমার মতন সন্তানের পিতার আর বিয়ে করা সাজে? আমি আর বিয়ে করবো না। আশীর্বাদ করুন, আমার নলিনী বেঁচে থাক্।"

অমলা যামিনীকে চিনিত, তাহার কণ্ঠস্বরে সে বিশেষ আশা পাইল না। ইহা যে বিপত্নীকের বাঁধা বুলি নয়, ইহা বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—"কিন্তু এই বয়স থেকে তুমি সংসারত্যাগী হয়ে থাকবে যামিনী, সেটা কিন্তু আমাদের বড় বাজবে।"

"সংসারত্যাগী বলচেন কেন? সংসারে এখনও কত কাজ, সব যদি করতে যাই, কোটি জন্ম ধ'রে খাটলেও তা শেষ হয় না। অবসর যত বেশী পাই, ততই তো ভাল? কেন মনে কষ্ট করচেন?"

অমলা একটু নিরুৎসাহিত ভাবে বলিল,—"পিসিমার খুবই ইচ্ছে, আর নলিনীকে দেখাশোনার জন্তেও তো একটি ভাল মায়ের ওর দরকার।"

যামিনী ঈষৎ গম্ভীর হইয়া জবাব দিল, "ওর বাপই ওকে দেখবে দিদি! আপনার ছোট ভাইকে এত অক্ষম মনে করেন?"

ত্রিপঞ্চাশ

যামিনীর কাছে হতাশ হইয়া অমলারা জ্যোৎস্নার অন্যত্র বিবাহ দেওয়াই ঠিক করিল। নূতন ডেপুটি ইন্দুভূষণ ছেলেটি খুবই ভাল, রূপ গুণ বিদ্যা এবং ভবিষ্যতের আশা তার যথেষ্টই। বিবাহের কথা পাকা হইয়া গেল। কিন্তু এদিকে বিপদ ঘটিল জ্যোৎস্নাকে লইয়া। সে বিবাহ করিবে না বলিয়া একেবারেই বাঁকিয়া বসিল। অমলা ও যোগমায়া নিজেরা অনেক বুঝাইয়াও

যখন তার মত বদলাইতে পারিল না, তখন পিতার শরণাপন্ন হইল। ইন্দ্রনাথবাবু মেয়ের মাথায় স্নেহহাত আবর্ষণ করিয়া গভীর স্নেহের সহিত কহিলেন, "কেন মা! বিয়ে করবে না কেন বল তো! আমাদের সমাজ এখনও সেরকম হয়নি, তা' ছাড়া নারীশক্তির একক কর্মসামর্থ্য অল্প, উপযুক্ত পুরুষের সহকারিণী রূপেই তার প্রকাশ পাওয়াতেই তা সর্ব্বতোভাবে সার্থক হয়, ইন্দুভূষণ ছেলেটি সকল দিক দিয়েই যোগ্যপাত্র। তুমি আর অমত করো না, তোমার মা তোমার দিদি বড্ড দুঃখ পাবেন।"

পিতার আদেশ অগ্রাহ্য করিবার সাধ্য কন্যার নাই,—সে গোপনে গোপনে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেও তাঁর কথার প্রতিবাদ করিতে পারিল না।

গভীর রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া অমলা জানিতে পারিল, জ্যোৎস্না জাগিয়া আছে এবং তার নীরব ক্রন্দনও অনুভব করিল। কাছে সরিয়া আসিয়া গায়ে হাত দিয়া ডাকিল, "জ্যোতি!"

"দিদি" বলিয়া জ্যোৎস্না জলভরা অস্ফুটস্বরে জবাব দিল।

"লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে বেড়ালে কি হবে? মনটা স্থির করে নে, কেন অমন করছিস বল তো?"

"দিদি! বিয়ে তোমরা আমার একটা দেবেই? কিছুতেই ছাড়বে না? আমি চিরদিন দুঃখ পাবো জেনেও দেবে?"

অমলা গভীর বেদনার শ্বাস মোচন করিল, "কেন তুই এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলি। আর এ'ও কথা—বল্লেই বা কি করতে পারতুম আমি! যামিনী যে গোড়া থেকেই মিস দত্তকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, এ তো সব্বাই জানে আর তার জন্যেই যখন সুনন্দার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়, সে সময় তোর সঙ্গেও তো বিয়ের কথা ওঠে, আমি তখন শুধু ঐ জন্যেই মত দিতে পারিনি। এখন বুঝি খুবই ভুল, খুবই অন্যায় করেছি কিন্তু এখন আর

উপায় নেই। তার মন আমি আগেই বুঝেছি, সে আর বিয়ে করবে না। অনর্থক আলেয়ার পেছনে ছুটে কি সুখী হতে পারবি ?"

"দিদি! সবাই কি জগতে সুখী হয় ? তুমি হয়েছ ?"

অমলা আবার একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল, "আমার কথা ছেড়ে দে তাঁকে বুকের মধ্যে রেখে সংসারের কর্তব্য যেটুকু পারি করে যাচ্ছি। মনে আশা আবার তাঁকে একদিন পাবো এবং এবার তাঁকে আর হারাবো না।"

"তুমি যা পারো তোমার বোন হয়ে আমি তা পারি না এই কি তুমি মনে করো ? আমিও অমনি করেই জীবন কাটাবো কিন্তু আর কারুকে বিয়ে আমি কিছুতেই করতে পারবো না। অনেক ভেবে দেখেছি,—না পারবো না।—শুধু যদি নলিনীকে পেতুম !"

"হতভাগী এ'কি করলিরে! এখন বাবার মুখ থাকে কোথায়! কি যে করি তোকে নিয়ে।"

এর ঠিক পরের দিনই রাস্তায় চলিতে চলিতে ইন্দুভূষণের সঙ্গে যামিনীর সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। ইন্দু বলিল, "চলুন, একটু কথা আছে আপনার সঙ্গে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে হবে না।"

যামিনীর বাড়ী কাছেই। দু'জনে আসিয়া তার বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল। ইন্দু একখানা মেয়েলী হাতের লেখা চিঠি বুকপকেট হইতে বাহির করিয়া তার হাতে দিয়া বলিল "চিঠিখানা পড়ুন দাদা!"

যামিনী চিঠি বাহির করিতে করিতে বলিল, "কি, ব্যাপার কি ?"

চিঠিপড়া হইয়া যাইতে গভীর উত্তেজনার সহিত বলিয়া উঠিল, "এ কোন গুপ্তশত্রুর কাজ! না না, বিশ্বাস করো না, ও'দের বাড়ী একটি পবিত্র তীর্থ, ঐ পরিবারটি একটি আদর্শস্থানীয়। এমন শত্রু ওঁদের মত লোকেরও আছে, আশ্চর্য্য !"

ইন্দু ক্ষণকাল যামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল, পরে সংযতস্বরে কহিল, "আমার কিন্তু সন্দেহ এ চিঠি কোন শত্রুতে লেখেনি, লিখেছেন তিনি নিজেই। এই দেখুন না, এই যে কথাগুলি, এ আর কে লিখবে, তিনি নিজে ছাড়া? ঐ অভাগী মেয়ে তার কিশোর বয়স থেকেই তার সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিল, অভিভাবকদের অতি-সাবধানতার মিলতে পারেনি, কিন্তু আজও সে তেমনি বাসে। এ জন্মে তাঁকে সে পাবে না, তাও সে জানে, কিন্তু সূর্য্যমুখী সূর্য্যকে পাবে না জেনেও কি তার সমর্পিত দেহমন তাঁর থেকে ফিরিয়ে নিয়েছে! একলব্যের মত তাঁর এই নীরব ভক্ত গোপনেই তাঁর পূজা করে যাবে। আর মতন গুরু-দক্ষিণা দিয়ে নিজেকে ধন্য করতেও হয়ত সে সুযোগ পাবে না। নাই পেলে। কিন্তু সে মহত্তম দুঃখে পড়বে যদি এ খবর পাবার পরেও আপনারা তার অভীষ্ট পথ থেকে বিচ্যুত করে দেন! যামিনীদা, আমার আর বিয়ে করে কাজ নেই! আপনিই ওদের বলে দেবেন, আমার বুকে পুরোন প্লুরিসির ব্যথা ফের চাগিয়েছে, হয়ত তা থেকে থাইসিস হতে পারে, তাই বিয়ে আমি করা সঙ্গত মনে করছি নে। যাক কাজটাই যখন হয়ে গেল এত সহজে তখন অফিসে দেরি করি কেন। চল্লুম—বলবেন, আজই বলে দেবেন।"

ইন্দু নমস্কার জানাইয়া দ্রুত চলিয়া গেল।

যামিনী বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সেই শান্তশিষ্ট মেয়ে জ্যোৎস্না, সে এই চিঠি লিখিয়াছে, আর যেসব কথা লিখিয়াছে,—এ কি সম্ভব? সংসারে দেখছি কিছুই অসম্ভব বলে নেই। তাই কি সে ইদানীং এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে? নলিনীকে—নাঃ, আর আমি পারি না। ভগবান! আমার মত সামান্য লোকের ক্ষুদ্র জীবনে বারে বারে এ'কি জটিল সমস্যার জাল বুনে এ কিসের খেলা তুমি খেলাচ্ছো? আমি যে দিশাহারা হয়ে যাচ্ছি!"

কাছারী-ফেরৎ অমলাকে নিবিষ্ট চিত্তে পিসিমার সহিত গল্প করিতে দেখিয়া মনের মধ্যে দারুণ আশঙ্কিত হইয়া উঠিল। কাছারী যাইবার পূর্ব্বেই সে ইন্দুর কল্পিত রোগের কাহিনী সে ইন্দ্রনাথবাবুকে লিখিয়া জানাইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে অমলা কি উদ্দেশ্য লইয়া তাহাকে ধাওয়া করিল?

শীঘ্রই সেটা জানা গেল। জলযোগের পর ঘরে ঢুকিতেই অমলাও অন্ত দ্বারপথে আসিয়া প্রবেশ করিল। কোন ভূমিকা না করিয়াই সে বলিয়া উঠিল, "প্রকাশ! তোমার ইন্দু তো এতদূর এগিয়ে এসে আবার পিছিয়ে গেল! এ দিকে জ্যোৎস্নাও তো ধনুর্ভঙ্গ পণ ধরেছে সে বিয়ে করবে না, কি যে তাকে নিয়ে করি! আর এই ইন্দুর ব্যাপারটাই বা কি—ও কি! এ কার চিঠি প্রকাশ, জ্যোতির হাতের লেখা যে!"

যামিনী নীরবে পত্রখানি অমলাকে প্রদান করিল। অমলা মনে মনে পত্র পাঠ করিয়া উহা যামিনীর হাতে ফেরৎ দিল, সনিশ্বাসে কহিয়া উঠিল, "পোড়া মেয়ে এই করেছে বুঝি! সেই জন্মেই ইন্দুভূষণ অন্য ভাবেই সরে দাঁড়িয়েছে! যাক্—একরকম ভালই হয়েছে, আরও বেশী যে কিছু কেলেঙ্কারী হয়নি! এততেও কি তুমি বুঝতে পারছ না প্রকাশ! আরও কি স্পষ্ট করে তোমায় বলে দিতে হবে যে তোমাকে, একমাত্র তোমাকেই জ্যোতি ভালবাসে, আর তুমি ছাড়া কাউকেই বিয়ে করতে রাজী হবে না।"

যামিনী কাতরভাবে কহিয়া উঠিল, "দিদি! দিদি! আমায় দয়া করুন! আজ আর আমি কোন কথা শুনতে পারবো না। আর কোন নতুন কথা আমায় আজ আর আপনি শোনাবেন না। যদি কিছু বলবার থাকে অন্যদিন শোনাবেন, আজ শরীর মন বড় ক্লান্ত—" সে টলিয়া বিছানার উপর ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

অমলা ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "একটু শুয়ে থাক। মাথাটায় একটু বাতাস

দিই প্রকাশ!" যামিনী বালিশে মাথা দিয়া চোখ বুজিল, "না, না, কিছু ব্যস্ত হবেন না, একটু শুয়ে থাকি এমনি।" সে চোখ বুজিল।

অমলা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া বাহির হইয়া আসিল, মনে মনে বলিল, "ঘুমিয়ে পড়ল কি? থাক, আর সইতে পারছে না! একদিকে প্রত্যাখ্যানের ব্যথা, অভাবনীয় প্রাপ্তির বিস্ময়—সমস্তা ওকে দিশাহারা করে দিয়েছে। জানি না পোড়ামেয়ের কপালে কি আছে! এক দিন ওঁরা তো প্রায় নাবালিকা মেয়েকে যেচে নিচ্ছিলেন, তখন অণিমার প্রতি ওর টানের ভয়েই কেন যে দিলুম না! সুসজ্জাকে ও ভালবাসেনি, দু'জনে একটুও বনেনি, তা বলে জ্যোতির সঙ্গে সে ভয় ছিল না! দুজনেই সুখী হতে পারতো। এ হ'লো শুধু আমারই মনের সঙ্কীর্ণ সন্দিগ্ধতার জন্যেই। নাটক তৈরী করে দিলুম, নিমিত্ত হয়ে এই আমিই।"

জ্যোৎস্না তখন যামিনীর বসিবার ঘর গুছাইতে গুছাইতে শুধু-গলায় অনতিউচ্চস্বরে একটা গান গাহিতেছিল।

গন্ধে ভরেছে দিশি রজনীগন্ধা,
শান্ত গগনতলে ধীরে নামে সন্ধ্যা।

পবন বহিছে মর্মরি শুন, কি! পরাগরেণুতে ভরেছে কেতকী,
ফুলেরা গোপনে কহিছে কত কি! গাহিছে বিহগী মধুর সুছন্দা।
কুটজ কুসুমে অর্ঘটি রচিয়া, দীর্ঘ এ দিবস রয়েছি বসিয়া।

রবো কি এমনি, যাবে কি যামিনী,
গোপনের এ পূজা তুমি লবে কি আসিয়া।

এর ঠিক পরের দিন অমলা আসিতেই যামিনীও কিছুমাত্র বাগাড়ম্বর না করিয়া সোজা বলিয়া বসিল, "আচ্ছা দিদি! জ্যোৎস্নাদেবীর বিয়ের জন্য এত ব্যস্ত হয়েছেন কেন আপনারা? পড়াশোনা পছন্দ করেন যখন, আরও কিছুদিন তাই নিয়েই থাকুন না।"

অমলা উত্তর করিল, "সে তো তাই চায়। বাবা আর পড়াতে রাজী নন। বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান।"

"আমায় যখন আপনার লোকের মতই আপনারা দেখেন তখন আমার উপর এই সামান্য ভারটা দিতে কিছু আর কুন্ঠিত হ'তে পারেন না। এই পড়ানোর ভারটা আমাকেই দিন না। কাকাবাবুর ছেলে নেই আমিই ত তাঁর ছেলে। তা' ছাড়া তাঁর উপরে আমারও তো কিছু কর্ত্তব্য রয়েচে, নেলকে তিনি যে রকম যত্ন করেন।"

অমলা আরক্তমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল,—"না যামিনী, তা হবে না। সে বাবা কিছুতেই রাজী হবেন না। আর জ্যোৎস্না—সেও যে এ রকম ক'রে তোমার দান নেবে, আমার তো এমন ভরসা হয় না। যদি তাকে দয়া দেখাতেই চাও, তার ভবিষ্যৎটা একটু ভেবে দেখো। তুমি তাকে ত্যাগ করলে তার কি দশা হবে মনে ক'রে দেখো তো! আইবুড়ো থেকেই চাকরী করে জন্ম কাটাবে? তোমাকে বেশী আর কি বলবো! বাবা মেয়েদের চিরকুমারী থাকা পছন্দ করেন না। তিনি ওর বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চান। জ্যোৎস্না ছেলেমানুষ হ'লেও—বাইরে খুব শান্ত হ'লেও তার মনের দৃঢ়তা বজ্রের মতই কঠিন। যেটা সে স্থির করে, তা' থেকে কেউ তাকে ফেরাতে পারে না। আমি বিলক্ষণ বুঝেছি,

—এটা তার বুকে সেই রক্তেরই লেখা।" চোখের জল চোখে চাপিয়া অমলা গমনোদ্যতা হইল।

যামিনী এতদূর কল্পনা করে নাই। অমলার শেষ কথা কয়টা তাহার বুকে বাজিল। মর্মপীড়িত হইয়া সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল,—"আমি যে কত নিরুপায়, আপনারা জানেন না! যদি অনুচিত মনে না করেন, তা' হ'লে একদিন গিয়ে আমি তাঁকে এ সম্বন্ধে আমার যা বলবার আছে, সব বুঝিয়ে বলবো।"

অমলা ভাবিল মন্দ কি! ইহার মনটা ঈষৎ ভিজিয়াছে, হয়ত জ্যোৎস্নাকে দেখিলে, কথা শুনিলে আরও একটু নরম হইতে পারে। এই ভাবিয়া সে বলিল,—"সে তো এ বাড়ীতে এসেছে। আমি তাকে ডেকে দিচ্চি, তুমি যদি তাকে বুঝিয়ে তোমার মতে রাজী করতে পার, সে তো ভালই।"

এই বলিয়া তাহাকে ভাবিবার অবসর না দিয়াই সে চলিয়া গেল। যামিনীও ঘরে না বসিয়া বাহির হইয়া আসিতেই বাগানের বাঁধানো চাতালে জ্যোৎস্না ও নলিনীকে দেখিতে পাইল। জ্যোৎস্না ফুলসাজ-সজ্জিতা নলিনীকে মৃদুকণ্ঠের গানের তালে নাচাইতেছিল।

নলিনী তাহাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল। "বাবা! বাবা! জ্যোতি মাসিমা আমায় আরও দুটো নাচ শিখিয়েছেন. একটা বর্ষার আর একটা শরৎকালের—তুমি দেখবে!"

ভিতর হইতে অমলা ডাকিল, "নলিনী দুধ খেয়ে যাও তো মামণি" নলিনী ছুটিয়া চলিয়া গেল।

যামিনী যখন অমলাকে সান্ত্বনা দিবার ছলেই কথাটা বলিয়াছিল, তখন একবারও ভাবে নাই, ইহারই মধ্যে এই দুরূহ কার্য সাধন করিবার জন্য নিজেকে তৈরি করিতে হইবে। একটুখানি ভাবিয়া লইয়া অভিনয়ের নট

যেমন নিজের স্থান গ্রহণ করে, সেও তেমনই করিয়াই চিত্ত হইতে যথাসম্ভব দ্বিধা-লজ্জা সরাইয়া দিয়া সহজ ভাব অবলম্বন করিয়া বলিল,—"এস, এইখানে বলা যাক জ্যোৎস্না।"

ইচ্ছা করিয়াই অন্তরঙ্গ আত্মীয় ভাবে কথা কহিল। অনিচ্ছাকুণ্ঠিত-পদে জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া লোহার বেঞ্চের সামনে যামিনীর পাশের দিকে থমকিয়া দাঁড়াইল। তার পা দু'খানা কাঁপিতে ছিল। হৃত-পদতল যেন শীতার্ত্তের মত অসাড় হইয়া আসিতেছিল তিনি কি সব জানিয়াই তাকে ডাকিয়াছেন? কিছু বলিবেন বলিয়া? কি বলিবেন? হয়ত তার গোপন অপরাধের দুঃসাহসিকতার জন্ম তিরস্কার করিবার জন্যই তাহাকে ডাকিয়াছেন, নহিলে আর কি? লজ্জায় সঙ্কোচে মর্শ্মের ভিতরে সে মরিয়া যাইতে লাগিল। কি বলিবেন? এই অপরাধের শাস্তি স্বরূপই কি তবে নলিনীকে তিনি তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতেছেন? মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত চিত্ত মন দারুণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কি ক্ষতি? এতে তাঁর কি ক্ষতি? কোথায় কোন্ সূর্য্যমুখী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া তাঁর মমতাহীন কিরণের দীপ্ত তেজে পুড়িতেছে, সে সংবাদ কি সূর্য্য রাখিবেন? সে খোঁজ-খবর খুঁটিয়া বাহির করিয়া তার পুড়িবারও সুখ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার জন্য মেঘ ঢাকা দিবারই বা এমন কি তাঁর দরকার পড়িল?

যামিনী সঙ্কোচহীন চোখের দৃষ্টি সম্মুখবর্ত্তিনীর লজ্জাসঙ্কুচিত আনত নেত্রের উপর স্থির করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল,—"তোমার সঙ্গে নলিনীর সম্বন্ধে কিছু পরামর্শ করব ব'লে ডেকেচি। তুমি তাকে বড্ডই স্নেহ ক'রো, তুমিই তার কিসে ভাল হবে সেটা ঠিক বুঝ্‌তে পারবে। ব'স না, এই যে এইখানে বসে পড়ো।" এই কথা বলিয়া সে বেঞ্চিটার পাশের দিকে সরিয়া বসিয়া তাহাকে বসিবার জন্ম অনেকখানি স্থান ছাড়িয়া দিল এবং পুনশ্চ কহিল,—"ব'স জ্যোৎস্না!"

এতদিন পরে আজই প্রথম যামিনী তাহাকে 'সে' বলিয়া বিশেষ করিয়া তাহাকে দেখিল। ছোট্ট একটি শান্তশিষ্ট মেয়ে, এইটুকু মাত্র পরিচয় মনে রাখিয়া ইতঃপূর্ব্বে সে যে তাহাকে আর কোন দিনই তেমন করিয়া লক্ষ্য করে নাই, ইহাতে তাহার অপরাধও এমন কিছু ছিল না। সে বরাবরই তাহার সাক্ষাতে কেমন একটা সঙ্কোচ করিয়া সরিয়া থাকিয়াছিল, যাহাতে বাধ্য হইয়া তাহাকে তার কাছে সঙ্কুচিত হইতে হইয়াছে। আজই প্রথম সে নিজের অন্তরস্থ কৌতূহলের বশেই যখন তাহার আনত মুখে সমালোচকের পর্য্যবেক্ষণ-দৃষ্টি প্রেরণ করিল, তখনই তার সেই অনুসন্ধান-দৃষ্টি বিস্ময়পূর্ণ প্রশংসায় চকিত হইয়া উঠিল। কি মিষ্ট, কি স্নিগ্ধ সেই ছোট্ট মুখখানি! সত্যই যেন শরৎকালের ফুটফুটে জ্যোৎস্নাটুকু!

জড়িতপদে কোন রকমে আসন গ্রহণ করিয়া জ্যোৎস্না যেন বাঁচিল। ডাকার উদ্দেশ্যটা জানিতে পাইয়াও সে ভিতরে ভিতরে অনেকটাই আশ্বস্ত ও নিজেকে কতকটা অনুগৃহীতও বোধ করিতেছিল। সে যে তাঁর পরামর্শের ভিতর আসিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, ইহাতে সে খুব একটা আত্মপ্রসাদও অনুভব করিল। কিন্তু বক্ষের বিপুল আলোড়ন সে তো কোন মতেই রুদ্ধ করিতে পারিতেছিল না। স্টীমারের চাকা পিছনদিকের জলকে যেমন করিয়া সশব্দে আলোড়িত করে, তেমনই করিয়া তার হৃৎপিণ্ড বুকের ভিতর রক্তের ঢেউ তুলিতে লাগিল।

যামিনী একখানা বই হাতে করিয়াই আসিয়াছিল, সেখানার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে সেই দিকে চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিল,—"আমার সময় বড্ড কম, আমি যে নলিনীকে ভাল রকম দেখা-শোনা করতে পারি এমন ভরসা হয় না। এখন তুমি দেখছো বটে, কিন্তু বরাবরই তো তোমার সে সুবিধা হবে না। তা' ছাড়া আরও একটা কথা আছে, তোমার নিজের শিক্ষাই এখনও সম্পূর্ণ হয় নি, এখন থেকে

তুমি একটি শিক্ষার শিক্ষার ভার নিলে নিজের ভবিষ্যতের ক্ষতি করা হবে। সেইজন্তে আমার বড্ড ইচ্ছে তুমি আরও কিছুদিন ধরে আরও একটু পড়া-শোনা ক'র। তারপর ওকে একটু দেখলে সে দেখাটা তখন ভাল হবে। ততদিনের জন্তে আমি একজন লোক ঠিক করেছি। এখন আমার নিজের স্বার্থের জন্তে আমি তোমায় একটি বিশেষ অনুরোধ করবো। 'না' বলো না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া যামিনী একবার উৎসুক নেত্রে জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চাহিল। সে ঈষৎ মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল মাত্র, কিন্তু কলে যেমন তেমনই স্তব্ধ ও স্থির রহিল। মুখের ভাবে কোন প্রকার আগ্রহ বা অনাগ্রহ কিছুই তার প্রকাশ পাইল না। ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত যামিনী কহিতে লাগিল,—"আমার ইচ্ছা একজন ভাল শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী তোমার জন্তে আমিই নিযুক্ত ক'রে দিই। এতে তুমি 'না' বলতে পাবে না কিন্তু, কেমন? যেহেতু আমার মেয়ের ভবিষ্যতের জন্তেই তো আমি এটা করতে চাচ্ছি। আর শুধু তোমার জন্তেই নয়। শিক্ষয়িত্রীটির জন্তে আরও দু'একটি ছাত্রীও আমি জোগাড় করে দেব, এই রকম করলে ক্রমে হয়ত একটি শিক্ষয়িত্রী-সমিতিও গড়া যেতে পারবে।"

জ্যোৎস্না ঈষৎ চঞ্চল হইয়া বিদ্যুৎ-চমকের মত একবার বক্তার দিকে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া পরক্ষণে তার চক্ষের সহিত মিলিত-দৃষ্টি হইয়া দৃষ্টি নত করিল। তার পরিপুষ্ট গণ্ড ও আকর্ণ-ললাট সিঁদুরমাখা হইয়া উঠিয়াছিল। এ কি অযাচিত করুণা?—না, এ সব বিধির কাণ্ড!

"তুমি এতে অমত ক'রে আমার মনে কষ্ট দেবে না, এই বিশ্বাসেই তোমার সব কথাই বল্লুম। তোমার বাবাকে আমি কাল গিয়ে ব'লে তাঁর মত করিয়ে আসব। তিনি আমায় সন্তানতুল্য স্নেহ করেন, তাঁর জন্তে আমি ভাবি না। বুঝে দেখ, তোমরা আমায় সাহায্য না করলে

মেয়েটিকে নিয়ে আমি বড্ড বিপদেই পড়বো। তার মা নেই, আর তোমার কাছে সব কথা খুলে বলাই ভাল, কারণ সে তোমার ভালবাসার সামগ্রী, তার সম্পূর্ণ অবস্থাটা তোমার জেনে রাখাই তো উচিত—কখনও তার মাতৃস্থান কেউ অধিকার করবে না। কেন তা'ও বলি শোন—এসব কথা অন্য কারু সঙ্গে আমি কোন দিন কই না, কিন্তু উচিতবোধে তোমায় আজ শুধু বলছি—কারণ, তোমার মত ওকে তো কেউ অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে না। আমি আমার বাবার আদেশেই শুধু নলিনীর মাকে বিবাহ করেছিলাম, কিন্তু সে বিয়ে খুব সম্ভব আমারই মনের পাপে দু'জনকেই সুখী করতে পারে নি। এ রকম অবস্থায় আবার আর একটা বিয়ে করা তো আমার পক্ষে সম্ভবই নয়, এবং মনুষ্যত্বের বিরোধী। তুমি তা হ'লে নিজের সম্বন্ধে একটুখানি ভেবে দেখো, আর যা' বলবার আছে দিদির কাছেই না হয় ব'ল, কিন্তু আমায় যদি পর ভেবে সরিয়ে দাও,—তা' হ'লে বুঝব নলিনীর প্রতি তোমার যথার্থ স্নেহ নেই। আর,—তোমাকে উপলক্ষ করে একটা বড় কাজের মূলপত্তন করবার ইচ্ছেও নেই।"

যামিনী যতক্ষণ কথা কহিতেছিল, বরাবরই গোপনে গোপনে তার দৃষ্টি জ্যোৎস্নার ভাব-পর্য্যবেক্ষণের দিকে নিবদ্ধ ছিল। তাহার কণ্ঠ শেষের দিকটায় মৃদু হইতে মৃদুতর ও স্নেহপূর্ণ সহানুভূতিতে উদ্বেলিত হইয়া আসিল। যদি তাহার ও অমলার সন্দেহ সত্য হয়, তবে না জানি সে ওই মৌন হৃদয়ে কি তীক্ষ্ণ শরই না বিদ্ধ করিতেছে।

তার কথা শেষ হইবার পর দুই তিন মিনিট মাত্র অপেক্ষা করিয়া জ্যোৎস্না উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখ না তুলিয়া চোখ নত রাখিয়াই সে তাহাকে নমস্কার করিল এবং তার পর ধীরপদে সেখান হইতে ভিতরে চলিয়া গেল। একটি শব্দও সে উচ্চারণ করিল না, এমন কি একটুখানি চোখের চাহনিও রাখিয়া গেল না, যেমন আসিয়াছিল তেমনি নীরবেই গেল।

জ্যোৎস্না চলিয়া গেলে যামিনী একটা সুদীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিল, "চমৎকার মেয়ে!" কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া দেওয়ালের উপরে চড়াইয়া দেওয়া একটা ফুলন্ত লতার প্রতি চাহিয়া রহিল; তাহারই চিত্তভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া একটা টিকটিকি বলিয়া উঠিল,—ঠিক ঠিক!—

যাহা জানানো আবশ্যক ছিল, তাহা জানাইয়া দেওয়া হইয়া গিয়াছে। জ্যোৎস্নার কাছেও সম্ভবতঃ বাহিরের খবরটা অজ্ঞাত নাই। ইহা হইতে সে প্রকৃত ব্যাপারটা বাহির করিয়া লইতে পারিবে এবং তাহার উপরে যদি তার কিছু মাত্র আকর্ষণ আজও পড়িয়া থাকে, তাহাও সে ফিরাইয়া লইতে নিশ্চয়ই সচেষ্ট হইবে। সেই জন্যই সে তাহাকে শিক্ষার ছলে কিছু সময় দেওয়াইতেও চায়। সে আবার আত্মগত বলিল,—"ঈশ্বর মেয়েটির মঙ্গল করুন! আমার দ্বারা যেন ও অসুখী না হয়।"

অমলা বিদায় লইতে আসিয়া সন্দিগ্ধচক্ষে পুনঃ পুনঃ তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল। যামিনী সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনাকে কিছু কি বলেছেন?" অমলা মাথা নাড়িয়া বলিল,—"কিছু না। শুধু বলেছে নলিনীকে যেন আমি মধ্যে মধ্যে দেখতে পাই। বলবার সময় তার চোখ দু'টো ছল ছল করছিল। সে যে ওকে কি ভালবেসেছে প্রকাশ সে তোমায় আমি কি বলবো। ঘুমন্ত অবস্থায় ওর নাম ক'রে ওঠে। একখানি মাতৃস্নেহ এই বয়সে ওর মধ্যে যে কোথা থেকে এলো আমি তো ভেবেই পাইনে!"

এই কথাগুলার গূঢ় অর্থ যামিনীকে ভিতরে ভিতরে বজ্রশেলের মতই আঘাত করিল। সে ব্যথিত লজ্জায় মাথা নত করিয়া ভাবিতে লাগিল,— একটি কুসুমপেলববৎ সুকোমলপ্রকৃতি-জীবনপারিজাত যদি তার এক বিন্দু সহানুভূতি চাহিয়া হতাশায় ঝরিয়া যায়, তবে সে কি এর জন্য কোনখানে জবাবদীহিতে পড়িবে না?

সেদিন বিদায়কালে একটা বিষাদের মৌনতা কথাবার্তার উপরেই বিস্তৃত হইয়াছিল। যামিনী অমলাদের গাড়িতে তুলিয়া দিবার জন্ত সঙ্গে আসিল, এদের সঙ্গে সহজ ভাবে কহিবার মত কোন কথা না পাইয়া মনের মধ্যে বিব্রত হইতেছিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যায় হিম পড়িয়া কুয়াশার মত চারিদিক ঝাপ্‌সা করিয়া দিয়াছে। আকাশে অল্প অল্প মেঘও জমিয়া উঠিয়াছে। যামিনী অমলার পাশে পাশেই চলিতেছিল, কিন্তু কাহারও যেন আজ কথা জুটিতেছিল না। গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি আসে নাই, গাড়িখানা বারান্দার বাহিরে কাঁকর-ফেলা পথের উপরে দাঁড় করাইয়া সহিস লণ্ঠনের বাতি জ্বালাইতেছিল।

যামিনী নীরব ছিল বটে কিন্তু তার মনের মধ্যে যে একটা তুমুল আলোড়ন চলিতেছিল, তাহা বুঝিতে অমলার একটুও কষ্ট পাইতে হইতেছিল না,—সে মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিল। চলিতে চলিতে সহসা চিন্তিতভাবে যামিনী পিছনে চাহিয়া দেখিল। নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটিকে একখানি প্রাণহীন বিসর্জ্জনের প্রতিমার মতই প্রতীয়মান হইতেছিল। অবনত মুখখানির উপরাংশে খণ্ডচন্দ্রের মত নির্ম্মল ললাট ঘেরিয়া মেঘপুঞ্জের ন্যায় কাল নরম চুলগুলি ঈষৎ ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। তারই নীচে তুলি-আঁকা সরু দু'টি ভ্রু-লেখা ও পাতা ঢাকা পদ্মকুঁড়ির মত দু'টি চোখের অদৃশ্য আভাস এবং একখানি নবকিসলয় সদৃশ কোমল মৌন অধর অকস্মাৎ এই শান্তিময় অন্ধকারের আধ ছায়ায় বিশ্বসৌন্দর্য্যের মোহপ্রাণ লাভ করিয়া যেন নব কান্তের সহস্র শোভায় ভরিয়া উঠিল। বিশ্বজীবনের মূল যে প্রেম—তাহা সেই সৃষ্টির পূর্ব্বাবধি বিশ্ব-বিধানের অন্তরের মধ্যে অধিষ্ঠিত রহিয়া তাঁহাকে সৃষ্টি-উন্মুখ করিয়াছিল,—বিশ্বে একমাত্র যাহা তাঁহারই প্রকাশরূপে শত নামে শত

ধারে প্রবাহিত রহিয়াছে—যাহা ক্ষেত্রে শস্য, বৃক্ষে পত্র ও চিত্তে আনন্দ দান করিয়া ইহাকে মরুভূমির পরিবর্ত্তে আনন্দকাননে পরিবর্ত্তিত করিয়া রাখিয়াছে, জ্যোৎস্না যেমনই তার নত দৃষ্টি উন্নমিত করিল, অমনই সহসা যেন যামিনী প্রজ্বলিত গাড়ির বাতির আলোটাতে তার কৃষ্ণ তারকার মধ্যে তাহারই সেই অক্ষয় অব্যয় জ্যোতিঃ মূর্ত্তরূপে দেখিতে পাইল। তাহার পক্ষে অপূর্ব্বদৃষ্ট হইলেও এ বস্তু চিনিতে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন রহে না। হীরাকে যাচাই না করিলেও আনাড়ি লোকেও হীরা বলিয়া চিনিতে পারে। একটা গভীর করুণাপূর্ণ সহানুভূতির সহিত অন্তরের মধ্যস্থল একটা অননুভূত আবেগে মুহূর্ত্তের জন্য স্পন্দিত হইয়া উঠিল। আহা! কেন সে তাহাকে তার প্রথম জীবনে পাইল না?—সুনন্দা যদি জ্যোৎস্না হইত!—

সেই মুহূর্ত্তে সহসা দ্রুম করিয়া একটা অশ্রুতপূর্ব্ব ভীষণ শব্দ হইয়া নিমেষে তাহার কানের পাশ দিয়া একটা কি যেন শঁা করিয়া বাহির হইয়া গেল এবং ইহার পরে উপর্য্যুপরি আরও গোটাকতক শব্দ মুহুর্মুহুঃ বাতাসে গর্জ্জিয়া উঠিল ও স্তব্ধ প্রকৃতিকে চমকিয়া দিয়া শূন্যে শূন্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া রহিল। কেমন করিয়া কি ঘটিল, ঠিক বলা যায় না,—একটি মুহূর্ত্তেই যেন সকলেই বজ্রাহতবৎ নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছিল এবং শুধু এইটুকুমাত্র অনুভব করিতে পারিয়াছিল, যে প্রথম শব্দটার সঙ্গে সঙ্গেই কেহ একজন অস্ফুট চিৎকার করিয়া সবেগে যামিনীর দেহের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে দু'হাতে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। এই শব্দগুলার শেষের সঙ্গেই একটা মৃদু আর্ত্তনাদের সহিত সে তার পদতলে আহত বিহঙ্গের মত লুটাইয়া পড়িয়াছে।

একটি ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তের মধ্যেই এত বড় কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল। অমলা নিজের জায়গায় দাঁড়াইয়া মূর্চ্ছিতাপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। সহিস কোচম্যানগুলা পর্য্যন্ত পাথরের মত জমিয়া গিয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে যামিনীরই

অস্ত্রাহত শরীরে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। আসন্ন মৃত্যুর ভীষণ গর্জন তখনও ব্যর্থ ক্রোধে তার চারিদিক বেড়িয়া বেড়িয়া দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া তীব্র বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছিল এবং ধূম্রকুণ্ডলী লহরে লহরে ভাসিয়া ঘুরিতেছে। সমস্ত শরীরের নিশ্চল রক্তস্রোত হিম শীতল হইয়া প্রতি শিরা-উপশিরার ভিতর অকস্মাৎ বরফের মত জমিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যেই একটা নিদারুণ সন্দেহে তাহার নিস্তব্ধ ধমনী সেই সংহার-শব্দেরই প্রতিধ্বনি তুলিয়া বক্ষের ভিতর আছ্‌ড়াইয়া পড়িল। তার পদতলে এ কে? যার উষ্ণ শোণিতের ধারায় তার শীতল পদতল এতক্ষণে ধৌত হইয়া গেল! কম্পিত দেহ অবনত করিয়া সে গভীর উদ্বেগের মধ্য হইতে সেই মৃত্তিকা-শায়িত দেহের উপরে কোনমতে চাহিয়া দেখিল। সংশয়হীন সত্য! নিষ্ঠুর সত্য! সেই নিশ্চেতন, প্রাণহীনবৎ শরীর জ্যোৎস্নার! সে-ই তাকে নিজের ক্ষুদ্র দেহ দিয়া ঢাকিয়া তাহার এই আকস্মিক নিষ্ঠুর মরণকে নিজের পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়াছে। তাহার মুখ হইতে মর্মভেদী আর্তনাদ আকুল বিলাপের মতই নির্গত হইয়া গেল।

হত্যাকারী আর কেহ নয়, ভূষণচন্দ্র। ভূষণ বাগানের ঝোপ হইতে বাহির হইয়া বেড়া ডিঙ্গাইয়া পলাইবার সময়েই ধরা পড়িয়াছিল। চারিদিকে লোক ধর্‌ ধর্‌ করিতেই সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল, বলিল,—"যাক্‌! এক ঢিলে দুটো পাখী শিকার করতে পেরেছি। বাবুকে শয়তানীর হাত থেকে রক্ষা করতে পারিনি, এইভাবে নাগমশাইএর উপকারটা তো করে গেলুম! যামিনী রায় মরেচে তো? তাহলেই পাঁচটি হাজার টাকা পেয়ে যাবো।"

ভূষণের মস্তিষ্কের কাছে বিতাড়িত হইয়া ইদানীং মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, আর সমস্ত ক্রোধ তার পড়িয়াছিল যামিনীর উপরে।

গভীর অনুতাপ যামিনীকে যেন বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল। কি হইল! এ' কি হইতে কি হইল? যে মুহূর্ত্তে তাহার অন্ধ-নেত্র এই মর-জগতে স্বর্গের আনন্দালোক প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তাহার উপরে এ কি ভীষণ বজ্রাঘাত। সমস্ত সংসার যখন সংহাররূপিণী ভৈরবীর আকস্মিক ভৈরব গর্জ্জনে মন্ত্র-সম্মূর্চ্ছিত, সেই প্রলয় বিষাণ একমাত্র গভীর প্রেমকেই কি শুধু পরাভব করিতে পারে নাই! এই নির্ম্মল প্রেমের কি অতুলনীয় শক্তি! জীবনে এবং মরণেও সমান উজ্জ্বলতায় ইহা প্রেম-পাত্রকে ঘেরিয়া অ-বিস্মৃত, অনিদ্রিত জাগরণে জাগ্রত থাকে, এ নিমেষমাত্র আত্মচিন্তা করে না। যেন যুগ-যুগান্তের পরপার হইতেও এই অমর প্রেমের ধারা তাহার উপর ইহার অমৃত কিরণ বর্ষণ করিয়া আসিয়া আজও নির্ম্মল অক্ষয় রহিয়াছে, ইহার পরে এমনই একটা প্রবলতম আকর্ষণ সে সেইক্ষণেই সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব করিল। আর তার বুক ফাটিয়া শোণিতাক্ত হাহাকার উত্থিত হইতে লাগিল। এই অতুলনীয় হৃদয়ের অম্লান মন্দারমাল্য সে কতটুকুই বা পূর্ব্বে হেলায় ফিরাইয়া দিয়াছিল। কেন এই রাবণের শক্তিশেল তাহারই বুকে বিঁধিল না? তার চিরজীবনের সকল জ্বালার যে এই মুহূর্ত্তে অবসান হইয়া যাইত! এ কি অপরিশোধ্য ঋণে এই বালিকা তার এই অনুশোচনাপূর্ণ জীবনটাকে অবিচ্ছিন্ন মহাগ্রন্থি দিয়া বাঁধিয়া দিয়া চলিয়া গেল! এতবড় ঋণভার কেমন করিয়া সে সহ্য করিবে!

যামিনীর গৃহ ডাক্তারে ও নর্সকে ভরিয়া গিয়াছিল। পুলিসের লোকেরও বিরাম ছিল না। কিন্তু আহতা-রোগিণীর নিকট অনতা পূর্ব্বেই

কম। কলিকাতা হইতে সার্জ্জন জেনারেল স্বয়ং আসিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। রক্তস্রাব যখন বন্ধ হইয়া আসিল, তখন তার শরীরে শোণিতের লেশও আর ছিল না। ইন্দ্রনাথবাবু কন্যাকে চুম্বন করিয়া শুধু মৃদুস্বরে কহিলেন,—"মা তোমার জন্যে আমার শোক করবার কিছু নেই, গৌরব-বোধ করবার অনেক আছে। নিজে ধন্যা হয়ে তুমি তোমার মা-বাপকেও ধন্য করেছ। চির শান্তিময়ী ছিলে, সেই শান্তি তোমার অমর লোকেও অটুট্ হোক্।"

ভোরের সময় কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ জ্যোৎস্নাটুকু পত্র-মর্ম্মর উদ্যানতরুর ছায়াতলে ঘুমাইয়া পড়িতেছিল, এমনই সময় নিবন্তপ্রায় জ্যোৎস্না তার স্নিগ্ধ দু'টি নেত্র উন্মীলিত করিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। অমলা ও ইন্দ্রনাথবাবু দুই দিক্ হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিলেন,—"জ্যোৎস্না!" সে পিতার পানে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থ যামিনীর উৎকণ্ঠা-শঙ্কিত আকুল উদ্‌ভ্রান্ত চোখের উপরে দৃষ্টি স্থির করিল। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত তখনও সেই দু'টি শান্ত চোখে কি হৃদয়ভরা প্রেমের জ্যোতিঃ ও সার্থকতার আনন্দ দীপ্যমান হইয়া রহিয়াছিল। সে দৃষ্টি যেন জ্বলন্ত গোলার মত যামিনীর অন্তরের অন্তঃস্তলে গিয়া প্রচণ্ড আঘাত করিল। মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া সহসা সে নিজের কম্পিত উভয় হস্তের মধ্যে তাহার হিম-শীতল একখানা ক্ষুদ্র হস্ত তুলিয়া লইয়া ব্যাকুলস্বরে ডাকিল,—"জ্যোৎস্না! জ্যোতি!"

জ্যোৎস্নার শান্ত অধরে বিজয়ের গৌরব গভীর শান্তির হাসির সহিত মধুরতররূপে ফুটিয়া উঠিল, তাহা আর মিলাইয়া গেল না।······

যামিনী ডাকিল, "দিদি!"

অমলা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। প্রভাতের নির্ম্মল আলোক ক্লান্তিহীন স্নিগ্ধহাস্যে গভীর নিস্তব্ধ গৃহের মধ্যে উঁকি দিয়া দেখিতেছিল। মানবের

সুখে দুঃখে চির-উদাসীনা প্রকৃতি প্রভাত-গগনকে সূর্য্য-কিরণচ্ছটা দ্বারা বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া জলে স্থলে শত বৈচিত্র্য ও ধরণীবক্ষের মুদিত মুকুল ফুটাইয়া বহুল গন্ধের সৃষ্টি করিতেছিল। মানবের চিত্ত-বেদনাকে উপহাস করিয়া স্নিগ্ধ বাতাস সেই গন্ধ বহন করিয়া চিরদিনের মত উপরে নীচে দিকে-বিদিকে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। ইহারই মাঝখানে কত বড় যে একটা মর্ম্মন্তুদ বিপ্লব কাণ্ড ঘটিয়া গেল, তাহার খোঁজ লইবারও যেন কাহারও আবশ্যকতা ছিল না। মানুষের সুখে দুঃখে প্রকৃতি চিরদিনই পরম উদাসিনী,—অথচ সেই নিষ্পাপ নিঃস্বার্থ শোণিতের গাঢ় রক্তিমা এখনও ধরণীর মাতৃবক্ষ ধুইয়া ফেলিতে সময় পায় নাই।

যামিনী বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকার পর মৃদুস্বরে ডাকিল,—"দিদি!" তাহার কণ্ঠে পুঞ্জীভূত অশ্রুজলের সহিত মর্ম্মভেদী যন্ত্রণার হাহাকার ব্যক্ত হইল। অমলা লক্ষ্যহীন দৃষ্টি এতক্ষণে তাহার 'পরে স্থির করিল,—কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল,—"প্রকাশ! ভাই! জ্যোৎস্না আমার কোথায় গেল? আমি যে বড় সাধ করেছিলাম তাকে দিয়ে তোমায় পাব।"

যামিনী আর্ত্ত শিশুর মতই অকুণ্ঠিত সরলতার সহিত রোদন-কম্পিতা অমলার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল,—"তাইত পেয়েছ দিদি! সে যে তার নিজের রক্তধারা দিয়ে তোমাদের সঙ্গে আমায় অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে দিয়ে চলে গেছে। আজ থেকে আমি তোমার, জ্যোৎস্নার বড় আদরের নলিনীও তোমার। তাকে আমি আজ থেকে তোমার কোলে ফেলে দিলুম। তাকে তুমি তার মনের মতন করে মানুষ করো। ভগবান আমায় সংসারী হ'তে পাঠাননি, আমি সংসার হ'তে বিদায় নেবো।"

ফাল্গুনের অতি উজ্জল প্রভাত। নবীন ছন্দের অতি সুমধুর সঙ্গীতে তার সমস্ত আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছে। বাতাস কুন্দ-চামেলীর গন্ধে ভরা।

গরদের চাদরখানি গায়ে টানিয়া তটচুম্বি জাহ্নবীতরঙ্গের কুলকুলু ধ্বনি-নিনাদিত সেই অজস্র ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা প্রভাত-বায়ু-সেবিত উদ্যানবেদিকায় আসন করিয়া দাদামহাশয় অণিমার পত্রখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে মধ্যে মধ্যে পথের দিকে চাহিতেছিলেন। যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

পত্রখানাতে অনেক কথাই ছিল।—সে লিখিয়াছে,—"তুমি লিখেছ 'আমি বরাবরই তাঁকে পেয়েছিলাম, কেবল আত্মবিস্মৃতির জন্য নিজে সেটা অনুভব করতে পারিনি। এইজন্যেই আমাদের একজন পথ-প্রদর্শক গুরু চাই, যিনি জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দিয়ে চোখ খুলে দিতে পারেন।' এই কথা তিনিও আমায় কতবারই বলেছিলেন। উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছি আমি। দাদামশাই! তুমি যা' বলেছ সবই সত্য! তিনিই আমার গুরু। তাঁকে আমার জীবনে না পেলে তোমায় আমি হয়ত চিনতে পারতাম না। কিন্তু তুমি যে আমার কি, সে শুধু আমিই জানি! সমস্ত যুক্তি সমূহের তর্ককে দু হাতে ঠেলে ফেলে দিয়ে শুধু তোমার মুখের দিকে চাইলেই যে সমস্ত দ্বিধা এক হয়ে যায়, তা' কি তুমি নিজেই জান? জড়-প্রকৃতি যে ওই জ্ঞান ও ওই আনন্দ তোমায় দিতে পারেনি, এতে অণুমাত্র সংশয় স্থান পায় না। যা' তার নিজের মধ্যে নেই, সে জিনিস অন্যকে দিতে সে কোথায় পাবে? ওই আনন্দের বিশোক-জ্যোতি যে পরমাপুরুষের নশ্বর লীলা-সংস্থান মাত্র নয়, যুগ-যুগান্তরের সাধনালব্ধ

ভগবান আর একবার অমর অন্তর আনন্দেই যে এর পর্য্যবসান, তা'ও তোমার মুখের চোখের ওই অনির্ব্বাণ অম্লান আনন্দের স্ফূর্ত্তি নিজের হয়েই নিজেকে প্রমাণ করে দিচ্ছে। দু'বৎসর আগে যে মহাৎ সন্ন্যাসীকে আমি একবারের জন্তে দেখেছিলাম, তখন তাঁর কঠোর মুখের প্রশান্ত শান্তি, আমার চোখে বিশ্ববিমোহন সৌন্দর্য্যের ছায়া ফেলেছিল বটে, কিন্তু তা'তে আমায় শুধু বিস্মিতই করেছিল, বিশ্বাস করায় নি। আজ তোমায় পেয়ে আমি বুঝেছি কে' তাঁর বিশ্ব-রঞ্জন ভূমিকাপাতে তাঁর সেই কঠোর মুখে অমন আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়ে তুলেছিল! এখন আমার এই অশান্ত প্রাণটাকে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি,—সেই শান্তি, সেই তৃপ্তি দিয়ে একে তুমি সফল করে দাও। দাদা আসছে,—তার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করতে চাই না। এ বাড়ীতেও তার স্থান নেই। সে আজ আর আমার ভাই নয়, সে এই বিখ্যাত বংশের আজ পরম শত্রু। বিধর্ম্মী বিদেশী, তাতে এক হীনবংশীয় কন্যা বিবাহ করে সে শুধু সত্যের নিকটেই নয়, সমাজের নিকট, পূর্ব্বপুরুষের নিকটেও ঘোর অপরাধে অপরাধী। আজ বুঝেছি এই জন্তেই সমাজবন্ধনের কতটা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এই জন্তেই এদেশের মনীষীরা এতটা বিরোধী। ভিন্ন সমাজের মধ্যে অবাধ মেলামেশার বিপক্ষতাচরণেরও এই একমাত্র কারণ, তাও এখন আমি বুঝতে পারছি। এই অসম-বিবাহের মত ক্ষতিকর সমাজের পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না। যে সব বংশ আপনাদের মত লোককে বক্ষে ধারণ করে কৃতকৃতার্থ হয়েছিল, সেই বংশেই অদূর ভবিষ্যতে চুনাগলির ইউরেশিয়ানের সৃষ্টি হবে, এর চাইতে জাতীয় অপকর্ষ আর কি হ'তে পারে? গ্লাডষ্টোন বিসমার্ক তো কই এ পর্য্যন্ত এ সম্প্রদায়ের মধ্য হতে সৃষ্ট হতে দেখা গেল না! বাড়ীখানা আমি স্কুলের জন্ত দান করে দিয়েছি,— বাবা আমাকেই এটা দিয়ে গেছেন। এখন আমার বাকি রইল একমাত্র

তোমারই কোল,—আর কিছুই নেই।—তোমার অণিমা।"

সজোজাত নির্ম্মল প্রভাতকে বিস্ময়চমকিত করিয়া মেঘ-বিস্ফুরিত বিদ্যুৎশিখার মত তরুণী সেই সৌম্যমূর্ত্তির পাদতলে মাথা নত করিয়া আকুল কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, "দাদামশাই!"

দুই হাত তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া প্রবীণ কহিলেন, "এস দিদি—এস!—"

সেই আদরপূর্ণ বাহুর মধ্যে নিজেকে নিঃসর্ত্তরূপে প্রদান করিয়া দিয়া সে গভীর অশ্রুভার-রুদ্ধস্বরে কহিল,—"এই নাও—আমায় নাও তুমি,—আমি যে আর সইতে পারচিনে,—চল দু'জনে আমরা অনেক দূরে কোথাও চ'লে যাই, যাবে দাদামশাই!"

এই বলিয়া অণিমা আকুল প্রত্যাশায় সহিত তাঁহার হাস্তস্নিগ্ধ শান্তি দু'টি চোখের উপর গভীর উদ্বেগ-ব্যাকুলতা-ভরা দুইটি চোখের দৃষ্টি সংস্থাপিত করিল।

তার এলোমেলো রুক্ষ চুলের উপর ধীরে ধীরে অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে দাদামহাশয় কহিলেন,—"কর্ত্তব্যকে দণ্ড না ভেবে তাকে আনন্দের দান মনে ক'রে নে না দিদি! আর এই আনন্দের যজ্ঞকুণ্ডে সব অশান্তি-গুলোকে আহুতি দিয়ে দে না ভাই! পালাবি কার ভয়ে?"

"কারুকে ভয় করিনে দাদামশাই! ভয় শুধু আজ আমার [illegible]। তোমায় আমি আর কি লুকবো? অন্তর্যামী তুমি, সবই তো তুমি জান। যা' আমার প্রথম জীবনে হারিয়েছি সে জন্মব্যাপী ক্ষতি আমি তো সইতেও কোনদিন কাতর হইনি। কতকষ্টেই যে তাকে জয় করেছিলুম, সে শুধু আমিই জানি। কিন্তু তাঁর এই মনঃকষ্টের সময় আমি যে তাঁকে দুটো সান্ত্বনার কথা বলতেও আর অধিকারী নই, এইটে আমি যে কোন মতেই

বরদাস্ত করতে পারছি না। নিজে আমি সব বইতে পারি, কিন্তু তাঁর কষ্টই আমার বুকে যে শেল বিঁধছে। মানুষ বড় লোভী, স্বার্থপর! মানুষের মন বড় হালকা। তিনি অন্যকে বিয়ে করেছিলেন, তাতে আমার ততো দুঃখ ছিল না, কিন্তু এ যে একটি অতি বদল লোকের দৃষ্টি দিয়ে তিনি নিজেকে এমন করে আবদ্ধ রাখবেন,—এ আমার যেন অসহ্য হয়েছে। আমারি দোষেই তো এই সব হ'ল। কেন আমি অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে নিজেকে এমন কঠিন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করলাম! সেই তো আমার কাল হ'ল। তাই থেকে সবই হারালাম। এ পৃথিবীর আমার যার যা' ছিল সবই তো চলে গেল। বাবাকে হারালাম, আর তাঁকেও। কিন্তু যা গেছে তা' তো আর ফিরবার নয় তবু আর যেন এবারটা আমি পারছিনে। এখন এস, দূরে নির্জনে দুজনে দু'জনকে নিয়ে স'রে চলে যাই। আমার এই জ্যোতিঃহারা জীবনের একমাত্র আশা-জ্যোতি তোমার কাছে থেকে মনের উপর তোমার ওই আনন্দের ছাপ গভীর চেপে বসবে, যখন মনের মধ্যে আর আশাতৃষ্ণার হাহাকার জেগে উঠবে না, নিজেকে নিজের সমস্ত ভোগ-বর্জনের জন্য তিরস্কার করবে না, যখন সত্যকে শিব, সুন্দর, অন্তরের আনন্দের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিতে পারব, তখন হয়ত আবার এখানে কিছুদিনের জন্যে ফিরতেও পারি। কিন্তু তার আগে আর নয়, এখন কিছুদিন নিজেকে সুদূর নির্বাসনে নির্বাসিত রেখে কঠোর তপস্যার আগুনে দগ্ধ করে তাকে শোধন করতে হবে। শুধু সাহিত্যের 'দম' নয়, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, বিবেক এবং বৈরাগ্য এ সকলগুলিই তো সম্পন্ন হওয়া চাই! এখানের কাজ আমার ফুরিয়েছে, ভগবান স্বয়ং তার নিয়েছেন। যদি কখনও নিজেকে নিজের মনের মত গঠিত পাই, তখন আবার নূতন কর্মক্ষেত্রে, নূতন কর্মের মধ্যে তোমার চরণধূলি মাথায় করে ফিরে আসবো। আজ সবার কাছেই বিদায়।"

দাদামশাই তাহাকে বুকে চাপিয়া মস্তক চুম্বন করিলেন, "তবে তাই চল্ দিদি ! তোকে নিয়ে পালিয়ে যাই। জীবনের দিব্যজ্যোতিঃতে জ্যোতির্ম্মী হয়ে আবার নূতনরূপে তোর এই কর্ম্মজগতে নব আবির্ভাব হোক।"

সমাপ্ত